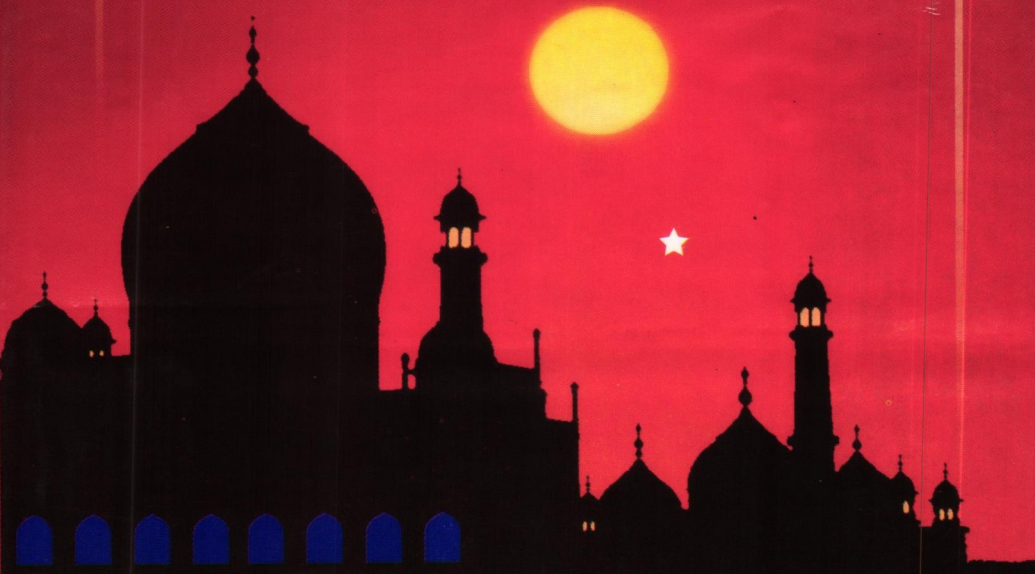
চার ইমামের জীবনী



ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)
ইমাম মালিক (রহঃ)
ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)
ইমাম আহ্‌মাদ বিন হাম্বাল (রহঃ)

চার ইমামের জীবনী

• ইমাম আবু হানিফা (রহ.) • ইমাম মালিক (রহ.)
• ইমাম শাফেয়ী (রহ.) • ইমাম আহ্‌মাদ বিন হাম্বল (রহ.)

মাওলানা লুৎফুর রহমান
কামিল হাদীস ও তাফসীর, মাদরাসা-ই আলিয়া, ঢাকা
বিএ, অনার্স (এরাবিক), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মীনা বুক হাউস
ইসলামী সাহিত্য প্রকাশক

বুকস এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স
দোকান নং-২০৮ (২য় তলা)
দোকান নং-১০৪ (নিচতলা)
৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ইসলামিক পুস্তক (নতুন) মার্কেট
সি-১৭, বায়তুল মোকাররম
উত্তর পূর্ব গেইট
ঢাকা-১০০০

প্রকাশক
আবু জাফর
মীনা বুক হাউস
প্রতিষ্ঠাকাল : ১৯৭৬ ইং

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : জুন-২০০৯ ইং
নবম মুদ্রণ : জুলাই-২০২২ ইং

হাদিয়া : ৩৫০/- টাকা মাত্র

ভিজিট করুন আমাদের ফেসবুক পেইজ
www.facebook.com/minabookhouseofficial
ওয়েব সাইট : www.minabookhouse.pub

ঘরে বসে মীনা বুক হাউস-এর যে কোনো বই পেতে ভিজিট করুন
www.rokomari.com/minabookhouse
অথবা ফোনে অর্ডার করতে কল করুন : ০১৫১৯৫২১৯৭১, হটলাইন : ১৬২৯৭

Sole Distributor :
ALI HASAN CHOWDHURY
IN UK AND EUROPE
Phone : +4407988667613
+4407957564770

কানাডা পরিবেশক :
এ টি এন মেগা স্টোর
২৯৭৬ ডেনফোর্থ এভিনিউ, টরেন্টো
ফোন : (৪১৬)৬৭১-৬৩৮২

প্রচ্ছদ : হামীদুল ইসলাম

মুদ্রণ : দি-দেশ প্রিন্টার্স

বাঁধাই : নামদার বুক বাইন্ডিং

ISBN : 987-984-8991-07-7

সূচিপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

ইমাম আবু হানীফা (রাঃ)

প্রথম পরিচ্ছেদ

নাম, বংশ ও জন্ম পরিচয় ১৭
আজওতী গোলাম নন ১৮
জওতীর জন্মভূমি কোথায়? ১৯
ইমাম সাহেবের সাহাবা-সাক্ষাৎ লাভ ২০
তিনি কেন রেওয়ায়েত করেন নাই? ২১
তিনি সাহাবা হইতে হাদীস শুনেন নাই ২২
ডাক নাম সম্বন্ধে দুইটি কথা ২৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এলম শিক্ষা–পীর ও উস্তাদ ২৩
ওমর-বিন আবদুল আজীজের সৎকার্যকলাপ ২৪
শিক্ষা প্রচেষ্টা ২৫
এলমে কালাম ২৫
এলমে কালামের প্রতি বিশেষ দৃষ্টিপাত ২৬
ফিকাহ ও ইমাম সাহেব ২৬
ইমাম-উস্তাদ হাম্মাদের ব্যক্তিত্ব ও বুজর্গী ২৭
ইমাম সাহেব ও হাদীস শিক্ষা ২৮
কূফা ২৯
বসরা ২৯
এলমে হাদীস, রেওয়ায়েত ও সূক্ষ্মদর্শিতার মাসআলা ৩০
হযরত ইমাম শায়বী ৩১
হযরত সেমাক ৩১
হযরত মুহারিব বিন ওসার ৩১
ইমাম হাদীস হেশাম বিন আরওয়া ৩২
ইমাম সুলায়মান বিন মাহরান ৩২
মুহাদ্দেস ও তাবেয়ীরূপে হযরত কাতাদা ৩২
হাদীসে আমীরুল মুমেনীনরূপে হযরত শুয়বা ৩৩

বিষয় পৃষ্ঠা

ইমাম সাহেবের মক্কা-মদীনা-ভ্রমণ ৩৩
আত্তার বিন আবি রব্বাহের শিক্ষা-মজলিস ৩৪
হযরত আকরমা ৩৫
ফকীহ্ সাবআ ৩৫
ইমাম সাহেব হাদীসের সনদ নিলেন ৩৬
হযরত ইমাম বাকের ও ইমাম আজম ৩৭
ইমাম সাহেবের পদ-গৌরব ৩৮
ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালেক ৩৯
হাদীস শিক্ষার বিভিন্ন ধারা ৪০
শিক্ষা-ধারার ক্রমোন্নতি ৪১
ইমাম সাহেবের হাদীস শিক্ষক ৪১
ইমাম সাহেবের শেখদের বিস্তৃত বিবরণ ৪২
ইমাম সাহেবের তাহকীক ও সতর্কতা ৪২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইমাম সাহেবের শিক্ষা-মজলিস্ ও জীবিকা-নির্বাহের
উপায় উস্তাদের প্রতি আদব ৪৪
শিক্ষা-মজলিসের বিস্তৃতি ৪৫
পদগ্রহণে অস্বীকৃতি ৪৫
সেফাহ ও মনসূরের রক্ত পিপাসা ৪৬
নফসে জকীয়া ও ইব্রাহীমের বিপ্লব ৪৯
ইব্রাহীমের পাশে ইমাম সাহেব ৫০

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইমাম সাহেবের মৃত্যুশোক ৫০
শোক-গীতি ৫১
ইমাম সাহেবের সন্তান সন্ততি ৫২

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ইমাম সাহেবের স্বভাব চরিত্র ও আমল আখলাক ৫৩
ইমাম সাহেবের প্রশংসাবাদে আবু ইউসূফ ৫৪
ইমাম সাহেবের শারীরিক গঠন ও আলাপ-আলোচনা ৫৫
পোশাক ৫৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
দরবারী টুপি	৫৫
সরকারী প্রভাব হতে বিমুক্ত থাকা	৫৬
আজাদী এবং অপরের কাছে না-চাওয়া	৫৮
নিঃস্বার্থ সত্য-প্রচার	৫৮
তেজারত ও দিয়ানত	৫৯
দানশীলতা	৫৯
ছাত্রদের প্রতি আচরণ	৬০
মহানুভবতা	৬০
হৃদয়ের প্রশস্ততা	৬০
পর দুঃখ-কাতরতা	৬১
ধৈর্য্য ও ক্ষমাশীলতা	৬১
অপ্রিয় ব্যবহারের জবাব	৬২
প্রতিবেশীর প্রতি সহৃদয়তা	৬২
মাতৃ-সেবা	৬৪
কুসুমের মত মৃদু, পর্বতের ন্যায় অটল	৬৫
জিহ্বার সতর্কতা	৬৬
জেকের ও এবাদত	৬৬
রোদন প্রবণতা	৬৮
গায়েবী সতর্কতা	৬৮
প্রাত্যহিক সাধারণ কর্তব্য	৬৯
ঈমানদারী	৬৯
ফতোয়া-সংকট	৭০
দীন ও দুনিয়া	৭০
কাজী আবু ইউসূফের প্রতি হেদায়তনামা	৭১
কবিতা আবৃত্তি	৭৫
উপস্থিত বুদ্ধি	৭৫
সঙ্কটময় মীমাংসা	৭৬
একটি হৃদয়গ্রাহী ফতোয়া	৭৭
খলিফা মনসূর ও ইমাম সাহেব	৭৮
খারেজীদের দুর্ব্যবহার	৭৯

বিষয় পৃষ্ঠা

আরও একটি ঘটনা ৮০
উদারতা ৮১

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

গ্রন্থাবলী, চিন্তাধারা, গবেষণা ৮৩
ফিকাহ-আকবর ৮৩
আমল ও ঈমান ৮৫
ঈমান ও আমল দুইটি পৃথক বস্তু ৮৬
মরজিয়া-বিভ্রাট ৮৬
ইমাম সাহেবের পত্র ৮৮
ঈমান কম-বেশী হওয়া ৯০
ঈমানের দিক দিয়ে সকলই সমান ৯০
কেবলাওয়ালাগণ সব মুমিন ৯২

সপ্তম পরিচ্ছেদ

হাদীস ও উসুলে হাদীস ৯৩
মুজতাহেদ ও মুহাদ্দেসে পার্থক্য ৯৪
খুলাফায়ে রাশেদীনের অল্প হাদীস-বর্ণনা ৯৪
ইমাম শাফেয়ীর সাথে ইমাম বোখারী ও মুসলেমের সম্বন্ধ ... ৯৫
মাহাদ্দেসীনদের মধ্যে দুইটি দল ৯৫
আহলে রায় উপাধি ৯৬
এজতেহাদের শর্ত ও মুজতাহেদরূপে ইমাম আবু হানীফা ৯৮
ইমাম আবু হানীফা সম্বন্ধে মুহাদ্দেস জাহবী ৯৯
হাদীস সঙ্কলনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ১০০
হযরত ওমর ও হাদীস-প্রচার ১০১
হাদীস সঙ্কলনে অসাবধানতার কারণ ১০২
হাদীসের সাথে অ-হাদীস কিরূপে মিশল? ১০৪
রদবদল ও রূপ পরিবর্তন ১০৪
সহী হাদীস অতি কম ১০৫
তিনি কার ভক্ত ছিলেন? ১০৫
রেওয়ায়েতে ইমাম মালেক ও ইমাম আবু হানীফা ১০৬
সহী হাদীস ও ইমাম শাফেয়ী ১০৬

বিষয়	পৃষ্ঠা

রেওয়ায়েতের নির্দিষ্ট শর্তাবলী ১০৭
ভাব-ধারার ভিত্তিতে রেওয়ায়েত ১০৯
ভাব-ধারানুযায়ী রেওয়ায়েতের সতর্কতা ১১০
উদ্দেশ্য সাধনে সাহাবাদের কম বেশী ১১১
ভাব-ধারানুযায়ী রেওয়ায়েতে ইমাম সাহেবের উসুল ১১২
উসূল-অনুভূতি ১১৩
যে হাদীস অকাট্য বুদ্ধির বিরোধী তা সহী নয় ১১৪
হাদীস ও কেয়াস ১১৫
কেয়াসের বিভিন্ন অর্থ ১১৬
তাহকীক ও বিস্তৃত ব্যাখ্যার পন্থা ১১৭
হাদীসের সমূহ স্তর ও পার্থক্য ১১৯
মুতাওয়াতের ১২০
মশহুর ১২০
আহাদ ১২০
আখবারে আহাদ সম্বন্ধে দুটি কথা ১২১
হাদীসকে ধারণামূলক বলবার সমূহ কারণ ১২২
দুরস্তি ও দুরস্তি-ত্রুটি সম্বন্ধে মতবিরোধ ১২৩
একভাবাপন্ন হাদীস ১২৪
লোক-যাচাই ১২৫
রেওয়ায়েতের ত্রুটি ও শুদ্ধি সম্বন্ধে মতবিরোধ ১২৫
উদ্দেশ্যের পরিপূর্ণতা ১২৬
খবরে ওয়াহেদ অকাট্য নয় ১২৮
এলমে কালামে এর প্রভাব ১২৮

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ফিকাহ্-বৈশিষ্ট্য ১২৯
ফিকাহর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ১২৯
আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) ১৩১
ইব্রাহীম নখয়ী (রাঃ) ১৩৩
ফিকাহ-সঙ্কলন ও ইমাম সাহেব ১৩৪
ফিকাহ-যাচাই এ ছাত্র-সহায়তা ১৩৫
যাঁচাই-কষ্টিপাথর ১৩৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
আফীয়া	১৩৬
সভার সাধারণ নিয়ম	১৩৬
অধিকাংশ শাসনকর্তাই হানফী ছিলেন	১৩৭
হানাফী মাজহাবের জনপ্রিয়তা	১৩৮
অন্যান্য ইমামদের প্রসার লাভের ভিত্তিভূমি	১৪০
ফিকাহ-সংক্রান্ত মাসায়েলের তফসীর	১৪২
মাজহাবী ও অ-মাজহাবী হাদীসাবলীর পার্থক্য	১৪২
যে মাসআলা তশরীয়ী নয়	১৪৪
মাসআলা যাচাই কখন শুরু হয়?	১৪৬
ওয়াসেল বিন আতায়া ও ফিকাহর কতিপয় কায়দা	১৪৬
উসূলে ফিকাহর ভিত্তিভূমি	১৪৭
নবম পরিচ্ছেদ	
হানফী ফিকাহ ও রাজ্য পরিচালনা	১৪৮
হানফী ফিকাহ ও বুদ্ধি-কষ্টিপাথর	১৪৯
ইমাম রাজীর মতামত	১৫২
হানফী ফিকাহ ও জাকাতের মাসায়েল	১৫৫
হানফী ফিকাহ অতি সহজ ও সরল	১৫৫
হানাফী ফিকাহ অত্যন্ত প্রশস্ত ও সভ্যতা-মুখী	১৫৭
বিবাহ	১৫৭
বিবাহে পাত্রীর অধিকার	১৫৮
বিবাহের মূল প্রয়োজন	১৬২
জিম্মিদের অধিকার	১৬৩
শরীয়ত ও হানফী মাজহাব	১৬৭
হানফী ফিকাহ হাদীস-বিরোধী নয়	১৬৮
এক তায়াম্মুমে কয়টি ফরজ আদায় হতে পারে	১৬৯
পানি ও তয়ম্মুম	১৬৯
প্রতিশোধ গ্রহণ	১৭০
অংশ বণ্টন	১৭২
দশম পরিচ্ছেদ	
ইমাম সাহেবের নামজাদা ছাত্র	১৭৩
মুহাদ্দেস-ছাত্র	১৭৩

বিষয় পৃষ্ঠা
এয়াহয়া বিন জাকারিয়া বিন আবি মায়েদা ১৭৬
হযরত ওকী' বিনেল জরাহ ১৭৬
হযরত দাউদ তায়ী ১৭৭

একাদশ পরিচ্ছেদ

ফিকাহ-বিশারদ কাজী আবু ইউসূফ ১৭৮
তাঁরহযরত ইমাম মুহাম্মদ (রাঃ) ১৮২
জামেয়ে সগীর ১৮৪
জামেয়ে কবীর ১৮৫
জিয়াদত ১৮৫
কিতাবুল হজ্জ ১৮৫
সীয়রে সগীর ও কবীর ১৮৬

ইমাম মালেক (রাঃ)

বৈশিষ্ট্য ১৮৭
জন্ম, বংশ ও শৈশব ১৮৭
শিক্ষা, লালন-পালন, ফিকাহ-জ্ঞান ও হাদীস-সঙ্কলন ১৮৮
মদীনার ফকীহ সাহাবা ১৮৮
সাহাবাদের ছাত্রবৃন্দ ১৮৯
সাত ফকীহের মজলিস ১৮৯
ইমাম মালেকের উস্তাদবৃন্দ ১৯০
ইমাম সাহেবের আত্মীয় মুহাদ্দেছ ১৯১
এলমুল হাদীস ১৯১
হযরত নাফেয় ১৯১
হযরত মুহাম্মদ বিন শেহাবুজ্জহুরী ১৯৩
হযরত জাফর সাদেক ১৯৪
হযরত মুহাম্মদ বিন এয়াহয়া ১৯৬
হযরত আবু হাজেম ১৯৬
হযরত এয়াহয়া বিন সাঈদ ১৯৭
ইমাম মালেকের শেখ-সংখ্যা ১৯৭
শেখুল ফিকাহ রবীয়াররায়ী ১৯৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
শেখ-নির্বাচন	২০০
ইমাম সাহেবের শেখ-নির্বাচন-বৈশিষ্ট্য	২০০
ইরাকী রেওয়ায়েতকারী	২০১
দাদা ও সাত ফকীহ থেকে রেওয়ায়েত না করার কারণ	২০২
হযরত ইবনে ওমরের মজলিস্	২০৫
হযরত নাফেয়ের মজলিস্	২০৫
ইমাম মালেকের মজলিস্	২০৫
শিক্ষা-মজলিস	২০৭
উক্ত তরীকার মাহাত্ম্য	২০৮
ছাত্র ও ভক্তদের মজলিস	২০৯
ছাত্র-সংখ্যা	২১০
ফকীহ ও মোহাদ্দেসের পার্থক্য	২১০
নবীজীর জমানা	২১০
আসহাবে সুফফা	২১০
সাহাবা ফকীহদের শ্রেণী বিভাগ	২১১
মদীনায় ও মদীনার বাইরে সাহাবাগণ	২১১
তাবেয়ীনদের স্থান	২১২
মালেকী-ফিকাহ	২১৩
সরকারী-ঘোষণা	২১৩
জোরজবরদস্তিতে তালাক ও ইমাম মালেক	২১৩
আমি জানিনা	২১৪
দূর-দরাজের ফতোয়া ও ইমাম সাহেব	২১৪
জবাবে চিন্তা ও অনুসন্ধিৎসা	২১৬
ন্যায় প্রিয়তা	২১৬
ইমাম সাহেবের ফজল ও কামাল-পরিচিতি	২১৭
জীবিকা, ব্যক্তিত্ব ও গৌরব	২১৮
খেলাফতে আব্বাসীয়া	২১৯
খলীফা-সংঘর্ষ	২২০
মনসূরের বেখবরী ও অনুতাপ	২২৩
মুহাম্মদুল মাহদী	২২৫

বিষয়	পৃষ্ঠা

হারুণুর রশীদ ২২৭
হারুণুর রশীদের শিক্ষা মজলিসে যোগদান ২২৭
হাদীস-মজলিস ২২৮
হারুণুর রশীদের কাছে ইমাম সাহেবের পত্র ২২৯
মৃত্যু শয্যায় ২৩০
স্বভাব-আমল ও জিন্দেগানী ২৩২
এলাহী-আনুগত্য ২৩২
রাসূল-প্রেম ২৩৩
মদীনা-প্রেম ২৩৩
দানশীলতা ২৩৩
অতিথি পরায়ণতা ২৩৪
কার্যে-মনোনিবেশ ২৩৪
ক্ষমা ও ধৈর্য ২৩৪
সত্য-প্রিয়তা ও আজাদী ২৩৫
আত্ম-সম্মান ২৩৬
ন্যায়-প্রিয়তা ২৩৭
আলেমের প্রতি শ্রদ্ধা ২৩৭
শারীরিক অকৃতি ২৩৮
পোশাক ২৩৮
সুগন্ধি-ব্যবহার ২৩৮
মুয়াত্তা ইমাম মালেক ২৩৯
মুয়াত্তা ২৪০
মুয়াত্তা-সঙ্কলন ২৪০
কিতাবের নাম 'মুয়াত্তা' রাখা হলো কেন? ২৪২
রেওয়ায়েত সংখ্যা ২৪২
'মুয়াত্তা' কিতাবের বিষয়বস্তু ২৪২
মুয়াত্তা ও অন্যান্য ফুকাহায়ে মুজতহেদীনের সঙ্কলিত হাদীস ২৪২
মুয়াত্তা ও সমসাময়িক কিতাব ২৪৩
হাদীসের কিতাবসমূহে 'মুয়াত্তা' এর শ্রেণীগত মর্যাদা ২৪৪
প্রথম শ্রেণীতে 'মুয়াত্তা' এর মর্যাদা ২৪৪
মুয়াত্তার সংস্করণ ২৪৬

ইমাম শাফেয়ী (রাঃ)

বিষয়	পৃষ্ঠা
বৈশিষ্ট্য	২৪৯
জন্ম, শৈশব ও শিক্ষা	২৪৯
জন্ম	২৫০
শৈশব	২৫০
স্বপ্ন ও এটার তাৎপর্য	২৫০
শিক্ষা ও লালন পালন	২৫১
উস্তাদ ও শায়খ	২৫৩
আরও কতিপয় শেখ	২৫৩
ইমাম শাফেয়ীর সূক্ষ্ম বুদ্ধি ডড	২৫৪
মক্কা শরীফ ও অন্যান্য স্থানে ভ্রমণ	২৫৬
সাহিত্য ও অভিধানে প্রসিদ্ধি লাভ	২৫৬
ইতিহাস	২৫৭
জ্যোতিষ-বিদ্যা	২৫৭
চিকিৎসা-বিদ্যা	২৫৮
বুদ্ধিমত্তা	২৬৩
ইমাম শাফেয়ীর গ্রেপ্তারী ও হারুণুর রশীদের ভ্রম	২৬৬
সৈয়দ-বংশের প্রতি আব্বাসীয়দের অত্যাচার	২৬৬
বখরানের গভর্ণররূপে	২৬৭
গ্রেফ্তারী ও মুক্তি	২৬৭
আল্লাহর উপর ভরসা ও ধৈর্য	২৬৮
সন্তুষ্টি	২৬৯
দানশীলতা ও বদান্যতা	২৬৯
বিনয়	২৭১
সুন্নতের পাবন্দী	২৭২
বুজুর্গদের প্রতি আদর শ্রদ্ধা	২৭৩
শিক্ষা-মজলিস	২৭৪
বুদ্ধির প্রখরতা	২৭৫
স্মৃতি শক্তি	২৭৬
ইমাম সাহেবের কেরামতি	২৭৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
নবী-বংশধরদের প্রতি শ্রদ্ধা	২৭৭
ইমাম সাহেবের বাণী	২৭৭
বুদ্ধি	২৭৮
আত্ম-বিশ্বাস	২৭৯
মুফ্‌তি পদ প্রাপ্তি	২৮০
ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের অভিমত	২৮১
তর্ক-শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি	২৮২
এতিমের মাল ও যাকাত	২৮২
ফিকাহ নাকি তামাশা	২৮৪
ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের বিরোধিতা	২৮৪
তিনি-তো কোন তার্কিক নন	২৮৫
রাসূলের বাণী দ্বারা প্রমাণ	২৮৫
অদ্ভূদ তর্ক	২৮৭
ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আবু ইউসূফ	২৮৯
ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম শাফেয়ী	২৯০
ইমাম শাফেয়ীর শারীরিক অবয়ব	২৯০
পরিবার	২৯১
ইমাম শাফেয়ীর পুত্র আবু ওসমান	২৯১
ইমাম সাহেবের ছাত্র ও শাগরেদ	২৯১
ইমাম হামীদী	২৯২
আবু ইব্রাহীম	২৯২
ইসমাইল বিন এয়াহয়া মাজনী	২৯৩
ইমাম সাহেবের রূহানী-গৌরব	২৯৩
বৈরাগ্য ও ইবাদত-বন্দেগী	২৯৪
শত্রুর মুখে চুনকালী	২৯৫
ইমাম শাফেয়ীর প্রতি হযরতের শাফাআত	২৯৫
ইমাম সাহেবের গ্রন্থাবলী	২৯৬
ইমাম সাহেবের শেখ উস্তাদবৃন্দ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ	২৯৮
মুসলেম বিন খালেদ জঞ্জী, ফকীহে মক্কা	২৯৮
হযরত ফুজাইল বিন আইয়াজ বিন মাসউদ (রাঃ)	২৯৯
হযরত সুফিয়ান বিন আনীয়া (রাঃ)	৩০২

বিষয় পৃষ্ঠা

ইমাম মালেক বিন আনাস ৩০৩
ইমাম মালেক সম্বন্ধে ইমাম শাফেয়ীর মতামত ৩০৪
ফিকাহর প্রাথমিক পর্যায় ৩০৬
নবীজীর জমানায় ফিকাহ শিক্ষা ৩০৬
সাহাবা ফকীহবৃন্দ তিন ভাগে বিভক্ত ৩০৭
হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাঃ) ৩০৭
হযরত জাইদ বিন সাবেত (রাঃ) ৩০৮
হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) ৩০৮
মাসআলা নির্বাচন ৩০৮
সাহাবাদের মতবিরোধ ৩০৯
বুঝা-পড়ার মতবিরোধ ৩১০
মতবিরোধের অপর একটি কারণ ৩১১
বিপরীত আদেশ সম্বন্ধে মতবিরোধ ৩১১
হযরত ওমর (রাঃ)-এর কর্মধারা ৩১২
অধিক রেওয়ায়েতকারীকে শাস্তি প্রদান ৩১৩
রেওয়ায়েত কোড়ার আঘাতের ভয় ৩১৩
ইরাক-বিজয়ের পর ফারুকী এজতেহাদ ৩১৪
মদীনার শ্রেষ্ঠ ফকীহবৃন্দ ৩১৪
কুফার ফকীহবৃন্দ ৩১৫
শাম ও দামেস্কের ফকীহবৃন্দ ৩১৫
তাবেয়ীন ও তবে তাবেয়ীনদের জমানা ৩১৬
সরকারের সাথে আলেমদের সম্পর্ক ছেদন ৩১৬
ইমাম মালেক ও ইমাম আবু হানীফা ৩১৭
পরিস্থিতি ও ফিকাহ ৩১৮
হযরত ইমাম শাফেয়ীর উসূল ও ব্যক্তিত্ব ৩১৯
ইমাম শাফেয়ীর চিন্তাধারার স্বীকৃতি ৩২০
কোরআন-জ্ঞান, তফসীরে কোরআন ও ইমাম শাফেয়ী ৩২১
জুলুম শব্দের বিভিন্ন অর্থ ৩২২
মুফাচ্ছির ইমাম শাফেয়ী ৩২৩
সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ ৩২৩
কোরআনী আদেশের বিভিন্ন ধারা ৩২৪

বিষয় পৃষ্ঠা

নিষিদ্ধ বস্তুকে হারাম করা ৩২৬
হযরতের বাণী তিনভাগে বিভক্ত ৩২৮
হাদীসের শ্রেণী বিভাগ ৩২৯
হাদীসে মওকুফ, মুনকাতেয় ও মুয়াল্লাক ৩৩১
পরস্পর বিরোধী হাদীসের সমাধান ৩৩৫
হাদীসের জাহেরী অর্থ সম্বন্ধে দুইটি কথা ৩৩৮
উপকার লাভ ও অনিষ্ট হতে রক্ষা ৩৩৯
কোরবাণীর মাসআলা ৩৪২
আবু হুরাইরার (রাঃ) রেওয়ায়েত ৩৪৪
হজ্ব সম্বন্ধে ইমাম শাফেয়ীর দলীল ৩৪৪
হাদীস দ্বারা কোরআন নাসেখ হতে পারে না ৩৪৫
প্রত্যেক নিয়মেরই ব্যতিক্রম রয়েছে ৩৪৭
সহী হাদীস ও সাহাবাদের বাণী ৩৪৮
হাদীস অনুযায়ী আমল করা জরুরী ৩৪৮
হাদীস-গ্রহণে ইমাম শাফেয়ীর শর্তাবলী ৩৪৯
ফিকাহ, উসুলে ফিকাহ, মাজহাবে ফিকাহ ৩৫০
ফিকাহ কাকে বলে? ৩৫১
এজতেহাদ ও ফিকাহ সম্পর্কে ফুকাহা ও মোহাদ্দেসদের পন্থা ৩৫২
হানফী মাযহাব ৩৫২
ফিকাহর উসূল ৩৫৩
এজতেহাদের শর্তাবলী ৩৫৩
এজমা ৩৫৩
কেয়াস ৩৫৪
ফিকাহে মালেকী ৩৫৪
ইমাম মালেকের চিন্তাধারা ৩৫৪
ইমাম শাফেয়ীর এজতেহাদ-ধারা এবং উসুলে ফিকাহ ৩৫৫
এজতেহাদের তিনটি পর্যায় ৩৫৫
কোন্‌টি এজমায়ী মাসআলা ৩৫৬
কেয়াস সম্বন্ধে ইমাম শাফেয়ীর রায় ৩৫৬
কেয়াস সম্বন্ধে দুইটি দৃষ্টান্ত ৩৫৭

বিষয় পৃষ্ঠা
আহমদ বিন হাম্বল ও শাফেয়ীর দৃষ্টিকোণ পার্থক্য ৩৫৮
ইমাম শাফেয়ীর বাণী ৩৬০
ইমাম শাফেয়ী সাহেবের পরিপূর্ণ বুদ্ধিমত্তা ৩৬১
শাহ্ ওলিউল্লাহ্ সাহেবের দৃষ্টিতে ইমাম শাফেয়ী (রাঃ) .৩৬৯
ইমাম শাফেয়ী সাহেবের দুইজন নামজাদা শাগরেদ ৩৭১
ইমাম বায়হাকী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহে ৩৭২
হাফেজ ইবনে হাজর আসকলানী ৩৭২
ইমাম শাফেয়ীর (রাঃ) মৃত্যুর পূর্ববর্তী অবস্থা ৩৭৩
কাফন-দাফন ৩৭৫
মৃত্যুর পরে সুসংবাদ ৩৭৫
শোক-গীতি ৩৭৬

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রাঃ)

বৈশিষ্ট্য ৩৭৭
জন্ম, শৈশব এবং বংশধারা ৩৭৭
ইবনে খলকানের তাহকীক ৩৭৭
জ্ঞান-পিপাসা ও জ্ঞান-লাভ ৩৭৮
ইমাম আহমদ ও ইমাম শাফেয়ী ৩৭৯
ইমাম আহমদ বিন্ হাম্বলের উস্তাদবৃন্দ ৩৭৯
ইমাম সাহেবের শাগরেদ ও উস্তাদ ৩৮০
বৈরাগী ও পরহেজগারী ৩৮০
খলকে কোরআনের বিবাদ ৩৮৫
ইমাম সম্বন্ধে অভিমত ৩৯৩
সরকার-বিরোধিতা ৩৯৫
ইমাম সাহেবের আকীদা ৪০০
গ্রন্থাবলী ৪০৫
মৃত্যুর পূর্বাবস্থা ৪০৬
ইমাম সাহেবের ব্যক্তিত্বের উপর নজর ৪০৮
শাগরেদ ৪০৯
সুসংবাদ ৪১৪

ইমাম আবু হানীফা (রাঃ)

প্রথম পরিচ্ছেদ

নাম, বংশ ও জন্ম পরিচয়

তাঁর আসল নাম– নু'মান। ডাক নাম– আবু হানীফা এবং উপাধি আজম। তাঁর বংশধারা– নু'মান বিন-সাবিত-বিন-জওতী-বিন-মাহ-এর প্রতি লক্ষ্য লক্ষ্য করলেই তাঁদের ধারাবাহিক নাম প্রকাশ হয়ে পড়ে।

অধিকাংশ লোকের ধারণা এই যে, তিনি আজমী ছিলেন। এ সম্বন্ধে অবশ্য মতবিরোধ রয়েছে যে, তিনি কোন্ বংশের লোক ছিলেন এবং আরবে তাঁদের বসবাস কিরূপে আরম্ভ হয়। বাগদাদের ঐতিহাসিক খতীব, ইমাম সাহেবের পৌত্র ইসমাঈলের কাছ হতে নিম্নলিখিত বর্ণনা বিবৃত করেছেন– আমি ইসমাঈল-বিন-হাম্মাদ-বিন-নু'মান-বিন-সাবিত-বিন-নু'মান-বিন-মারজেবান। আমরা পারস্যের অধিবাসী। আমাদের কেউ কোনদিন গোলামী করেন নাই।

সাবিত শৈশবে হযরত আলী কররমল্লাহু ওয়াজহাহুর খেদমতে হাজির হন। শেরে খোদা তাঁর ও তাঁর খান্দানের মঙ্গলের জন্য দো'আ করেন। আমাদের ভরসা যে, সে দো'আ ব্যর্থ হবার নয়। তা ইমাম আবু হানীফার জীবনে পরিপূর্ণরূপে মূর্ত হয়ে উঠেছিল।

ইসমাঈল সাহেব ইমাম সাহেবের দাদার নাম নু'মান এবং পরদাদার নাম মারজেবান বলে উল্লেখ করেছেন। অথচ সাধারণত তিনি জওতী এবং মাহ্ নামে পরিচিত। খুব সম্ভবতঃ জওতী যখন ঈমান আনেন, তখন তাঁর নাম নু'মান রূপে পরিবর্তিত হয়ে যায়।

ধারাবাহিক বংশ-পরিচয় দানকালে ইসমাঈল সেই ইসলামী নামের উল্লেখ করেন। মুসলিম সমাজ একে মেনে নিয়েছে। জওতীর পিতার সম্ভবতঃ অন্য আসল নাম ছিল, আর মাহ্ ও মারজেবান উপাধি ছিল, তাঁরা পারস্যের এক বিখ্যাত সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। শহর-নেতাকে পারস্যে মারজেবান বলা হত। এজন্য অনেকটা সুনিশ্চিতভাবে বলা চলে যে, মাহ্ ও মারজেবান নাম নয়, উপাধি মাত্র। মাহ্ ও মারজেবান শব্দদ্বয়ের একই অর্থ দাঁড়ায়।

জওতী গোলাম নন

জওতী সম্বন্ধে বর্ণনা দান কালে কোন কোন ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, গ্রেপ্তারী অবস্থায় জওতী কাবুল হতে আসেন এবং বনি-তাইমুল্লাহ্ বংশের জনৈক স্ত্রীলোক তাঁকে ক্রয় করেন। তিনি সেই স্ত্রীলোকের গোলামীতে কিছুকাল যাপন করেন। তারপর স্ত্রীলোকটি তাঁকে আজাদ করে দেন। এজন্যই ইমাম-বংশকে 'মাওলা বনি-তাইমুল্লাহ' বলা হয়। তাঁর বিরোধীদলের মধ্যে যারা ইমাম সাহেবকে হেয় করার নেশায় অন্ধ দিশাহারা ছিল, তারা এই সকল বর্ণনাকে বেশ জোরালো করে প্রচার করত। আর যদি তাঁর গোলামী করা সাব্যস্তও হয়ে যায়, তবে তাও বাস্তবপক্ষে তেমন কোন আপত্তিজনক হতে পারে না। সময়ে ঘূর্ণিচক্রে রাজ-পরিবারের লোকের নামেও এসমস্ত কলংক কালিমা স্পর্শ করে থাকে। মুসলিম জাহানে হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) স্ত্রী হযরত হাজেরাও বাঁদি রূপে পরিচিত। ইসলামের স্বর্ণযুগে প্রায় অধিকাংশ এমন লোকই হাদীস বর্ণনা করতেন এবং রেওয়ায়োতকারী এমন বহু ইমামও পরিদৃষ্ট হতেন, যাঁদের নামের উপর এর ছাপ ছিল। ইমাম হাসান বসরী, ইবনে সীরীন, তাউস, আত্তার-বিন ইয়াসির, নাফে, ইকরমা মাকহুল ইত্যাদি যে সকল জনগণমান্য নেতৃবৃন্দ ছিলেন, তাঁরা নিজেরা বা তাঁদের বাপ-দাদা গোলামী করতেন।

জওতী গোলাম ছিলেন বলে যদি প্রমাণিত হয়, তবে তাতেও কিছু আসে যায় না। কিন্তু ঐতিহাসিক সত্য এর বিপরীত। ইমাম সাহেবের বংশ-পরিচয় সম্বন্ধে আরও অপর অভিমতও রয়েছে।

'আবুমুতী' ইমাম সাহেবকে আরবের বংশের বলেই পরিচয় প্রদান করেছেন। তিনি নিম্নলিখিত বংশ-পরিচয় প্রদান করেছেন। নু'মান বিন-সাবিত বিন-জওতী বিন-তাকী বিন-জাইদ বিন-আসাদ বিন-রাশিদুল-আনসারী। এই বংশ-পরিচয় সম্পর্কে হাফিজ আবু ইসহাক নিম্নলিখিত বর্ণনা দিয়েছেন। নু'মান বিন-সাবিত বিন-তাউস বিন-হুরমুজ বিন-বাহরাম। জওতীর অবস্থান সম্পর্কেও মতবিরোধ রয়েছে। আর এই মতবিরোধের ভিত্তিভূমিও রয়েছে।

জওতী যখন সর্বপ্রথম আরবের বুকে পা ফেলেন, তখন সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত তাঁকে অজ্ঞাত অপরিচিত রূপেই কালাতিপাত করতে হয়েছিল। আর ভাষায় পার্থক্য থাকায় আরব অধিবাসীদের সাথে তাঁর পরিচয় হতে বেশ সময়ও লাগছিল। সুতরাং জীবিকা নির্বাহের নিমিত্ত স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে আলাপ-পরিচয় ও সৌহার্দ অপরিহার্য হয়ে উঠল। আরবে এর প্রয়োজনও ছিল সুপ্রকট। এই রীতি আরবে সুপ্রচারিত ছিল। আরবে একে 'অলা' বলা হত। এটা হতে মাওলা শব্দ বের হয়েছে। গোলামকেও মাওলা বলা হত। শব্দের এই মারপেচের

দরুণ জওতীকে অনেকে গোলাম বলতেও দ্বিধাবোধ করতো না। আর আস্তে-ধীরে এ সকল ধারণা বিকৃতির আকার ধারণ করে। অবশেষে এটা সাধারণভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে। এজন্যই ইসমাঈল সাহেবকেও বলতে হয়েছিল, 'আল্লার কছম, আমার বংশ কোনদিন কারও গোলামী করেন নাই।'

ইসমাঈল সাহেব পরম সম্মানী ও সত্যবাদী লোক ছিলেন। এজন্যই সূক্ষ্মদর্শী ঐতিহাসিকগণ তাঁর অভিমতের উপর সবশেষে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। প্রসিদ্ধ লেখক কাজী সামেরী সুস্পষ্টরূপে বিবৃতি দিয়েছেন যে, জওতী বনি তাইমুল্লাহ্ গোত্রের সাথে মিত্রতা বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন।

যে রেওয়ায়োত দ্বারা জওতী সাহেবের গোলামী করার বর্ণনা পাওয়া যায়, সেই বর্ণনা অনুযায়ী এটা গ্রহণযোগ্য নয়, তিনি কাবুল হতে গ্রেপ্তার হয়ে আসছিলেন। ফারসী ভাষায় জওতী সাহেবের বাপ-দাদার নাম রাখা হয়েছিল। স্বয়ং আবু হানীফা সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, বংশগতভাবেই তিনি ফারসী ভাষা অবগত ছিলেন। অথচ এটা কে না জানে যে, কাবুলের ভাষা ফারসী ছিল না!

জওতীর জন্মভূমি কোথায়?

তিনি কোন্ শহরের অধিবাসী, তা বলা কঠিন। ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন শহরের নাম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কোনটার প্রতিই আমরা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে পারি না। তবে এতটুকু নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, তিনি পারস্য দেশের অধিবাসী ছিলেন। সেই দেশ তখন ইসলাম প্রভাবান্বিত ছিল। আর সেই দেশের অধিকাংশ প্রধান প্রধান গোত্রসমূহ দীন-ইসলাম গ্রহণ করত। জওতী সম্ভবতঃ তখনই দীন-ইসলাম কবুল করেন। তজ্জন্য তাঁর বংশধরেরা এবং দেশবাসী তাঁর প্রতি বিদ্রোহী হয়ে উঠে।

ধর্ম না বাঁচলে সেই দেশে মুসলমান বসবাস করতে পারে না। তেমন ক্ষেত্রে মুসলমানদের পক্ষে হিজরত করার নির্দেশও কোরআনে রয়েছে। বাহ্যিকভাবে এটা অনেকের পক্ষে অপ্রীতিকর হলেও এতে মহা লাভ ও চরম সার্থকতা রয়েছে। কোরআন শরীফে ঘোষণা রয়েছে, "যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করে, সেই ব্যক্তি পৃথিবীতে অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত-স্থান ও স্বচ্ছলতা প্রাপ্ত হবে।" ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক যুগে মুসলমান যখন মক্কা হতে আবিসিনিয়া ও মদীনায় হিজরত করেন, তখন এ সত্য সুপ্রমাণিত হয়েছিল। তখন শুধু আবিসিনিয়া ও মদীনাই তাঁদের করতলগত হয়নি; মুসলমানদের এই বেপরোয়া ভাবই তাঁদেরকে একদিন অর্দ্ধ পৃথিবীর অধিকারী করে তুলেছিল। আজকের মুসলিম জাহান যদি সনাতন ইসলামের শুধু এই অমূল্য আদেশটুকু পালন করত,

তবে মুসলিম জাহান তথা সারা বিশ্বের একটা মহান পরিবর্তন সাধিত হত। মুসলিম জীবন পালন করলে অচিরেই বিদেশও স্বদেশ হয়ে যায়। এজন্য মহাকবি ইকবাল বলেছেন, "আরব, চীন ও সারা পৃথিবী আমাদের স্বদেশভূমি।"

জওতীর দেহে ইসলাম-রক্ত প্রবাহিত ছিল। সুতরাং ধর্মকে বাঁচায়ে রাখবার নিমিত্ত তিনি ইসলাম-ভূমি আরবে রওয়ানা হলেন। জনাব আমীর (রাঃ) তখন খলিফার আসনে সমারুঢ়। কূফা নগর তখন রাজধানীর সম্মান লাভ করেছেন। সুতরাং জওতী কূফায় বসবাস করতে আরম্ভ করলেন। তিনি মাঝে মাঝে খলিফার দরবারেও যাওয়া আসা করতেন। তাঁর আলাপ-আলোচনা, আদব-কায়দায় ইসলামের প্রতি তাঁর গভীর ভক্তিশ্রদ্ধা ফুটে উঠত।

তখন জওতী একটি পুত্র সন্তান লাভ করেন। তাঁর নাম রাখা হলো সাবিত। তিনিই ইমাম আবু হানীফার পিতা। জওতী তাঁর পুত্রকে হযরত আলী কাররামুল্লাহ্ ওয়াজহাহুর খেদমতে নিয়ে গেলেন। শেরেখোদা শিশুটিকে স্নেহ-আদর করলেন। তারপর শিশুটি এবং তাঁর বংশধরের জন্য তিনি দো'আ করলেন।

সাবিত যৌবনে পদার্পণ করলে, তিনি ব্যবসায়ী জীবন আরম্ভ করলেন। চল্লিশ বছর বয়সে তিনি একটি পুত্র-সন্তান লাভ করেন। তাঁর নাম রাখা হল নু'মান। তিনিই একদিন পরিণত বয়সে ইমাম আজম উপাধিতে ভূষিত হন।

ইমাম সাহেবের সাহাবা-সাক্ষাৎ লাভ

আবদুল মালেক বিন মরওয়ান মরওয়ানী রাজ্যের দ্বিতীয় বাদশারূপে পরিগণিত হন। তখন সেই পবিত্র যুগ ছিল যে, সে সকল লোক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারক স্বচক্ষে দেখবার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন, তাঁদের কতিপয় লোক তখনও পৃথিবীতে বেঁচে ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে ইমাম আবু হানীফার যৌবনকাল পর্যন্তও জীবিত ছিলেন। হযরত আনছ বিন মালিক রাসূল (সঃ)-এর বিশিষ্ট খাদেম ছিলেন। তিনি হিজরী ৯৩ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। সহল বিন সাইদ (রাঃ) ৯১ সালে ইন্তেকাল করেন। আবুত্তাফীল আমর বিন ওয়াসালা (রাঃ) একশত হিজরী পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। কিন্তু এমন প্রমাণ নাই যে, ইমাম আবু হানিফা তাঁদের কারও কাছ হতে কোন হাদীস বর্ণনা করেছেন। এজন্য অনেকে আশ্চর্যান্বিত হলেও এর পিছনে অনেক যুক্তিসংগত কারণও রয়েছে। আর ঐতিহাসিকগণ এর বহু কারণ নির্দ্দেশ করেছেন। অনেকের ধারণা যে, ইমাম সাহেব তখন পর্যন্ত তেমন কিছু জ্ঞানলাভ করেননি।

তাঁর বাপ-দাদা ছিলেন ব্যবসায়ী। কাজেই এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই যে, তিনি সেই আবহাওয়াতেই জন্মলাভ ও লালিত পালিত হন। ইতিমধ্যে ইমাম শায়বী (রাঃ)-এর হেদায়াতের ফলে তিনি শিক্ষার প্রতি ঝুঁকে পড়েন। তিনি যখন শিক্ষালাভ করে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েন, তখন সাহাবা কেরামদের কেহ জীবিত ছিলেন না।

তিনি কেন রেওয়ায়েত করেন নাই?

মুহাদ্দেসীনদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে যে, হাদীস শিক্ষা করার জন্য অন্ততঃপক্ষে কত বয়স হওয়া আবশ্যক। কূফাবাসীগণ এ সম্বন্ধে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করতেন। তাঁদের মত বিশ বছর কম বয়সের লোকের পক্ষে হাদীসের জমায়েতে শামিল হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। হাদীসের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে হলে পরিণত বয়সের লোক হওয়া অবশ্য কর্তব্য। অন্যথায় হাদীস বুঝা ও বুঝান উভয়ই কঠিন হয়ে দাঁড়ান। এতে ভুল বুঝাবুঝিরও আশঙ্কা থাকে। সম্ভবতঃ এ সকল কারণেই ইমাম সাহেব সেই সুযোগ হতে বঞ্চিত ছিলেন। তিনি যদি দশ বছর বয়সে সাহাবাদের কাছ হতে হাদীস শুনে থাকতেন। তবে তাঁর বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হত। কিন্তু তাতেও প্রবল সন্দেহের অবকাশ থাকত যে, এত কম বয়সের লোকের হাদীসের পরিপূর্ণ মর্ম খেয়ালে নাও আসতে পারে এবং তাতে মর্ম উদ্ধারেও মহা ভুল হয়ে যেতে পারে।

বাস্তব সত্য এই যে, ইমাম আবু হানীফা কোন সাহাবীর কাছ হতে কোন হাদীস শুনেন নাই। তবে সে সকল লোক স্বচক্ষে পয়গম্বর সাহেবকে দেখছিলেন, তিনি তাঁদের অনেকের সন্দর্শন লাভ করেছিলেন। এর একটি ঐতিহাসিক ঘটনা।

বিখ্যাত মুহাদ্দিস হাফেজ ইবনে হাজর লিখছেন, ইমাম আবু হানীফার জমানায় কয়েকজন সাহাবী জীবিত ছিলেন। ইমাম সাহেব কূফানগরে আশি হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তখন কূফায় সাহাবীদের মধ্যে আবদুল্লাহ্ বিন আবী আওফা বর্তমান ছিলেন। ইবনে সাইদ বর্ণনা করেছেন, ইমাম আবু হানীফা আনস বিন মালিককে দেখেছেন। এই দুইজন সাহাবা ব্যতীত অন্যান্য সাহাবাও বিভিন্ন শহরে তখন বর্তমান ছিলেন। ইমাম সাহেব সাহাবাদের কাছ হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন বলে কোন কোন লোকে হাদীসের উল্লেখ করলেও সেই সকল হাদীসের সনদ দুর্বলতা হতে মুক্ত নয়। এটা অকাট্য যে, ইমাম সাহেব সাহাবাদের সমসাময়িক লোক ছিলেন এবং কতিপয় সাহাবাকেও তিনি দেখেছেন।

এই সকল হতে প্রমাণিত হচ্ছে যে, ইমাম আবু হানীফা তাবেঈনদের শ্রেণীভুক্ত ছিলেন।

ইবনে সায়াদ সাইদ বিন জাবের হতে শুনেছেন এবং সাইফ স্বয়ং ইমাম আবু হানীফার কাছ হতে শুনেছেন।

ইবনে সায়াদের পরিচয় সম্পর্কে আল্লামা নুদী 'তাহজীবুল আছমা' কিতাবে লিখেছেন যে, যদিও তাঁর শেখ সেই সময়ের জন্য খুব বিশ্বাসযোগ্য নন, কিন্তু তিনি নিজে পরম বিশাসযোগ্য ছিলেন। সাইফ বিন জাবির বসরার কাজী ছিলেন এবং সহী বর্ণনাকারী ছিলেন। এই বর্ণনা এতদূর সত্য এবং সুপ্রমাণিত যে, সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিশালী হাদীস ও এর চেয়ে অধিক সত্য হতে পারে না। এই ভিত্তিতে বিখ্যাত মুহাদ্দেসীন যেমন খতীব বাগদাদী, 'আনসাব' কিতাবের লেখক আল্লামা সামআনী, সহী মুসলিমের শারেহ আল্লামা নূদী আল্লামা জাহবী, হাফেজ ইবনে হাজর আসকলানী, জইনুদ্দীন ইরাকী, ইসখাবী আবুল মহাসিন এবং মশকী ইত্যাদি যে সকল লোকের উপর আজও হাদীস ও রেওয়ায়োত নির্ভর করে, তাঁরা প্রত্যেকেই এর সুস্পষ্টভাবে মীমাংসা করে দিয়েছেন যে, ইমাম আবু হানীফা হযরত আনস (রহঃ) কে দেখেছেন।

ইবনে খলকানও খতীব বাগদাদীর বর্ণনা নকল করেছেন। তিনি লিখেছেন, ইমাম আবু হানীফা কোন সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভ পান নাই এবং তাঁদের কাছ হতে কোন হাদীস বর্ণনাও করেন নাই। কিন্তু অন্যান্য বিখ্যাত লোকের বর্ণনানুযায়ী তা গ্রহণযোগ্য নয়।

তিনি সাহাবা হইতে হাদীস শুনেন নাই

কোন কোন হানফী ইমাম সাহেব সাহাবাদেরকে দেখিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ করিতে গিয়ে ইমাম সাহেব সাহাবাদের কাছ হইতে হাদীসও শুনিয়াছেন বলিয়া দাবী করিতেছেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, হেদায়ার শারাহ্কারী আইনীও এই ভুলের সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু ন্যায়ের চোখে দেখিতে গেলে, ইহা আদৌ সমর্থনযোগ্য নয়।

আর ইহাও সুস্পষ্ট যে, ইমাম সাহেব যদি সাহাবাদের কাছ হইতে একটি হাদীসও শুনিয়া থাকেন, তবে ইমাম সাহেবের ছাত্রবৃন্দ বিশেষভাবে তা প্রচার করিতেন। কিন্তু কাজী আবু ইউসুফ, ইমাম মোহাম্মদ, হাফেজ আবদুর রাজ্জাক আবদুল্লাহ্ বিন মুবারক, আবু নয়ীম, ফজল বিন ওকীহ মক্কী বিন ইব্রাহিম, আবু আসিম আল জাবিল ইত্যাদি ইমাম সাহেবের বিখ্যাত ভক্ত ও সত্যপরায়ণ ছাত্রবৃন্দ এ সম্বন্ধে একটি অক্ষরও লিখেন নাই।

ডাক নাম সম্বন্ধে দুইটি কথা

ইমাম সাহেব তাঁহার ডাক নাম আবু হানীফা রূপেই অধিক পরিচিত। ইহা তাঁহার প্রকৃত ডাকনাম নয়। ইমাম সাহেবের কোন ছেলের নাম হানীফ ছিল না। তাঁহার গুণের পরিচয় দিবার মানসেই তাঁহাকে আবু হানীফা নামে ডাকা হতো। কোরআন মসজিদে খোদা মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছে, 'ইব্রাহীমের তরীকার পায়রবী কর, যে শুধু এক খোদার হয়ে কাল যাপন করিয়াছিল'। এই অর্থে ইমাম সাহেবকে আবু হানীফা বলিয়া ডাকা হইতো।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এলম শিক্ষা–পীর ও উস্তাদ

খলীফা আবদুল মালিকের তরফ হইতে হেজাজ বিন ইউসূফ ইরাকের গবর্ণররূপে নিয়োজিত হন। তখন সারা দেশ অত্যাচার অবিচারে জর্জরিত হয়ে উঠে। ধর্মপরায়ণ লোকদের বিরোধিতার দরুণ তখনও আরব ও ইরাকে মরওয়ানী শাসন প্রবর্তিত হইতে পারে নাই।

সুতরাং তাঁহাদের প্রতিই হেজাজ সর্বাধিক ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ করিতেন। হযরত ওমর বিন আবদুল আজীজ অত্যন্ত সত্যপরায়ণতার সাথে বলিয়াছেন যে, অন্যান্য সব পয়গাম্বরের উম্মতগণ সকলে মিলিতভাবে যদি নিজ নিজ সময়কার সমুদয় অপকর্মকারীদেরকে এক পাল্লায় রাখেন এবং আমরা যদি শুধু হেজাজের অপকর্মীগণকে অপর এক পাল্লায় রাখি, তবে খোদার কসম আমাদের পাল্লা অধিক ভারী হইবে।

আবদুল মালিক হিজরী ৮৬ সনে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তারপর তাঁহার পুত্র অলীদ সিংহাসনে সমারূঢ় হন। অলীদের শাসনকালে মুসলিম সাম্রাজ্য সুদূর বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল; স্পেন হইতে সিন্ধু পর্যন্ত এক বিপুল খণ্ড মুসলমানদের করতলগত হইয়াছিল। খাওয়ারেজ ও সমরকন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া কাবুল ও ফরগনা পর্যন্ত স্থানে তখন ইসলামের পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল।

কিন্তু তাহাতে ইসলামের রূহানী বরকতের নাম-গন্ধ ও ছিল না। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগে যত উচ্চ রাজকর্মচারী ছিলেন, তাঁহার প্রত্যেকেই অত্যাচারী ও রক্তপিপাসু ছিলেন।

সেই সময় সম্বন্ধে হযরত ওমর বিন আবদুল আজিজ বলিতেন–শ্যামদেশে অলীদ, ইরাকে হেজাজ, মিসলে কারয়া এবং খোদার কসম সারা দুনিয়া তখন অত্যাচারে জর্জরিত ছিল। সেই বিশ্বজোড়া অত্যাচার-অবিচারের যুগে যদিও

শিক্ষা-দীক্ষার দ্বার রুদ্ধ ছিল না, বিভিন্নস্থানে হাদীস-তফছীরের মাদ্রাসা বিরাজিত ছিল এবং মুহাদ্দেসীন ও ফকীহবৃন্দ শতপ্রকারে বিপদগ্রস্ত ও অশান্তিতে ভুগিয়াও শিক্ষা-দীক্ষায় নিমগ্ন ছিলেন, তথাপি সেই বিরাট ভূখণ্ডকে ইসলামের ভাব-ধারায় বিধৌত করিয়া দেয়া তখন সম্ভবপর হয়নি।

ওমর-বিন আবদুল আজীজের সৎকার্যকলাপ

হেজাজ হিজরী ৯৫ সনে মৃত্যুমুখে পতিত হন। রাজ্যের জন্য ইহা একটি সুসংবাদ ছিল। অলীদও ৯৬ হিজরীতে মারা যান। অলীদের পরে সুলায়মান-বিন আবদুল মালিক খিলাফতের সিংহাসনে আরোহণ করেন। উম্মাইয়া বংশে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ শাসনকর্তা বলিয়া ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করিয়াছেন। ওমর-বিন আবদুল আজীজকে রাজ্যের পরামর্শদাতারূপে নিযুক্ত করিয়া তিনি মুসলিম জগতের এক মহা উপকার সাধন করিলেন এবং মৃত্যুর সময় তিনি লিখিতভাবে অছিয়ত করিয়া গেলেন– আমার মৃত্যুর পর ওমর-বিন আবদুল আজীজ সিংহাসনে আরোহণ করবেন। সুলায়মান ৯৯ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তাঁহার অছিয়ত অনুসারে ওমর-বিন আবদুল আজীজ সিংহাসনে আসীন হইলেন। তিনি খলীফা হওয়ার পরই অবিলম্বে মরওয়ানী অনুশাসনের রং সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গেল। রাজ্যময় ন্যায়নিষ্ঠা, এলম ও আমল এবং সৎকার্যধারা সজীব ও সতেজ হয়ে উঠল। সুদীর্ঘ কাল পর্যন্ত খুতবাতে হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর প্রতি যে লানত বর্ষিত হচ্ছিল, অকস্মাৎ তা রহিত হয়ে গেল।

উম্মাইয়া বংশের হাত হইতে জায়গীরসমূহ ছিনাইয়া লওয়া হলো। দেশে স্থানে স্থানে যে সকল অত্যাচারী শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হইয়াছিল, অবিলম্বে তাহাদেরকে পদচ্যুত করা হলো। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই ছিল যে, ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি এমনই সুনজর দান করা হলো যে, ঘরে ঘরে ইহার চর্চা আরম্ভ হয়ে গেল। হাদীসসমূহ একত্র করিবার জন্য সরকারীভাবে ইমাম জহুরীকে হুকুম দেয়া হলো। হাদীসসমূহের একত্র সমাবেশের পর ইসলামী রাজ্যসমূহে উহার নকল প্রেরণ করা হলো।

হেজাজ ও অলীদের শাসনকাল পর্যন্ত ইমাম আবু হানীফা এলম লাভ করিবার যথেষ্ট সুযোগ পান নাই। তাঁহার বাপ-দাদা ব্যবসায়ী লোক ছিলেন। তিনিও ব্যবসায়ে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেন। কিন্তু সুলায়মানের খিলাফতের জমানায় যখন শিক্ষা-দীক্ষা জনসাধারণের মধ্যে বিস্তারিত হয়ে পড়ল, তখন ইমাম সাহেবের অন্তরেও তজ্জন্য প্রবল বাসনা জাগিয়া উঠল। ইতিমধ্যে এমন এক ঘটনা ঘটিল যে তাঁহার সেই বাসনা কার্যে পরিণত করিবার এক সুবর্ণ-সযোগ ঘটিল।

শিক্ষা প্রচেষ্ট

ইমাম সাহেব একদিন বাজারের দিকে যাইতেছেন। সেইপথে কুফানগরের বিখ্যাত ইমাম হযরত শায়বীর বাড়ী ছিল। যুবক আবু হানীফাকে কোন তালেবুল এলম মনে করিয়া তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোথায় যাইতেছ?" আবু হানীফা এক সওদাগরের নাম বলিলেন। হযরত শায়বী বললেন, "আমি জানিতে চাই যে, তুমি কাহারও কাছে পড়াশুনা করিয়া থাক।" যুবক আক্ষেপের স্বরে বললেন, আমি কাহারও কাছে পড়াশুনা করি না।" হযরত শায়বী বললেন, "তোমার চেহারায় আমি উপযুক্ততার দীপ্তি দেখতে পাচ্ছি। আলেমদের খেদমতে তোমার যাতায়াত একান্তই বাঞ্ছনীয়।"

এই কয়টি-মাত্র শব্দ যুবকের দেহমনে আন্দোলন জাগাইয়া তুলিল। এলম শিক্ষা করিবার জন্য তিনি পাগল প্রায় হয়ে উঠিলেন। আদব, আনছাব ফেকা, আরব-ইতিহাস, হাদীস, কালাম ইত্যাদি তখন শিক্ষার অংগ ছিল। কালাম বিদ্যাতে তখনও দর্শনের ছায়া নিপতিত হয়নি। সময়োপযোগী দূরদৃষ্টি, উদার ও মহৎ চিন্তা-ধারার তাতে প্রচুর অভাব ছিল। ইসলাম যতদিন আরব-সীমানায় সীমাবদ্ধ ছিল, ততদিন পর্যন্ত তা বড় সহজ সরল ছিল। কিন্তু পারস্য, মিসর ও শ্যাম দেশের মাটির সংস্পর্শে গিয়ে তা বহু রংগের সাথে মিশ্রিত হয়ে পড়ল। দর্শনের বেড়াজালে নিপতিত বহু ভ্রান্ত ধারণা লোকসমাজে প্রচারিত হলো। প্রত্যেক বস্তুকে সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও সতর্কতার সাথে দেখা মানুষের একটা স্বভাব-ধর্ম প্রায় হয়ে উঠল।

এলমে কালাম

খোদার জাত ও ছিফত আদি ও অন্ত ইত্যাদি সম্বন্ধে কোরআন পাকে যাহা কিছু বর্ণনা রয়েছে, আরবে তা মোটামুটিভাবে আলোচিত হতো। আর দৃঢ়বিশ্বাসের জন্য তাই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু ইসলাম পারস্য ও শ্যামের মাটিতে পৌছার পর এ সম্বন্ধে বহু সূক্ষ্ম ও জটিল প্রশ্নের উদ্ভব হল। এ সমস্তের সমাধান কল্পে বহু দল উপদলের উদ্ভব হল। মু'তাজেলা, জাহরী, খারেজী, রাফেজী ইত্যাদি বহু দল মেতে উঠল। তাদের মধ্যে এইরূপ বাড়াবাড়ি আরম্ভ হয়ে গেল যে, সত্যভক্ত হলে এসব বিষয়ের জবাব দেয়ারও বেহুদা মনে করলেন। তবে পথভ্রান্তদেরকে পরিচালিত করার বাসনায় তাঁদেরকে সর্বদা সজাগ থাকতে হয়েছিল। এভাবেই এলমে কলামের উদ্ভব হয়। ইমাম শায়বী এবং আবুল মনসূর প্রমুখ বিখ্যাত ইমামগণ এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে গবেষণা করতেন।

এলমে কালামের প্রতি বিশেষ দৃষ্টিপাত

এলমে কালামে পরবর্তী জীবনে পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়ে বিশিষ্ট একটি বিষয়ে পরিণত হয়। কিন্তু তখনও এটাকে পরিপূর্ণরূপে আয়ত্তাধীন করার জন্য শুধু স্বাভাবিক তীক্ষ্ণবুদ্ধিতা ও ধর্মীয় জ্ঞান-গরিমাকে যথেষ্ট মনে করা হতো। স্বভাবগতভাবে ইমাম আবু হানীফা এ সব গুণে ভূষিত ছিলেন। তাঁর শরীরে ইরানী রক্ত প্রবাহিত ছিল। আর তিনি কঠোর পরিশ্রমী ও সংগ্রামী লোক ছিলেন। ধর্মীয় বিবরণ ও মাসআলা মসায়েল কুফায় এরূপ বহু প্রচার হয়েছিল যে, যে কোন সাধারণ মানুষের পক্ষে আলেমের দরবারে উঠা-বসা ও যাতায়াত করেই তা লাভ করা সম্ভবপর হতো।

ইমাম আবু হানীফাও সে বিষয়ে এমন পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন যে, নামজাদা পণ্ডিতকুল তাঁকে এ বিষয়ে অগ্রনায়ক বলে মান্য করতেন। ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে প্রায়ই তিনি বসরা যেতেন। বসরা তখন বিভিন্ন মতাবলম্বীদের কেন্দ্রস্বরূপ ছিল। খারেজীদেরও এটা বিশেষ কেন্দ্র ছিল। কিন্তু প্রত্যেক মতাবলম্বীরাই ইমাম সাহেবের সাথে আলাপ-আলোচনা করে সন্তুষ্ট হতেন। তাদের সবাইকে ইমাম সাহেবের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল। পরিশেষে ইমাম সাহেব সবকিছু পরিত্যাগ করে বিশেষভাবে ফিকাহ শাস্ত্রের প্রতি মনোযোগ দিলেন। অবশিষ্ট জীবন তিনি এ সাধনায় কাটায়ে দেন।

ফিকাহ্ ও ইমাম সাহেব

প্রথম জীবনে ইমাম সাহেব ফিকাহশাস্ত্র সম্বন্ধে আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সেই মনোভাবের পরিবর্তন সাধিত হতে থাকে। তিনি স্বয়ং বলছেন, "প্রথম জীবনে ফিকাহ শাস্ত্রকে আমি সর্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্র বলে জানতাম আমার বিশ্বাস ছিল যে, আবিদা ও ধর্মের ভিত্তি এর উপরেই নির্ভর করে। কিন্তু পরিশেষে আমার ধারণা জন্মিল যে, সাহাবা কেরাম এসব আলাপ-আলোচনা হতে সর্বদা পৃথক থাকতেন। অথচ এ সমস্তের হাকীকত তাঁদের চেয়ে অধিক কেউই অবগত ছিলেন না।"

আর যেসব লোক এলমে কালাম নিয়ে মশগুল থাকেন, তাঁদের জীবন ধারার প্রতি দৃষ্টিপাত করে তাঁর মন অধিক পীড়িত হয়ে উঠল। চারিত্রিক পবিত্রতা ও রূহানী গুণাবলীর দিক দিয়ে পূর্ববর্তী বুজর্গদের সাথে তাঁদের কোন তুলনাই হতে পারে না।

তিনি বহু পীর মুর্শিদ ও বুজর্গ লোকের সাহচর্য লাভ করেছিলেন। তিনি কতিপয় সাহাবা-কেরামেরও সাহচর্য লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। হযরত

জাফর সাদেক রদিয়াল্লাহু আন্হুর সাথে তাঁর সুগভীর প্রণয় ছিল। তিনি হযরত ফাজীল বায়াজ, হযরত ইব্রাহীম আদহাম, হযরত বশর হাফী এবং দাউদ তায়ী রাহমাতু-শাহ্ আলাইহিম আজমাঈনের উস্তাদ ছিলেন।

তিনি হুজুর (সাঃ)-এর রওজা মুবারক জিয়ারতে যেয়ে বললেন, "আচ্ছালামু আলাইকুম, এয়া সাইয়েদাল মুরসলীন।" তখনই জবাব আসল, "ওয়াআলাইকুম সালাম, ইয়া ইমামাল মুসলিমীন।"

ইমাম-উস্তাদ হাম্মাদের ব্যক্তিত্ব ও বুজর্গী

তিনি কূফানগরের বিখ্যাত ইমাম ও শিক্ষাগুরু ছিলেন। রাসূলুল্লার খাদেম হযরত আনাছ (রহঃ) হতে তিনি হাদীস শুনছিলেন।

তদুপরি বহু বিখ্যাত তাবেয়ীদের ফয়েজ সাহচর্যলাভে তিনি উপকৃত হন। কূফানগরে তাঁর মাদ্রাসা স্থাপিত ছিল। তখনকার দিনে একেই জনসাধারণের শিক্ষা কেন্দ্র মনে করা হতো।

হযরত আবদুল্লাহ্-বিন মসউদ নামক সাহাবা হতে ফিকাহ শাস্ত্রের ক্রমধারা চলে আসছে। হযরত হাম্মাদ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি সম্পদশালী লোক ছিলেন। তার সমাজ ও জাতির খেদমত করার তাঁর যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা ছিল। কাজেই গভীর মনোযোগ ও পরম শান্তির সাথে তিনি কর্তব্যকর্মে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তিনি ইমাম আবু হানীফাকে এলমে ফিকাহ পড়াতে আরম্ভ করেন।

তখনকার শিক্ষাধারা এরূপ ছিল যে, উস্তাদ কোন বিষয় সম্বন্ধে মৌখিক আলাপ-আলোচনা করতেন। শাগরিদ তা স্মরণ রাখত। আর কখন কখন লিখে নিত।

ইমাম আবু হানীফা প্রথম দিন বামের কাতারে বসেন। নবাগতদের নিমিত্ত এটাই ছিল। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে উস্তাদ সাহেব যখন বুঝতে পারলেন যে, স্মৃতি-শক্তি ও মেধার দিক দিয়ে আবু হানীফার ন্যায় সারা মাদ্রাসায় দ্বিতীয় একটি ছাত্র নেই, তখন তাঁকে সকলের সম্মুখে আসন গ্রহণ করতে আদেশ দিলেন।

ইমাম সাহেব বলেন, "আমি দুই বছর পর্যন্ত হযরত হাম্মাদের মাদ্রাসায় তালিম গ্রহণ করি। তারপর ধারণা জন্মিল যে, আমি নিজেই শিক্ষাদান কার্য আরম্ভ করিব। কিন্তু তাদের প্রতি সম্মানার্থে আমি তা হতে বিরত রইলাম।"

বসরায় হযরত হাম্মাদের এক আত্মীয় ছিলেন। সেই আত্মীয় মৃত্যুমুখে পতিত হলে অগত্যা তাঁকে সেখানে গিয়ে বসবাস করতে হলো। সুতরাং তিনি ইমাম আবু হানীফাকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে যান। তখন হতে ছাত্রবৃন্দ ও দেশবাসী ইমাম সাহেবের কাছে মহাভিড় করতে লাগলেন।

এমন সব প্রশ্নও আসতে লাগল যে, ইমাম সাহেব উস্তাদের কাছে এ সম্বন্ধে কোনকিছুই বলেন নাই। তখন তিনি বুদ্ধি খাটায়ে সেই সবের উত্তর দিতে লাগলেন। আর স্মরণ রাখবার নিমিত্ত তিনি তা লিখে রাখলেন। দুই তিন মাস পরে উস্তাদ সাহেব বসরা হতে ফিরিলে, ইমাম সাহেব সেই সকল প্রশ্ন সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করতেন। তন্মধ্যে প্রায়গুলো শুদ্ধ বলে প্রমাণিত হতো; দুই চারটি ভুলও বের হতো। তাতে ইমাম সাহেব প্রতিজ্ঞা করলেন যে, উস্তাদ সাহেব যতদিন পর্যন্ত জীবিত থাকবেন, ততদিন পর্যন্ত তিনি তাহার সাথে সুগভীর সম্বন্ধ রাখবেন।

হিজরী ১২ সনে হযরত হাম্মাদ ইন্তেকাল করেন। ইমাম সাহেব যদিও অন্যান্য বুজর্গদের খেদমতে থেকেও ফিকাহশাস্ত্র অধ্যয়ন করছিলেন, তথাপি এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তিনি প্রধানতঃ হযরত হাম্মাদের কাছেই বিশেষভাবে শিক্ষা লাভ করেন। এ জন্যই ইমাম সাহেব তাঁকে সর্বাধিক ভক্তি করতেন।

ইমাম সাহেব ও হাদীস শিক্ষা

হযরত হাম্মাদের জামানাতেই হাদীসের প্রতি ইমাম সাহেবের বিশেষ মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। কেননা, ফিকাহ সংক্রান্ত মসায়েল সম্বন্ধে মুজতাহিদ সুলভ তাহকীক তখন তাঁর জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। আর হাদীস সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান না থাকলে, তা সম্ভবপর নয়।

তখন সমগ্র মুসলিম জাহানে হাদীস-চর্চা বড় জোরেশোরে আরম্ভ হয়েছিল। আর প্রতিটি রাজ্যে সনদ ও রেওয়ায়েতের দপ্তর খোলা হয়েছিল। তখনও সাহাবাদের সংখ্যা দশ হাজারের মত ছিল। তাঁরা মুসলিম জাহানের সর্বত্র বিরাজ করছিলেন।

কাজেই তাঁদের কল্যাণে সারা দেশ ব্যাপিয়া সনদ ও রেওয়ায়োতের এক মহা শক্তিশালী ধারা প্রবাহিত হয়েছিল। লোকেরা সাহাবাদের কোন সন্ধান পাওয়া মাত্রই তাঁদের কাছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের হাল অবস্থা শুনবার জন্য বা শরীয়ত সম্বন্ধীয় মাসআলার তাহকীক করবার মানসে চারদিক হতে ঝুঁকে পড়ত। সাহাবাদের সাগরিদকে তাবেয়ীন বলা হতো। তাঁদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে লাগল।

এরূপে তাবেয়ীনগণ বিপুল সংখ্যায় মুসলিম রাজ্য সমূহে ছড়াইয়া পড়লেন। যেসব শহরে অধিক সংখ্যক সাহাবা বা তাবেয়ীন সমবেত হতেন, তাই শিক্ষা কেন্দ্রে পরিণত হতো। তন্মধ্যে মক্কা মুয়াজ্জমা, মদীনা শরীফ, বসরা এবং কূফা সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে।

কূফা

ইমাম আবু হানীফা কূফায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সেখানেই বসবাস করেন। ইসলামী সভ্যতা ও ইসলাম-বিস্তারের এটাই ভিত্তিভূমি ছিল। আরবের অপরিসর ভূখণ্ড আরববাসীদের ক্রমোন্নতির জন্য পর্যাপ্ত ছিল না।

হযরত সায়াদ বিন আবি ওক্কাছ পারস্য-বিজয় পরিপূর্ণ করার পর যখন ময়দানে অবস্থান করছিলেন, তখন প্রয়োজনের তাগিদে হযরত ওমর (রাঃ) তাঁকে চিঠি লিখলেন যে, মুসলমানদের হিজরত-স্থান এবং আবাস ভূমির নিমিত্ত একটি শহরের ভিত্তি পত্তন করতে হবে। হযরত সায়াদ তজ্জন্য কূফা-ভূমিকে পছন্দ করলেন। আঠার হিজরীতে এর ভিত্তি স্থাপন করা হয়।–তখন সেখানে সাধারণ ধরনের ঘর বাড়ী প্রস্তুত করা হয়। আরববাসীগণ চারদিক হতে তথায় আসিয়া বসবাস করতে আরম্ভ করলেন।

এরূপে অল্পদিনের মধ্যে এটা আরবের একটি বিশিষ্ট অংশে পরিণত হলো। কূফা শহরকে সমাগত লোকের বসবাসের উপযুক্ত করার নিমিত্ত অসংখ্য লোক নিয়োজিত করতে হলো। অল্পদিনের মধ্যে কূফা এরূপ জনবহুল ও সৌন্দর্যমণ্ডিত শহরে পরিণত হলো যে ফারুকে আজম একে 'আল্লাহর রহমত' ও ঈমান-ভাণ্ডার' বলে আখ্যা দান করলেন। তিনি চিঠিপত্রে কূফাকে খিলাফত কেন্দ্ররূপে সাব্যস্ত করেছিলেন। এক হাজারেরও অধিক সাহাবা সেখানে যেয়ে বসবাস করতে আরম্ভ করলেন।

তন্মধ্যে এমন চব্বিশজন সাহাবাও ছিলেন, যাঁরা বদরের যুদ্ধে বিশ্বনবীর সহায়রূপে যোগদান করেছিলেন। সেইসব বুজর্গলোকের কল্যাণে সর্বত্র হাদীস ও রেওয়ায়েতের চর্চা আরম্ভ হয়ে গেল। এরূপে কূফা নগরের প্রতিটি ঘরবাড়ী হাদীস ও রেওয়ায়েতের শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হলো।

বসরা

ফারুক আজমের আদেশক্রমেই বসরারও ভিত্তিপত্তন করা হয়। এলমের প্রসারতা ও হাদীস প্রচারের দিক দিয়ে এটা কূফার সমকক্ষ ছিল। মক্কা ও মদীনার ন্যায় কূফা ও বসরা ইসলামের প্রধান শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হলো।

মসরুক বিনেল আজদার, ওবাইদ বিন ওমর, আছওয়াদ বিন ইয়াজিদ, জার বিন হাবশ, রাবীয় বিন খাসীম, আবদুর রহমান আবি লাইলী, আবু আবদুর রহমান আসলামি, শারীহ বিনেল হারস, শারীহ বিন হাফী, ইবনে সালাম, কাইস

বিন হাজেম, হাসান বসরী, শুয়বা বিন হেজাজ ইত্যাদি মহাত্মাগণ কূফা ও বসরা শহরে বসবাস করেন। আল্লামা জেহনী তাঁদেরকে হাদীসের বহনকরীরূপে উপাধি দান করেন।

ইমাম সাফইয়ান প্রায়ই বলতেন, বিশ্ব-কেন্দ্ররূপে মক্কাশরীফ, কেরাআতের জন্য মদীনা এবং হালাল ও হারামের নিমিত্ত কূফা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। ফিকাহশাস্ত্রের নিমিত্ত ইমাম আবু হানীফা হযরত হাম্মাদের মজলিসকে যথেষ্ট মনে করতেন। কিন্তু হাদীসের জন্য তা যথেষ্ট ছিল না। সেখানে শুধু মেধা ও বুদ্ধিমত্তা দ্বারা কাজ চলে না। সেখানে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে রেওয়ায়োতের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে।

এলমে হাদীস, রেওয়ায়েত ও সূক্ষ্মদর্শিতার মাসআলা

তখনকার দিনে হাদীস-সংগ্রহ ও সংকলন অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার ছিল। এমন কি সুবিখ্যাত উস্তাদগণও দুই চারিশত হাদীসের চেয়ে অধিক হাদীস মুখস্ত রাখতেন না।

জরুরী মাসায়েলের মীমংসা করার জন্য এটা যথেষ্ট ছিল না। তদুপরি রেওয়ায়েত ব্যাপারে এরূপ মতবিরোধ দেখা দিত যে, একটি হাদীস যতক্ষণ পর্যন্ত বিভিন্ন লোকের কাছ থেকে শুনা না যেত ততক্ষণ পর্যন্ত এর অর্থ ও তাৎপর্য সঠিকভাবে উপলব্ধি করা কঠিন হয়ে পড়ত।

ইমাম আবু হানীফা সাহেবও এটা মনে মনে উপলব্ধি করেন। এজন্য তিনি হাদীসের অর্থ ও তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা ও দেল-দেমাগ খাটাতেন। এজন্য কূফা নগরে এমন অতি কম মুহাদ্দেস ছিলেন যাঁর দরবারে ইমাম আবু হানীফা সাহেব নতজানু হয়ে বসেন নাই। এরূপেই তিনি হাদীস শিক্ষালাভ করেন।

আবুল মহাসিন শাফী হাদীস-বিশারদদের নাম উল্লেখ করতে যেয়ে বলছেন যে, তাঁদের মধ্যে নিরানব্বই জন কূফাবাসী ছিলেন। তন্মধ্যে ইমাম শায়বী, সলমা বিন কাহীল, মহারেব বিন ওসার, আবু ইসহাক সাবয়ী, উন বিন আবদুল্লাহ্, ছেমাক বিন হারব, ওমরাহ বিন মররাহ, মনসুরুল আমর, আয়মাস, ইবনে আসীম বিন মোহাম্মদ, আদী বিন সাবেতুল আনসারী, আতা বিনেল মসায়েব, মূসা বিন আবি আয়েশা, আলকম বিন মুরসাদ সুবিখ্যাত মুহাদ্দেস, এবং সনদ ও রেওয়ায়েতের সাধারণ কেন্দ্র ছিলেন।

হযরত ইমাম শায়বী

তিনিই ইমাম আবু হানীফাকে শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করেন। তিনি বহু হাদীস রেওয়ায়েত করেন। কথা আছে যে তিনি পাঁচ শত সাহাবাকে দেখেছিলেন। আরব, ইরাক, ও শ্যামে যে চারি ব্যক্তি চরম শিক্ষাগুরু বলে আখ্যা পেয়েছিলেন, হযরত শায়বী তন্মধ্যে একজন।

ইমাম জহুরী বলতেন, "মাত্র চারজন আলেম রয়েছেন–মদীনায় ইবনুল মসীব, বসরায় হাসান, শ্যামে মকহুল এবং কূফায় শায়বী।"

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন ওমর (রহঃ) কে তিনি একবার গাজীগণকে শিক্ষা দিতে দেখতে পেয়ে বলেন, "আল্লার কসম, দুই ব্যক্তি এই বিষয় আমার চেয়ে উত্তম জানেন।" তিনি সুদীর্ঘ কাল অবধি কাজীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ধনী দরিদ্র আপামর জনতা তাঁকে পরম শ্রদ্ধা করিত। তিনি হিজরী ১০৪ অথবা ১০৬ সনে ইন্তেকাল করেন।

সলমা বিন কাহীল বিখ্যাত মুহাদ্দেছ এবং তাবেয়ী ছিলেন। জনদব বিন আবদুল্লাহ্ ইবনে আবি আওফা, আবুত্তোফায়েল এবং অপরাপর বহু সাহাবা হতে তিনি হাদীস রেওয়ায়েত করেছিলেন।

সূফয়ান বিন আইনিয়া (ইমাম শাফীর উস্তাদ) বলেন, সলমা বিন কাহীল বিশিষ্ট লোক হিসেবে পরিগণিত হয়েছিলেন।

ইবনে মাহদী বলেন, মনসূর, ওমর বিন মাররা, আবু হুসাইন এবং আবু ইসহাক এই চারজন সর্বাপেক্ষা অধিক সহীহ রেওয়ায়েতকারী ছিলেন।

হযরত সেমাক

তিনি তাবেয়ী ও মুহাদ্দেস ছিলেন। ইমাম সূফ্য়ান সওরী বলেন, "সেমাক কখনও হাদীসে ভুল করেন নাই।" সেমাক স্বয়ং বলেছেন, "আমি আশি জন সাহাবার সাথে মিলিত হয়েছিলাম।"

হযরত মুহারিব বিন ওসার

তিনি আবদুল্লাহ্ বিন ওমর (রহঃ) এবং জাবের (রহঃ) ইত্যাদি হতে রেওয়ায়েত করেছেন। ইমাম সূফ্য়ান সওরী বলতেন, "মুহারিবের চেয়ে অধিক বৈরাগ্য আমি আর কারও মধ্যে দেখি নাই।"

আল্লামা জেহনী লিখছেন, ইমাম আহমদ বিন মুয়ীন, আবু জারআ, দারকূৎনী, আবু হাতিম, এয়াকুব বিন ছুফ্য়ান এবং নেসায়ী মুহারিবকে মহামান্যরূপে বরণ করে নিয়েছেন। তিনি কূফার কাজীপদে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

তিনি উন বিন আবদুল্লাহ্ বিন ওতবা বিন মসউদ, হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ),এবং আবদুল্লাহ্ বিন ওমর (রহঃ) হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি একজন মহামান্য পরহেজগার ব্যক্তি ছিলেন।

ইমাম হাদীস হেশাম বিন আরওয়া

তিনি মহা সম্মানিত এবং বিখ্যাত তাবেয়ী ছিলেন। তিনি বহু সাহাবা হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাদীসের ইমাম সূফ্য়ান সওরী এবং ইমাম মালেক, সুফ্য়ান বিন আইনিয়া তাঁর শাগরেদ ছিলেন। খলীফা মনসূর তাঁকে সম্মানের চোখে দেখতেন। এক সময় তিনি তাঁকে লক্ষ দেরহাম দান করেন। খলীফা স্বয়ং তাঁর জানাযার নামাজ পড়েন। ইবনে সায়াদ লিখেছেন যে, তিনি বিশ্বাসযোগ্য এবং তিনি বহু হাদীস জানতেন। ইমাম হাতেম তাঁকে হাদীসের ইমাম বলে স্বীকার করেছেন।

ইমাম সুলায়মান বিন মাহরান

তিনি বেশি ক্রন্দন করতেন। তিনি কূফার বিখ্যাত ইযাম ছিলেন। সাহাবাদের মধ্যে তিনি আনাছ বিন মালেকের সাথে মিলিত হয়েছিলেন। আবদুল্লাহ্ বিন আবি আওফা হতে তিনি হাদীস শ্রবণ করেন। সুফ্য়ান সওরী ও শুয়বা তাঁর শাগরেদ ছিলেন।

বসরায়ও তিনি হাদীস সংকলন করেন। ইমাম হাসান বসরী, শুয়বা ও কাতাদার ফয়েজ লাভে তিনি উপকৃত হন।

মুহাদ্দেস ও তাবেয়ীরূপে হযরত কাতাদা

তিনি বিখ্যাত মুহাদ্দেস ও তাবেয়ী ছিলেন। হযরত আনছ বিন মালিক (রাঃ) আবদুল্লাহ্ এবং আবুত্তোফায়েল এবং অপরাপর সাহাবা হতে তিনি হাদীস রেওয়ায়েত করেন। হযরত আনাছের দুইজন নামজাদা শাগরেদ ছিলেন। তন্মধ্যে তিনি একজন। শব্দ ও অর্থ সঠিক রেখে তিনি হাদীস বর্ণনা করতেন। তাঁর অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ছিল।

ওমর বিন আবদুল্লাহ্ বলেন, মদীনায় এক উস্তাদের কাছে হযরত কতাদা ফিকাহ ও হাদীস পড়তেন। একদিন উস্তাদ সাহেব বললেন, "তুমি প্রতিদিনই বহু কথা জিজ্ঞাসা করিয়া থাক। সেই সমস্তের কোন কিছু তোমার স্মরণ আছ কি?" তিনি বললেন, "প্রতিটি অক্ষর আমার স্মরণ রয়েছে।" তারপর তিনি যা কিছু শুনেছিলেন, তা সমুদয় দিন তারিখ সহ বলে যেতে লাগলেন।

উস্তাদ সাহেব তখন অতীব আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন, "জানতাম না যে, খোদা তোমার মত লোকও দুনিয়ায় পয়দা করেছেন।" তারপর হতে তিনি লোক সমাজে স্মরণকারীরূপে অভিহিত হতেন।

হাদীসে আমীরুল মুমেনীনরূপে হযরত শুয়বা

তিনি অতি উচ্চশ্রেণীর মুহাদ্দেস ছিলেন। তাঁর দুই হাজার হাদীস মুখস্ত ছিল। সুফ্য়ান সওরী তাঁকে হাদীস সম্বন্ধে মুমিনদের আমীর বলে মান্য করতেন।

ইমাম শাফী বলেন, হযরত শুয়বা না হলে ইরাকে হাদীসের চর্চা হতো না। তিনি ১৬০ হিজরীতেই ইন্তেকাল করেন। সুফ্য়ান সওরীর কাছে তাঁর মৃত্যু-সংবাদ পৌছলে তিনি বলেন, "আজ হতে ফন্নে-হাদীসেরও মৃত্যু হয়েছে।" ইমাম আবু-হানীফার সংগে হযরত শুয়বার সুগভীর সৌহার্দ ছিল।

হযরত শুয়বা একদিন ইমাম আবু হানীফার প্রসঙ্গক্রমে বলেন, "সূর্য দীপ্তমান, আমি তা যতখানি সত্যরূপে জানি, আমি ততখানি দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি যে, এলমও আবু হানীফা সমদীপ্তিমান।"

ইমাম বুখারীর উস্তাদ হযরত এয়াহ্য়া বিন মুঈনকে কেউ ইমাম আবু হানীফা সম্বন্ধে তাঁর ধারণার কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, 'এটাই যথেষ্ট যে, হযরত শুয়বা তাঁকে হাদীস শুয়বা তাঁকে হাদীস ও রেওয়ায়েত করার অনুমতি দান করেন। এটাই তাঁর উপযুক্ত যথেষ্ট প্রমাণ।"

ইমাম সাহেবের মক্কা-মদীনা-ভ্রমণ

যদিও ছাত্র-জীবনেই ইমাম আবু হানীফা হাদীস শরীফের অমূল্য মূলধন লাভ করেছিলেন, তথাপি এ সম্বন্ধে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করার মানসে তাঁর পক্ষে মক্কা-মদীনা-ভ্রমণ জরুরী ছিল। মক্কা-মদীনাকে হারামাইন বলা হতো। হারামাইন তখন ধর্মীয় শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র ছিল। ইমাম সাহেব কোন্ সনে প্রথম তথায় ভ্রমণ করেন, তা ইতিহাসে সঠিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। তা সত্ত্বেও প্রবল বিশ্বাস এ যে, তিনি যখন প্রথম ভ্রমণে বের হন, তখন তাঁর পাঠ্যাবস্থা ছিল। ঐতিহাসিক ইবনে খালকান লিখেছেন যে, ইমাম আবু হানীফা হতে ওকীহ বর্ণনা করেছেন– ইমাম সাহেব বলতেন, "আমি হজ্জের সময় চুল কাটাতে যেয়ে এক নাপিতের কাছে জব্দ হয়েছিলেন। চুল কাটাতে কত লাগবে জানতে চাইলে সে বলল, হাজীদের কাছ হতে দাম চুকাইয়ে নেয়া হয় না। আমি তখন চুপ হয়ে মাথার চুল কাটাতে লাগলাম। সে আমাকে আমার ভুল দেখায়ে বলল, হজ্জের সময় চুপ থাকা বাঞ্ছনীয় নয়; তকবীর বলা চাই। চুল কাটা শেষ করে আমি বাড়ীর দিকে রওয়ানা হলে, সে বলল, প্রথমে দুই রাকায়াত নামায পড়ে নিবো। তারপর অন্য

কোথায়ও যাবেন। আমি আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললাম, তুমি এসব মাসআলা কার কাছে শিক্ষা করছো? সে বলল, আত্তার বিন আবী রব্বাহের ফয়েজ হতে আমি এ সকল শিক্ষা লাভ করেছি।"

এ সকল ব্যাপার হতে জানা যায় যে, ইমাম সাহেব প্রথম জীবনে ভ্রমণ সমাপ্ত করেছিলেন।

আত্তার বিন আবি রব্বাহের শিক্ষা-মজলিস

ইমাম আবু হানীফা যে সময় পবিত্র মক্কায় পৌছেন, তখন শিক্ষাদান ও শিক্ষা অত্যন্ত জোরেশোরে চলছিল। হাদীস সম্বন্ধে যাঁরা গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, এবং যাঁদের অধিকাংশই সাহাবাদের সাহচর্য লাভে উপকৃত হয়েছিলেন, তাঁরা প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা-মজলিস কায়েম করেছিলেন।

তন্মধ্যে আত্তার-বিন আবি রব্বাহের শিক্ষা-মজলিস সর্ববৃহৎ ও সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল। তিনি একজন বিখ্যাত তাবেয়ী ছিলেন। প্রায়ই তিনি সাহাবাদের খেদমতে থাকতেন। আর তাঁদের সংগলাভের ফয়েজ হতে তিনি এজতেহাদের উপযুক্ততা লাভ করেছিলেন।

তিনি হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রহঃ), ইবনে ওমর (রহঃ), ইবনে জায়েদ (রহঃ), আছমা বিন জায়েদ (রহঃ), জাবের বিন আদুল্লাহ্ (রহঃ), জায়েদ বিন আরকম (রহঃ), আবদুল্লাহ্ বিন সায়েব (রহঃ), রাফে (রহঃ), আবু হুরাইরা (রহঃ) ইত্যাদি বহু সাহাবা হাদীস শ্রবণ করেন।

তিনি স্বয়ং বর্ণনা দিয়েছেন–রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওরা সাল্লামের সাহচর্য লাভ করেছেন, এমন দুইশত বুজর্গের সংগলাভ আমার ভাগ্যে ঘটেছিল।

হযরত ওমর ফারুকের (রহঃ) পুত্র হযরত আবদুল্লাহ বলতেন, আত্তার বিন আবিরব্বাহ বর্তমান থাকতে লোকেরা আমার মজলিসে আসে কেন? হজ্জের জমানায় সর্বদাই সরকারের পক্ষ হতে ঘোষণাবাণী প্রচার করা হতো যে, আত্তার ব্যতীত অপর কারও ফতোয়া দেওয়ার অধিকার নাই।

ইমাম আওজায়ী ও জহুরী ইত্যাদি ইমামগণ তাঁর কাছ হতে শিক্ষা লাভ করে পরিশেষে উস্তাদ হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

ইমাম আবু হানীফা যখন শিক্ষার্থী হিসেবে তাঁর খেদমতে পৌছলেন, তখন পরীক্ষামূলকভাবে তাঁকে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হলো। এতে সন্তোষজনক উত্তর পেয়ে তিনি আবু হানীফাকে শিক্ষা-মজলিসে যোগদান করতে অনুমতি দান করলেন। তাঁর আদব-কায়দা, আমল আখলাক, স্মৃতি ও মেধার পরিচয় পেয়ে শাগরেদের প্রতি উস্তাদের প্রীতি উত্তরোত্তর বেড়ে চলল।

পরিশেষে ব্যাপার এমন দাঁড়াল যে, তিনি যখন ক্লাসে যেতেন তখন উস্তাদ সাহেব অপরাপরকে দূরে সরায়ে আবু হানীফাকে নিজের কাছে বসাতেন।

হযরত আত্তার হিজরী ১৫৫ সন পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত আবু হানীফা সাহেব যখনই মক্কাশরীফে যেয়ে সুযোগ-সুবিধা পেতেন, তখন হযরত আত্তারের খেদমতে অধিকাংশ সময়ই কাটাতেন।

হযরত আকরমা

হযরত আত্তার ব্যতীত ইমাম সাহেব মক্কা শরীফে যেসব মুহাদ্দেসীনের কাছ হতে হাদীসের সনদ লাভ করেছিলেন, তন্মধ্যে হযরত আকরমা অন্যতম। তিনি হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রহঃ) এর গোলাম ও শাগরেদ ছিলেন। উস্তাদ সাহেব বিশেষ মনোযোগের সাথে তাঁকে আদব-কায়দাও শিক্ষা দান করেন। এমনকি উস্তাদের জীবিতাবস্থাতেই হযরত আকরমা এজতেহাদও ফতোয়া দানের উপযুক্ততা লাভ করেন।

হযরত আলী (রহঃ), আবু হুরাইরা (রহঃ), আবদুল্লাহ বিন ওমর (রহঃ), ওকবা বিন ওমর (রহঃ), সফওয়ান (রহঃ), জাবের (রহঃ), আবু কাতাদা (রহঃ), হতে হযরত আকরমা হাদীস শিক্ষা করেন এবং ফিকাহ সম্পর্কীয় মাসায়েলের তাহকীক করেন। প্রায় সত্তর জন তাবেয়ীন তাঁর কাছ হতে হাদীস ও তফসীর সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেন।

ইমাম শায়বী বলতেন, বর্তমান জমানায় আকরমা হতে অধিক কোরআন-অবগত আর কেউই না। সাইদ বিন জুবাইর তাবেয়ীনদের সরদার ছিলেন। এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "দুনিয়ায় আপনার চেয়ে বড় আলেম কেউ আছেন কি? জবাবে তিনি বললেন, "হ্যাঁ, আকরমা আমার চেয়ে বড় আলেম।"

ফকীহ সাবআ

হিজরী ১০২ সনের প্রথম ভাগে আবু হানীফা মদীনা রওয়ানা হলেন। মদীনা তখন হাদীস-কেন্দ্র ছিল। আর এটা ছিল বিশ্বনবীর শেষ আবাসভূমি। সাহাবাদের পরে তাবেয়ীদের মধ্যে সাত ব্যক্তি এলমে ফেকাহ ও হাদীস সম্বন্ধে সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

শরীয়তের মাসায়েল সম্বন্ধে লোকেরা তাঁদের উপরই অধিক নির্ভর করত। সেই সকল তাবেয়ীন বিখ্যাত সাহাবাদের সাহচর্যের ছায়ার থেকে তাঁদের ফয়েজ হতে শিক্ষালাভ করেছিলেন। তাঁরা এমন মর্যাদা লাভ করেছিলেন যে, তাঁদের সাহায্য ও সহানুভূতিতে সারা রাজ্যময় শিক্ষা বিস্তৃতি লাভ করে। তাঁরা প্রায় সকলেই সমকক্ষ লোক ছিলেন এবং তাঁদের সম্মিলিত মজলিসের মারফত সমগ্র

শরীয়তী মাসআলার মীমাংসা হতো। ইমাম মালেক মদীনার ফেকাহশাস্ত্রের নেতা ছিলেন। তিনি এ সম্মিলিত দলের ফতোয়া অনুযায়ী সব কিছু মীমাংসা করতেন।

ইমাম আবু হানীফা যখন মদীনায় পৌছেন, তখন সাহাবাদের মধ্যে মাত্র দুই ব্যক্তি জীবিত ছিলেন। তন্মধ্যে একজন হলেন সুলাইমান এবং অপর জন সালেম বিন আবদুল্লাহ্। সুলাইমান ছিলেন রাসূল (সাঃ)-এর স্ত্রী হযরত মাইমুনার গোলাম।

সালেম ছিলেন হযরত ফারুকের পৌত্র। তিনি তাঁর মহামান্য বংশধরদের কাছ হতে শিক্ষালাভ করেন। ইমাম আবু হানীফা উভয় বুজর্গের খেদমতে উপস্থিত হলেন। তাঁর কাছ হতে তিনি বহু হাদীস শুনতে পান।

যদিও ইমাম সাহেবের শিক্ষা প্রচেষ্টা মদীনা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল, তথাপি তাঁর জ্ঞান-স্পৃহা জীবিত পর্যন্ত সজীব ছিল। তিনি প্রায়ই মক্কা-মদীনায় যাতায়াত করতেন। আর কিছুকাল সেখানে অবস্থানও করতেন।

হজ্জ-মৌসুমে ইসলামী রাজ্যসমূহ হতে বিখ্যাত আলেম ও বুজর্গ ব্যক্তি মক্কায় এসে সমবেত হতেন। তাতে মুসলিম জাহানের শত প্রকার মংগল সাধিত হতো। ইমাম সাহেব প্রায়ই সেই সব সম্মেলনে যোগদান করেও মহা উপকৃত হতেন।

ইমাম সাহেব হাদীসের সনদ নিলেন

ইমাম আওজয়ী ও মকহুল শামীতে শাম দেশের ধর্মীয় ইমাম বলা হতো। ইমাম আবু হানীফা মক্কা শরীফেই তাঁদের পরিচয় লাভ করেন। পরবর্তী জীবনে আবু হানীফা সাহেব ইমাম আওজয়ীর কাছ হতে শিক্ষালাভ করেন এবং হাদীসের সনদ প্রাপ্ত হন। এর বিস্তৃত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো।

আবু হানীফা সাহেবের স্মৃতিশক্তি এবং এজতেহাদের সুনাম বহু দূরদেশ পর্যন্ত জড়ায়ে পড়েছে। মুসলিম জাহানে তখন তাঁর সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা হচ্ছিল। সে যুগে আবদুল্লাহ্ বিন মুবারক নামে আবু হানীফা সাহেবের একজন নামজাদা ছাত্র শাম দেশে ভ্রমণে বের হন। তাঁর কাছে ইমাম আওজায়ী জিজ্ঞাসা করলেন, কূফায় আবু হানীফা নামে কে নাকি জন্মগ্রহণ করেছেন যে, ধর্ম সম্বন্ধে তিনি নূতন নূতন কথা বলে থাকেন।

আবদুল্লাহ বিন মুবারক এর কোন উত্তর না দিয়ে বাড়ী চলে আসেন। দুই তিন দিন পরে যখন তিনি আবার ইমাম আওজয়ী সাহেবের খেদমতে গেলেন, তখন তাঁর সঙ্গে কিছু কাগজের টুকরা নিয়ে গেলেন। আওজায়ী তাঁর হাত হতে সেই টুকরাখানা নিজ হাতে নিলেন। শিরোনামার উপর লেখা ছিল, "নুমান বিন

সাবিত বলছেন।" বেশ কিছু সময় পর্যন্ত তিনি বিশেষ মনোযোগের সাথে তা দেখলেন। তারপর আবদুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করলেন, নু'মান কোন্ বুজর্গ? তিনি বললেন, তিনি ইরাকের অধিবাসী। আমি তাঁর খেদমতেই কালাতিপাত করে থাকি।

ইমাম আওজায়ী বললেন, মনে হচ্ছে যে, তিনি একজন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন লোক। আবদুল্লাহ আরজ করলেন, তিনি সেই আবু হানীফা যাঁকে আপনি একদিন প্রবঞ্চক জ্ঞান করেছিলেন।

হযরত আওজায়ী তখন নিজের ভ্রম বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হলেন। হজ্জের সময় ঘনায়ে আসলে তিনি মক্কা শরীফে গমন করলেন। ঘটনাক্রমে আবু হানীফা সাহেবের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হলো। তাঁদের মধ্যে কোন এক মাসআলা সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা আরম্ভ হলো। আবদুল্লাহ বিন মুবারকও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ইমাম আবু হানীফা তখন এমন তত্ত্বপূর্ণ আলোচনা করলেন যে, ইমাম আওজায়ী মোহিত ও মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তিনি সেই স্থান পরিত্যাগ করার পর আওজয়ী সাহেব বলেন, ইমাম সাহেব এমনই একজন উপযুক্ত লোক যে, তাঁকে দেখে লোকের ঈর্ষা হওয়া স্বাভাবিক। তার সম্বন্ধে আমার ভ্রান্ত ধারণার জন্য আমি বিশেষ দুঃখিত।

হযরত ইমাম বাকের ও ইমাম আজম

ইমাম বাকের সাহেবের সাথেও তাঁর এক অপ্রিয় ঘটনা ঘটে। ইমাম আজম একদিন মদীনায় গেলেন। তিনি ইমাম বাকের সাহেবের খেদমতে উপস্থিত হলেন। ইমাম আজমের এক সাথী তাঁর পরিচয় দান করলে, ইমাম বাকের সাহেব বললেন, শুনেছি, আপনি কেয়াসের উপর ভিত্তি করে আমার বাপ-দাদার হাদীসের বিরোধিতা করে থাকেন। ইমাম আজম বিনীতভাবে বললেন, "আমি আল্লাহর আশ্রয়ে চলছি। হাদীসের বিরোধিতা করার অধিকার কারও নাই। আপনার অনুমতি পেলে, আমি আমার বক্তব্য পেশ করব।" তারপর তাঁদের মধ্যে রীতিমত আলাপ-আলোচনা আরম্ভ হলো।

ইমাম আজম– স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে কে দুর্বল?

ইমাম বাকের– স্ত্রীলোক।

ইমাম আজম– বাট-বণ্টনে পুরুষের হক অধিক না স্ত্রীলোকের?

ইমাম বাকের– পুরুষের।

ইমাম– আমি যদি কেয়াসের উপর ভিত্তি করতাম, তবে বলতাম যে, স্ত্রীলোককে অধিক অংশ দেয়া বাঞ্চনীয়, কেননা, বাহ্যিক কেয়াসের উপর গুরুত্ব

দিলে দুর্বলকে অধিক অংশ দেয়া সমুচিত। তারপর আরজ করলেন, আচ্ছা, নামায শ্রেষ্ঠ, না রোযা?

ইমাম বাকের– নামায।

ইমাম আজম– এদিক দিয়ে দেখতে গেলে হায়েজওয়ালী স্ত্রীলোকের রোযার কাজা ওয়াজেব না হয়ে নামাযের কাজা ওয়াজেব হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল। অথচ আমি রোযার কাজা করার ফতোয়া দিয়া থাকি।

এ সকল আলাপ-আলোচনায় ইমাম বাকের সাহেব এইরূপ সন্তুষ্ট হলেন যে, তিনি স্বীয় আসন হতে উঠে এসে ইমাম আজম সাহেবের কপাল চুম্বন করলেন। ইমাম আজম সাহেবও উপকার লাভ করার উদ্দেশ্যে সুদীর্ঘকাল ইমাম বাকের সাহেবের খেদমতে ছিলেন।

তাঁর সাথে আলাপ-আলোচনা করে ইমাম সাহেব ফিকাহ ও হাদীস সংক্রান্ত বহু বিষয়ের মীমাংসা করে নিলেন। ইমাম সাহেব হযরত জাফর সাদেক (রাঃ)-এর সাহচর্য হতে অশেষ উপকার লাভ করেন।

ইমাম সাহেবের পদ-গৌরব

এমন এক সময় ছিল যে, ইমাম সাহেব সামান্য একজন তালেবুল-এলম হিসেবে মক্কা ও মদীনা পরিভ্রমণ করতেন। পরবর্তী জীবনে সেই দিনও আসছিল যে, তিনি যদি ভ্রমণে বাহির হবার ইচ্ছা করতেন, তখন সর্বত্র শোরগোল পড়ে যেত যে, ফকীহ সাহেব আরব পরিভ্রমণে বের হয়েছেন। তিনি যে কোন বস্তি বা হয়ে যেতেন, সেখানে হাজার হাজার লোকের ভিড় পড়ে যেত।

একদিন মক্কা শরীফে তাঁর মজলিসে এত ভিড় পড়ে গেল যে, সেখানে তিল মাত্র জায়গাও আর রইল না। সেখানে ফিকাহ ও হাদীস উভয়বিধ লোকের আগমন হয়েছিল। সেখানে শান্তিতে বসা দূরের কথা দাঁড়াবার স্থানও পাওয়া যেত না।

পরিশেষে ইমাম সাহেব বেগতিক দেখে বললেন, কেউ যদি মেজবানের কাছে সকল লোকজনের বসার স্থানের সুবন্দোবস্ত করে দিত!

আবু আসেম সেখানে ছিলেন। তিনি বললেন, যাচ্ছি। তারপর তিনি কয়েকটি মাসআলা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করার জন্য সেখানে থেমে গেলেন। ইমাম সাহেব তখন তাঁকে কাছে ডেকে বিশেষ মনোযোগের সাথে তাঁর প্রশ্নের মীমাংসা করে দিলেন। তখন মেজবানের কথা কারও স্মরণ রইল না। ইমাম সাহেব আবু আসেমকে বিদায় দানপূর্বক অপর এক তালেবুল এলমের দিকে মনোযোগ দিলেন। পূর্বকথা তিনি সম্পূর্ণরূপে ভুলে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে তা খেয়ালে

আসলে তিনি বললেন, কে না জানি মেজবানকে যেয়ে এ সকল কর্ণগোচর করার ভার গ্রহণ করেছিল? সেই ব্যক্তিটি কোথায়?

আবু আসেম বললেন, আমি আরজ করেছিলাম। ইমাম সাহেব বললেন, তবে তুমি যাও নাই কেন? আবু আসেম তখন তর্কচ্ছলে বললেন, আমি-তো এমন কথা বলি নাই যে, আমি এখনই যাচ্ছি। আমার অবসর মত আমি অবশ্য যাব।

ইমাম সাহেব বললেন, সাধারণ কথাবার্তায় ঐ সকল ধারণার অবকাশ নাই। জনসাধারণ এর দ্বারা যে অর্থ বুঝায় তাই গ্রহণ করা উচিত।

এক হিসেবে এটাও ফিকাহর মাসআলা ছিল। ইমাম সাহেবের প্রতি কথায় বহুকিছু মীমাংসা হয়ে যেত।

ইমাম সাহেবের উস্তাদবৃন্দও তাঁকে এরূপ সম্মানের চোখে দেখতেন যে, লোকেরা আশ্চর্যান্বিত হয়ে যেত। মোহাম্মদ বিন ফজল বলেন, এবার ইমাম সাহেব এক হাদীসের তাহকীক করার জন্য হযরত খাদীবের কাছে গেলেন। আমিও তাঁর সহচর ছিলাম। তিনি ইমাম সাহেবকে দেখা মাত্র উঠিয়া দাঁড়াইল এবং পরম সম্মানের সাথে তাঁর পাশে বসালেন। তারপর তাদের মধ্যে হাদীস সম্বন্ধে বহু আলাপ আলোচনা হলো।

ওমর বিন দীনার মক্কা শরীফের একজন বিখ্যাত মুহাদ্দেস ছিলেন। ইমাম আজম তাঁর মজলিসে উপস্থিত থাকলে তাঁকে ব্যতীত তিনি অপর কাকেও আহ্বান করতেন না।

ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালেক

ইমাম মালেক ইমাম আজমের চেয়ে বয়সে তের বছরের ছোট ছিলেন। তথাপি ইমাম প্রায়ই তাঁর মজলিসে যোগদান করে হাদীস শ্রবণ করতেন।

আল্লামা জাহবী তাজকেরাতুল হাফ্‌ফাজে লিখছেন, ছাত্র যেরূপ আদব-তমীজের সাথে শিক্ষকের সম্মুখে বসে, ইমাম আজমও ইমাম মালেকের সম্মুখে তদ্রূপভাবে বসতেন। অনেকে একে অপমানসূচক বলে মনে করত। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে তা এলমের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা ও ভদ্রতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। ইমাম মালেক ও ইমাম আজমকে কম ভক্তির চোখে দেখতেন না।

আবদুল্লাহ্ বিন মুবারক বলেন, আমি ইমাম মালেকের খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় এক বুজর্গকে সেখানে আসতে দেখলাম। ইমাম সাহেব

পরম ভক্তি শ্রদ্ধার সাথে তাঁকে নিজের পাশে বসালেন। তিনি প্রস্থান করলে ইমাম সাহেব বললেন, আপনারা কি জানেন, তিনি কে? তিনি ইরাকের মহান ইমাম আবু হানীফা। তিনি ইচ্ছা করলে, এ খুঁটিকে স্বর্ণে পরিণত করতে পারেন।

কিছুক্ষণ পরে অপর একজন বুজর্গলোক সেভানে আসলেন। ইমাম সাহেব তাঁর প্রতিও ভক্তি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন। কিন্তু ইমাম আজমের ন্যায় তত ভক্তিশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেননি। সেই বুজর্গ লোক প্রস্থান করলে, ইমাম সাহেব লোকদের কাছে পরিচয় প্রদান করলেন যে, তিনি সূফ্য়ান সওরী।

হাদীস শিক্ষার বিভিন্ন ধারা

হেজাজ ও ইরাকের ইমামগণ হাদীস বর্ণনাকালে বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করতেন। তখন শিক্ষার ধারাও বিভিন্ন ছিল। অনেকে হাদীস লিপিবদ্ধ করায় গুরুত্ব প্রদান করতেন না। ইব্রাহীম ও শায়বী হাদীস মুখস্ত করাকে সনদ মনে করিতেন। হাদীস বর্ণনাকালে অর্থ বিগড়ায়ে না গেলে, হাদীসের কোন এক অংশকেও বাদ দেয়া তিনি দুরস্ত মনে করতেন। অনেকে এর ঘোর বিরোধিতা করতেন।

একদল বলতেন যে, রাবী সম্মুখে উপস্থিত না থাকা পর্যন্ত তাঁর কাছ হতে কোন হাদীস বর্ণনা করা যায় না। ইমাম আজম সাহেবের উস্তাদ হযরত শায়বীও উক্ত মতাবলম্বী ছিলেন।

অপর একদল পর্দার আড়াল হতে লিখিতভাবে হাদীস বর্ণনা করা দুরস্ত মনে করতেন। ইমাম জহুরীর অভ্যাস এই ছিল যে, হাদীস বর্ণনা কালে শব্দ ও উদ্দেশ্যের তফসীরও বর্ণনা করে যেতেন। অনেক লোক এরও ঘোর বিরোধী ছিলেন। এক ব্যক্তি ইমাম জহুরীকে সাবধান করে বলে দিলেন যে, আপনি হাদীসে নববীতে নিজের কথা জুড়ে দিবেন না।

ইমাম মালেক এটা সর্বাধিক পছন্দ করতেন যে, ছাত্র পড়ে যাবে আর তিনি তা শুনে যাবেন। কিন্তু সকলে এই নিয়ম পছন্দ করতেন না। এক ব্যক্তি ইমাম সাহেবের মজলিস হতে এই বলে চলে গেলেন যে, শিক্ষক নিজে না পড়ে ছাত্র দ্বারা পড়ায়ে থাকেন। এ জাতীয় বহু মতবিরোধ রয়েছে।

ইমাম আজম সাহেব এই সকল মতবিরোধের অবসান কল্পে বিভিন্ন ফকীহ ও মুহাদ্দেসীনদের কাছে যাওয়া আসা করতেন। এ সম্পর্কে ইমাম সাহেবের যা কিছু অবদান রয়েছে, তা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

শিক্ষা-ধারার ক্রমোন্নতি

ইমাম সাহেবের পক্ষে সুখের বিষয় এই যে, তিনি শিক্ষা-ক্ষেত্রে অগ্রসর হবার পূর্ব হতেই হাদীসের শিক্ষা-ধারণা যথারীতি ক্রমোন্নতি আরম্ভ হয়েছিল। তারপূর্বে মৌখিকভাবে হাদীস বর্ণনা করার রীতি ছিল। কোন কোন ইমাম হাদীসকে লিপিবদ্ধ করা নাজায়েজের কাছাকাছি মনে করতেন। হিজরী ১০১ সনে হযরত ওমর বিন আবদুল আজীজ মদীনাবাসীকে চিঠি লিখলেন–হযরত (সাঃ)-এর রয়েছে, তা লিপিবদ্ধ করতে হবে। অন্যথায় তা বিলুপ্ত হবার আশংকা রয়েছে। প্রতি শহরে এসব ফরমান প্রচার করে দেয়া হলো। সুতরাং মদীনায় ইমাম জহুরী হাদীস সংগ্রহ আরম্ভ করলেন। সেসব লিপিবদ্ধ করে এর নকল কয়েকটি সংখ্যা সরকারের পক্ষ হতে সমগ্র মুসলিম সাম্রাজ্যে প্রচার করে দেয়া হল। তখন হতে হাদীস লিপিবদ্ধ করা একটি সাধারণ নিয়মে পরিণত হলো। আর যে যে স্থানে হাদীস অবগত লোক ছিলেন, তাঁদের অনুসন্ধান নিয়ে হাদীস সংকলন ও লিপিবদ্ধ হওয়া আরম্ভ হয়ে গেল।

ইমাম আজম সাহেবের উস্তাদ হযরত শায়বী মৌখিকভাবে হাদীস বর্ণনা করার পক্ষপাতী ছিলেন, তথাপি হাদীস বর্ণনাকালে তিনি কিতাব সঙ্গে রাখতেন।

তখন শিক্ষা-ধারার সর্বাধিক উন্নতি হয়েছিল। জনসভায় শেখ এক উচ্চস্থানে আসন গ্রহণ করতেন। আর হাদীসের কিতাব তাঁর হাতে থাকত। ছাত্রেরা কলম দোয়াত সহকারে বসে যেত। উস্তাদ যা কিছু বলতেন ছাত্রবৃন্দ হুবহু সেইসব শব্দে তা লিখে নিত। শ্রোতার সংখ্যা অধিক হয়ে পড়লে মধ্যবর্তী লোক দাঁড়াইয়ে যেতেন। উস্তাদ যা বলতেন, তিনিও হুবহু তাই বলে যেতেন। একটি শব্দও যাতে এদিক সেদিন না হয় তজ্জন্য কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করা হতো। কাজেই মধ্যবর্তী লোক নির্বাচনে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হত যে– তাঁর স্মৃতিশক্তি যেন প্রখর এবং সর্ব বিষয়ে তিনি যেন পারদর্শী হন। আর তাঁর সুর ও আওয়াজ যেন বুলন্দ হয়। সর্বদিক লক্ষ্য করে আদম বিন আবী আইয়াজ এবং ইবনে আতীয়াকে যথাক্রমে ইমাম শায়বী এবং ইমাম মালেকের শিক্ষা মজলিসের মধ্যবর্তী লোক নির্বাচন করা হয়।

ইমাম সাহেবের হাদীস শিক্ষক

ইমাম সাহেবের হাদীসের শিক্ষক অসংখ্য ছিলেন বলে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। আবু হেফজ কবীর দাবী করেছেন যে, ইমাম সাহেব অন্ততঃ পক্ষে চার হাজার ব্যক্তির কাছে হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। অবশ্য ইসলামের ইতিহাসে এরূপ উদাহরণ বিরল নয়।

হাদীস সংগ্রহে মুসলমানগণ যেরূপ কঠোর পরিশ্রম ও আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন দুনিয়ার অন্যান্য সম্প্রদায়ের পক্ষে তা অনুমান করা সুকঠিন ব্যাপার। চার হাজার লোকের কাছ হতে হাদীস সংগ্রহ করেছেন, এমন অসংখ্য লোকের নাম আমরা জানি। আর এমন লোকের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়, যাঁরা হাজার লোকের কাছে পড়াশুনা করছেন। তাঁদের নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

ইমাম সাহেবের শেখদের বিস্তৃত বিবরণ

পরিতাপের বিষয় এ যে, মুহাদ্দেসীন যেসব কিতাবে ইমাম সাহেবের হাল অবস্থা ও তাঁর শেখদের পরিপূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করছেন, সেই সকল কিতাব আমাদের হাতে পড়ে নাই। আর যে সব কিতাব আজকাল পরিদৃষ্ট হয়, তাতে এত অসংখ্য লোকের হাল-অবস্থার বিবরণ রয়েছে যে, তা হতে কোন লোকের ব্যক্তিগত হাল-অবস্থা পরিজ্ঞাত হওয়া কঠিন ব্যাপার।

বাগদাদ-ইতিহাস, তাহজীবুল কামাল, তাহজীবুল আসমা ও লুগাত, তাযকিরাতুল হোফ্‌ফাজ মুয়াত্তা ইমাম ইত্যাদি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস হতে ইমাম সাহেবের শেখদের যে বিবরণ পাওয়া যায়, তা আমরা পৃথক ভাবে পূর্ব অধ্যায় সমূহে বর্ণনা করেছি। নিম্নে তাঁদের নাম দেয়া গেল।

মক্কাশরীফে ছিলেন– আত্তার বিন রব্বাহ, ওমর ইবনে দীনার, আবদুল আজীজ বিন রাফীয়, আবুজ্জুবাইর মোহাম্মদ বিন মুসলিম, ইসমাঈল বিন আদুল মালেক, হারেস বিন আবদুর রহমান ও ইবনে আব্বাস।

মদীনা শরীফে ছিলেন– আতীয়া বিন সাইদ, হেসাম বিন আরওয়া, নাফেয় বিন ওমর, আবদুর রহমান বিন হরজুমুল আয়রাজ, আবদুল্লাহ্ বিন ওমর বিনহেফাজ এবং আবদুর রহমান বিন দীনার।

কূফানগরে ছিলেন– হাকীম বিন ওতবা, ছলমা বিন কাহীল, জায়াদ বিন আল্লাকাহ, সয়ীদ বিন মাসরূক, আবু ইসহাক, মহারেব বিন ওসার, হাসীম বিন হাবীবুস ছারাফ, ফারেছ বিন মুসলিম, ইয়াজীদুল ফাকীর, সেমাক বিন হরব, আবদুল মালেক বিন ওমর, আয়মাশ ও উন বিন আবদুল্লাহ্।

বসরায় ছিলেন– কাতাদা, আসেম বিন সুলায়মান আহওয়াল ও শাইবান বিন আবদুর রহমান।

ইমাম সাহেবের তাহকীক ও সতর্কতা

ইমাম সাহেবের শেখদের যে তালিকা দেয়া হয়েছে, তা বাস্তবের তুলনায় অতি সংক্ষিপ্ত। সব শেখদের নাম উল্লেখ করতে হলে এর কলেবর শতগুণে বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু প্রকৃত সর্ত এ যে, ইমাম সাহেবের অসংখ্য শেষ থাকা যেরূপ

গৌরবের বিষয়, এর চেয়ে অধিক গৌরবের বিষয় এ যে, তিনি হাদীস শ্রবণ ও সংগ্রহ ব্যাপারে আপ্রাণ সতর্কতা অবলম্বন করতেন। তিনি এর বিশেষভাবে অবগত যে, হাদীস বর্ণনাকালে যত অধিক মধ্যস্থতা থাকবে, ততই এতে পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধনের আশংকা থাকিবে।

ইমাম সাহেবের উস্তাদ প্রায়ই তাবেয়ীনদের অন্তর্গত ছিলেন এবং তাদেরকে রাসূল (সাঃ) পর্যন্ত একটিমাত্র মধ্যস্থতা অবলম্বন করতে হয়েছিল বা এমন লোক তাঁর উস্তাদ ছিলেন, যাঁরা নামজাদা তাবেয়ীনদের সাহচর্যে ছিলেন; তাঁদের এলম ও ফজীলত, আমানতদারী ও পরহেজগারী অতুলনীয় ও অপার্থিব।

ইমাম সাহেবের শিক্ষাধারা সাধারণ শিক্ষার্থী হতে পৃথক ছিল। জীবন প্রভাতেই তিনি তর্কবিতর্ক ও এজতেহাদে উঠে পড়ে লেগে যান। আর এ সম্পর্কে প্রয়োজনবোধে ওস্তাদের বিরোধিতা করতেও তিনি পরওয়া করতেন না।

তিনি এক দফা হযরত হাম্মাদের সাথে কোথাও যাচ্ছিলেন। পথ চলতে চলতে মাগরিবের নামাযের সময় হয়ে গেল। হযরত হাম্মাদ তয়ম্মুম করার ফতোয়া দিলেন। ইমাম সাহেব এর বিরোধিতা করে বলেন, নামাযের শেষ সময় পর্যন্ত পানির জন্য অপেক্ষা করতে হবে। ঘটনাক্রমে কিছুদূর যেয়েই পানি পাওয়া গেল। তখন সকলে অজু করে নামায আদায় করলেন। সেদিন জীবনের সর্বপ্রথম তিনি শেখের বিরোধিতা করলেন। আর তাও তাঁর শিক্ষার্থী জীবনের প্রথম পর্যায়ের ঘটনা।

ইমাম শায়বী ছিলেন তাঁর ওস্তাদ। উস্তাদ সাহেবের রায় এই ছিল যে, পাপের কোন কাফ্ফারা দিতে হয়; কেননা, খোদাতায়ালা তালাকের কাফ্ফারা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। ইমাম শায়বী এর কোন সদুত্তর দিতে পারলেন না। তিনি ক্রোধভরে বললেন, আপনি কি কেয়াস করে বলছেন?

কোন এক ব্যক্তি হযরত আত্তার বিন আবি রব্বাহের কাছে আয়াতের অর্থ জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, "হযরত আইয়ূবের যেসব বংশধর মারা গিয়েছিল খোদা তাঁদেরকে জীবিত করে দিলেন এবং তাঁদের সঙ্গে নূতন লোকও পয়দা করলেন।" ইমাম আবু হানীফা বললেন, কোন ব্যক্তি যদি কারও ঔরসে জন্ম গ্রহণ না করে, তবে সে তার সন্তান হতে পারে না।

ইমাম সাহেবের জ্ঞানের দিক দিয়ে উন্নতির অপর একটি কারণ এই যে, তাঁর জীবনে বহু কামেল ব্যক্তির সাহচর্য লাভের সুযোগ ঘটেছিল। কূফা, বসরা, মক্কা, মদীনা ইত্যাদি যে সকল শহরে তাঁর অবস্থান করার সুযোগ লাভ হয়েছিল, সেই সব স্থানে আলো-বাতাস মজহাবী আলাপ-আলোচনায় ভরপুর ছিল।

আলেমদের সাথে মিলেমিশে করা এবং এলমী সভাসমিতিতে যোগদান করার প্রেরণা তাঁর রক্ত-মাংসের সাথে জড়িত ছিল। তাঁর নামধাম ও যশ-গৌরব দেশ-বিদেশে এরূপ ছড়ায়ে পড়েছিল যে, তিনি যেখানেই যেতেন, তাঁর সাথে সাক্ষাৎ লাভ, উপকার প্রাপ্তি এবং তর্ক-বিতর্ক করার জন্য শত সহস্র লোক সমবেত থাকত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইমাম সাহেবের শিক্ষা-মজলিস্ ও জীবিকা-নির্বাহের উপায়

উস্তাদের প্রতি আদব

হযরত হাম্মাদ ছিলেন ইমাম আজমের উস্তাদ। উস্তাদের জীবিতকালেই ছাত্র এজতেহাদের উপযুক্ততা অর্জন করেছিলেন। তাঁর বয়সও তখন কম ছিল না। উস্তাদের মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল চল্লিশের মত। তথাপি উস্তাদের প্রতি তাঁর এমনই গভীর ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিল যে, উস্তাদের জীবিতকালে তিনি পৃথক দরবার কায়েম করবেন, তা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। পূর্বকালে উস্তাদের প্রতি শাগরেদের কিরূপ ভক্তিশ্রদ্ধা ছিল তা অনুমান করাও আজকাল কঠিন ব্যাপার।

ইমাম সাহেব বলছেন–হযরত হাম্মাদ যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন আমি তাঁর বাড়ীর দিকে পা মেলে বসি নাই।

হিজরী ১২০ সনে হযরত হাম্মাদ ইন্তেকাল করেন। হযরত ইব্রাহীমের ইন্তেকালের পরে হযরত হাম্মাদই ফিকাহ-শাস্ত্রের কেন্দ্রস্থল ছিলেন। হযরত হাম্মাদের মৃত্যুতে কুফানগর নিষ্প্রভ হয়ে গেল। হযরত হাম্মাদ এক উপযুক্ত পুত্র রেখে ইন্তেকাল করেন। লোকের অনুরোধে পুত্রকে পিতার আসনে বসতে হলো। কিন্তু তাঁর চরিত্রে কঠোরতার অভাব থাকায় তাঁকে অপসারিত করে হযরত হাম্মাদের শিষ্যবৃন্দের মধ্যে সর্বগুণে গুণান্বিত এবং বয়োজ্যেষ্ঠ মূসা বিন কাছীরকে সেই মসনদে সমাসীন করা হলো। ফিকাহতে যদিও তিনি তত পারদর্শী ছিলেন না, তথাপি তিনি বহু বুজর্গ লোকের সাহচর্য লাভ করেছিলেন এবং তজ্জন্য লোকেরাও তাঁকে পরম শ্রদ্ধার সাথে দেখত। কাজেই তিনি কিছুকাল শিক্ষাদান কার্য পরিচালনা করলেন। তিনিও হজ্জে চলে গেলে সব বুজর্গ লোক একমত হয়ে ইমাম আবু হানীফাকে সেই পদ অলঙ্কৃত করার জন্য অনুরোধ করলেন।

ইচ্ছা করলে তার আগেও ইমাম আজম সেই আসনে সমাসীন হতে পারতেন। তা দূরের কথা, আজ সর্বলোকে তাঁকে সেই কাজে অগ্রবর্তী হতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করছে। তথাপি সেই গুরুভার স্বীয় স্কন্ধে বহন করতে তাঁর মন রাজী হয়ে উঠছে না। ইতিমধ্যে ইমাম সাহেব এক রাত্রে স্বপ্নে দেখলেন যে,

তিনি হুজুর আলায়হিছ সালামের কবর মোবারক হতে হুজুরের হাড়গুলো একত্র জমা করতেছেন এবং এক হাড় হতে অন্য হাড় পৃথক করে রাখতেন। তিনি ভীত-কম্পিত হৃদয়ে জাগরিত হলেন। তারপর তিনি জনৈক স্বপ্নবিশারদের কাছে এর বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করলেন। সেই ব্যক্তি বললেন, আপনি হুজুর আলায়হেছ সালামের এলম, ফিকাহ ও সুন্নত বিষয়ে এরূপ উন্নতিলাভ করবেন যে, আপনার তফছীর বর্ণনা করার মত শক্তিও অর্জিত হবে। আর আপনি মিথ্যা হতে সত্যকে উদ্ধার করবেন।

ইমাম সাহেব দ্বিতীয় বার হুজুর (সাঃ) কে স্বপ্নে দেখলেন। হুজুর বললেন, " হে আবু হানীফা, খোদা তোমাকে এই জন্য সৃষ্টি করেছেন যে, তুমি আমার সুন্নতকে জীবিত করবে। তোমাকে লোক সমাজে বসবাস করতে হবে।"

শিক্ষা-মজলিসের বিস্তৃতি

এ স্পেন ব্যতীত অপরাপর প্রত্যেকটি ইসলামী রাজ্য হতেই ছাত্রগণ ইমাম সাহেবের কাছে পড়া-শুনা করতে আসতেন। যেসব অঞ্চলে সেই প্রভাব বিস্তারিত হয়ে পড়েছিল, এদের সংখ্যা গণনা করা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত জেলা ও প্রদেশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য যথা মক্কা, মদীনা, দামস্ক, বসরা, জজীরাহ, মিসর, ইয়ামন, বাগদাদ, কেরমান ও নেশাপুর। মোটকথা এই যে, ইমাম সাহেবের উস্তাদী-সীমানা তখনকার খলীফার রাজ্যের বরাবর ছিল।

শাহ্ আবদুল আজীজ সাহেব লিখেছেন যে, বনু-উম্মাইয়ার জমানায় জায়েদ বিন আলী যে বিপ্লব করেন, ইমাম সাহেব তাতে যোগদান করেছিলেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিকগণেরও এরূপ ধারণা। কিনতু আমি যে সব ইতিহাসের কথা জানি, তাতে কোথাও এর উল্লেখ দেখি নাই। এ বক্তব্য সত্য হয়ে থাকলে নিশ্চয়ই এ সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য ঘটনা থাকত।

পদগ্রহণে অস্বীকৃতি

মরওয়ান ইয়াজীদ বিন ওমরকে গবর্ণর নিযুক্ত করেন। তিনি অত্যন্ত ধীর-স্থির সাহসী, সৎ বংশজাত এবং ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোক ছিলেন। তিনি মরওয়ানী হুকুমতের দোষ-ত্রুটির সংশোধন সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলেন। পরিশেষে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, উক্ত শাসন ধর্ম ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায়ে অপরাপর দিক দিয়ে তেমন কোন মারাত্মক দোষ-ত্রুটি না থাকা সত্ত্বেও এটা দুর্বল হয়ে পড়েছে। কাজেই তিনি ধর্মীয় ভিত্তি সর্বপ্রথমে সুদৃঢ় করার সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন। তজ্জন্য তিনি ইরাকের সকল আলেমকে ডেকে এনে বিভিন্ন উচ্চপদে বহাল করতে চাইলেন।

তিনি ইমাম সাহেবকে মীর-মুন্সী এবং প্রধান খাজাঞ্চীর পদে নিযুক্ত করতে চাইলেন। কিন্তু ইমাম সাহেব স্পষ্টভাবে তা অস্বীকার করলেন। ইয়াজীদ কসম খেয়ে বলল যে, তাঁকে অবশ্যই উক্ত পদ গ্রহণ করতে হবে। অন্যান্য বুজর্গ লোকেরাও ইমাম সাহেবকে উক্তপদ গ্রহণ করার জন্য বহু অনুরোধ করলেন। তিনি তাঁর পূর্ব মতেই অটল রইলেন। ইয়াজীদ এতে ক্রোধান্ধ হয়ে তাঁকে প্রতি রোজ দশ দোর্‌রা মারার জন্য আদেশ দিল।

উক্ত আদেশ পালন করা হলো। তথাপি ইমাম সাহেবের মনোবৃত্তির বিন্দুমাত্রও পরিবর্তন সাধিত হলো না।

একদিন সেই সময়কার খলীফা প্রধান কাজী শায়বী ও অন্যান্য খাস আলেমদেরকে ডাকলেন। তারপর প্রত্যেক খাদেমের নামে কিছু বিষয়-সম্পত্তি লিখে দেবার জন্য দারোগাকে বললেন। তারপর উক্ত দলীল দস্তখতের জন্য আলেমদের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হলো। কাজী শায়বী সাক্ষী স্বরূপ উক্ত দলীলে দস্তখত করলেন। অতঃপর অন্যান্য আলেমগণও এতে দস্তখত করলেন। ইমাম আবু হানীফা কিন্তু এতে দস্তখত করতে রাজী হলেন না। তিনি খাদেমকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমীরুল মুমেনীন কোথায়? খাদেম বলল, তিনি এখন রাজপ্রাসাদে অবস্থান করছেন। তিনি বললেন, হয় আমীরুল মুমেনীন এখানে আগমন করবেন, না হয় আমাকে সেখানে যেতে হবে। অন্যথায় সাক্ষ্য প্রদান দুরস্ত হবে না।

রাজকর্মচারীদের মেজাজ প্রায়ই ভাল পাওয়া যায় না। উর্দ্ধতন কর্মচারী হতে নিম্নতম কর্মচারীদের চরিত্রেও এই হীন রোগ পরিলক্ষিত হয়। খাদেম এর অন্যথা হবে কেন? বিশ্ববিখ্যাত ইমামকে খাদেম বলল, কাজী ও অপরাপর ফকীহ্ গণও সাক্ষ্য দান করছেন। কিন্তু আপনি কেন অনর্থক বাড়াবাড়ি করছেন? তথাপি ইমাম সাহেব ধীর শান্তভাবে বললেন, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ আমলের জন্য দায়ী হইবে।

এসব আলাপ-আলোচনা খলীফারও কর্ণগোচর হলো। তিনি কাজী শায়বীকে রাজ-দরবারে আনাইয়া জিজ্ঞাসা করলেন, সাক্ষ্যপ্রদানে কি উপস্থিতি অপরিহার্য অংশ? কাজী সাহেব তা স্বীকার করলে খলীফা সাহেব বললেন, তবে আপনি না দেখে কেন সাক্ষ্য প্রদান করেছিলেন? ইমাম শায়বী বললেন, আমি বুঝে নিয়েছিলাম যে, এটা আপনার জ্ঞাতসারেই হয়েছে। আর এটাও সত্য যে, আপনাকে এসে দেখে যেতে বলতে আমি সাহস পাই নাই।

ইমাম সাহেব বললেন, এটা কাজী-সুলভ জবাব হয় নাই। এমন ত্রুটি যার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়, তাকে কাজীর পদে বহাল রাখা সমীচীন নয়।

কাজী-পদ অপর কাকে দেয়া যায়, খলীফা তখন হতে সেই চিন্তায় বিভোর হলেন। তারপর এ সম্বন্ধে আমীর ওমরাদের পরামর্শ চাইলেন। তাঁর যথাক্রমে ইমাম আবু হানীফা, সূফ্য়ান শারীহ এবং মাশআর বিন কেরাম (রাঃ)-এর নাম পেশ করলেন। খলীফা চারজনকেই আহ্বান করলেন।

ইমাম সাহেব পথিমধ্যে তাঁদেরকে বললেন, আমি আপদেরকে পরামর্শ দিচ্ছি যে, আমি-তো চালাকী করে বেঁচে যাব। সূফ্য়ান পলায়ন করবেন। মাশআর নিজেকে পাগল বলে প্রমাণিত করবেন। কাজেই কাজী-পদ শারীহের স্কন্ধেই নিপতিত হবে।

সূফ্য়ান সেই পরামর্শানুযায়ী ভেগে গেলেন। তিনি এক কিশ্তিতে গোপন ভাবে রইলেন। নৌকাওয়ালাকে এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে বলে কয়ে রাখলেন। ইমাম সাহেব সকলকে নিম্নলিখিত হাদীস শুনিয়ে দিলেন। হাদীস–

"যাকে লোকের কাজী বানান হয়, তাকে ছুরি ব্যতীতই জবেহ্ করা হয়।" অর্থাৎ কাজী-পদ অত্যন্ত দায়িত্ব ও গুরুত্বপূর্ণ। সঠিকভাবে স্বীয় কর্তব্য পালন না করিলে তাকে ভীষণ শাস্তিগ্রস্ত হতে হবে। এর অর্থ দাঁড়ায় না যে, কেউ যেন কাজীর পদ গ্রহণ না করে। ইসলাম-আদর্শ-ভ্রষ্ট খলীফার অধীনে কাজীপদ করলে ইসলামকে পরিপূর্ণরূপে পালন করা সম্ভবপর হবে না ভেবে ইমাম আজম এর দায়িত্ব কবুল করেন নাই।

সূফ্য়ানকে মাঝিরা গোপন করে নিল। অপরাপর তিন জনেই খলীফার দরবারে হাজির হলেন। খলীফা সর্বপ্রথমে আবু হানীফা সাহেবকে কাজী-পদ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করলেন।

তিনি বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন, আমি আরব দেশের লোক নই। আরব-নেতৃবৃন্দ আমার ফতোয়াকে গ্রাহ্য করবেন না।

জাফর বরমকী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, কাজীপদের সাথে এর কোন সংশ্রব নাই। বরং এতে এলমের প্রয়োজন।

এটা শুনে ইমাম সাহেব বললেন, আমি আপনাদেরকে বলছিলাম যে, আমি কাজী-পদের উপযুক্ত নই। কাজেই আমি যদি সত্য বলে থাকি, তবে এটা প্রমাণিত হয়ে গেল যে, আমি উক্ত পদের উপযুক্ত নই। আর যদি মিথ্যা বলে থাকি, তবে মিথ্যাবাদীকে কখনও উক্ত পদে নিযুক্ত করা সমীচীন নয়। আপনি বর্তমান সময়ের খলীফা। আপনার পক্ষে এটা কস্মিণকালেও শোভা পায় না, আপনি এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে একজন মিথ্যাবাদীকে নিযুক্ত করবেন। এই সব বলে ইমাম সাহেব রেহাই পেলেন।

তারপর মশআর সাহেব খলীফার দরবারে উপস্থিত হয়ে হঠাৎ খলীফার হাত

চেপে ধরলেন। আর বললেন, আপনি কেমন আছেন, আপনার সন্তান-সন্ততি কেমন আছে? খলীফা তাঁর এ অবস্থা দেখে তাঁকে উন্মত্ত ভেবে দরবার হতে বের করে দিলেন।

তারপর শারীহকে কাজী-পদ গ্রহণ করার জন্য বলা হলে, তিনি বললেন, আমি একজন উন্মত্ত ব্যক্তি। আমার মস্তিষ্ক অত্যন্ত দুর্বল। খলীফা তাঁকে চিকিৎসার পরামর্শ দিলেন। তারপর তাঁকে কাজীপদে নিযুক্ত করলেন। তখন হতে ইমাম আবু হানীফা তাঁর সাথে সকল সম্পর্ক ছেদ করলেন। তিনি তাঁর সাথে কোন কথা পর্যন্ত বলতেন না।

সেফাহ্ ও মনসূরের রক্ত পিপাসা

আব্বাসীয়গণ ওমাইয়া খান্দানকে যখন প্রায় সমূলে ধ্বংস করে ফেলেছিল, এমনকি সেই বংশের খলীফাদের কবর খনন করে তাঁদের হাড় পর্যন্ত পুড়িয়ে দিয়েছিল, তথাপি যেহেতু নব সরকার গঠিত হচ্ছিল এবং কোন সরকারই সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত ছিল না এবং বিভিন্ন স্থানে বিপ্লব-বিদ্রোহ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল, সেইসব অশান্তি-বিদ্রোহকে শান্ত করতে যেয়ে সেফাহ ও মনসূর ন্যায়-পরায়ণতার সীমা বহুদূর ডিঙ্গিয়ে গিয়েছিল। ফলে মরওয়ানী হুকুমতের ছবি আবার প্রত্যেকের চোখে ভেসে উঠেছিল। নব শাসনকর্তা নিযুক্ত হলে প্রত্যেকের দৃষ্টি তৎপ্রতি আকৃষ্ট হতো। কিন্তু এ রক্ত-পিপাসু-দল সকলকে হতাশ করিয়া দিত।

কোন এক বিষয় প্রসঙ্গে মনসূর তাঁর বাল্যবন্ধু রহমানকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমার শাসনকাল ও মরওয়ানী শাসনকালের মধ্যে কি প্রভেদ রয়েছে?" সেই ব্যক্তি বললেন, আমার চোখে-তো কোন পার্থক্য ঠেকতেছে না। তখন মনসূর বললেন, আমি কি করব, কাজের মানুষ-তো মিলা ভার।

আবদুর রহমান বললেন, যে জিনিষের চাহিদা অধিক, বাজারে, তাই অধিক পরিমাণ আমদানী হয়ে থাকে।

সাদত সুদীর্ঘকাল অবধি খিলাফত লাভের বাসনা পোষণ করছিলেন। এক দিক দিয়ে তাঁর সেই দাবী করার যথেষ্ট অধিকারও ছিল। কিন্তু সাদতের মৃত্যুর পূর্ব-সময় পর্যন্ত তেমন কোন আভাসও পাওয়া যায় নাই। শুধু সন্দেহের বশবর্তী হয়ে মনসূর তাঁকে এবং তাঁর দলগত লোকের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ করে দিল। সেই দলের নেতৃবৃন্দের প্রতি নৃশংস অত্যাচার চলছিল। সেই দলের অন্যতম নেতা মোহাম্মদ বিন ইব্রাহীমকে দেওয়াল-চাপা দিয়ে মেরে ফেলা হয়েছিল।

পরিশেষে হিজরী ১৪৫ সনে মোহাম্মদ নফছে-জকীয়া অল্পসংখ্যক লোকসহ পবিত্র মদীনা শহরে পলাইয়া যান। অল্প দিনের মধ্যে সেই দল সংখ্যাপুষ্ট হয়ে উঠল। ধর্মীয় অন্যতম নেতৃবৃন্দ, এমনকি ইমাম মালেক ফতোয়া দান করলেন যে, মনসূর অন্যায়ভাবে খিলাফত অধিকার করে নিয়েছেন। খিয়াফতের প্রকৃত অধিকারী ছিলেন নফছে জকীয়া।

নফসে জকীয়া ও ইব্রাহীমের বিপ্লব

নফছে-জকীয়া অত্যন্ত সাহসী শক্তিমান ও যুদ্ধ-বিশারদ ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস কেউই ফিরাইতে পারে না। হিজরীতে পারে না। হিজরী ১৪৫ সনে অপূর্ব বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করে তিনি শহীদ হন। তারপর তাঁর ভ্রাতা ইব্রাহীম এর চূড়ান্ত প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। তিনি এমনই বিপুল আয়োজন সহকারে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন যে, মনসূরের হুঁশ পর্যন্ত হারাবার উপক্রম হলো। তাতে তিনি এমনই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন যে, দুই মাস পর্যন্ত তিনি কাপড় বদলাবার অবসর পেয়ে উঠলেন না। তিনি শয়নের সময় তাকেও সরায়ে দিলেন। তিনি বলতেন, আমি জানি না, এই তকিয়া আমার, না কি ইব্রাহীমের। তখন দুইটি সুন্দরী নারী তাঁর অন্তঃপুরে প্রবেশ করলে, তিনি তাদের সাথে একটি কথাও বললেন না, কোন এক ব্যক্তি এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বললেন, এ সকল অবসর সময়ের ব্যাপারে। এখন তো আমি এই চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত আছি যে, আমার শির প্রথমে ছিন্ন হবে, নাকি ইব্রাহীমের শির।

ইব্রাহীম একজন জনপ্রিয় জবরদস্ত আলেম ও সাহসী যোদ্ধা ছিলেন। সুতরাং তাঁর খেলাফত লাভের আন্দোলন চারদিকে জনপ্রিয় হয়ে উঠল। শুধু কূফা নগরেই প্রায় বিশ লক্ষ লোক তাঁর জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হয়ে গেল। ধর্মপ্রাণ মুসলমান, বিশেষভাবে আলেম ও ফকীহবৃন্দ তাঁর পতাকা তলে সমবেত হলেন।

ইমাম আবু হানীফা প্রথম হতেই আব্বাসীদের অত্যাচার অবিচার অবলোকন করে আসছিলেন। আর সফাহের জমানায় এটা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে যে, তারা খেলাফত পাবার উপযুক্ত লোক নয়।

ইব্রাহীম বিন মাইমুনা একজন দীনদার আলেম ছিলেন। তিনি ইমাম সাহেবের একজন পরম বন্ধুও ছিলেন। এ সম্বন্ধে চুপ থাকা সমীচীন কিনা, তা তিনি প্রায়ই ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞাসা করতেন। ইমাম সাহেব বলতেন, সৎকার্যে আদেশ অসৎকার্যে নিষেধ ফরজ। এতে সন্দেহের অবকাশ নাই। তবে শর্ত এই যে, তেমন শক্তি সঞ্চয় করা চাই।

হিজরী ১৪৫ সনে ইব্রাহীম যখন খিলাফত আন্দোলন জোরেশোরে চালালেন,

তখন অন্যান্য ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে ইমাম সাহেবও তাঁর প্রতি সমানুভূতি প্রদর্শন করলেন। ইমাম সাহেব নিজেও সেই সংগ্রামে যোগদান করতে চাইলেন। কিন্তু কয়েকটি অপরিহার্য কারণে তাতে যোগদান করতে পারলেন না। তজ্জন্যে তিনি চিরকাল আক্ষেপ করে গিয়েছেন।

ইব্রাহীমের পাশে ইমাম সাহেব

তিনি ইব্রাহীমের কাছে নিম্নলিখিত চিঠি লিখেন–"আমি আপনার কাছে চার হাজার দেরহাম পাঠাচ্ছি। বর্তমানে আমার হাতে এর চেয়ে অধিক অর্থ নাই। আমার কাছে লোকের আমানত না থাকলে আমি অবশ্যই আপনার সাথে মিলিত হতাম। আপনি যদি দুশমনের উপর জয়লাভ করতে পারেন, তবে আপনার পূর্ব-পুরুষ হযরত আদী (রাঃ) সফ্ফীন বাসীদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করছেন, আপনিও তাদের প্রতি তদ্রূপ ব্যবহার করবেন। কিন্তু আপনার পিতৃপুরুষ উষ্ট্রযুদ্ধে "আহত ও পলায়নপর লোকদের নিহত কর" যে নীতি অবলম্বন করেছিলেন সেই নীতি অবলম্বন করবেন না: কেননা তারা সংখ্যায় অসংখ্য।" এই চিঠি সম্বন্ধে এতখানি বর্ণিত রয়েছে যে, এটা বিশ্বাসযোগ্য কিতাব হতে উদ্ধৃত করা হয়েছে। কোন নির্দিষ্ট কিতাবের নাম করা হয় নাই।

এ চিঠি সহীহ হোক বা ভুল হোক কিন্তু এতে সন্দেহ নাই যে, ইমাম সাহেব স্পষ্টভাবে ইব্রাহীমের পক্ষাবলম্বন করেছিলেন। আর ইমাম সাহেব যদিও স্বয়ং যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন নাই তথাপি সর্বদিক দিয়ে তিনি তাঁকে আপ্রাণ সাহায্য করেন। ইব্রাহীমকে শৃঙ্খলার অভাবে পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল। তিনি বসরায় মহা পরিক্রম ও বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইমাম সাহেবের মৃত্যুশোক

হিজরী ১৪৬ সনে ইমাম সাহেবকে মনসূর কারারুদ্ধ করেন। কিন্তু ইমাম সাহেবকে কারারুদ্ধ করেও মনসূর শান্তিতে কালযাপন করতে পারেন নাই। বাগদাদ রাজধানীতে পরিণত হওয়ায়ে এটা শিক্ষা-দীক্ষারও কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হয়েছিল। জ্ঞান-পিপাসু ছাত্রবৃন্দ ইসলামী রাজ্যের চারদিক হতে বাগদাদের দিকে ঝুঁকে পড়ল। ইমাম সাহেবের যশ সুখ্যাতি বিশ্বময় ছড়ায়ে পড়ছিল। কারারুদ্ধ হওয়ায়ে তিনি অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করলেন। শহরের উপর বাগদাদের আলেম-ওলমা ও পীর-ফকীহদের প্রবল পরাক্রান্ত প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল তাঁরা ইমাম সাহেবের প্রতি বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা রাখতেন।

মনসূর অবশ্যই ইমাম সাহেবকে কারারুদ্ধ করেন। কিন্তু তাঁর প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা সম্মানের উপর আঘাত করবে, এমন কোনকিছু করা মনসূরের ক্ষমতার বাইরে ছিল। জেলখানার ভিতরেই ইমাম সাহেব যথারীতি শিক্ষাদান কার্য বরাবর চালায়ে গেলেন। বিশ্ববিখ্যাত ইমাম মোহাম্মদ এই জেলখানাতেই ইমাম আজমের কাছে শিক্ষা লাভ করেন। যে ভয়ে ভীত হয়ে মনসূর তাঁকে কারারুদ্ধ করেন, কারারুদ্ধ করেও তিনি তা হতে রেহাই পান নাই। ইমাম সাহেবের আদর্শের বিপরীত ভাবে শাসন করা খলীফার পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। মনসূর পরিশেষে গোপনে আহার্য্যের সঙ্গে বিষ মিশায়ে ইমাম সাহেবকে খাওয়ায়ে। ইমাম সাহেব বিষ ক্রিয়া বুঝতে পেরে সেজদায় পতিত হলেন। সেই অবস্থায়ই তিনি ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহ.....।

তাঁর মৃত্যু-সংবাদ ঝড়ো-গতিতে দেশময় ছড়িয়ে পড়ল। সারা বাগ্‌দাদ তখন জড় হয়ে আসল। শহরের কাজী সাহেব তাঁকে গোসল দান করলেন। গোসল করার সময় তিনি বলছিলেন, আল্লাহ কসম, হে মহান, ইনি সর্বশ্রেষ্ঠ ফকীহ, আবেদ ও জাহেদ ছিলেন। আপনি সর্বগুণের আধার ছিলেন। আপনি অতি উচ্চ মর্যাদা লাভ করেছিলেন। গোসল দানের সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চাশ হাজার লোক তাঁর জানাযায় শামিল হলো। তথাপি লোকের ভীড় কমিল না। চারবার তাঁর জানাযা পড়া হলো। আসরের সময় ঘনাইয়ে আসল তাঁকে দফন করা হলো।

খীজরানের কবরস্থানে দফন করার জন্য ইমাম সাহেব অসিয়ত করে যান। তাঁর ধারণা ছিল, এ জায়গা আল্লাহর ক্রোধ-মুক্ত। সেই অসিয়ত অনুযায়ী তাঁকে তথায় দফন করা হলো। তাঁর জন-প্রিয়তা এর চেয়ে অধিক কি প্রমাণ থাকতে পারে!

শোক-গীতি

তখন সেই রাজ্যে বহু নামজাদা ধর্মীয় নেতা বিদ্যমান ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ইমাম সাহেবের কয়েকজন উস্তাদও ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে সকলেই শোকাকুল হয়ে উঠলেন।

ইবনে জরীহ মক্কায় অবস্থান করছিলেন। তিনি ইমাম সাহেবের মৃত্যুসংবাদ শুনে বললেন, ইন্না লিল্লাহে, বহু বড় একজন আলেম আজ দুনিয়া ছেড়ে গেলেন।

ইমাম সাহেবের শেখ এবং বসরার ইমাম হযরত শুয়বাহ্‌বিনুল হেজ্জাজ বললেন, কূফা অন্ধকার হয়ে গেল।

এর কিছুদিন পর আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক বাগদাদ যাবার পথে ইমাম সাহেবের কবরের পাশে যেয়ে রোদন করতে করতে বললেন, আবু হানীফা, খোদা আপনার উপর রহম করুক! ইব্রাহীম মরে গেলেও তিনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত লোক

রেখে গিয়েছিলেন। কিন্তু হে মহান, সমগ্র দুনিয়ায়ও আপনি আপনার একজন স্থলাভিষিক্ত লোক রেখে যান নাই। তাঁর মাযার চির সম্মান লাভ করল। আজও হাজার হাজার লোকে এটি জিয়ারত করে থাকে। তাঁর মাযারের সন্নিকটে একটি মাদ্রাসা স্থাপন করা হয়েছে। এমন সুরম্য অট্টালিকার মাদ্রাসা অতি বিরল।

সেই মাদ্রাসার পাশে একটি মুসাফির খানাও স্থাপিত হয়েছিল। ইসলামী রাজ্যের বিভিন্ন অংশ হতে যে সকল শিক্ষার্থী এলম শিক্ষা করতে আসতেন তারা এখানে আহার ও বাসস্থান পেতেন। আজও এর শান-শওকত ও ইজ্জত গৌরব দেখলে স্তম্ভিত হতে হয়।

ইমাম সাহেবের সন্তান সন্ততি

তাঁর সন্তান সন্ততির বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া কঠিন। তবে এতটুকু নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, ইমাম সাহেবের মৃত্যুর সময় হাম্মাদ ব্যতীত তাঁর অন্য কোন সন্তান জীবিত ছিলেন না।

হাম্মাদ অতি উচ্চ শ্রেণীর আলেম ছিলেন। শৈশব হতেই অত্যন্ত সতর্কতার সাথে তাঁকে শিক্ষাদান করা হয়। ছেলেটি যখন 'আলহামদু' খতম করলেন, তখন তাঁর আব্বাজন উস্তাদকে পাঁচ-শত দেরহাম নজর স্বরূপ দান করেন। তারপর ইমাম সাহেব স্বয়ং তাঁর শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। এলম ও ফজলের সঙ্গে সঙ্গে পরহেজগারী ও দেয়ানতদারীতেও তিনি পিতার উপযুক্ত পুত্ররূপে পরিচয় দান করেছিলেন।

ইমাম সাহেব যখন ইন্তেকাল করেন, তখন তাঁর ঘরে লোকের বহু মালমাত্তা আমানত ছিল। তাঁর পুত্র সেই সবকিছু মালমাত্তা শহরের কাজী সাহেবের কাছে জমা রেখে বললেন, যার যার মাল তাকে বিলায়ে দিন। কাজী সাহেব বললেন, এগুলো আপনার কাছেই রেখে দিন। আপনার কাছে এই মালমাত্তা অধিক যত্নে থাকবে। আপনি এদের লিষ্ট রেখে দিন। এর কোন কিছু যেন দাগ না পড়ে। তিনি কাজী সাহেবকে সম্পূর্ণ মাল বুঝায়ে দিয়ে নিজে রেহাই পেলেন।

তিনি কোনদিন চাকুরী করেন নাই। শাহী দরবারের সাথে তিনি কোন সম্বন্ধ রাখতেন না। তিনি হিজরী ১৭৬ সনে ইন্তেকাল করেন। ওমর, ইসমাঈল, আবু হাইয়ান এবং ওসমান নামে চারজন পুত্র তিনি রেখে যান।

ইসমাঈল এলম ও ফজলের দিক দিয়ে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। মামুনুর রশীদের দরবারে তিনি কাজীর পদে বরিত হন। তিনি এমনই ন্যায় পরায়ণতা ও বিশ্বস্ততার সাথে স্বীয় কর্তব্য পালন করেছিলেন যে, তিনি যখন বসরা হতে চলে আসেন, তখন সারা শহরের লোক তাঁর পিছনে ছুটে যান। সকলেই তাঁর জান-মালের জন্য দো'আ করত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ইমাম সাহেবের স্বভাব চরিত্র ও আমল আখলাক

শেখ বু-আলি বলছেন, 'আমি একবার তুরস্কে গিয়েছিলাম। একদিন রাসূলুল্লাহ (সহঃ)-এর আযান দাতা হযরত বিলাল (রহঃ)-এর কবরের পাশে শুয়েছিলাম। স্বপ্নে দেখি, আমি মক্কাশরীফে অবস্থান করছি। হুজুর (সাঃ) শিশুকে কোলে রাখবার ন্যায় এক বৃদ্ধকে কোলে করে বনিশায়রা দরজা দিয়ে বের হয়েছেন। আমি দৌড়ায়ে যেয়ে হুজুরের কদমবুচি করলাম। এই বৃদ্ধলোকটি কে, তাহা আমি আশ্চর্যান্বিত হয়ে ভাবছিলাম। এমন সময় প্রেমের নবী বলে উঠলেন, ইনি মুসলমানদের ইমাম আবু হানীফা।

ইমাম সাহেব সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর অবধি এশার নামাযের ওযু দিয়ে ফজরের নামায আদায় করছিলেন। ত্রিশ বছর পর্যন্ত ক্রমাগতভাবে রোযা রাখতেন। তিনি যেখানে মৃত্যুমুখে পতিত হন, সেখানে সাত হাজার বার কোরআন খতম করা হয়।

তিনি প্রতি রাত্রে তিন শত রাকআত নামায পড়তেন। একদিন তিনি পথ অতিক্রম করার কালে এক স্ত্রীলোককে অপর স্ত্রীলোকের সাথে বলতে শুনলেন, "এই ব্যক্তি প্রতি রাত্রে পাঁচ-শত রাকআত নামায পড়ে থাকেন।" এটা শুনে ইমাম সাহেব নিয়ত করলেন যে, তখন হতে তিনি প্রতি রাত্রে পাঁচশত রাকআত নামায পড়বেন, তা হলে স্ত্রীলোকটি মিথ্যাবাদিনী হবে না।

অপর একদিন তিনি বালকদেরকে পরস্পর বলাবলি করতে শুনলেন, ইনি প্রতি রাত্রে হাজার রাকআত নামায পড়েন। ইমাম সাহেব তখন হতে প্রতি রাত্রে হাজার রাকআত নামায পড়তে আরম্ভ করলেন।

এক ছাত্র বললেন, হুজুর, লোকেরা বলে থাকে যে, আপনি সারা রাত্রি জেগে নামায পড়েন। ইমাম সাহেব তখন হতে রাত্রে আর শুতেন না। আল্লাহ বলছেন, "অনেক লোক আছে যে, তারা যা করে নাই, এর প্রশংসা শুনতে ভালবাসে।" ইমাম সাহেব ভাবলেন যে, তিনি যদি সারা রাত্রি জেগে ইবাদত না করেন, তবে তিনিও হয়ত তাদের অন্তর্গত হতে পারেন।

ইমাম সাহেব একদিন এক ধনী ব্যক্তিকে তার ধনের জন্য যথেষ্ট সম্মান করেছিলেন। অতঃপর মনে মনে দুঃখিত হয়ে এক হাজার বার 'কোরআন' খতম করে তজ্জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

নওফেল বিন হায়ান বলেন, ইমাম আবু হানীফা সাহেবের ইন্তেকালের পর আমি এক রাত্রে স্বপ্নে দেখলাম যে, সকল লোক হাশরের ময়দানে উপস্থিত এবং

হুজুর (সাঃ) হাউজে কাওসারের কাছে দণ্ডায়মান এবং তাঁর ডানে ও বামে বহু বুজর্গলোক দণ্ডায়মান। তন্মধ্যে আমি একজন অত্যন্ত সুন্দর বৃদ্ধ পুরুষকে দেখতে পেলাম; তাঁর মাথা ও মুখ সাদা। তিনি হুজুরের চেহারার দিকে চেয়ে দাঁড়ায়ে রয়েছেন এবং ইমাম সাহেব তাঁর পার্শ্বে। আমি ইমাম সাহেবকে সালাম জানায়ে কিছু পানি চাইলে ইমাম সাহেব বললেন, হুজুর (সাঃ) যতক্ষণ পর্যন্ত আমাকে আদেশ না দিবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমি পানি দিতে পারি না। অতঃপর হুজুর (সাঃ) আমাকে পানি দিতে আদেশ করলেন। ইমাম সাহেব আমাকে পানি দিলে আমিও আমার বন্ধু তা পান করলাম। কিন্তু পেয়ালা পূর্ণই রয়ে গেল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হযরতের দক্ষিণ পাশে এই সুন্দর পুরুষটি কে?

ইমাম সাহেব বললেন, তিনি হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এবং বামে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)। তারপর আমি অন্যান্য বুজর্গদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আর ইমাম সাহেব উত্তর দান করেছিলেন। আমি সতর ব্যক্তির নাম আঙ্গুলে গণনা করলাম। জেগে আমার আঙ্গুল করের সতর দাগে আবদ্ধ পেলাম।

এয়াহয়া রাজী নামক বুজর্গ ব্যক্তি বলেন, আমি হুজুর (সাঃ) কে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, হযরত, আমি আপনাকে কোথায় তালাশ করিব? হযরত বললেন, তুমি আমাকে আবু হানীফার জ্ঞানরাশির মধ্যে পাবে। অর্থাৎ আবু হানীফা পায়রবি করলেই আমার সন্তুষ্টি পাবে।

ইমাম সাহেবের প্রশংসাবাদে আবু ইউসূফ

খলীফা হারুনুর রশীদের কর্ণে ইমাম আজম সাহেবের কত না প্রশংসাগীতি পৌঁছছে! রূপ-কথার ন্যায় প্রতি ঘরে ইমাম সাহেবের কাহিনী বর্নিত হয়েছে। খলীফা সাহেবের স্পৃহা তাতেও থামছে না। তিনি একদিন কাজী আবু ইউসূফকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। কাজী সাহেব বললেন, ইমাম আজম অত্যন্ত পরহেজগার লোক ছিলেন। তিনি সর্বপ্রকার পাপ হতে দূরে থাকতেন, তিনি চিন্তাশীল, প্রায়ই তিনি চুপ থাকতেন। কোন মাসআলা জিজ্ঞাসিত হলে ওয়াকিফহাল থাকলে জবাব দিতেন, অন্যথায় খামোশ থাকতেন। তিনি অত্যন্ত অমায়িক ও দানশীল ছিলেন। কারও কাছে কোন কিছু চাইতেন না। দুনিয়াদারদের সংস্পর্শে যাইতেন না। পার্থিব বাসনা-কামনা সম্মান প্রতিপত্তির প্রতি অনাসক্ত ছিলেন। তিনি একজন জবরদস্ত আলেম ছিলেন। মাল-সম্পত্তি ও এলম তিনি অকাতরে বিলায়ে দিতেন।

হারুণুর রশীদ এসব শুনে বললেন, সালেহীনদের অবস্থা এরূপই হয়ে থাকে।

ইমাম সাহেবের শারীরিক গঠন ও আলাপ-আলোচনা

তাঁর স্বভাব-চরিত্রের ন্যায় শারীরিক সৌন্দর্যেও তিনি ছিলেন অতুলনীয়। আকার আয়তন মানানসই, চেহারা সুশ্রী, মধ্যম রকমের শরীর, মিষ্টভাষী, স্বর উচ্চ, স্পষ্ট। সংকট ও গুরুত্ব পরিপূর্ণ বিষয়ও তিনি অতি অনায়াসে ও স্বচ্ছন্দভাবে প্রকাশ করতে পারতেন।

পোশাক

মেজাজ ছিল গুরুগম্ভীর। তিনি প্রায়ই উত্তম পোশাক পরিধান করতেন। কোন কোন সময় মূল্যবান পোশাকও পরিধান করতেন। তাঁর এক ছাত্র বলেন, আমি একদিন তাঁকে মহা মূল্যবান পোশাক পরিধান করতে দেখলাম। এর মূল্য চার শত দেরহামের কম হবে না।

নসর বিন মোহাম্মদ একদিন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। তখন ইমাম সাহেব কোথায়ও যাচ্ছিলেন। তিনি নসর বিন মোহাম্মদকে বললেন, কিছু সময়ের জন্য আপনার চাদরখানা আমাকে দিন-তো তিনি ফিরে এসে বললেন, আমি আপনার চাদরখানা ব্যবহার করে আরাম পাইনি। আমি একে যত পছন্দসই মনে করেছিলাম তা তদ্রূপ নয়।

নসর বলেন, আমি সেই চাদরখানা পাঁচ দীনার দ্বারা খরিদ করেছিলাম। আমি একে খুব সৌখিন পোশাক মনে করতাম। কাজেই ইমাম সাহেবের ওজর শুনে আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলাম। কিন্তু অন্য এক সময় তাঁর পরিধানে একটি চাদর দেখতে পেলাম। এর মূল্য ত্রিশ দীনারের কম হবে না। তখন আমার পূর্ব আশ্চর্যভাব বিদূরিত হলো।

দরবারী টুপি

খলীফা মনসূর স্বীয় দরবারের জন্য বিশেষ টুপির প্রচলন করেছিলেন। এ টুপিগুলো দামী এবং বিবিধ কারুকাজ করা। আকার আয়তনে উচ্চ ধরনের ছিল। এ সম্বন্ধে এক কবি অতি সুন্দর বলছেন যে, খলীফার সাথে আমাদের যতখানি সম্ভবপর মিলজোল রাখা আবশ্যক। কাজেই ইমাম সাহেব অন্য কোন দিক দিয়ে না হলেও টুপি পরিধানের দিক দিয়ে সেই সামঞ্জস্য রক্ষা করছেন। ইমাম সাহেব যদিও রাজ-দরবারের আংগিনাও মাড়াতেন না, কিন্তু আমীর ওমরা এবং দরবারী লোকেরা যে সকল বিশেষ টুপি ব্যবহার করতেন, তিনি মাঝে মাঝে সেই সকল টুপি ব্যবহার করতেন। ইমাম সাহেবের পরিচ্ছন্ন-গৃহে প্রায়ই সাত আটটি টুপি মজুদ থাকত। ধনী ও দুনিয়াদারদের নিমিত্তে এটা অতি সাধারণ কথা। কিন্তু ইমাম সাহেবের বেলায় এই রূপ ব্যাপার দেখে আলেম-সমাজ পরম আশ্চর্যবোধ করতেন।

বিশ্ববরেণ্য ইমাম সাহেবের মাঝে মাঝে দরবারী টুপি পরিধানে শুধু তাঁর চরিত্র নয়, বরং এই বিশ্ববুকের বহু জ্ঞানী-মানী ও বিপ্লবী বীর-পুরুষদের একটি চারিত্রিক ছবি ফুটে উঠছে। মহৎ লোকেরা অকিঞ্চিৎকর পৃথিবীকে অকিঞ্চিৎকর-রূপেই দেখে থাকেন। এই সংসারের মোহ-মায়া তাঁদেরকে স্পর্শ করতে পারে না। কিন্তু আল্লাহর এই আকাশ-তলে আল্লাহ ব্যতীত জিনরূপী বা মানবরূপী কোন শয়তানের শাসন কায়েম হবে, এটা তাঁরা বরদাস্ত করতে পারেন না। আল্লাহর এই আকাশতলে আল্লাহ ব্যতীত অপর কারও শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়া কিরূপ জঘন্য পাপ তা এই বিশ্বচরাচরে আজ পর্যন্ত তেমনভাবে ভাষা না পাইলেও বহু মহৎ লোকের ন্যায় ইমাম আবু হানীফার প্রাণেও বড় রিনী-ঝিনি করে বেজে উঠছিল। সেই বিদ্রোহী মনের উজ্জ্বল আলোকে তাঁরা মিথ্যা ও অলীক অন্ধকারকে ক্ষণিকের নিমিত্তও সমর্থন করতে পারেন নাই। এজন্যই অসত্য ও অন্ধকার জগতের বিরুদ্ধে তাঁদের আপোসহীন চিরবিদ্রোহ বিঘোষিত রয়েছে। কিন্তু ইমাম সাহেবের দরবারী টুপি ব্যবহারের ন্যায় অন্যান্য কার্যাবলী দ্বারা তাঁরা প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, বিপ্লব তাঁদের বাতিক নয়। নিতান্ত নিরুপায় না হয়ে তাঁরা কোনদিন বিপ্লব বিদ্রোহ ঘোষণা করেন নাই। অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁদের আপোসহীন সংগ্রাম চললেও শুধু সংগ্রামের খাতিরে তাঁরা সংগ্রাম করেন না। কোন ব্যক্তিগত লোকের বিরুদ্ধে তাঁদের সংগ্রাম পরিচালিত হয় না।

সরকারী প্রভাব হতে বিমুক্ত থাকা

শুধু দরবারী টুপি পরিধান নয়, অন্যান্য ব্যাপারেও ইমাম সাহেব সাধারণ আলেম-ওলামা হতে পৃথক ছিলেন। তাঁর সমকক্ষ বহু আলেমই তখন শাহী দরবারে বা আমীর-ওমরাদের বৃত্তি ও জায়গীর ভোগ-দখল করতেন। তাঁরা এসবকে আদৌ দোষের বিষয় মনে করতেন না। বেতন ভোগী জনৈক কাজী সাহেবকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলে, তিনি জবাব স্বরূপ কোন কোন সাহাবা বা বহু তাবে-তাবেয়ীনদের উদাহরণ পেশ করেন যে, তাঁরাও এসব বেতন ও অজিফা ভোগ করতেন।

তখনও কোন প্রকার বেতন বা পারিশ্রমিক গ্রহণ না করে ওলমায়েকেরাম শিক্ষা দান করতেন। আলেমগণ নিজেদের বাড়ী বা মসজিদের লোকদেরকে বিনা বেতনে শিক্ষা দিতেন। আর সেই ধারা এরূপ প্রসারিত ও উপকারী ছিল যে, আজ পর্যন্ত এর চেয়ে উত্তম পন্থা কেউ অবলম্বন করতে সমর্থ হন নাই। রাজ-সরকার বা আমীর ওমরাদের পক্ষ হতে যাকিছু বেতন দান করা হতো বা মাঝে মাঝে পুরস্কার বা উপঢৌকনস্বরূপ যা কিছু মিলতো তাই পরোক্ষভাবে বেতনে পরিণত

হতো। কিন্তু এটা অস্বীকার করা চলে না যে, রাজকীয় চাকুরী বা উপঢৌকন ভোগ করলে পীরজাদাগিরি ও পরমুখাপেক্ষিতা প্রশ্রয় পায়। এ সবের পরিণাম এই যে, এরূপে সমাজের এক বিরাট অঙ্গকে অলস ও অকেজো করে দেয়।

এজন্যই ইমাম আজম সাহেব এসবের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁরা সেই আপোসহীন সংগ্রামের ফল এই দাঁড়ায়েছিল যে, সৎকার্যে আদেশ ও অসংখ্য কার্যে নিষেধে তিনি কোন কিছুতেই পরওয়া করেননি। মানুষ যতই আজাদী স্বভাব বা স্পষ্টবাদী হোক না কেন, কিন্তু উপকার এমনই গুপ্ত যাদু যে এর প্রভাব হতে মুক্ত থাকা যদিও অসম্ভব নয় তথাপি তাহা কস্মিনকালেও বিপদের আশংকা হতে খালি নয়। ইমাম সাহেব আজীবন কারও বিন্দু পরিমাণ সাহায্যও গ্রহণ করেননি। এজন্যই তাঁর আজাদীকে খরিদ করা কারও পক্ষে সম্ভবপর হয়নি।

আজও মুসলিম জাহানে মসজিদ মাদ্রাসা শিক্ষা এবং সরকারী শিক্ষা বিভাগ চলে আসছে। প্রকৃতপক্ষে উভয় শিক্ষাধারার সম্বন্ধেই বহুকিছু বক্তব্য রয়েছে। এদের মধ্যে কোন শিক্ষা ধারাই যে পরিপূর্ণ সন্তুষ্টজনক নয়, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ দেখিনি। আজ মাদ্রাসা-শিক্ষা নামে এই বিশ্ব-বুকে যা কিছু প্রতিষ্ঠান রয়েছে, কোন যাদুবলে যদি এদের সবকিছু বিনষ্ট করে দেয়া যায়, তবে এর মারাত্মক ফল এ দাঁড়াবে যে, তখন এ দুনিয়ার পৃষ্ঠে ইসলাম দূরের কথা, আল্লাহ ও রসূলদের নামগন্ধও থাকবে না। আবার অপরদিক লক্ষ্য করে এটা বলা চলে যে, মসজিদ-মাদ্রাসা ব্যতীত অপর যাকিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে, কোন যাদু-মন্ত্র বলে যদি সেই সমুদয় ও রাতারাতি বিনষ্ট করার উপায় করা যায়, তবে আজকার দুনিয়া অচল হয়ে পড়বে। তখন এই পৃথিবীর চেহরা বিধবা নারীর রূপ ধারণ করবে।

সুতরাং বর্তমানে প্রচলিত মসজিদ-মাদ্রাসার যাঁরা অন্ধভক্ত এবং এই শিক্ষাকেই যাঁরা একমাত্র শিক্ষা মনে করেন, তাঁদের পক্ষেও এই বিষয়ে কিছুটা মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নাই বললে সত্যের অপলাপ করা হবে। তাঁদের পক্ষেও বহুকিছু মাথা ঘামাবার প্রয়োজন রয়েছে। তাঁদের অবগতির নিমিত্ত এটা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, নবী, রসূল ও পীর পয়গম্বরদের ন্যায় তাঁরাও যতদিন পর্যন্ত দুনিয়াদারদের হাত হতে রাজত্বকারীরা আনতে না পারবেন ততদিন পর্যন্ত হুকুমতে এলাহীকে পূর্ণভাবে কায়েম করা দূরের কথা, হুকুমতে এলাহীর ভক্তদের পক্ষে মান-সম্ভ্রম বাঁচায়ে রাখাও সম্ভবপর হবে না। তাঁদের মুখে ইসলামী বহু দামী কথা শুনা গেলেও হযরত ইব্রাহীম, হযরত মুসা এবং হযরত মোহাম্মদ আলাইহিমুচ্ছাল্লামদের ন্যায় তাঁরাও যতদিন পর্যন্ত জেহাদে সক্রিয় অংশগ্রহণ না

করবেন এবং স্বয়ং আল্লাহ্ তায়ালার সাহায্যক্রমে তাঁরাও তখন জয়যুক্ত হবেন, সেই পথ অবলম্বন না করা পর্যন্ত শুধু মসজিদ মাদ্রাসার ওয়াজ নসীহতে জনসাধারণকে মোহিত ও মুগ্ধ করলেই স্বীয় কর্তব্য ফতে' হইবে না। পরিপূর্ণ কর্তব্যপরায়ণতা হতে তাঁরাও বহু-দূরে রয়েছে।

আজাদী এবং অপরের কাছে না-চাওয়া

কূফার বিখ্যাত গবর্ণর ইবনে হাবীরা একদিন বিনীতভাবে ইমাম সাহেবকে বললেন, হযরত, আপনি যদি মাঝে মাঝে এ গরীবালয়ে পদার্পণ করেন, তবে আমি চির কৃতজ্ঞ থাকিব।

ইমাম সাহেব বললেন, আপনার সাক্ষাৎ লাভ আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অর্থহীন। আপনি যদি অনুগ্রহপূর্বক আমার এখানে আসেন, তবে ভয় আছে যে, আমি আপনার ফাঁদে নিপতিত হবে। আর যদি আপনি আমার অপমান করেন, তবে আমার পক্ষে তা সুখের বিষয় হতে পারে না। আপনার কাছে যে মাল-সম্পত্তি রয়েছে, আমি এর আকাঙ্ক্ষী নই। আর আমার কাছে যে সম্পত্তি রয়েছে, তা কেউ ছিনায়ে নিতে পারবে না। ঈসা বিন মুসার সম্বন্ধেও সেই একই ব্যাপার ঘটে।

নিঃস্বার্থ সত্য-প্রচার

একদিন খলীফা মনসূর এবং তাঁর স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য ঘটে। তাঁর বিবির অভিযোগ এ ছিল যে, খলীফা ন্যায়বিচার করেন না। খলীফা একজন বিচারক সাব্যস্ত করতে বললে, বিবি সাহেবা ইমাম সাহেবের নাম পেশ করলেন। অবিলম্বে ইমাম সাহেবকে আনয়ন করা হলো। সবকিছু দেখবার, শুনবার জন্য বিবি সাহেবা পর্দার আড়ালে বসে রইলেন।

মনসূর বললেন, শরীয়তানুযায়ী পুরুষ কয়টি বিবাহ করতে পারে? ইমাম সাহেব বললেন, চার।

মনসূর তাঁর বিবিকে লক্ষ্য করে বললেন। তুমি শুনেছ কি? পর্দার আড়ালে থেকে বিবি সাহেবা তা স্বীকার করলেন। ইমাম সাহেব মনসূরকে লক্ষ্য করে বললেন, কিন্তু আদেশ তার জন্য সীমাবদ্ধ যে প্রত্যেক বিবির সাথে ন্যায়বিচার করার ক্ষমতা রাখে। অন্যথায় একের অধিক বিবাহ করা বাঞ্ছনীয় নয়। খোদা বলেন–আর যদি ভয় কর যে, ন্যায়বিচার করতে পারবে না, তবে এক বিবাহ করবে।

ইমাম সাহেব ঘরে পৌছার পর এক খাদেম পঞ্চাশ হাজার দেরহামের একটি থলে তাঁর খেদমতে পেশ করে জানাল যে, বেগম সাহেবা তা প্রেরণ

করেছেন। তিনি আপনার কাছে সালাম জানায়েছেন। আর আপনার সত্যপ্রিয়তার জন্য শুকরিয়া আদায় করছেন।

ইমাম সাহেব থলে ফেরৎ দিয়ে খাদেমকে বললেন যে, তুমি যেয়ে বেগম সাহেবাকে জানায়ে দাও যে, আমি যা কিছু বলেছি, তা কোন স্বার্থের বশীভূত হয়ে বলি নাই। তা আমার অবশ্য কর্তব্য কর্ম ছিল।

তেজারত ও দিয়ানত

তিনি খুব বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। ব্যবসা উপলক্ষে তাঁকে বহু টাকার আদান প্রদান করতে হতো। প্রায় শহরেই তাঁর কাজকারবার ছিল। বড় বড় ব্যবসায়ীদের সাথে তাঁর যোগাযোগ ছিল। কিন্তু তিনি সর্বদা সতর্ক থাকতেন যে, তাঁর তহবিলে যেন একটি না-জায়েয পয়সাও না ঢুকে এইসব কারণে তাঁকে মাসে মাসে বিরাট ক্ষতির ভাগী হতে হতো। কিন্তু তজ্জন্য তিনি কোন পরওয়া করতেন না।

একদিন তাঁর এক কর্মচারীর কাছে তিনি কাপড়ের কতিপয় থান পাঠায়ে দেন। তিনি তাঁকে এটাও জানায়ে দিয়েছিলেন যে, অমুক থানে দোষ রয়েছে। তা যেন ক্রেতাকে দেখায়ে বিক্রয় করা হয়। কর্মচারী তা ভুলে যান। মাল বিক্রয় করে ফেলা হলো। কিন্তু দোষের কথা গ্রাহককে বলে দেয়া হলো না।

ইমাম সাহেব তা জানতে পেরে বহু আক্ষেপ করলেন। থানগুলো ত্রিশ হাজার দেরহামে বিক্রয় হয়েছিল। ইমাম সাহেব সমুদয় টাকা দান করে ফেললেন।

একদিন এক স্ত্রীলোক এক দামী কাপড়ের থান ইমাম সাহেবের কাছে বিক্রয় করতে গেলে, ইমাম সাহেব এর মূল্য কত জিজ্ঞাসা করলেন। স্ত্রীলোকটি এর দাম একশত টাকা চাইল। ইমাম সাহেব বললেন, এর মূল্য এত কম নয়। স্ত্রীলোকটি তখন এর দাম দুই শত টাকা চাইল। ইমাম সাহেব বললেন, এর মূল্য পাঁচ শত টাকা দুই শত টাকা হতে পারে না। স্ত্রীলোকটি বলল, আপনি বোধ হয় আমার সাথে হাসী-তামাসা করতেছেন। ইমাম সাহেব তখন পাঁচ শত টাকা এনে স্ত্রীলোকটিকে দিয়ে দিলেন। এরূপ সতর্কতা ও বিশ্বস্ততার দরূণ তাঁর ব্যবসা-বাণিজ্যের অধিকতর উন্নতি হয়েছিল।

দানশীলতা

তাঁর ব্যবসায়-বাণিজ্য ও ধন-সম্পত্তি যতই বৃদ্ধি পেতে লাগল, জনসাধারণ ততই অধিক উপকৃত হতে লাগল। তাঁর যত বন্ধুবান্ধব ছিলো এবং যত লোক তাঁর সাথে দেখা সাক্ষাৎ করতে আসত, প্রত্যেকের জন্য তিনি মাথাপিছু নির্দিষ্ট

অংশ নির্ধারিত করে রাখছিলেন। শেখ ও মুহাদ্দেসীনদের জন্য তিনি কারবারের একটি নির্দিষ্ট অংশ দিয়ে দেন। এটা হতে যে আয় হতো, তা প্রতি বছর তাঁদেরকে বিলিয়ে দিতেন।

তাঁর একটি সাধারণ অভ্যাস এই ছিল যে, তিনি তাঁর পরিবারস্থ লোকের জন্য যত পরিমাণ বস্তু খরিদ করতেন, তত পরিমাণ বস্তু তিনি মুহাদ্দেসীন ও আলেমদের জন্য পাঠায়ে দিতেন। কেন লোক তাঁর সাথে দেখা করতে আসলে, তার হাল-অবস্থা জিজ্ঞাসা করতেন। অভাবী হলে, তিনি তাদের অভাব দূর করে দিতেন।

ছাত্রদের প্রতি আচরণ

নিঃস্ব ছাত্রদেরকে তিনি এত পরিমাণ অর্থ দান করতেন যেন স্বচ্ছন্দে তারা লেখাপড়া করতে পারে। এমন সংখ্যক লোকও পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যেত যে, অর্থাভাবে তাঁদের পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যেত। ইমাম সাহেবের সাহায্যক্রমে তাঁরা নামজাদা আলেম হয়ে গিয়েছেন। তন্মধ্যে কাজী ইউসূফ সাহেব অন্যতম। পরে তাঁর সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা হবে।

মহানুভবতা

একদিন কতক লোক তাঁর সাথে দেখা করতে আসে। তাদের মধ্যে একটি লোককে বাহ্যিকভাবে ভীষণ অভাবগ্রস্ত বলে বুঝা গেল। লোকটি বিদায় হয়ে চলে যেতে চাইল ইমাম সাহেব তাকে কাছে ডাকায়ে বললেন, থাম। তারপর তিনি তাকে বিছানা উল্টাতে আদেশ করলেন। লোকটি সেখানে হাজার দেরহাম পরিপূর্ণ থলে দেখতে পেল। ইমাম সাহেব তাকে তা উঠায়ে নিতে অনুরোধ করলে, লোকটি বলল, আমি অভাবগ্রস্ত নই। অপর লোককে তা দিয়ে দেন। তখন ইমাম সাহেব বললেন, তবে তোমার এমনভাবে থাকা উচিৎ, যেন লোকে তোমাকে অভাবগ্রস্ত বলে সন্দেহ না করে।

হৃদয়ের প্রশস্ততা

ইমাম সাহেব একদিন কোন রোগীকে দেখবার জন্য কোথাও যাচ্ছিলেন। পথে এক ব্যক্তির সাথে তাঁর দেখা হলো। তিনি সেই ব্যক্তির কাছে টাকা পাওনা ছিলেন। দূরে থেকে তাঁকে দেখতে পেয়ে সেই ব্যক্তি পাশ কেটে চলে যাচ্ছিল। তিনি তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় যাচ্ছ? লোকটি তখন দাঁড়াল। তিনি বললেন, আমাকে দেখে তুমি পাশ কেটে যাচ্ছিলে কেন? লোকটি বলল, আমি আপনার কাছ হতে দশ হাজার দেরহাম এনেছিলাম। আমি আজ পর্যন্তও

তা শোধ করতে পারিনি। সেই লজ্জায় আপনার দিকে চোখ তুলে চাইতে পারছিলাম না। ইমাম সাহেব তার আত্মসম্মান বোধ দেখে আশ্চর্যান্বিত হলেন। তারপর তিনি বললেন, আচ্ছা যাও, আমি তোমাকে সমুদয় টাকা ক্ষমা করে দিলাম।

পর দুঃখ-কাতরতা

একদিন আবদুল্লাহ্ সাহমীর সঙ্গে তিনি হজ্জের সফরে ছিলেন। এক মঞ্জিলে এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ্কে ধরে ইমাম সাহেবের সম্মুখে নিয়ে আসল। লোকটি বলল, আমি তার কাছে টাকা-পয়সা পাওনা রয়েছি। কিন্তু সে তা আদায় করে দিচ্ছে না।

ইমাম সাহেব তাকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে, সোজাসুজি অস্বীকার করল। তিনি পাওনাদারকে জিজ্ঞাসা করলেন, সে কত টাকা পাওনা ছিল। সে চল্লিশ টাকার উল্লেখ করলে, ইমাম সাহেব বললেন, আজকাল লজ্জা-শরম উঠে গিয়েছে। এত সামান্যের জন্য কি ঝগড়া করতে হয়? অতঃপর সব টাকা তিনি দিয়ে দিলেন।

ইব্রাহীম বিন আতীয়ার চার হাজার দেরহাম ঋণ ছিল। তিনি তা কিছুতেই পরিশোধ করতে না পেরে লজ্জায় ম্রিয়মান হয়ে কালযাপন করতে লাগলেন। এমনকি লোকের সাথে মিলেমিশে করেও তিনি পরিত্যাগ করলেন। তাঁর এক বন্ধু তা আদায় করতে দেবার মানসে চাঁদা আদায়ে নেমে গেলেন। লোকেরাও আপ্রাণ সাহায্য করতে লাগল। ইমাম সাহেবের কাছেও চাঁদা চাইলেন তিনি মোট ঋণ কত জিজ্ঞাসা করলেন। বন্ধুটির মুখে চার হাজার দেরহাম ঋণের কথা শুনে তিনি বললেন,এত সামান্য টাকার জন্য লোকদের বিরক্ত করে লাভ নেই। অতঃপর তিনি নিজ পকেট হতে চার হাজার দেরহাম দিয়ে দিলেন। ইমাম সাহেবের জীবনে এরূপ বহু ঘটনা ঘটেছে।

ধৈর্য্য ও ক্ষমাশীলতা

তিনি যেমন ছিলেন মহাসম্মানী ও সম্পদশালী, তেমনই ছিলেন বিনীত, ভদ্র ও ধৈর্য্যশীল। একদিন তিনি এক মসজিদে অবস্থান করছিলেন। সেখানে বহু শাগরেদ ও ভক্তবৃন্দ ছিলেন। এক অপরিচিত ব্যক্তি তাঁর কাছে একটি মাসআলা জিজ্ঞাসা করলেন। ইমাম সাহেব যথাযথ উত্তর দিলেন। কিন্তু সেই লোকটি বলল, হযরত হাসান বসরী এর অন্যরূপ জবাব দিয়েছেন। তিনি বললেন, হযরত হাসান বসরীর জবাব ভুল হয়েছে।

সেই মজলিসে হযরত হাসান বসরীর এক অন্ধ ভক্ত ছিল। সে ক্রোধান্ধ হয়ে

ইমাম সাহেবকে যা ইচ্ছে তা বলতে লাগল। তখন সভাস্থ সকল মহা গরম হয়ে উঠল। তারা প্রতিবাদকারীকে যথোপযুক্ত শিক্ষা দিতে চাইল। ইমাম সাহেব সকলকে শান্ত করলেন। অতঃপর প্রতিবাদকারীকে বললেন, হ্যাঁ হযরত হাসান ভুল করেছেন। এ সম্বন্ধে হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ যা বর্ণনা করেছেন, তা সহী।

সূফীয়ান সওরী ও ইমাম সাহেবের মধ্যে কিছু মতবিরোধ ছিল। এক ব্যক্তি ইমাম সাহেবের কাছে এসে বলল যে, সূফীয়ান সওরী আপনার কুৎসা রটনা করছেন। ইমাম সাহেব বললেন, খোদা আমাকে ও হযরত সূফীয়ান সওরীকে ক্ষমা করুন।

অপ্রিয় ব্যবহারের জবাব

তিনি মসজিদে একদিন শিক্ষাদান করছিলেন। তাঁর সাথে এক ব্যক্তির শত্রুতা ছিল। সে তখন ইমাম সাহেবের প্রতি ভীষণ অপ্রিয় ব্যবহার আরম্ভ করে দিল। ইমাম সাহেব তার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করলেন না। তিনি দৃষ্টিপাত করতে নিষেধ করলেন। তিনি শিক্ষাদান শেষ করে বাড়ী রওয়ানা হলেন। সেই ব্যক্তিও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলল। আর মুখ দিয়ে যা আসে তাই বলে যেতে লাগল। ইমাম সাহেব বাড়ীর কাছে পৌছায়ে দাঁড়ায়ে বললেন, ভাই, এই-তো আমার বাড়ী। তোমার যদি আরও কিছু বলবার সখ থেকে থাকে, তবে তা বলে শেষ করে নিও। আমি বাড়ীর ভিতর চলে গেলে তোমার সেই সুযোগ মিলবে না।

একদিন তিনি ছাত্রদেরকে পড়াচ্ছিলেন। এক নব্য যুবক একটি মাসআলা জিজ্ঞাসা করল। ইমাম সাহেব এর উত্তর দিলেন। যুবক বলল, আবু হানীফা, তোমার জবাব ভুল হয়েছে। আবুল খত্তাব জরজানীও সেখানে ছিলেন। তিনি মহা রাগান্বিত হয়ে সমবেত লোকদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, আপনাদের কোন মান সম্ভ্রম নাই। ইমাম সাহেবকে একজন নরপশু যা ইচ্ছে তা বলতেছে, আর আপনারা তা নীরবে সহ্য করছেন।

ইমাম সাহেব বললেন, আপনি তাদের উপর দোষারোপ করবেন না। আমি এইসব জায়গায় এই জন্য বসে থাকি যে, লোকেরা যেন স্বাধীনভাবে আমার দোষ-ত্রুটি বের করতে পারে এবং আমি তা নীরবে সহ্য করব।

প্রতিবেশীর প্রতি সহৃদয়তা

ইমাম সাহেবের মহল্লায় এক মুচি বাস করতে। সে খুব খোশ-মেজাজী ও রসিক ছিল। সে সারাদিন পরিশ্রম করত। সন্ধ্যায় বাজারে যেয়ে গোস্ত ও শরাব ক্রয় করত। রাত্রিকালে তার বন্ধু-বান্ধব সমবেত হতো। সে নিজেই কবাব তৈরী

করে বন্ধুবান্ধবদেরকে নিয়ে আহারে বসে যেত। আহারান্তে শরাব-পান ও গান-বাজনা চলত।

ইমাম সাহেব জেকের-আজকারে রাত্রি কাটায়ে দিতেন। মুচির সেই সব আমোদ-আহ্লাদ ও গান-বাজনা তাঁর কর্ণ কুহরে প্রবেশ করত। আর তাঁর স্বভাব এরূপ কোমল ছিল যে, তিনি মুচির কার্যকলাপের কোন প্রতিবাদ করতেন না।

একদিন রাত্রে শহরের পাহারাদার সেদিকে আসলে মুচির এই অবস্থা দেখে তাকে গ্রেপ্তার করে।

প্রভাতে ইমাম সাহেব তাঁর বন্ধু-বান্ধবদেরকে বললেন, আজ রাত্রে আমার প্রতিবেশীর কোন আওয়াজ পাইনি কেন?

তখন লোকেরা রাত্রের ঘটনা বর্ণনা করল। তিনি তা শোনামাত্র গাড়ী আনাইলেন। দরবারের পোশাক পরিধান করে রাজধানী অভিমুখে রওয়ানা হলেন।

তখন আব্বাসীয়দের রাজত্ব। খলীফা মনসূর ইসা বিন মূসাকে কূফার গভর্ণররূপে নিযুক্ত করেন। তিনি খুব সাহসী ও বীর যোদ্ধা ছিলেন। লোকেরা গভর্ণর বাহাদুরকে সংবাদ ছিল যে, ইমাম সাহেব তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসতেছেন। ইমাম সাহেবকে স্বাগত জানানোর জন্য গভর্ণর সাহেব তাঁর অমাত্যবর্গকে পাঠিয়ে দিলেন। আর ইমাম সাহেবের গাড়ী রাজপ্রাসাদে নিয়ে আসবার জন্য তিনি আদেশ করলেন। গাড়ী যথাস্থানে পৌছলে গভর্ণর তাঁর সম্মানার্থে উঠে দাঁড়ালেন এবং তাঁর পাশাপাশি আসনে বসালেন। তারপর বললেন, আপনি এত কষ্ট স্বীকার করছেন কেন? আমাকে খবর দিলেই আমি আপনার খেদমতে উপস্থিত হতাম।

ইমাম সাহেব বললেন, আমার মহল্লায় এক মুচি থাকে। কোতোওয়াল তাকে গত রাত্রে গ্রেফতার করে এনেছেন। তাকে কারামুক্ত করে দিলে আমি খুশী হব।

গভর্ণরের আদেশক্রমে মুচিকে মুক্ত করে দেয়া হলো। ইমাম সাহেবের ব্যবহারে মুচি মোহিত ও মুগ্ধ হয়ে গেল। ইমাম সাহেবের কাছ হতে সে কোন দিন এরূপ ব্যবহার আশা করে নাই। তখন সে সবকিছু অপকর্ম পরিত্যাগ করল। তখন হতে সে ইমাম সাহেবের কাছে পড়াশুনা করতে লাগল। ধীরে-ধীরে সে ফিকাহ-শাস্ত্রে মহা পাণ্ডিত্য অর্জন করে। পরবর্তীকালে মুচি একজন নামকরা ফকীহরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

মাতৃ-সেবা

ইমাম সাহেব যৌবনে পদার্পন করার পূর্বে তাঁর পিতা মৃত্যুমুখে পতিত হন। কিন্তু তাঁর মাতা দীর্ঘকাল অবধি জীবিত থাকেন। সুতরাং তাঁর জীবনে মাতৃ-খেদমত করার যথেষ্ট সুযোগ ঘটে। অপরাপর স্ত্রীলোকের ন্যায় ইমাম জননীর মেজাজও কড়া ছিল। বক্তা ও গল্প-কাহিনী বিবৃতিকারীদের প্রতি তাঁর গভীর ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিল।

কূফায় ওমর বিন জরকা নামক একজন বিখ্যাত ওয়াজী লোক ছিলেন। ইমাম সাহেবের মাতা তাঁর পরম ভক্ত ছিলেন। কোন মাসআলা জানবার প্রয়োজন হলে তা জানার জন্য ইমাম-মাতা তাঁকে সেই বক্তার কাছে প্রেরণ করতেন। ইমাম সাহেব মাতৃ-আদেশানুযায়ী তাঁর কাছে যেয়ে সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে আসতেন। জরকা বলতেন, আপনার সম্মুখে আমি কিরূপে মুখ খুলতে পারি? ইমাম সাহেব বলতেন, এটাই আমার আম্মাজানের নির্দেশ। প্রায়ই এমনও ঘটিত যে, বক্তা সাহেব যখন সেই মাসআলার মীমাংসা করতে অপারগ হতেন, তখন ইমাম সাহেবকে এর ফায়সলা করে দেবার নিমিত্ত তিনি অনুরোধ করতেন।

ইমাম জননী কখন নিজে যেয়ে সেই মাসআলার জবাব শুনে আসার আব্দার করতেন। তিনি খচ্চরের উপর আরোহণ করে পথ চলতেন। আর ইমাম সাহেব পায়ে হেঁটে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে যেতেন। ইমাম জননী নিজেই মাসআলার বিবরণ পেশ করতেন। আর নিজ কানেই এর জবাব শুনতেন। অন্যথায় তাঁর মন শান্ত হতো না।

ইমাম জননী একদিন বললেন, অমুক মাসআলা সম্বন্ধে আমার জানবার বিশেষ প্রয়োজন হয়েছে। এমতাবস্থায় আমি কি করব? ইমাম সাহেব এর জবাব দিলেন। ইমাম জননী বললেন, তোমার সনদ নাই। বক্তা জরকা এর সমর্থন না করলে আমার মন শান্ত হবে না।

ইমাম সাহেব তখন জননীসহ বক্তা সাহেবের খেদমতে যেয়ে সেই মাসআলার বিবরণ পেশ করলেন।

জরকা বললেন, আপনি এ বিষয়ে আমার চেয়ে অধিক ওয়াকেফহাল। আপনি এর মীমাংসা করে দেন নি কেন?

ইমাম সাহেব বললেন, আমি এ ফতোয়া দিয়েছিলাম। জরকা বললেন, এটা সম্পূর্ণ সহী হয়েছে। ইমাম জননী এটা শুনে শান্ত হলেন। তারপর উভয়ে বাড়ী ফিরলেন।

ইবনে হাবীরা যখন ইমাম সাহেবকে আহ্বান করে তাঁকে মীর মুন্সী পদে বহাল করতে চাইলেন এবং ইমাম সাহেব তা অস্বীকার করায় তাঁকে নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছিল, তখনও ইমাম জননী জীবিত ছিলেন। ইমাম-জননী এতে সাতিশয় মর্মাহত হলেন।

ইমাম সাহেব বলতেন, জেল-জরিমানা ও নির্যাতন ভোগে আমার মনের শান্তি বিনষ্ট করতে পারেনি। কিন্তু আমার প্রতি এরূপ নৃশংস ব্যবহারে আমার আম্মাজানের বৃদ্ধকালে যে আঘাত পেলেন তা তিনি সামলায়ে উঠতে পারবেন কিনা, এটা চিন্তা করে আমি বিচলিত হয়ে উঠতাম।

কুসুমের মত মৃদু, পর্বতের ন্যায় অটল

তাঁর হৃদয়টি ছিল অত্যন্ত কোমল। কারও দুঃখ-কষ্ট তিনি সহ্য করতে পারতেন না।

একদিন তিনি মসজিদে উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বলল, অমুক ব্যক্তি দালানের উপর হতে পড়ে গিয়েছে। এটা শুনে ইমাম সাহেব এমনভাবে আর্তনাদ করে উঠলেন যে, সারা মসজিদ থর থর করে কাঁপতে লাগল। তখন তিনি খালি পায়ে দিকে দৌড়ায়ে গেলেন। সেই বাড়ীতে যেয়ে তিনি বহু শোক-আফসোস করলেন। তিনি তাদের প্রতি এমনই সহানুভূতিপূর্ণ ছিলেন যে, সেই ব্যক্তি সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ না করা পর্যন্ত তিনি প্রত্যহ প্রভাতে যেয়ে তার হাল-অবস্থা জেনে আসতেন।

অথচ নিজের উপর যখন কোন বিপদ আসত তখন তিনি ঝড়-ঝঞ্জার সাথে মুকাবেলা করার জন্যই যেন তাঁর জন্ম হয়েছে, সেই মনোভাব দেখাতেন। মৃত্যুর গর্জনকে তিনি অমৃতের মত শুনিতেন। উচ্চ রাজ-কর্মচারী ও শাসনকর্তাদের সাথে তাঁর মনোমালিন্য, মন কষাকষি এবং বিরোধিতা লেগেই থাকত। ফলে তাঁকে আজীবন বহু দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল। তারা জীবনও তাঁর মনোবৃত্তির কিছুই পরিবর্তন সাধন করতে পারেনি। শাসনদণ্ড খলীফা মনসূরের হাতে থাকলেও শাসনকার্য চলতে লাগল কারারুদ্ধ হযরত ইমাম আবু হানীফার ইচ্ছে ও মর্জি মোতাবেক। খলীফা এটা সহ্য করতে না পেরে ইমাম সাহেবকে খাদ্যের সাথে বিষ মিশ্রিত করে তাঁর প্রাণ-হানি করলেন।

একদিন তিনি মসজিদে শিক্ষাদান করেছিলেন। ছাত্র ও ভক্তের দল বিশেষ মনোযোগের সাথে তাঁর উপদেশামৃত পান করছিল। এমন সময় উপর হতে একটি সর্প ইমাম সাহেবের কোলের উপর পতিত হলো। সকলে তখন ভীত-শঙ্কিত হয়ে এদিক সেদিক ছুটাছুটি করে বের হয়ে গেল। কিন্তু ইমাম সাহেব

একটু নড়চড়াও করলেন না। ইমাম মালেকের জীবনেও এমন একটি ঘটনা ঘটেছিল। পার্থিব কোন কিছুতে ভীত-শঙ্কিত হওয়া তাঁদের স্বভাব ছিল না।

ইমাম সাহেব বড় স্বল্পভাষী ছিলেন। বিনা প্রয়োজনে তিনি কোনদিন মুখ খুলতেন না। তাঁর শিক্ষা-মজলিসে ছাত্রবৃন্দ পূর্ণ স্বাধীনতার সাথে তর্ক-বিতর্ক করতেন। আর গভীর মনোযোগের সাথে তিনি তা শুনে যেতেন। এরূপ বিতর্ক-সভা যখন গরম হয়ে উঠত এবং ছাত্রদের দ্বারা এর সমাধান অসম্ভব হয়ে পড়ত, তখন তিনি অতি সহজে সমস্যাসমূহের সমাধান করে দিতেন।

জিহ্বার সতর্কতা

গীবত বাক্য কোনদিন তাঁর মুখে উচ্চারিত হয়নি। খোদা তাঁকে অপবিত্রতা হতে বিমুখ রেখেছেন; এজন্য তিনি অহোরাত্র শোকরিয়া আদায় করতেন।

একদিন এক ব্যক্তি বললেন, হযরত লোকেরা আপনার সম্বন্ধে বহু কিছু বলা-বলি করে থাকে। কিন্তু আপনার মুখে-তো এ সম্বন্ধে একটি কথাও উচ্চারিত হতে শুনেনি? তিনি তখন পাক কালামের আয়াত "আল্লাহর এই নিয়ামত তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে দান করে থাকেন" পাঠ করলেন।

ইমাম সূফীয়ান সওরীকে কোন এক ব্যক্তি বললেন, আমরা কোনদিন ইমাম আবু হানীফাকে কারও গীবত করতে শুনি নাই। জবাবে তিনি বললেন, ইমাম আজম বোকা লোক নন যে, গীবত গেয়ে তিনি নিজেই নিজের নেক আমলকে বিনষ্ট করে দিবেন।

অনেকে কথায় কথায় কসম খেয়ে থাকে। তিনি একে অত্যন্ত খারাপ জানতেন। এ সম্বন্ধে তিনি আপ্রাণ সতর্ক থাকতেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, ঘটনাক্রমে যদি তাঁর দ্বারা এরূপ কোন ত্রুটি ঘটে যায়, তবে তিনি এর কাফ্ফারা স্বরূপ এক দেরহাম দিবেন। ভুলে একদিন তিনি কসম খেয়ে ফেলেছিলেন। তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন যে, আবার যদি আমার দ্বারা এরূপ পাপ সংঘটিত হয়, তবে এর কফ্ফারা স্বরূপ এক দেরহাম না দিয়ে এক দীনার দিবেন।

জেকের ও এবাদত

তিনি পরম সংসার বিরাগী ছিলেন। জেকের ও ইবাদতে তিনি মজে থাকতেন। আহ্লাদভরে তিনি এসব কর্তব্য পালন করতেন। এজন্য তিনি বিশ্বচরাচরে চির আদর্শরূপে বিরাজ করছেন।

আল্লামা জাহবী লিখেছেন, পরহেজগারী ও ইবাদতে তিনি অতুলনীয় ছিলেন। নামাযে ও কোরআন পাঠকালে প্রায়ই তিনি অধীরভাবে রোদন করতেন।

এরূপে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁর রোদন অবস্থায় কেটে যেত। ইব্রাহীম বছরী বলেন– একদিন ফজরের নামাযে আমি ইমাম সাহেবের সাথে শরীক হয়েছিলাম। ইমাম সাহেব নামায পড়লেন "আর আল্লাহকে জালেমদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে গাফেল জানবে না।" তখন ইমাম সাহেবের এমন এক অবস্থা হলো যে, তাঁর সর্বশরীর থর থর করে কাঁপতে লাগল।

এক বুজর্গ ব্যক্তি বলেন, একটি জরুরী মাসআলার মীমাংসার জন্য আমি ইমাম সাহেবের খেদমতে গেলাম। আমি ইমাম সাহেবের সাথে এশার নামাযে শামিল হলাম। তিনি নফল নামায হতে ফারেগ হলে, আমি সেই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করতে অপেক্ষা করতে লাগলাম। তিনি কোরআন পাঠ করতে করতে এ পর্যন্ত পৌঁছে তা বারংবার পাঠ করতে লাগলেন। এরূপে ফজর হয়ে গেল। তথাপি তিনি সেই আয়তই পাঠ করতে লাগলেন।

একবার ইমাম সাহেব এই আয়াত পাঠ করলেন– "কেয়ামতে পাপীরা স্বীয় কার্যের ফল পাবে। কেয়ামত ভয়ঙ্কর মসিবতের স্থান এবং এটা অসহ্যকর ব্যাপার।" এই আয়াত পাঠ করতে করতে তিনি সারা রাত্রি খতম করে দিলেন। তিনি উক্ত আয়াত বারংবার পাঠ করছিলেন, আর রোদন করছিলেন।

ইয়াজীদ বিন কামীয়ত একজন মশহুর আবেদ ছিলেন। তিনি ইমাম সাহেবের সমসাময়িক লোক ছিলেন। তিনি বলেন, আমি একদিন এশার নামাযে ইমাম সাহেবের সাথে শরীক হই। তিনি নামাযে পড়লেন। লোকেরা নামায পড়ে চলে গেল। আমি সেখানে রয়ে গেলাম। ইমাম সাহেব তখনও দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলছিলেন। তখন তাঁর সম্মুখে থাকা বাঞ্ছনীয় নয় মনে করে আমি সেখান থেকে চলে আসলাম। শেষ রাত্রে মসজিদে যেয়ে দেখি, তিনি তখনও মসজিদে চিন্তিত অবস্থায় বসে রয়েছেন।

একদিন তিনি বাজারের মধ্য দিয়ে পথ চলছিলেন। একটি বালকের গায়ে হঠাৎ তাঁর পা লেগে গেল। বালকটি চেঁচিয়ে বলে উঠল, তুমি তো খোদাকে ভয় কর না।

তা শুনে ইমাম সাহেব বেহুশ হয়ে পড়লেন। তাঁর সঙ্গে এক বুজর্গ লোক ছিলেন। তিনি তাঁকে তাড়াতাড়ি ধরে ফেললেন। তিনি হুশ ফিরে পেতে আরম্ভ করলে, সেই বুজর্গ ব্যক্তি বললেন, হযরত এ কেমন ব্যাপার যে, আপনি একটি বালকের কথায় এমনভাবে বেহুশ হয়ে পড়লেন।

তিনি বললেন, এতে আশ্চর্যের কিছুই নাই যে, তা গায়েবী হেদায়তও হতে পারে।

রোদন প্রবণতা

ইমাম সাহেব তাঁর অভ্যাস মত একদিন দোকানে গেলেন। কর্মচারী দোকান খুলে বসেছিল। ইমাম সাহেবকে দেখতে পেয়ে কর্মচারী বলল, খোদা আমাদেরকে বেহেস্ত দান করুক!

এটা শুনে ইমাম সাহেবের এরূপ অবস্থা হইল যে, কাঁদতে কাঁদতে তাঁর শ্বাসরুদ্ধ হবার উপক্রম হলো। তিনি কর্মচারীকে দোকান বন্ধ করতে বলে চেহারার উপর রুমাল ঢেলে বাজারের বাইরে চলে গেলেন।

দ্বিতীয় দিবস দোকানে যেয়ে কর্মচারীকে বললেন, ভাই, আমি বেহেশ্‌ত পেতে কামনা করব, এমন উপযুক্ততা আমার আছে কি? আল্লাহর আজাবে যদি নিপতিত না হই তবে তাই যথেষ্ট।

হযরত ওমর ফারুকও প্রায়ই বলতেন, কেয়ামতের দিবস যদি আমার প্রতি কোন ধরপাকড় না হয় এবং আমি কোন পুরস্কারও না পাই, তাতেও যে আমি রাজী থাকব।

গায়েবী সতর্কতা

একদিন ইমাম সাহেব জনৈক ব্যক্তিকে মাসআলা বলে দিচ্ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি বলল, ইমাম সাহেব, ফতোয়া দিবার কালে খোদাকে যথেষ্ট ভয় করবেন।

এই শব্দ কয়টি ইমাম সাহেবের উপর এরূপ প্রভাব বিস্তার করল যে, তাঁর চেহারার রং সম্পূর্ণ বদলায়ে গেল। অতঃপর তিনি সেই ব্যক্তিকে বললেন, ভাই, খোদা আপনাকে পুরস্কৃত করুক! আমার যদি এই আশঙ্কা না থাকত যে, খোদা আমাকে এই বলে ধরপাকড় করবেন যে, তুমি এলম জেনেও কেন তা গোপন করে রেখেছ, তবে আমি কস্মিনকালেও ফতোয়া দিতাম না।

এমন কোন জটিল মাসআলা যদি এসে পড়ত যে, এর জবাব তাঁর জানা থাকত না, তবে তিনি শঙ্কিত হয়ে উঠতেন যে, তিনি নিশ্চয়ই কোন পাপে লিপ্ত হয়ে থাকবেন। বোধহয় এর ফলেই তিনি এর জবাব অবগত নন। এরূপ আশঙ্কা তাঁর মনে জাগত। তখন তিনি নূতন করে অযু করে নামায ও এসতেগফার পড়তেন।

হযরত ফুজাইল বিন আইয়াজ (রাঃ) একজন বিখ্যাত সূফী ছিলেন। লোকমুখে তিনি এই কাহিনী শুনতে পেয়ে বহু রোদন করলেন। রোদন শেষে বললেন, হযরত আবু হানীফার পাপ অতি কম ছিল। এই জন্যই তাঁর এরূপ ধারণা জন্মিয়েছে। যারা পাপে ডুবে থাকে, তাদের উপর শত সহস্র বিপদ আসে। কিন্তু তারা ভ্রমেও বুঝতে পারে না যে, এটা গায়েবী সতর্কতা।

প্রাত্যহিক সাধারণ কর্তব্য

তিনি ফজরের নামাযের পরই মসজিদে ছাত্রদেরকে পড়াতে আরম্ভ করতেন। তাঁর কাছে বহু দূর-দরাজ হতে লোকেরা জটিল মাসআলার সমাধান ও ফতোয়ার জন্য আসত। তিনি মৌখিক বা লিখিতভাবে সকলের জবাব দিতেন। এরপর ফিকাহর মজলিস বসে যেত। নামজাদা শাগরিদবৃন্দ সমুপস্থিত থাকতেন। সর্বসম্মতিক্রমে যে মাসআলার মীমাংসা হয়ে যেত, তা লিপিবদ্ধ হয়ে যেত। জুহরের নামায পড়ে তিনি ঘরে ফিরতেন।

গ্রীষ্মকালে তিনি সর্বদাই জুহরের নামাযের পর শুইতেন আসরের নামাযের কিছুক্ষণ পর পর্যন্ত শিক্ষাদান কার্য চলতে থাকত। অবশিষ্ট সময়ে তিনি বন্ধুবান্ধবের সাথে মিলেমিশে, রোগীদের দেখাশুনা এবং গরীবদের সেবায় কাটাতেন। মাগরিবের পর আবার শিক্ষাদান আরম্ভ হয়ে যেত। এশার নামায পর্যন্ত তা চলতে থাকত।

এশার নামাযের পর তিনি ইবাদত-বন্দেগীতে নিমগ্ন হতেন। আর প্রায় রাত্রেই তিনি শয়ন করতেন না। শীতকালে মাগরিবের পরই মসজিদে শুয়ে পড়তেন। আর দশটার কাছাকাছি সময় তিনি এশার নামায পড়তেন। আর তাহাজ্জুদ, দরূদ ও অজিফা পাঠে তিনি সারারাত্র কাটায়ে দিতেন। আর কোন সময় দোকানেও বসতেন।

ঈমানদারী

একদিন তিনি ঘরে বসেছিলেন। তাঁর মেয়ে মাসআলা জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি আজ রোযাদার। আমার দাঁত হতে রক্ত বের হয়ে থুথুর সাথে গলার ভিতরে ঢুকে গিয়েছে। এতে আমার রোযা বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে কিনা?"

ইমাম সাহেব বললেন, "হে প্রিয় বৎস, তুমি তোমার ভ্রাতা হাম্মাদের কাছে জিজ্ঞাসা কর। আমাকে-তো ফতোয়া দিতে নিষেধ করে দেয়া হয়েছে।"

ঐতিহাসিক ইবনে খলকান এই বিষয় প্রসঙ্গে লিখছেন যে, আনুগত্য ও আমানতদারীর এর চেয়ে অধিক জ্বলন্ত আদর্শ আর কি হতে পারে?

এর অল্প কয়েক দিন পরে গভর্ণর বাহাদুর ঘটনাক্রমে ফিকাহ-সংক্রান্ত এক জটিল মাসআলার সম্মুখীন হলেন। তখন ইমাম সাহেবের শরণাপন্ন হওয়া ব্যতীত অন্য কোন উপায় রইল না। সুতরাং ইমাম সাহেব ফতোয়া দিবার জন্য আবার সাধারণ হুকুম পেলেন।

ফতোয়া-সংকট

একদিন সৌভাগ্যক্রমে ইমাম সূফীয়ান সওরী, কাজী ইবনে আবি লাইলী ও ইমাম আবু হানীফা সাহেব সমবেত হলেন। জ্ঞান পিপাসুদের নিমিত্ত এর চেয়ে অধিক সুবর্ণ সুযোগ আর কি হতে পারে?

একব্যক্তি এসে মাসআলা জিজ্ঞাসা করল যে, কতক লোক একত্র সমবেত ছিল। হঠাৎ একটি সর্প বের হয়ে এক ব্যক্তির শরীরের উপর উঠতে লাগল। সেই ব্যক্তি ঘাবড়ায়ে এটা দূরে নিক্ষেপ করল। সর্প দ্বিতীয় ব্যক্তির শরীরে যেয়ে পড়ল। সেই ব্যক্তিও সন্ত্রস্ত হয়ে সর্পটি দূরে নিক্ষেপ করল। এরূপে সর্বশেষ লোকটিকে সর্প দংশন করল। লোকটি মরে গেল। এমতাবস্থায় দীয়ত (রক্ত-মূল্য) কাকে দিতে হবে? এর মীমাংসা বড় কঠিন ছিল। এ সম্বন্ধে সকলেই মাথা ঘামাতে আরম্ভ করলেন। কেউ কেউ বললেন যে, সকলকেই দীয়ত দিতে হবে। কেউ কেউ বললেন, শুধু প্রথম ব্যক্তি জিম্মাদার হবে।

কিন্তু একজনের সাথে অপর জন একমত হতে পারছিলেন না। বহু তর্ক-বিতর্কের পরও কেউই কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন নি।

ইমাম আবু হানীফা সাহেব কিন্তু আগাগোড়া মৌন রইলেন। পরিশেষে সকলেই তাঁর শরণাপন্ন হলেন। ইমাম সাহেব বললেন, যখন প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তির উপর সর্পটি নিক্ষেপ করল এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি অক্ষতদেহ রইল, তখন প্রথম ব্যক্তি জিম্মাদারী হতে বেঁচে গেল।

সর্বশেষ ব্যক্তি সম্বন্ধে ব্যাপার এই যে, তার সম্মুখে দুইটি অবস্থা ছিল। তার প্রতি সর্প-নিক্ষেপকারী এর জন্য দায়ী। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে যদি তাকে সর্প দংশন করে থাকে তবে সর্প-নিক্ষেপকারীও জিম্মাদারী হতে বেঁচে গেল।

এমতাবস্থায় যদি সর্প সর্বশেষ ব্যক্তিকে দংশন করে থাকে তবে এটা তার অলসতা যে, সে কেন স্বীয় সংরক্ষণে ক্ষিপ্রতার সাথে তৎপর হলো না।

এই সিদ্ধান্তের উপর সকলেই একমত হলেন। তখন প্রত্যেককেই পঞ্চমুখে ইমাম সাহেবের প্রশংসাগীতি গাইতে লাগলেন।

দীন ও দুনিয়া

দীন ও দুনিয়া আদৌ পরস্পর বিরোধী নয়। বরং এরা একই বৃন্তে দুইটি ফুল সদৃশ। দুনিয়াকে সুপরিচালিত করার মানসে দীনের আবশ্যক। এই বিশ্বচরাচরের অধিপতি একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। তাঁর আইনের নাম ইসলাম। ইমাম সাহেব এ সম্বন্ধে চির-জাগ্রত ছিলেন। তিনি তাঁর ছাত্র ও ভক্তদেরকে এই মহান ইসলামী শিক্ষা প্রদান করেছিলেন।

কোরআনে পাকে বলা হয়েছে– "আমাদেরকে ইহ-পরকালে মঙ্গল দান কর।"

ইমাম আজম সাহেবের জীবিতাবস্থায় যদিও আবু ইউসূফের সাথে রাজ সরকারের কোন সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নাই, তথাপি তাঁর ব্যক্তিগত উপযুক্ততা এবং ইমাম সাহেবের শিক্ষা উভয়ের সমন্বয়ে তাঁর মধ্যে যে উপযুক্ততা দেখা গিয়েছিল, এই উদ্দেশ্যে ইমাম তাঁকে যাকিছু লিপিবদ্ধ করে দেন, তা রাজ্য-পরিচালনে যথেষ্ট। অপরিসর স্থানের দিক দিয়ে লক্ষ্য করিয়া এর পূর্ণ বিবরণ প্রদান সম্ভবপর নয়। তা সত্ত্বেও পরিস্থিতি ও প্রয়োজনের তাগিদে নিম্নে এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো।

কাজী আবু ইউসূফের প্রতি হেদায়তনামা

তখনকার শাসন-কর্তৃপক্ষের প্রতি লক্ষ্য করে বলা হয়েছে যে, বাদশাদের কাছে খুব কম যাতায়াত করবে। মানুষ যেমন অগ্নি হতে বেঁচে থাকে তুমিও তাঁদের সংশ্রব দরবারে যাবে না, তাহলে তোমার মান-সম্মান ও গৌরব অটুট থাকবে। আর দরবারে যদি এমন লোকের সমাবেশ থাকে যে, তুমি তাঁদের সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল নও তখন সেই দরবার হতে অধিক দূরে থাকবে, কারণ তুমি যখন তাঁদের মান-সম্মান সম্বন্ধে অজ্ঞাত, এমতাবস্থায় তুমি তাঁদের প্রতি যে আচার ব্যবহার করবে এবং তাঁদের সাথে যে আলাপ-আলোচনা করবে, তা তাঁদের মনঃপূত নাও হতে পারে। তাঁরা যদি তোমার চেয়ে অধিক মর্যাদা-সম্পন্ন হয়ে থাকেন এবং তুমি যদি তার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন না কর, তবে তাঁরা তোমার সব কিছুকে বেতমীজী মনে করবেন; আর তাঁরা যদি সাধারণ লোক হয়ে থাকেন, আর তুমি যদি তাঁদের প্রতি অযথা ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন কর, তবে বাদশার দৃষ্টিতে তুমি হেয় প্রতিপন্ন হবে। বাদশা যদি তোমাকে কাজী পদে নিযুক্ত করতে চান, তবে তুমি প্রথমে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে নিবে যে, তিনি তোমার এজতেহাদ-তরীকার সাথে একমত কিনা। যদি তা না হয়ে থাকে এবং তুমি উক্তপদে নিযুক্ত হও, তবে তোমাকে সুলতানের প্রভাব-প্রতিপত্তির ফাঁদে পড়ে তোমার মতের বিরুদ্ধে কাজ করে যেতে হবে। তুমি যে কাজ বা পদের উপযুক্ত নও, তা কস্মিনকালেও গ্রহণ করবে না।

আর কেউ যদি শরীয়তে বেদায়াৎ আমদানী করতে চায়, তবে প্রকাশ্যভাবে ভ্রম ত্রুটিকে লোকের চোখের সম্মুখে তুলে ধরবে, তাহলে অন্য লোক তাদের খপ্পরে পতিত হবে না। তখন তারা কে বা কার তা দেখবার কোন প্রয়োজন নাই,

কেননা সত্য প্রকাশ ও সত্য প্রচারে খোদা তোমার সহায়; তুমি তাঁর দীনের সহায় ও সাহায্যকারী হলে তিনিও তোমার সহায় এবং সাহায্যকারী হবেন।

স্বয়ং বাদশার মধ্যে যদি এমন কোন দোষ-ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়ে থাকে, তবে পরিষ্কাররূপে বলে দিবে, "যদিও কাজী হিসেবে আমি আপনার অধীন, তথাপি আপনার ভুল-ত্রুটি সর্বসাধারণের সম্মুখে প্রচার করা আমার পক্ষে ফরজ।" বাদশা যদি তা না মানেন, তবে গোপনে একাকী তাঁকে বলে দিবে যে, আপনার এই কাজ কোরআন মজীদ ও হাদীসে নববীর বিরোধী। বাদশা যদি তা মেনে লন, তবে তিনি ধন্য, অন্যথায় তাঁকে বলে দিবে যে আপনাকে সুমতি দান করার জন্য খোদার কাছে দো'আ করা ব্যতীত আমার গত্যন্তর থাকবে না।

ইমাম সাহেব পার্থিব জীবনের সবকিছু সম্বন্ধে বহু মূল্যবান উপদেশ দান করে গিয়েছেন। তিনি লিখেছেন– জ্ঞানার্জনে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করবে। জ্ঞানার্জনের পরে জায়েয তরীকানুযায়ী জীবিকা-নির্বাহের উপায়ের নিমিত্ত ধন সঞ্চয় করতে হবে। এলম ও দৌলত একই সময়ে উপার্জন করা যায় না।

তারপর বিবাহ করবে; কিন্তু তখনও তোমার দৃঢ় বিশ্বাস থাকা চাই যে, অবশ্যই তোমার স্ত্রী-পুত্র লালন পালনের ক্ষমতা রয়েছে। পূর্ব-স্বামীর সন্তান রয়েছে, এমন স্ত্রীলোককে বিবাহ করবে না।

জনসাধারণ বিশেষভাবে ধনীদের সাহায্য হতে দূরে থাকবে। অন্যথায় তারা ধারণা করবে যে, তুমি তাদের মুখাপেক্ষী। সেই ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা তোমাকে ঘুষ দিতেও সাহস করবে।

বাজারে যাওয়া, দোকানে বসা, রাস্তা বা মসজিদে বসে কোনকিছু খাওয়া ইত্যাদি হতে বেঁচে থাকবে।

কেউ কোন মাসআলা জিজ্ঞাসা করলে শুধু এর উত্তর দিবে, নিজের পক্ষ হতে কিছু বাড়াবে না, বা কমাবে না।

আকায়েদ সম্বন্ধে সর্বসাধারণের সাথে আলাপ-আলোচনা করবে না। শাগরেদের সাথে এমন সদয় সস্নেহ ব্যবহার করতে হবে যে, অপর কেউ দেখলে যেন মনে করে যে, তারা তোমার সন্তান।

জনসাধারণ এবং নিম্নস্তরের লোকের সাথে তর্ক-বিতর্ক হতে দূরে থাকবে। কোন শহরে গেলে সেখানকার আলেম-ওলমাদের সাথে এমনভাবে মিলজোল করে চলবে তাঁদের মনে যেন বিরোধিতার কোন প্রশ্নই সমুদিত না হয়।

এলম সম্বন্ধীয় কোন আলাপ আলোচনা হলে জেনে বুঝেই আলাপ-আলোচনা করবে। তুমি যথেষ্ট প্রমাণ দিতে পারবে না, এমন কোন কথা বলবে না।

তর্ক-বিতর্ক সভায় চরম সাহস ও স্থিরতা-ধীরতার সাথে অগ্রসর হবে। অন্তরে বিন্দু-পরিমাণ ভয়ও যদি থাকে, তবে ভাব-ধারা স্থির রাখতে পারবে না, আর ভাষাও বলিষ্ঠ এবং সাবলীল হবে না। যারা তর্ক-বিতর্কের আদব-কায়দা জানে না বা অহংকার দেমাগ বাতিকগ্রস্ত, তাদের সাথে কখনও তর্ক করবে না। তর্কের সময় রাগান্বিত হতে নাই।

কত হাসবে। অধিক হাসলে অন্তঃকরণ মরে যায়। যে কোন কাজ করবে, সুস্থ দেহ-মনে করবে। কোন লোক সম্মুখে এসে আহ্বান না করা পর্যন্ত জবাব দিবে না; কেননা, পিছন হতে পশুকে মাত্র আহ্বান করা যায়।

রাস্তায় চলার সময় ডানে-বামে চাইবে না। গোসলের ঘাটে গেলে জনসাধারণের সুবিধার প্রতি অধিক নজর দিবে। সকালে বা দ্বিপ্রহরে ঘাটে যাবে না। আলাপ-আলোচনায় কঠোরতা পরিহার করবে।

খুব জোরে কথা বলবে না; কোন বস্তু ক্রয় করতে হলে, নিজে বাজারে না যেয়ে টাকার দ্বারা আনয়ন করবে।

রাজ-দরবারে কখনও নীরব দর্শক হবে না; প্রতি কথায় ও কাজে বেপরওয়া থাকবে। সাধারণ লোকদের সাথে বসে ওয়াজ করবে না; কেননা, এইসব ক্ষেত্রে বক্তাকে প্রায় ক্ষেত্রেই মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়।

শাগরেদকে ফিকাহ্ পড়ার অনুমতি দান করতে হলে, নিজে সেই মজলিসে বসে তার উপযুক্ততা সম্বন্ধে পরীক্ষা করবে। পরীক্ষা না করে কাউকেও তাতে আদেশ প্রদান করবে না। সে যদি ঘটনাক্রমে ভুল পথে পরিচালিত হয়, আর তখনও যদি তুমি চুপ থাক, তবে লোকেরা ধরে নিবে যে, সঠিকই বলছে।

ফিকাহ্ ব্যতীত অন্য কোন মজলিসে নিজে যাবে না। তোমার বন্ধু-বান্ধব বা শাগরেদকে পাঠায়ে দিবে। তারা তোমার কাছ হতে সবকিছু জেনে শুনে কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হবে।

প্রতি কাজে পরহেজগারী ও আমানতদারীর প্রতি সর্বাধিক দৃষ্টি রাখবে। লোকের সাথে যা প্রকাশ করে থাক, খোদার সাথে অন্তরের দিক দিয়েও তদ্রূপ করবে।

আযানের স্বর কর্ণে প্রবেশমাত্র অবিলম্বে নামাযের জন্য প্রস্তুত হবে। প্রতি মাসে রোযা রাখার নিমিত্ত দুই চার দিন নির্দিষ্ট করে নিবে।

নমাযের পর প্রতি রোজ কিছু নির্দিষ্ট অজিফা পড়বে। কোরআন তেলাওয়াতে গাফিল না হওয়া চাই। দুনিয়ার প্রতি অধিক ঝুঁকিও না। প্রায়ই কবরস্থানে যাবে।

বৃথা আমোদ-আহ্লাদে মাতবে না। পাড়া-প্রতিবেশীর কোন দোষ দেখলে, তা ঢেকে রাখবে। বেদাতীদের সাথে কোন সংশ্রব রাখবে না। লোকেরা তোমার সাথে দেখা করতে আসলে, তাদের সাথে জ্ঞান-চর্চা করবে। সেই ব্যক্তি যদি জ্ঞানী হয়ে থাকে, তবে উপকার লাভ করবে; অন্যথায় তোমার সাথে তার ভালবাসা জন্মিবে।

ইমাম সাহেবের এক শাগরেদকে খলীফার দরবারে আহ্বান করা হলো। তখন তিনি ইমাম সাহেবের কাছে পরামর্শ করার জন্য এসে বললেন, "আমি খলীফার দরবারে যেতে চাই। কিন্তু সেখানে যেয়ে আমি কি বলব, তা কিছুই আমার বুঝে আসতেছে না। হযরত, আপনি আমাকে এ সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দান করুন।"

ইমাম সাহেব বললেন, তুমি তাঁকে বললে, হে আমীরুল মুমেনীন! সম্মান, সম্পত্তি এবং রাজত্বের জন্য লোকেরা দুনিয়াকে চেয়ে থাকে। আপনার এ সব কোন কিছুরই অভাব নেই। আপনি যদি পরহেজগারী ও নেক আমল এখতেয়ার করেন, তাহলে আপনার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গল লাভ হবে।

ইমাম সাহেব বলছেন, এলম যাকে পাপ ও নির্লজ্জতা হতে বিরত রাখে নাই, তার চেয়ে অধিক হতভাগা আর কেউই নাই। যে ব্যক্তি এলমে-দীন সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করে এবং তার এরূপ ধারণা জন্মে যে, তাকে এই জন্যে সেই সমস্তের জবাবদিহি হতে হবে, সেই ব্যক্তি ধর্মের মর্যাদা উপলব্ধি করা দূরের কথা, সে নিজের মূল্যও কিছুই বুঝতে পারে নাই।

আলেমগণ যদি আল্লাহর বন্ধু না হয়ে থাকেন, তবে এই বিশ্বচরাচরে আল্লাহর কোন বন্ধু নাই।

যে ব্যক্তি দুনিয়ার নিমিত্ত এলমকে শিখে থাকে, তার অন্তরে এলম স্থান পায় না।

ঈমানের চেয়ে বড় ইবাদত আর কিছুই নাই। আর কুফরীর চেয়ে অধিক পাপ আর কিছুই নাই। সুতরাং যে ব্যক্তি এই শ্রেষ্ঠ ইবাদতের পায়রবি করে থাকে এবং হীনতম পাপ হতে বেঁচে থাকে, সে যত বড় পাপীই হউক না কেন, একদিন না একদিন তার ক্ষমা প্রাপ্তির আশা রয়েছে।

যে ব্যক্তি হাদীস শিক্ষা করে এবং তদানুযায়ী আমল করে না, তাকে এমন একজন চিকিৎসকের সাথে তুলনা করা যায় যে, তার কাছে বহু ঔষধ রয়েছে, কিন্তু সে জানে না যে, কোন্‌টি কোন্ রোগের ঔষধ।

এক ব্যক্তি ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞেস করলেন, ফিকাহ্ শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করার জন্য সবচেয়ে অধিক প্রয়োজনীয় কি? ইমাম সাহেব বললেন, একাগ্রতা। সেই ব্যক্তি বললেন, তা কিরূপে সহজলভ্য হতে পারে? তিনি বললেন, মানুষ শুধু আবশ্যকীয় বস্তু সমূহ ব্যবহার করবে, এতদ্ব্যতীত সবকিছু পরিত্যাগ করবে।

একদিন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, হযরত আলী (রাঃ) এবং আমীর মাবিয়া (রাঃ) সম্বন্ধে হুজুর কি বলেন? তিনি বললেন, কেয়ামতের দিবস আমাকে যে সকল কথা জিজ্ঞাসা করা হবে, সেই সম্বন্ধে আমি অধিক ভয় পাই। এ সম্বন্ধে খোদা আমাকে কোনকিছু জিজ্ঞাসা করবেন না, কাজেই এ সম্বন্ধে মাথা ঘামাবার আমার কোন প্রয়োজন নাই।

এতে কেউ যেন এ মত ধারণা না করে যে, এ সম্বন্ধে ইমাম সাহেবের কোন ব্যক্তিগত অভিমত নাই। ইমাম সাহেব স্বয়ং এ সম্বন্ধে বলছেন, হযরত আলীর (রাঃ) আদর্শ যদি আমাদের সম্মুখে না থাকত, তবে বিদ্রোহীদের সাথে কিরূপ আচরণ করা সমুচিত, তা আমরা বলতে পারতাম না।

ইমাম শাফী (রাঃ)ও এ সম্বন্ধে একমত। কিন্তু এ সবকে ইসলামের একটি জরুরী মাসআলা রূপে বিবেচনা করা এবং এর উপর নিজেদের ইচ্ছামত মন্তব্য করা একটি অবান্তর কাজ ব্যতীত আর কিছুই নয়। ইমাম সাহেবও এর প্রতি ইশারা করেছেন।

কূফার গভর্ণর একদিন ইমাম সাহেবকে বললেন, "হযরত, আপনি আমার কাছ হতে এত দূরে থাকেন কেন?" তিনি বললেন, "শান্তির সাথে এক টুকরা রুটি এবং মোটা বস্ত্র যদি মিলায়ে যায়, তবে তা সেই আরাম-আয়াশ হতে শ্রেষ্ঠ পাছে যার জন্য অনুতাপ করতে হয়।

কবিতা আবৃত্তি

ইমাম সাহেব মাঝে মাঝে কবিতা আবৃত্তি করতেন। কিন্তু তা কখনও গজল বা গানের সুরে নয়। তিনি প্রায়ই আবৃত্তি করতেন।

অর্থাৎ মানুষ যতদিন পর্যন্ত জীবিত থাকে, ততদিন পর্যন্ত একটি উত্তম ঘরের আবশ্যক। এমন একটি ঘর মিলে গেলে তার শুকরিয়া আদায় করা চাই। আর আখেরাতের ঘরের জন্য তার আপ্রাণ চেষ্টা করা প্রয়োজন।

উপস্থিত বুদ্ধি

ইমাম সাহেবের উপস্থিত বুদ্ধি প্রবাদের মত দেশময় বলা-বলি করা হতো। আল্লামা জাহবী-লিখেছেন–আদম-সন্তানদের মধ্যে যাঁদের বুদ্ধি অসাধারণ ছিল, তাঁদের মধ্যে ইমাম আজম সাহেবও একজন ছিলেন। খুব কঠিন সমস্যা উপস্থিত

হলে, তিনি এত দ্রুত এর সমাধান করে দিতেন যে, লোকেরা হয়রাণ হয়ে যেত। মাসআলা-মাসায়েল সম্বন্ধে বিশেষ ওয়াকিফহাল হয়ত অনেকে ছিলেন। কিন্তু কোন প্রকার চিন্তা না বা সামান্য একটু দেরী না করেই এর যথাযথ উত্তর দেওয়ার ইমাম সাহেবের সমকক্ষ আর কেউই ছিলেন না।

এক ব্যক্তি কোন এক কথায় তাঁর স্ত্রীর প্রতি নারাজ হয়েছিল। সে শপথ করে বলল, "তুমি যতক্ষণ পর্যন্ত আমার সাথে কথা না বল, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি কখনও তোমার সাথে কথা বলবো না।"

স্ত্রীলোকটির মেজাজও কড়া ছিল। সেও তার স্বামী যা বলেছিল, হুবহু তাই বলল। রাগের সময় কেউ-তো কোনকিছু তলায়ে দেখে নাই। এরপর তাদের মেজাজ যখন ঠাণ্ডা হয়ে আসল, তখন উভয়ের মনেই অনুতাপানল জ্বলে উঠল।

স্বামী তখন ইমাম আবু সূফীয়ান সওরীর খেদমতে হাজির হলো। এর কোন সুরাহা হয় কিনা তা তলায়ে দেখার নিমিত্ত ইমাম সাহেবকে সে বহু কাকুতি মিনতি করল।

ইমাম সাহেব বললেন, "যাও, খুব আগ্রহভরে আলাপ কর। এজন্য কাকেও কাফ্ফারা দিতে হবে না।"

সওরী সাহেব এটা শুনে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন। অতঃপর ইমাম আজম সাহেবের কাছে যেয়ে বললেন, "আপনি লোকদেরকে ভুল মাসআলা বলে থাকেন।"

ইমাম সাহেব তখন সেই ব্যক্তিকে দ্বিতীয় বার ডেকে এনে তাকে ঘটনাটি পুনরায় বলে যেতে আদেশ করলেন। সে তা পালন করল। তখন ইমাম সাহেব সওরী সাহেবকে লক্ষ্য করে বললেন, "আমি পূর্বে যা বলেছিলাম, এখনও তাই বলছি।" সওরী সাহেব এর গুঢ়তত্ত্ব জানতে চাইলে তিনি বললেন, "স্ত্রীলোকটি যখন স্বামীকে লক্ষ্য করে উক্ত কথা বলেছিল, তখন স্ত্রীলোকটির পক্ষ হতেই প্রথম কথা বলা শর্ত হয়ে গেল। অতঃপর স্ত্রীলোকটি যখন কথা বলে ফেলল, তখন শপথ আর কোথায় রয়ে গেল?"

সূফীয়ান বললেন, "প্রকৃতপক্ষেই উপস্থিত ক্ষেত্রে আপনার মাথায় যে বুদ্ধি খেলে, ততদূর পর্যন্ত আমাদের কল্পনাও দৌড়ায় না।"

সঙ্কটময় মীমাংসা

কূফায় এক ব্যক্তি মহা ধুমধামের সাথে একই সময়ে দুইটি মেয়ের বিবাহ দেয়। শহরের সকল গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং আলেম ওলমা নিমন্ত্রিত হলেন। মাসআর বিন কেরাম, হাসান বিন সালেহ, সূফীয়ান সওরী এবং ইমাম আবু

হানীফা সাহেবও সেই উৎসবে যোগদান করেন। তখনও সকল লোকের খাওয়া দাওয়া শেষ হয় নাই। এমন সময় বাড়ীওয়ালা বেহুশ অবস্থায় ঘর হতে বের হয়ে বলতে লাগলেন, "গজব হয়ে গিয়েছে।" লোকেরা ব্যাপারটি কি জানতে চাইলে বাড়ীওয়ালা বললেন, "মেয়েদের ভুলে মিলন রাতে নুতন স্বামী-স্ত্রী উলট পালট হয়ে গিয়েছে। মেয়ে যে যুবকের সাথে ছিল, সে তার স্বামী ছিল না। এখন উপায় কি?"

সূফীয়ান বললেন, "আমীর মাবিয়ার জমানায়ও এমন এক ঘটনা ঘটেছিল। এতে বিবাহ ভেঙ্গে যায় না। অবশ্য উভয়কেই মোহর আদায় করতে হবে।"

মাসআর বিন কেরাম ইমাম আবু হানীফা সাহেবকে লক্ষ্য করে বললেন, " এ সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি?"

ইমাম সাহেব বললেন, "জামাতা স্বয়ং আমার কাছে আসলে, আমি এর জবাব দিব।" লোকেরা তাদেরকে ডাকায়ে আনল।

ইমাম সাহেব উভয়কেই পৃথক পৃথক ডাকায়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "রাত্রিতে যে মহিলাটি আপনার সাহচর্যে ছিলেন, তিনিই যদি আপনার স্ত্রীরূপে পরিগণিত হন তবে আপনি সম্মত আছেন তো?" উভয়েই তাতে সম্মত হলেন। ইমাম সাহেব বললেন, "যে মহিলার সাথে আপনাদের বিবাহ হয়েছিল। আপনারা প্রত্যেকেই সেই মহিলাকে তালাক দিয়ে দেন এবং বাসঘরে যে মহিলার সাথে আপনার মিলন হয়েছিল, তাদের সাথে আপনাদের বিবাহ হয়ে যাক।"

সওরী সাহেব যে জবাব দিয়েছেন, যদিও তা ফিকাহ মোতাবেক সহী কেননা এতে সহবাসের সন্দেহ বর্তমান রয়েছে, তথাপি এতে বিবাহ ভাঙ্গে না। কিন্তু ইমাম সাহেব পরিস্থিতি অনুযায়ী যাতে সর্বদিক রক্ষা পায়, সেই হিসেবে ব্যবস্থা করেছেন। তিনি বিবেচন করেছেন যে, এমতাবস্থায় বিবাহ কায়েম থাকলেও তা রুচি ও সম্মানের দিক দিয়ে বেখাপ্পা হবে। পরিস্থিতির চাপে পড়ে স্বামী-স্ত্রী যদি তা মেনেও লয়, তথাপি তাদের মধ্যে আন্তরিকতা এবং এক দেহ এক প্রাণ ভাব নাও জন্মাতে পারে। আর দাম্পত্য জীবনের তাই মূল উদ্দেশ্য। আর এতে মোহর প্রদানও সহজ হবে। এর কারণ এই যে, স্ত্রীসহবাসের পূর্বে তালাক দিলে, তখন শুধু অর্ধেক মোহর আদায় করতে হয়।

একটি হৃদয়গ্রাহী ফতোয়া

লাইছ বিন সায়াদ মিসরের একজন বিখ্যাত ইমাম ছিলেন। তিনি ইমাম আবু হানীফার বহু নাম খ্যাতি ও গুণ-গরিমার কথা শুনেছেন, কিন্তু তিনি তাঁকে

কখনও দেখেননি। তিনি সেই সুযোগ অনুসন্ধান করছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি হজ্জের কাছাকাছি সময় মক্কা শরীফ যাওয়ার পথে এক সভায় বহু লোকের ভীড় দেখতে পেলেন। একজন লোক সভাপতির আসনের সন্নিকট আসনে উপবিষ্ট রয়েছেন, আর লোকেরা তাঁর কাছে সমূহ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছে।

এক ব্যক্তি সম্মুখে অগ্রসর হয়ে বলল, "হে ইমাম আবু হানীফা সাহেব, আমার একটি বদমেজাজী পুত্র আছে, আমি যদি তাকে বিবাহ করায়ে দেই, তবে সে তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়। আর বাঁদী যদি খরিদ করে আনি, তবে তাকে আজাদ করে দেয়। হযরত, আপনি আমাকে বলে দিন, আমি এখন কোন্ পথ অবলম্বন করব।"

ইমাম আবু হানীফা সাহেব অতি অনায়াসে বলে দিলেন, "আপনি আপনার ছেলেসহ বাজারে যাবেন। আপনার ছেলে যে বাঁদী পছন্দ করে, তাকেই আপনি খরিদ করে আপনার ছেলেকে বিবাহ করায়ে দিবেন। তখন বাঁদীকে সে আর আজাদ করে দিতে পারবে না। কারণ তখন সে বাঁদীর মালিক হতে পারবে না। সে যদি বাঁদীকে তালাক দিয়ে দেয়, তবে তাতে আপনার কোন ক্ষতি হবে না। আপনার বাঁদী তখন কিছুতেই আপনার হাত ছাড়া হবে না।"

ইমাম সায়াদ বলেন, "আমি ইমাম আজম সাহেবের উপস্থিত বুদ্ধি দেখে মহা আশ্চার্যান্বিত হলাম।"

খলিফা মনসূর ও ইমাম সাহেব

রবী' নামে এক ব্যক্তি ইমাম সাহেবের ঘোর শত্রু ছিল। রবী' খলিফার অমাত্যবর্গের একজন ছিলেন। একদিন ইমাম সাহেব কোন কার্য উপলক্ষে খলিফার দরবারে গেলেন। রবী' ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। মনসূর বললেন, হুজুর, রবী' আমীরুল মুমিনীনের বংশধর আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের বিরোধিতা করে থাকেন।"

তিনি বলেন, "কোন ব্যক্তি যদি কোন কথার উপর শপথ করে এবং দুই একদিন পর বলে লয়, তবে তা শপথের মধ্যে সামিল হবে এবং তাকে শপথ পূর্ণ করতে হবে।

ইমাম সাহেব এর বিরুদ্ধে ফতোয়া দিলেন। তিনি বললেন, শব্দ যদি শপথের সঙ্গে বলা হয়, তবে তা শপথের অংশ স্বরূপ বুঝতে হবে।"

ইমাম সাহেব বললেন, "এটা কি আপনাদের দৃঢ় বিশ্বাস, নাকি শুধু অনুমান

মাত্র।" তারা বলল, "এটা তো শুধু আমাদের অনুমান মাত্র।" অন্যথায় তা অনর্থক ও অর্থহীন।"

ইমাম সাহেব বললেন, "হে আমীরুল মুমিনীন, রবী' এই ধারণা পোষণ করেন যে, আপনার কাছে দীক্ষা গ্রহণ মূল্যহীন।"

মনসূর বললেন, "আপনি কিরূপে তা বলছেন?" ইমাম সাহেব বললেন, "আপনার ধারণা এই যে, দরবারে যদি কোন ব্যক্তি আপনার খেলাফতের দীক্ষা গ্রহণ করে এবং বাড়ী যেয়ে শপথ করে বলে, তখন তার শপথ অর্থহীন হয়ে পড়ে এবং তার উপর আইনগতভাবে কোন ক্ষমতা খাটবে না।"

মনসূর তা শুনে রবী'কে লক্ষ্য করে বললেন, "আপনি ইমাম সাহেবের সাথে হাসি-তামাশা করবেন না। তাঁর উপর আপনার কোন ক্ষমতা খাটে না।"

ইমাম সাহেব যখন দরবার হতে বের হয়ে আসলেন, তখন রবী' বললেন, "আজ তো আপনি আমাকে প্রাণে মেরে ফেলবার উপক্রম করেছিলেন।" ইমাম সাহেব বললেন, "আপনিই বরং আমার প্রতি এরূপ ধারণা পোষণ করেছিলেন। আমি-তো শুধু আপনার প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলাম।"

খারেজীদের দুর্ব্যবহার

একদিন বহুসংখ্যক খারেজী ইমাম সাহেবের বাড়ী যেয়ে আক্রমণ করল। তারা বলতে লাগল, "আপনাকে এখন কুফরী হতে তওবা করতে হবে।" ইমাম সাহেব বললেন "হাঁ, আমি আপনাদের কুফরী হতে তওবা করছি।"

খারেজীদের বিশ্বাস এই ছিল যে, মানুষ পাপ করলে কাফের হয়ে যায়। অর্থাৎ পাপ ও কুফরী এক বরাবর।

ইমাম সাহেবের উদ্দেশ্য এই ছিল যে, যাকে আপনারা কুফরী মনে করে থাকেন, আমি তা হতে তওবা করছি।

কোন এক ব্যক্তি খারেজীদের কাছে যেয়ে বলল যে, আবু হানীফা আপনাদেরকে ধোঁকা দিয়েছেন। তিনি স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে এ সকল বলছেন।

খারেজীরা ইমাম সাহেবের কাছে কৈফিয়ত চাইল যে, তিনি কেন ঘুরায়ে ফিরায়ে কথা বলছেন?

ইমাম সাহেব বললেন, "এমতাবস্থায় স্বয়ং আপনাদেরকে তওবা করতে হবে। কারণ খোদা বলেন, নিশ্চয় অধিকাংশ অনুমান পাপ ব্যতীত আর কিছুই নয়।

একদিন তিনি মসজিদে বসেছিলেন। বহু শাগরেদ সেখানে সমবেত হয়েছিলেন। হঠাৎ একদল খারেজী সেই মসজিদে ঢুকে পড়ল। লোকেরা পলায়ন করতে আরম্ভ করল। ইমাম সাহেব তাদেরকে বললেন, "আপনারা ভয় পাবেন না। আপনার শান্তির সাথে বসে যান।"

তখন এক খারেজী নেতা ইমাম সাহেবের পাশে এসে বসল। ইমাম সাহেব তখন কোরআন শরীফের নিম্নলিখিত আয়াত পাঠ করলেন–"অংশীবাদীদের কেউ যদি আশ্রয় চায়, তবে আশ্রয় দাও যেন যে খোদার কালাম শুনতে পায়; এরপর তাদেরকে নিরাপদ স্থানে পৌছায়ে দাও।"

খারেজীরা নিজদেরকে ব্যতীত সকল মুসলিম জাতিকে অংশীবাদী ও কাফেররূপে বিবেচনা করত। আর তাদেরকে নিহত করা পরম পুণ্যের কাজ মনে করত। সুতরাং তারা এই উদ্দেশ্যে এসেছিল যে, ইমাম সাহেব যদি স্বীয় আকীদার বিবরণ দেন, তবে তাঁর উপর তারা কুফরীর অপবাদ দিবে এবং তাঁকে নিহত করবে। কিন্তু ইমাম সাহেবের দাঁতভাঙ্গা উত্তর তাদের সবকিছু পরিশ্রমকে পণ্ড করে দিল। তখন তাদের নেতা তাদেরকে বলল যে, তাঁকে কুরআন পাঠ করে শুনাও এবং তাকে ঘর পর্যন্ত পৌছায়ে দাও।

আরও একটি ঘটনা

আবুল আব্বাস নামে খলিফা মনসূরের দরবারে একজন উচ্চপদস্থ মহা সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ইমাম আবু হানীফা সাহেবের সাথে ঘোর বৈরি ভাব পোষণ করতেন। তিনি সর্বদাই ইমাম সাহেবের অনিষ্ট চিন্তা করতেন।

একদিন কোন একটি কার্য উপলক্ষে তিনি খলিফার দরবারে গেলেন। ঘটনাক্রমে আবুল আব্বাসও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি লোকের সাথে বলাবলি করতে লাগলেন যে, আজ ইমাম সাহেবের আর রক্ষা নেই। অতঃপর ইমাম সাহেবকে লক্ষ্য করে বললেন, "হে আবু হানীফা, আমীরুল মুমিনীন আমাদেরকে আদেশ করে থাকেন যে, লোকটি প্রকৃতপক্ষেই দোষী কিনা। এমতাবস্থায় আমাদের সেই আদেশ পালন করা উচিত কিনা।" তখন ইমাম সাহেব বললেন, "আপনারা যদি বুঝতে পারেন যে, খলিফা অন্যায় আদেশ করছেন, তবে তা মান্য করবেন না।"

মনসূরের সম্মুখে কার এমন কথা বলবার শক্তি রয়েছে যে তা নাজায়েয। আবুল আব্বাসকে বাধ্য হয়ে বলতে হলো যে, খলীফা ন্যায় আদেশই করে থাকেন।

এক ব্যক্তি কসম খেল, "আজ যদি আমি ফরজ গোসল করি, তবে আমার বিবি তিন তালাক হয়ে যাবে।" এর কিছুক্ষণ পরে বলল, "আজ যদি আমার স্ত্রী কোন নামায কাজা করে, তবে সে তালাক প্রাপ্তা হবে।" আবার বলল, "আজ যদি আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস না করি, তবে সে তালাক প্রাপ্ত হবে।

লোকেরা ইমাম সাহেবের কাছে এসে এ সম্বন্ধে মাসআলা জিজ্ঞেস করল। ইমাম সাহেব বললেন, "আজ আসরের নামায পড়ে সে যেন স্ত্রী-সহবাস করে আর সূর্যাস্তের পর গোসল করে যেন অবিলম্বে মাগরিবের নামায পড়ে লয়। এই পথ অবলম্বন করলে, তার সব শর্ত আদায় হয়ে যাবে।"

সেই ব্যক্তি উক্ত সময় স্ত্রীর সাথে সহবাস করল; নামাযও কাজা হলো না; ফরজ গোসলও হয়ে গেল।

একদিন এক ব্যক্তি ইমাম সাহেবের কাছে এসে বলল, "আমি সতর্কতার সাথে এক জায়গায় টাকা রাখছিলাম। কিন্তু তা কোথায় রাখছিলাম, এখন আমার মনে পড়ছে না। আমি এখন ভীষণ বিপাকে পতিত হয়ে আপনার শরণাপন্ন হয়েছি, আপনি এর কোন প্রতিকার করে দিন।"

ইমাম সাহেব বললেন, "ভাই, এই মাসআলা তো ফিকাহ-শাস্ত্রে নেই। কাজেই তুমি আমার কাছে কি জিজ্ঞেস করতে এসেছো?"

সেই ব্যক্তি তবুও বাড়াবাড়ি করলে তিনি বললেন, "তোমাকে আজ সারারাত নামায পড়তে হবে।"

সেই ব্যক্তি তখন নামায পড়া শুরু করে দিল। কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই তার স্মরণ হলো যে, সে অমুক স্থানে টাকা রেখেছিল। সে তখন ইমাম সাহেবের কাছে দৌড়ে এসে বলল, "হযরত আপনার চেষ্টা সফল হয়েছে।"

তিনি বললেন, "হাঁ, এটা কি শয়তানের সহ্য হতে পারে যে, তুমি সারারাত্র নামায পড়বে? এজন্যই সে তোমাকে শীঘ্রই তা স্মরণ করায়ে দিয়েছে। তথাপি এর শুকরিয়া স্বরূপ সারারাত নামায পড়ে কাটেয়ে দেয়া তোমার উচিত ছিল।"

উদারতা

অন্য একদিন এক ব্যক্তি এসে বলল, "আমি কিছু জিনিসপত্র ঘরের কোন এক কোণায় পুঁতে রেখেছিলাম। কোনস্থানে আমি তা গেড়ে রেখেছিলাম এখন স্মরণ হচ্ছে না। এখন উপায় কি?"

ইমাম সাহেব বললেন, "তোমার যখন স্মরণ নেই, এমতাবস্থায় আমার স্মরণ হওয়া কি সম্ভাবনা রয়েছে?"

লোকটি কাঁদতে আরম্ভ করল। ইমাম সাহেবের হৃদয় করুণায় বিগলিত হয়ে গেল। তিনি তখন কতক ছাত্রকে নিয়ে তথায় গেলেন। তৎপর প্রত্যেককে বললেন, "আচ্ছা, এটা যদি তোমাদের হতো এবং হেফাজতের জন্য যদি তোমরা কোন বস্তু গোপন করে রাখতে তবে তোমরা তা কোথায় লুকায়ে রাখতে?" তখন প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধারণানুযায়ী বিভিন্ন স্থানের উল্লেখ করল।

ইমাম সাহেব বললেন, "এই সকল স্থানের মধ্যে নিশ্চয়ই তিন চারটি স্থানের কোন না কোন স্থানে বস্তুগুলো গর্ত করে রাখা হয়েছে। তিনি সেইসব স্থানে খুঁড়তে আদেশ দিলেন। খোদার কি কুদরৎ, তৃতীয় স্থান খুঁড়িয়ে সবগুলো বস্তু পাওয়া গেল।

ইমাম সাহেব যদিও অত্যন্ত গম্ভীর, বুদ্ধিমান এবং মহামান্য ব্যক্তি ছিলেন, তথাপি তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রভাবে তিনি মাঝে মাঝে হাসি-তামাশাও করতেন।

একদিন তিনি চুল কাটাছিলেন। তিনি নাপিতকে বললেন, "সাদা চুল তুলে ফেল।"

নাপিত বলল, "আমি সাদা চুল যত তুলি, ততই আরো বেশী বের হয়।"

ইমাম সাহেব বললেন, "এটাই যদি হয়ে থাকে, তবে কাল চুল তুলতে থাক, তখন কাল চুল অধিক হয়ে যাবে।"

কাজী শরীফ এই গল্প শুনে বললেন, "ইমাম সাহেব নাপিতের সঙ্গেও কেয়াছ বর্জন করেননি।"

ইমাম সাহেবের মহল্লায় এক আটা পেষণকারী থাকত। সে গোঁড়া শিয়া ছিল। তার দুইটি খচ্চর ছিল। সে সখ করে একটি নাম 'আবু বকর' এবং অপরটির নাম 'ওমর' রাখছিল। ঘটনাক্রমে একটি খচ্চর অপর খচ্চরকে লাথি মারলে খচ্চরটি মরে গেল।

মহল্লায় এ সম্বন্ধে বলা-বলি আরম্ভ হলো। ইমাম সাহেব তা শুনে বললেন, "তোমরা যেয়ে দেখ যে, শিয়া ব্যক্তি যে খচ্চরের নাম 'ওমর' রেখছিলেন, সেই খচ্চরই লাথি মেরে থাকবে।"

লোকেরা অনুসন্ধান করে বাস্তবক্ষেত্রেও তাই দেখতে পেল।

কূফায় এক শিয়া থাকত। সে হযরত ওসমান (রাঃ) কে ইহুদী বলত। ইমাম সাহেব একদিন তার কাছে যেয়ে বললেন, "তুমি যদি তোমার মেয়েকে বিবাহ দিতে চাও, তবে অমুক একটি পাত্র আছে সৎবংশজাত, অবস্থাপন্ন এবং পরহেজগার। সারারাত্রি জাগরণকারী ও হাফেজুল কোরান।"

শিয়া ব্যক্তি বলল, "তার চেয়ে উত্তম পাত্র আমি কোথায় পাব? আপনি আশা করি এই বিবাহ ঠিকঠাক করে দিবেন।"

ইমাম সাহেব বললেন, "তবে একটিমাত্র কথা এই যে, সে ইহুদী ধর্মাবলম্বী।" এটা শুনে সেই ব্যক্তি মহা অসন্তুষ্ট হয়ে বলল, "ছুবহানাল্লাহ্, আপনি কি আমাকে ইহুদীর সাথে আত্মীয়তা করার মত দিয়েছেন?"

তখন ইমাম সাহেব বললেন, "এতে যদি তোমার ঘোর আপত্তি থেকে থাকে, তবে কি তুমি বলতে চাও যে, বিশ্বনবী (সাঃ) তাঁর দুই দুইটি মেয়েকে একজন ইহুদীর কাছে বিবাহ দিয়েছিলেন?"

খোদার কি কুদরত, এতটুকু মাত্র কথাতে সেই লোকটি সতর্ক হয়ে গেল। সে তখন পূর্ব-মতের পরিবর্তন করে তওবা করল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

গ্রন্থাবলী, চিন্তাধারা, গবেষণা

তিনি 'ফিকাহ-আকাবর,' 'আল-আলেমু ওয়াল মুতাআল্লেমু', 'ভারতবর্ষ' ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করেন।

ফিকাহ-আকবর

এটা ধর্মবিশ্বাস সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ। বিষয়বস্তু ও শব্দ-বিন্যাসের দিক দিয়ে এটা 'আকায়েদে নুছুফী' সমজাতীয় গ্রন্থ। এটা সর্বত্রই কুতুবখানায় পাওয়া যায়। মুহিউদ্দীন, মুহাম্মদ বিন বাহাউদ্দীন, মওলা ইয়িলাস বিন ইব্রাহীম, আছীনুবী মওলা আহমদ বিন বাহাউদ্দীন, মওলা ইলিয়াস বিন ইব্রাহীম আছীনুবী মওলা আহমদ বিন মুহাম্মদিল ওতছাদী, হাকীম ইসহাক, শেখ আকমলুদ্দীন, মুল্লা আলী আলকারী প্রমুখ মহাত্মাগণ 'ফিকাহ-আকবর' কিতাবের ব্যাখ্যা লেখেন। স্থানে স্থানে পাণ্ডলিপি আকারে আরও ব্যাখ্যা দেখতে পাওয়া যায়। হিজরী ৯১৮ সনে হাকীম ইসহাক সাহেবের ব্যাখ্যাকে আবুল বেকার আহমদ কবিতা আকারে প্রকাশ করেন। আর মুল কিতাবকে ইব্রাহীম বিন হিছাম কবিতাকারে লেখেন। এটা 'শরীফী' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

যদিও ফখরুল ইসলাম বজুদী, আবদুল আলী, বাহরুল উলুম এবং ফিকাহ-আকবর গ্রন্থের ব্যাখ্যাকারীগণ ফিকাহ-আকবর, ইমাম সাহেবের লিখিত বলে উল্লেখ করেছেন, তথাপি এটা আমাদের পক্ষে বিশ্বাস করা সুকঠিন যে, উক্ত

কিতাব যে সময়ে লিখিত হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তখন মুদ্রার কার্য প্রচলিত হয়নি। এতে দর্শন-পরিপূর্ণ বহু শব্দ ব্যবহার হয়েছে। অথচ সেই সময় পর্যন্ত ভাষার মধ্যে সেইসব শব্দ স্থান পায়নি। এটা নিঃসন্দেহে যে, আব্বাসী জমানায় ইউনানী ভাষার দর্শনের কিতাবসমূহ অনুবাদ করা হয়েছিল। কিন্তু সেই যুগ ছিল ইমাম সাহেবের শেষ জীবনের যুগ।

মোটকথা কিছুতেই অনুমান করা চলে না যে, তখনই এসব অনুবাদ হয়ে গিয়েছিল। আর এই সব শব্দ এত দ্রুত প্রচারিত হয়েছিল যে, সাধারণ পুঁথি-পুস্তকেও তা ব্যবহৃত হতো। ধর্মীয় কিতাবসমূহে আজকালও দর্শন-শাস্ত্রের বহু শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এরূপে এই সব শব্দের বহুল ব্যবহারের ফলে তা ভাষারই একটা অংশে পরিণত হলো। তখন সাধারণ আলাপ-আলোচনায়ও সেইসব শব্দ ব্যবহার না করে কোন উপায় থাকে না। কিন্তু ইমাম সাহেবের জমানার পরে এইসব চর্চা আরম্ভ হয়।

অনুভূতির ভিত্তিতে এইসব আলাপ-আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু রেওয়ায়েতের ধারানুযায়ী এটা প্রমাণিত হয় না। দ্বিতীয়, তৃতীয় এমনকি চতুর্থ শতাব্দীর কিতাবসমূহেও এদের কোন আভাস পাওয়া যায় না। পূর্বকালের যেসব কিতাবে এর উল্লেখ রয়েছে, তন্মধ্যে ফখরুল ইসলাম বজুদীর কিতাবুল উসূল উল্লেখযোগ্য। এটা পঞ্চম শতাব্দীর লিখিত হয়েছিল।

ইমাম আবু হানীফার হাজার হাজার শাগরেদ ছিলেন। তাঁদের অনেকেই উপযুক্ত শিক্ষক হন। তাঁদের শিক্ষার ফলে অসংখ্য লোক শিক্ষার আলোকে প্রাপ্ত হন। ইমাম সাহেবের লিখিত কোন কিতাব যদি থাকত, তবে এটা কিরূপে সম্ভবপর হতে পারে না যে, এত অসংখ্য ছাত্রের মধ্যে একজনের মধ্যেও এর কোন উল্লেখ শুনা যায়নি! এলমে আকায়েদ এবং এই সম্পর্ক সহায়েফ, শরহে মকামা, শরহে মওয়াকেফ ইত্যাদি বড় বড় কিতাব লিখিত হয়েছে। সেইসব কিতাবেও এর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

সপ্তম অষ্টম শতাব্দীর পরে এই কিতাবের সবকিছু শরাহ লিখিত হয়েছিল। কিতাবে 'রেজালে' এ সম্বন্ধে মুহাদ্দেসীন কঠোর মন্তব্য করছেন। কিন্তু তা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। কাজেই এমন সন্দেহযুক্ত কিতাব যা শুধু আবুমতী' বলখীর রেওয়ায়েত পর্যন্ত সীমাবদ্ধ, তা মুহাদ্দেসদের উসুল অনুযায়ী গ্রহণ করা যেতে পারে না।

আমল ও ঈমান

সাহাবাদের সময় পর্যন্ত ইসলামী আকায়েদ সম্বন্ধে কেউ কোনদিন কোন প্রশ্ন তোলেনি। এ সম্বন্ধে তখন কোন আন্দোলনের নাম-গন্ধও পাওয়া যায়নি। আরববাসী এ সম্বন্ধে কোন গবেষণা বা সূক্ষ্মচিন্তাও করেননি। মধ্যযুগে বনু উম্মায়াদের সামরিক শক্তি যখন দুর্বল হয়ে পড়ে, কৃষ্টি ও জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্র যখন অধিক প্রশস্ত হয়ে পড়ে এবং শতবিধ সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে, তখন ন্যায়পরায়ণতার প্রতি আর তত সূক্ষ্ম দৃষ্টি রাখা হলো না। আরবের বাইরের লোকেরাই এ সম্বন্ধে অধিক অগ্রসর হলো। অথবা যেসব আরববাসীর উপর আজমীর প্রভাব বিস্তার লাভ করেছিল, তারাও এ সম্বন্ধে অগ্রসর হলো না। তখন ইসলামের অধঃপতনের যুগ ছিল।

ধর্মীয় দল সমূহের মধ্যে আরববাসীদের সাথে যাদের অধিক ঘনিষ্ঠতা ছিল তাদের মন পীড়িত হয়ে উঠল। তখন মোহাদ্দেসীন এ ফকীহবৃন্দ বেদাতীদের বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে লেগে গেলেন। সেই অভিযানে বুজর্গদেরকে পর্যন্ত কোন এক পক্ষ অবলম্বন করতে হলো। কিন্তু তাদের বিরোধিতায় মেতে ন্যায়ের সীমা রক্ষা করা অনেকের সম্ভবপর হলো না।

মু'তাজেলা নামে এক দল ছিল। তারা বলতো যে, কোরআন মজীদ খোদাতালার এক নব কালাম। রাসূলুল্লাহ নবুওতের সঙ্গে সঙ্গে এটা ভিত্তি পত্তন হয়।

লোকেরা তাদের বিরোধিতায় এরূপ উঠে পড়ে লেগে গেল যে, কোন মোহাদ্দেস কোরআন শরীফের উচ্চারণকেও 'কদীম' বলে প্রমাণ করলেন।

এ সম্পর্কে ইমাম বোখারীর উস্তাদ বুখারী সাহেবের প্রতি এরূপ অসন্তুষ্ট হলেন যে, তিনি বোখারী সাহেবকে শিক্ষা-মজলিস্ হতে বের করে দিলেন। আর সর্বসাধারণের মধ্যে এমন ঘোষণাও প্রচার করলেন যে, যে সকল লোক ইমাম বোখারীর কাছে যাওয়া আসা করবে, তাঁর দরবারে তাদের প্রবেশ নিষেধ। ইমাম বুখারী স্বয়ং কোরআনকে 'কদীম' বলে মনেপ্রাণে মানতেন। কিন্তু কেরাতকে 'কদীম' বলে মানতেন না। তাঁর উস্তাদ উভয়কেই 'কদীম' বলে মানতেন।

মাসআলা-মাসায়েল সম্বন্ধেও এইরূপ বহু অবিচার চলছিল, এখানে সেই বিস্তৃত বিবরণ দেয়া সম্ভবপর নয়। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা যেখানে যে সত্যটুকু পেতেন তাই গ্রহণ করতেন। আর বাস্তবক্ষেত্রেও এ সম্বন্ধে তাঁর ন্যায়পরায়ণতা তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রয়েছে।

অন্যান্য মাসআলার ন্যায় ঈমান এবং আমল সম্বন্ধেও লোকের মধ্যে ঘোর মতবিরোধ ছিল। মরজিয়াদের মতবাদ এই ছিল যে, ঈমান ও আমল পৃথক বস্তু। আর ঈমান ও সত্যকে যদি পরিপূর্ণ রূপে স্বীকার করা হয়, তবে আমল না করলেও কোন ক্ষতি নেই। কোন ব্যক্তি যদি অন্তরের সাথে তওহীদ ও নবুওতকে স্বীকার করে লয় এবং ফরজসমূহ আদায় না করে, তবে তাকে তজ্জন্য জবাবদিহি হতে হবেন না। এই মতবাদের প্রথমাংশ তো ঠিক, কিন্তু মুহাদ্দেসীন এর কোন তারতম্য করেননি। তাঁরা সবকিছু সম্বন্ধে সেই দলের বিরোধী হয়ে গেলেন।

ঈমান ও আমল দুইটি পৃথক বস্তু

'এই মাসআলাটি অমুকের বা অমুক দলের' ইমাম সাহেবের কাছে এমন কোন প্রশ্ন ছিল না। তিনি সবকিছুতেই প্রকৃত ঘটনা দেখতেন এবং মূল বস্তুর প্রতি দৃষ্টি রাখতেন। ঈমান ও আমলের প্রশ্ন যখন তাঁর সম্মুখে পেশ করা হলো, তখন তিনি প্রকাশ্যভাবে প্রচার করলেন যে, ঈমান ও আমল দুইটি পৃথক পৃথক বস্তু। আর উভয়ের হুকুমও পৃথক পৃথক।

এটা শুনে বহু লোক ইমাম সাহেবকেও মরজিয়া বলত। আর মোহাদ্দেসীন ও ফকীহদের মধ্যে যাঁরা ইমাম সাহেবের সাথে সমভাবাপন্ন ছিলেন, তাঁদেরকেও লোকেরা মরজিয়া বলতো।

মরজিয়া-বিভ্রাট

মোহাদ্দেস ইবনে কুতাইবা কর্তৃক তাঁর বিখ্যাত ও বিশ্বাসযোগ্য 'কিতাবুল মআরেফ' গ্রন্থে যেসব লোককে মরজিয়া বলে লোকসমাজে প্রচার করা হয়েছিল, তন্মধ্যে যেসব মোহাদ্দেস ও ফিকাহ্‌বিদ লোক ছিলেন, নিম্নে তাঁদের কয়েকজনের নাম দেয়া হলো। যথা– ইব্রাহীম তাইমী, তালাকুল হাবীব, হাম্মাদ বিন সুলায়মান, আবদুল আজীজ বিন আবিদাউদ, খারেজা বিন মায়সাব, আবু মবীতুদ্দবীর, এয়াহইয়া বিন জাকরিয়া ও মসআর বিন কেরাম। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই হাদীস ও রেওয়ায়েত ইমাম ছিলেন। সহীহ বোখারী ও মুসলেম শরীফে তাঁদের অসংখ্য রেওয়ায়েত মজুদ রয়েছে। মোহাদ্দেস জাহবী লিখছেন, বহু খ্যাতনামা আলেমকেও অনেকে মরজিয়াভুক্ত করছেন। অথচ তাঁদের উপর বিন্দু পরিমাণ দোষারোপ করবার কারও অধিকার নেই। ইমাম আবু হানীফাকে তাঁরা মরজিয়া ভুক্ত করতে লজ্জাবোধ করেননি।

ইমাম সাহেব সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করছেন যে, আমলকে ঈমানের অংশ বলা চলে না। কেননা আমলকে যদি ঈমানের অংশ বলা হয়, তবে যে ব্যক্তি আমলের পাবন্দি করে না, তাকের মুমিনও বলা চলে না। উদাহরণ স্বরূপ খারেজীদের উল্লেখ করা যেতে পারে। তারা পাপীদেরকে কাফের বলে থাকে। ইমাম রাজী (রাঃ) ইমাম শাফীকে সর্বান্তকরণে সমর্থন করতেন। তিনি তাঁর কিতাবে লিখছেন, লোকেরা ইমাম শাফী সম্বন্ধে অভিযোগ করে যে, তিনি ত্রুটিপূর্ণ কথার সমর্থনকারী। তিনি বলে থাকেন যে, স্বীকার ও আমলের সমন্বয়ের নাম ঈমান। তৎসঙ্গে তিনি এটাও বলে থাকেন যে, আমল না করলে কেউ কাফের হয় না।

অথচ সমষ্টিগত কোন এক বস্তুর কোন একটি অংশ যদি না থাকে; তবে তা আর মিশ্রিতদ্রব্য থাকে না। এজন্য মুতাজিলাগণ বলে থাকে, আমল না থাকলে ঈমানও থাকে না। কিন্তু ইমাম শাফীর পক্ষ হতে এতটুকু বলা চলে যে, স্বীকার এবং বিশ্বাসই আসল ঈমান। আর আমল ঈমানের ফল স্বরূপ এবং এর অনুসরণকারী। কিন্তু যেহেতু অনুসৃত বস্তুর প্রতিও মাঝে মাঝে বাহ্যিকভাবে আসল বস্তুর সম্বন্ধ হয়ে থাকে, এজন্য সেই নিয়ম অনুযায়ী আমলের সাথেও ঈমানের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়ে থাকে। আর এটাও সর্ববাদীসম্মত যে, অনুসরণকারী বস্তু বিনষ্ট হয়ে গেলে, আসল বস্তু বিনষ্ট হয় না।

ইমাম রাজী এটা মীমাংসা করে দিয়েছেন। তিনি বলছেন, হয় আমলকে ঈমানের অনুসরণকারী বলে গণ্য করতে হবে, না হয় এটা মেনে নিতে হবে যে, যে ব্যক্তি আমলের পাবন্দ নয় সে মুমিনও নয়।

এ সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফা সাহেবের একটি লিখিত মীমাংসা মজুদ রয়েছে। এর যুক্তি-তর্ক ও ন্যায়পরায়ণতার প্রতি লক্ষ্য করলেই বুঝা যাবে যে, সময়ের প্রতি তাঁর কিরূপ উদার ও দূরদৃষ্টি ছিল। তাতে মূল সমস্যারও সমাধান হয়ে যাবে। কাজেই এখানে আমি উদ্ধৃত করা বাঞ্ছনীয় মনে করছি।

ওসমান সাহেব সেই জমানার একজন বিখ্যাত মুহাদ্দেস ছিলেন। তিনি ইমাম সাহেবের কাছে একখানা চিঠি লিখছিলেন। ইমাম সাহেব এর যে জবাব দিয়েছিলেন, তাই নিম্নে লিপিবদ্ধ হলো। জনসাধারণের মধ্যে যখন ইমাম সাহেবের ভাবধারা সম্বন্ধে সমালোচনা চলছিল তখন মুহাদ্দেস সাহেব বন্ধুভাবে একটি পত্র দেন। এর মর্ম এই ছিল– "লোকেরা আপনাকে মরজিয়া বলে থাকে। আর প্রচার করে থাকে যে, আপনি মুমিনীনদের পথভ্রান্তিকে জায়েয বলে থাকেন। এ সকল কথা শুনে আমার মনে খুব কষ্ট হয়েছে। এ সকল কথা কি

সত্য?" ইমাম সাহেব সেই চিঠিতে বন্ধুর প্রতি শোকরিয়া আদায় করেছেন। আর এতে বহু উপদেশও রয়েছে। এর সবকিছু এখানে উদ্ধৃত করা যায় না। প্রয়োজন মত কিছু কিছু অংশ নেয়া হয়েছে।

ইমাম সাহেবের পত্র

আপনার অবগতির জন্য আমি লিখেছি যে, রাসূল (সাঃ) দীন-ইসলাম প্রচার করার পূর্বে সকলে অংশীবাদী ছিল। তাঁর নুবুওত প্রাপ্তির পর তিনি লোকদেরকে আহ্বান জানালেন যে, তোমরা এক খোদাকে মানিবে এবং রাসূল (সাঃ) যা নিয়ে এসেছেন, তা শিরোধার্য করে নিবেন।

এমতাবস্থায় যারা দীন-ইসলাম কবুল এবং অংশীবাদীতা পরিত্যাগ করল, তাদের জান-মাল মুসলমানের জন্য হারাম হয়ে গেল। অতঃপর যারা ঈমান আনল শুধু তাদের ঘাড়ের উপর কতগুলো কর্তব্য চেপে বসল। কাজেই সেই কর্তব্য পালন একটি কাজে পরিণত হলো। খোদাও সেই ইশারা দিয়ে বলছেন, 'যারা ঈমান আনছে এবং সৎকাজ করছে এবং যে ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে।' এ জাতীয় আরও বহু আয়াত রয়েছে, যা দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে, কোন ব্যক্তি আমল না করলে তার ঈমান যাবে না। অবশ্য স্বীকৃতি ও বিশ্বাস যদি না থাকে, তবে মুমিন বলে পরিগণিত হবে না। আমল ও ঈমান এক নয়। কাজেই স্বীকৃতির দিক দিয়ে বিবেচনা করতে গেলে, মুসলমান বরাবর। কিন্তু আমলের তারতম্যে মর্যাদার পার্থক্য ঘটে থাকে। দীন ও ধর্ম সকলেরই এক।

আল্লাহ স্বয়ং বলেন– "তোমাদের জন্য এই ধর্মকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছি; নূহকেও এর জন্য অছিয়ত করেছিলেন এবং যা তোমার কাছে অহিরূপে প্রেরণ করছি এবং যা দ্বারা ইব্রাহীম ও মূসা এবং ঈসাকেও অছিয়ত করেছি, এটা এই যে, "ধর্মকে কায়েম রাখবে এবং এ সম্বন্ধে বিভিন্ন পথ অবলম্বন করবে না।"

আপনি জেনে রাখবেন যে, স্বীকৃতিও হেদায়েতের একটি অংশ এবং আমলও হেদায়েতের একটি অংশ। অথচ এর প্রত্যেকটিই পৃথক। এমন এক ব্যক্তি যে ফরায়েজ সম্বন্ধে অনবগত তাকে মুমিন বলা যায়। ফরায়েজের দিক দিয়ে লোকটি মুর্খ এবং স্বীকৃতির দিক দিয়ে মুমিন। কোরান পাকে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা সতর্ক করে বলছেন, "তুমি কি সেই ব্যক্তিকে যে আল্লাহ্ ও রাসূলের পরিচয় লাভ সম্বন্ধে পথভ্রষ্ট তাকে সেই লোকের বরাবর ভাবছেন, যে মুমিন কিন্তু আমল সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল নয়?" এই কর্তব্য পালনে বর্ণনা সম্পর্কে খোদা বলছেন–খোদা

এজন্য বর্ণনা করছেন যেন তোমরা পথভ্রান্ত না হও।" অপর আয়াতে বলা হয়েছে, "একে ভুলে গেলে অপরে স্মরণ করিয়ে দিবে।" হযরত মুসা (আঃ) এর জবানে উচ্চারিত হয়েছিল– 'অনন্তর আমি যখন তা করেছিলাম, তখন আমি পথভ্রান্ত ছিলাম।' এই দাবী সুপ্রমাণিত করার নিমিত্ত অকাট্য দলীলস্বরূপ এই সকল আয়াত ব্যতীত আরও বহু আয়াত রয়েছে। এ সম্বন্ধে অধিক স্পষ্ট ও দেদীপ্যমান হাদীসাবলীরও অভাব নেই।

হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ) কে আমীরুল মুমিনীন উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। এই জন্য এর অর্থ কি এই হতে পারে যে, তাঁরা শুধু ঐ সকল লোকের আমীর যারা ফরজ কর্তব্যাবলী ও আমল পালন করে থাকেন? শাম দেশের যে সকল অধিবাসী হযরত আলীর সাথে লড়াই করেছিল, তিনি তাদেরকেও মুমিন বলছেন। খুনের চেয়ে অধিক পাপ আর কি হতে পারে?

কেবলাওয়ালা সব মুমিন। আর ফরজ তরককারীরা কাফের হয়ে যায় না। যে ব্যক্তি ঈমানের অন্তর্গত সকল ফরজ আদায় করে, সেই ব্যক্তি মুমিন এবং বেহেশতি। আর যে ব্যক্তি ঈমান ও শরীয়তের বিধান উভয়কে তরক করে, সেই ব্যক্তি কাফের এবং দোজখী। আর যার ঈমান রয়েছে অথচ তার ফরজ তরক হয়ে যায়, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই মুসলমান; কিন্তু পাপী মুসলমান। তাকে শাস্তি দেয়া বা ক্ষমা করা খোদার ইচ্ছাধীন।

ইমাম সাহেব এ সম্পর্কে যেরূপ সুচারুরূপে মীমাংসা করছেন এর চেয়ে অধিক মীমাংসা আর কিছুই হতে পারে না। তিনি ফরজ-কর্তব্য পারল এবং ঈমানের পার্থক্য দেখায়ে দিয়েছেন। এর চেয়ে উত্তর আর কি প্রমাণ হতে পারে যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে ঈমানের দাওয়াত দেয়া হয়েছিল! তখন ফরজ কর্তব্যাবলীর অস্তিত্ব ছিল না। ইমাম সাহেব এ সম্পর্কে যে সকল আয়াত পেশ করছেন, তাদ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে, এরা পৃথক বস্তু।

এই সকল অকাট্য দলীলের পাশাপাশি কতিপয় আয়াত ও হাদীস রয়েছে। কিন্তু সেই সকল দাবী সমর্থন করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। হাদীস শরীফে আছে যে মুমিন, মুমিন থেকে ব্যভিচার ও চুরি করতে পারে না। আমরা সাধারণভাবে বলে থাকে যে, ভাল লোকে এরূপ কাজ করতে পারে না। এর উদ্দেশ্য এই হয় যে, এটা ভদ্রতার খেলাপ। এটা নিঃসন্দেহ যে, ব্যভিচার ও চুরি ঈমানের মর্যাদার উপযুক্ত নয় এবং হাদীসের মর্মও তাই। হযরত আবুজর বর্ণিত সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি বলবে সে বেহেশতী হবে, যদিও সে ব্যভিচারী ও চোর হয়ে থাকে।

ঈমান কম-বেশী হওয়া

দ্বিতীয় মাসআলা এই যে, অর্থাৎ ঈমান কম-বেশী হয় না। এটাই ইমাম সাহেবের মত। অনেকে এর অর্থ ভুল বুঝে থাকে। আর এ সম্বন্ধে বহুকিছু বলবার রয়েছে।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যখন খোদাকে বললেন, "হে খোদা তুমি মৃতকে কিরূপে জীবিত করে থাক?" তখন খোদা বললেন, "তা কি এখন পর্যন্ত তোমার বিশ্বাসে আসে নাই?" তিনি বললেন, "নিশ্চয়ই এটা আমার বিশ্বাস হয়েছে, কিন্তু 'আমার হৃদয়কে অধিক আশ্বস্ত করার জন্য।' খোদা কয়েকটি আয়াতে এটা সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, ঈমানের উন্নতি সাধন হয়ে থাকে; শব্দ দ্বারা তা প্রমাণিত হয়েছে। যে ব্যক্তি আমলের পাবন্দি করে, সে অধিক মুমিন। যে পাপী সে কম মুমিন। মুহাদ্দেসীন তাঁদের এই মতের সমর্থনে আরও দলীল পেশ করছেন। আল্লামা কসতলানী সহীহ বুখারীর শরাহ লিখতে যেয়ে লিখছেন–অর্থাৎ সাওয়াবের কাজ করলে ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং পাপ করলে হ্রাস পায়। মুহাদ্দেসীন বহুস্থানে এর বিস্তৃত ব্যাখ্যা দান করছেন।

এই দিক দিয়ে দেখতে গেলে বুঝা যায় যেন ইমাম আবু হানীফা ঈমানের বৃদ্ধি হ্রাসকে স্বীকার করছেন না। তাঁর ধারণা এই যে, আমল যখন ঈমানের অংশ নয়, কাজেই এর হ্রাস-বৃদ্ধিতে ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। এই কথাকে ঠেলা যায় না।

হাদীসে এসেছে, "তোমাদের উপর যে আবু বকরের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে, তা নামায-রোযার আধিক্যে নয়, বরং তাঁর অন্তরে যাকিছু রয়েছে, তাই তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের কারণ।"

ঈমানের দিক দিয়ে সকলই সমান

মূল ঈমানে কোন পার্থক্য নেই, এই কথায় ইমাম সাহেব দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। অর্থাৎ বিশ্বাসের দিক দিয়ে সকলই মুসলমান। ইমাম সাহেবের এই যুক্তির কোন সনদ নেই। সনদ না থাকলেও কোন ক্ষতি নেই। কেউ কেউ বলছেন, 'আমাদের ও সাহাবাদের ঈমান বরাবর।' এর অর্থ এই যে, বহু ব্যাপারে আমরা এবং সাহাবাদের বরাবর। তথাপি আমাদের ও সাহাবাদের মধ্যে এ সম্বন্ধে আসমান জমীন পার্থক্য রয়েছে।

এই জাতীয় সমগ্র মাসআলা সমূহে ইমাম সাহেবের বিশেষ রায় রয়েছে।

কিন্তু সেই বিভিন্ন মতবাদের দরুণ তিনি কারও বিরুদ্ধে কুফর ও ফুসুকের অভিযোগ করেননি। এ উদারতা ইমাম সাহেবের একটি বৈশিষ্ট্য। ইসলামের স্বর্ণযুগের পরে এরূপ উদারতা অতি বিরল। এই উদারতার বিপরীত মত-বিরোধের ন্যায় অপর কোন কিছুই ইসলামের এত মারাত্মক ক্ষতি করেনি।

অবশ্য এটা সত্য কথা যে, সাহাবাদের জমানাতেই এটা শুরু হয়েছিল। আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) এবং অন্যান্য বহু সাহাবার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, রাসূল (সাঃ) মে'রাজে খোদাকে স্বচক্ষে দেখেছিলেন। কিন্তু হযরত আয়েশা (রাঃ) খুব জোরে-সোরে এর প্রতিবাদ করেন। হযরতের স্বশরীরে মে'রাজ ভ্রমণ সম্বন্ধে আমীর মাবীয়ার ঘোর সন্দেহ ছিল। এসব সত্ত্বেও তাঁদের মধ্যে কোন মারাত্মক অমিল দেখা যায়নি। তাঁদের মধ্যে কোন কোন দিক দিয়ে অমিল থাকলেও অপরাপর শত দিক দিয়ে তাঁদের মধ্যে মিলও ছিল গভীর।

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন ওমরের কাছে কোন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন যে, এমন কতক লোকও জন্মিয়াছে যে, যারা ভুল মতবাদ প্রচার করে থাকে এবং আমাদেরকে কাফের বলে সাব্যস্ত করে, তারা নিজেরা কাফের কিনা? হযরত আবদুল্লাহ্ বললেন যে, 'খোদা দুইজন' এটা না বলা পর্যন্ত কেউ কাফের হতে পারে না। সাহাবাদের পরে এই মতবিরোধ খুব জোরেশোরে চলতে থাকে। এরূপে কালক্রমে বহু দল উপদলের সৃষ্টি হয়।

আকীদা সম্পর্কীয় এবং ফেকাহ সংক্রান্ত এমন মাসায়েলও পেশ হতো যার সম্বন্ধে কোন অকাট্য দলীল মিলিত না। এ সমস্তের মীমাংসার জন্য এজতেহাদের বিপুল প্রয়োজন পড়ত। এজন্য হাজার লোকের হাজার মত দেখা দিত। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তাদের সমস্ত মতামত সহী নয়। কিন্তু এটাও বলা চলে না যে, এর সব কিছু কুফর।

ধর্মীয় জোশ এবং স্বীয় মতের পৃষ্ঠপোষকতায় অন্ধ ও দিশাহারা হয়ে লোকেরা তখন একে অপরের মতবিরোধকে বিন্দু পরিমাণও সহ্য করে উঠতে পারত না। অত্যন্ত অসহিষ্ণুভাবে একে অপরের বিরোধিতা করত। কথায় কথায় কুফরের ফতোয়ার তুফান বইত। ধর্ম-সম্বন্ধে যিনি যত বেশী গোঁড়া ছিলেন কুফর-ফতোয়া প্রদানে তিনি তত বেশি অসাবধান থাকতেন। এরূপে একে অপরের পথভ্রান্তি ও গোমরাহী প্রমাণ করার জন্য হাদীসের দুর্বল রেওয়ায়েতের সাহায্য নিতে লাগলেন। কাজেই এত সংখ্যক দল-উপদল গড়ে উঠল যে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাদের সেই ৭২ দলের মধ্যে মাত্র একদল সুপথগামী ছিল। আর

অবশিষ্ট সকল দল পথভ্রষ্ট ছিল। সেই বিভিন্ন দলের বিভিন্ন নামকরণ করা হয়েছিল। এতেও পরিতুষ্ট হতে না পেরে প্রত্যেক দল নিজেদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন রেওয়ায়েতের আশ্রয় গ্রহণ করতে লাগলেন। এরূপ বিরাট মুসলিম জাহান খণ্ড বিখণ্ড হয়ে পড়ল। আর বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন মজহাব, চরিত্র, সভ্যতা ও জীবিকা নির্বাহের উপায়সমূহ অবলম্বিত হলো। ইসলাম জগতে সেই দুর্দিনে ইমাম আবু হানীফার সুর সম্পূর্ণ অন্য ধরনের ছিল। তিনি তখন জোরেসোরে প্রচার করে বেড়াতেন যে, কেবলাওয়ালাদের কাউকেও কাফের বিবেচনা করা অনুচিত। প্রথমতঃ অতি অল্প লোকেই তাঁর সেই ঘোষণাবাণীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে লোকেরা তৎপ্রতি আকৃষ্ট হতে আরম্ভ করল। এরূপে তাঁর ঘোষণাবাণী একদিন সুফলপ্রসূ হয়ে উঠল।

কেবলাওয়ালাগণ সব মুমিন

বহুচিন্তা-ভাবনা, গবেষণা, তাহকীক ও পরীক্ষার পর তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন। আর বিভিন্ন মজহাবের মূল আন্দোলনকারীবৃন্দ তাঁর জমানাতেই জন্মগ্রহণ করেন। ইমাম সাহেবও তাদের সাথে মিলবার মিশবার সুযোগ পেয়েছিলেন। খারেজীদের নেতা বসরার অধিবাসী ছিল। এটা ইমাম সাহেবের শহর হতে খুব বেশী দূরে ছিল না। বসরায় আরও বহু মজহাব-নেতা জন্মগ্রহণ করেন। ইমাম সাহেব তন্মধ্যে অনেকের সাথেও মিলামিশা করেন। আর তাঁদের জল্পনা-কল্পনা ও ভাবধারার সাথে তিনি সুপরিচিত ছিলেন। সেই বিভিন্ন দলের বিভিন্ন কথা প্রসিদ্ধ ছিল।

তন্মধ্যে কতক লোক আগাগোড়াই সত্যের সাথে সংশ্রবহীন ছিল। অনেকগুলো বিকৃত ভাব-ধারার সন্তুষ্টি মাত্র ছিল। আর কতকগুলো প্রকৃতপক্ষেই বৃথা ও বাজে ছিল। কিন্তু তা কুফরের সীমা পর্যন্ত পৌছেনি। কাজেই ইমাম আবু হানীফা সাহেব এই সাধারণ আদেশ প্রচার করলেন যে, আহলে কেবলা ওয়ালারা মুমিন।

তিনি দেখতে পেলেন যে, যে সকল মাসআলার উপর ভিত্তি করে 'কেয়াছ' গড়ে উঠছিল এবং যা কুফর ও ইসলামের মধ্যে ভেদরেখা টেনেছিল, তাতে অসংখ্য শব্দ বিভ্রাটে ও প্রকাশ-ধারা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। কোরআন কদীম হওয়া না হওয়া তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা ছিল। একে প্রায় তওহীদের সমপর্যায়েভুক্ত করা হয়েছিল।

বহু নামজাদা আলেমের অভিমত এই যে, দুইজন মহাত্মা ইসলামকে বড় সঙ্কট মুহূর্তে রক্ষা করছেন।

রাসূল (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর আরব-বুকের (রাঃ) উপর ধর্মভ্রষ্টেরা যখন মাথাচাড়া দিয়ে উঠল, তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) তাদেরকে দমন করে ইসলামের গৌরব রক্ষা করলেন। মামুনুর রশীদের জমানায় লোকেরা কোরআনের মৌলিকতা সম্বন্ধে যখন সংশয়-বাতিকগ্রস্ত হয়ে পড়ল তখন ইমাম আহমদ বিন হাম্বল দীন-ইসলামকে বিপদাপন্ন অবস্থা হতে উদ্ধার করেন। এই দিক দিয়ে তাঁরা ইমাম হাম্বলের উপর অধিক গুরুত্ব দান করছেন যে, হযরত আবু বকরের (রাঃ) সেই কার্যে মুহাজির ও আনসারবৃন্দ তাঁর সাহায্যকারী ছিলেন। কিন্তু ইমাম সাহেব কাউকেও সাহায্যকারী-রূপে পাননি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ
হাদীস ও উসুলে হাদীস

'এলমে হাদীস ইমাম আবু হানীফা তত পরিপক্ক লোক ছিলেন না' এরূপ ধারণা যদিও ভুল ছিল এবং তা অবশ্যই সুস্পষ্ট ভ্রান্ত-ধারণা, তথাপি তা অস্বীকার করার কোন প্রয়োজন নেই যে, তিনি সাধারণভাবে মুহাদ্দেস উপাধিতে মশহুর ছিলেন না।

বুজর্গানে দীনের মধ্যে এরূপ শত সহস্র লোক অতীত হয়েছেন, যাঁরা এজতেহাদ ও রেওয়ায়েত উভয় ব্যাপারেই চরম কৃতিত্ব দেখায়েছেন। কিন্তু তন্মধ্যে যিনি যে বিষয়ে অধিক কৃতিত্ব দেখায়েছেন, তাতেই তিনি অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করছেন।

ইমাম আবু হানীফা হাদীসের কোন কিতাব লিখে যাননি। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ীও জগতে মুহাদ্দেস রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেননি। 'সেহা-সিত্তাহ' যেরূপ সর্বজনগ্রাহ্য হয়েছিল, তাঁদের কারও গ্রন্থ তদ্রূপ স্বীকৃতি লাভ করেননি। এলমে হাদীসের দিক দিয়ে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল তাঁদের তুলনায় অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে। এত অধিক পরিমাণে সহীহ হাদীস সংগ্রহে তাঁর সমকক্ষ আর কেউই ছিলেন না। তিনি হাদীস ও রেওয়ায়েতে যেরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন, সংগ্রহ ও এজতেহাদে তত প্রসিদ্ধি লাভ করতে পারেননি। আল্লামা তিবারী মুহাদ্দেস ও মুজতাহেদ ছিলেন। তথাপি তিনি মুজতাহেদরূপে পরিগণিত হননি।

ইমাম রাজী লিখেছেন, ইমাম শাফেয়ীর পরে কোন মৌলিক মুজতাহেদ জন্মগ্রহণ করেননি। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল সম্বন্ধে অধিকাংশ আলেমের দৃঢ়বিশ্বাস যে, এজতেহাদ সম্বন্ধে তিনিও পরিপক্ক লোক ছিলেন। তথাপি তিনি মুজতাহেদরূপে জনপ্রিয়তা লাভ করেনি।

মুজতাহেদ ও মুহাদ্দেসে পার্থক্য

বাস্তব সত্য এই যে, মুজতাহেদ ও মুহাদ্দেস উভয়েই ওয়াজ, কাহিনী ও ফজায়েল ইত্যাদি বর্ণনার ব্যাপারে প্রায় এক রকম কর্তব্যই পালন করে থাকেন। তবে বিশেষ পার্থক্য এই যে, মুজতাহেদগণ শুধু সেই সকল হাদীসের প্রতিই অধিক গুরুত্ব প্রদান করে থাকেন, যা থেকে শরীয়তের হুকুম পাওয়া সম্ভবপর। এজন্যই প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায় যে, মুহাদ্দেসীনদের তুলনায় মুজতাহেদগণ কম রেওয়ায়েত বর্ণনা করে থাকেন।

'মোয়াত্ত্বা' কিতাবে ইমাম মালেকের সমূদয় রেওয়ায়োত লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তাতে মাত্র এক হাজার হাদীস স্থান লাভ করেছে। তন্মধ্যে সাহাবা ও তাবেয়ীনদের বহু বাণী স্থান লাভ করেছে।

ইমাম আহমদ (রাঃ)–এর সম্মুখে ইমাম শাফেয়ী স্বীকার করতেন, হাদীস সম্বন্ধে আপনি আমার চেয়ে অধিক ওয়াকিফহাল।

তিরমিজীর শেখ কাজী এয়াহ্য়া বিন আকছাম প্রায়ই আক্ষেপের সাথে বলতেন যে, ইমাম শাফেয়ী যদি হাদীসের প্রতি পরিপূর্ণরূপে মনোযোগ দান করতেন, তবে তিনি আমাদেরকে এই ব্যাপারে অভাবশূন্য করে দিতে পারতেন।

খুলাফায়ে রাশেদীনের অল্প হাদীস-বর্ণনা

ইমাম আবু হানীফা (রাঃ)–এর ওয়াকিফহাল অবস্থা ও সূক্ষ্মদর্শিতা অস্বীকার করা, অদূরদর্শিতা ও সুক্ষ্মদৃষ্টির অভাবের পরিচায়ক। যদিও ইমাম সাহেব অতি কম কিতাব লিখছেন এবং রেওয়ায়েতও কম করছেন, এতে এটা প্রমাণিত হয় না যে, তিনি অদূরদর্শী ছিলেন।

রাসূল (সাঃ)–এর সাথে মিলবার মিশবার সুযোগ আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)–এর চেয়ে অপর কারও অধিক ছিল না। তিনি হুজুরের বক্তব্য [বাণী] এবং কার্যকলাপের সাথে যেরূপ সুপরিচিত ছিলেন, তদ্রূপ সৌভাগ্য আর কারও ভাগ্যে ঘটেনি। কিন্তু সকল হাদীসের কিতাবে তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা সত্তরের চেয়ে

অধিক নয়। তাতে কি কেউ বলতে চান যে, তিনি মাত্র সেই কয়েকটি হাদীসেই অবগত ছিলেন?

হযরত আবু বকরের (রাঃ) পরই হযরত ওমর ফারুকের স্থান। তিনিও মাত্র পঞ্চাশটি হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন। হযরত ওসমান (রাঃ) এবং হযরত আলীর (রাঃ) অবস্থাও তদ্রূপ। অথচ হযরত আবু হুরাইরাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করছেন ৫৩৪৬টি হাদীস। হযরত আনস (রাঃ) বর্ণনা করছেন ২২৮৬টি হাদীস। হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করছেন ২২৪০টি হাদীস। হযরত জাবের (রাঃ) হতে ২৫৪০টি হাদীস এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) যিনি নবীর জমানায় যুবক ছিলেন তিনি বর্ণনা করছেন ২৬৩টি হাদীস।

ইমাম শাফেয়ীর সাথে ইমাম বোখারী ও মুসলেমের সম্বন্ধ

এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, ছেহাছিত্তার সঙ্কলনকারীবৃন্দ ইমাম সাহেবের কাছ হতে কোন হাদীস বর্ণনা করেননি। অপরাপর ইমাম সম্বন্ধে সেই একই কথা খাটে। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ইসহাক বিন য়াহওয়ান এবং আবু হাতেম প্রমুখ বিখ্যাত মুহাদ্দেসীন হাদীস রেওয়ায়েত সম্বন্ধে ইমাম শাফেয়ীকে তসলিম করছেন। কিন্তু ইমাম বোখারী ও মুসলেম তাঁর সনদ দিয়ে কোন রেওয়ায়েত করেননি। ইমাম রাজী, ইমাম বোখারী ও মুসলেমের উক্ত কার্যের নিন্দা করছেন। কিন্তু এ সম্পর্কে তাঁর যুক্তির অবতারণা করেননি। তিরমিজী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাতেও ইমাম শাফেয়ী বর্ণিত অতি কম হাদীসই পরিলক্ষিত হয়।

মাহাদ্দেসীনদের মধ্যে দুইটি দল

হাদীস শিক্ষা করা ও শিক্ষা প্রদানে যে সকল লোক নিযুক্ত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে দুইটি দল রয়েছে। হাদীস ও রেওয়ায়েত সঙ্কলনে যাঁরা ব্যস্ত ছিলেন। তাঁরা শুধু রেওয়ায়েত কিভাবে পাওয়া গেল তাই লক্ষ্য করতেন। তন্মধ্যে কোন্‌টি নাছেখ কোন্‌টি মনসূখ সেই খেয়ালও তাঁরা করতেন না।

অপর দলটি হাদীস হতে কি কি আদেশ ও মাসআলা বের করা যায় তৎপ্রতি সবিশেষ লক্ষ্য রাখতেন। কোন অকাট্য দলীল পাওয়া না গেলে কেয়াস দ্বারা এর মীমাংসা করা হতো।

প্রথম দলটি আহলে রেওয়ায়েত বা আহলে হাদীস এবং দ্বিতীয় দলটি

মুজতাহেদ বা আহলুর রায় নামে পরিচিত ছিলেন। ইমাম মালেক, সূফীয়ান সওরী ও আওজায়ী আহলুর রায় নামে পরিচিত হওয়ার কারণ এই ছিল যে, তাঁরা মুহাদ্দেস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুজতাহেদ ও মুজহাবের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। কিন্তু যেহেতু হাদীস পরীক্ষা ও এজতেহাদের ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিত, তজ্জন্যে তাঁদের একদল আহলুর রায় এবং অপর দলকে আহলে হাদীস বলা হতো। এজন্য ইমাম মালেকের সাথে তুলনায় ইমাম আবু হানীফা মুজতাহেদ ও আহলে রায় উপাধিতে অধিক পরিচিত হতেন। একদিন নজর বিন এয়াহইয়া ইমাম আহমদ হাম্বলকে (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইমাম আবু হানীফা সম্বন্ধে আপনাদের কি অভিযোগ রয়েছে।' তিনি বললেন, 'রায় সম্বন্ধে তাঁর সাথে আমাদের মতবিরোধ রয়েছে।'

নজর বললেন, 'ইমাম মালেক কি রায় অনুযায়ী আমল করেন না'? ইমাম আহমদ হাম্বল বললেন, 'হ্যাঁ, কিন্তু ইমাম আবু হানীফা রায়ের উপর অধিক উভয়কেই সমান অভিযোগকারীরূপে আখ্যা দেয়া যায়। আহমদ বিন হাম্বল-এর কোন সদুত্তর দিতে পারলেন না। বরং তিনি চুপ করে রইলেন।

আহলে রায় উপাধি

ইমাম সাহেবের পূর্বে ফিকাহ কোন নির্দিষ্ট এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল না। এমন হাজার হাজার মাসআলা উপস্থাপিত হতো যে, সে সম্বন্ধে কোন হাদীস দূরের কথা বরং সাহাবাদের কোন বাণী পর্যন্ত ছিল না। কাজেই কেয়াস দ্বারা এদের মীমাংসা করতে হতো।

পূর্বেও কেয়াস দ্বারা এ সকল মীমাংসা করা হতো। স্বয়ং সাহাবাগণও কেয়াস করতেন। আর সেই অনুযায়ীই ফতোয়া দিতেন। এর বিস্তৃত বিবরণ সম্মুখে পাওয়া যাবে।

সেই সময়েও ইসলামী সভ্যতা তত বিস্তৃতি লাভ করেনি। এজন্য কেয়াসের অপরিহার্য প্রয়োজন হয়, এমন ঘটনা খুব বেশি ঘটত না। ইমাম সাহেব ফিকাহকে একটি বিষয়বস্তু রূপে পরিগণিত করতে চেয়েছিলেন। কেয়াসের সাহায্যে যত বেশি নেওয়া হতে লাগল, সেই পরিমাণে উসূল ও আইন-কানুনের প্রয়োজনও তত প্রকট হয়ে উঠল। এ সকল কারণেই ইমাম সাহেব রায় ও কেয়াসের জন্য সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করলেন।

ইমাম সাহেবের প্রসিদ্ধি লাভ করার অপর একটি কারণ এই ছিল যে,

সাধারণ মুহাদ্দেসীন, হাদীস ও রেওয়ায়েতের ব্যাপারে (অনুভূতির) এর প্রতি কোন গুরুত্ব আরোপ করতেন না। ইমাম সাহেব প্রথমে এর ভিত্তি স্থাপন করেন। এর সাহায্যস্বরূপ বহু উসূল ও কাওয়ায়েদের কিতাব লিখা হলো এবং উসূলের মাপকাঠি অনুযায়ী না হওয়ায়ে তিনি বহু হাদীস বাদ দেন।

এই সকল আনুষঙ্গিক তর্ক-বিতর্কের পরে এখন আমরা আসল মাসআলার প্রতি ফিরে আসছি। ইমাম আবু হানীফা সাহেব-শাস্ত্রে কতখানি ব্যুৎপত্তি হাসিল করছেন, এ সম্পর্কে উপসংহারে পৌছতে হলে, তাঁর এলমি জীবনের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টিপাত করতে হবে। এ সম্বন্ধে বহু সহী ও নির্ভরযোগ্য কিতাব রয়েছে। যে সকল কিতাবে ইমাম সাহেবের হাদীস সঙ্কলন সম্বন্ধে বহু বিবরণ পাওয়া যায়। তিনি বিশ বছর বয়স হতে এলমে হাদীসের প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত এতেই নিমগ্ন ছিলেন। তিনি কূফার বিখ্যাত হাদীস-বিশারদ হতে হাদীস শিক্ষা করেন। তিনি মক্কা-মদীনার হাদীস মজলিসেও যোগদান করতেন। মদীনার শেখগণ তাঁকে সনদ দান করেন।

আতা বিন আবী রব্বাহ, নাফে ইবনে ওমর, মুহারিব বিন ওসার, আয়মশ কূফি, ইমাম বাকের আলকমা বিন মুর্শিদ, মকহুল শামী, ইমাম জরায়ী, মুহাম্মদ বিন মুছালেমুজ্জহুরী, আবু ইসহাক, সুলাইমান বিন ইয়াসার, আবদুর রহমান বিন হুমুজুল আয়য়াজ, মনসূরুল মুতা'মির, হিশার বিন আরওয়া প্রমুখ হাদীস বিশারদবৃন্দ তাঁর উস্তাদ ছিলেন। তাঁরা প্রত্যেকেই রেওয়ায়েত শাস্ত্রের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। তাঁদের রেওয়ায়েত হতেই বোখারী ও মুসলেম শরীফ সঙ্কলিত হয়েছে। হাদীস-শাস্ত্রে তাঁরা অত্যন্ত জবরদস্ত ব্যক্তি ছিলেন।

শুধু তাঁর উস্তাদগণ নন। তাঁর সাগরেদগণও কম জবরদস্ত ব্যক্তি ছিলেন না। নিম্নে তাঁদের নাম দেয়া গেল ঃ

(১) জরাহা ও তা'দীল শাস্ত্রের ইমাম ইযাহ বিন এয়াহয়া বিন সাইদুল কুত্তান।

(২) আবদুল রজ্জাক বিন হাম্মাম। জামেয়ে কবীর তাঁর একটি বিখ্যাত কিতাব। ইমাম বোখারী উক্ত কিতাব হতে বহু ফায়দা লাভ করেন।

(৩) ইয়াজীদ বিন হারুণ। তিনি আহমদ বিন হাম্বল সাহেবের উস্তাদ ছিলেন।

(৪) ওয়াকী বিনেল জাযাহ। তাঁর সম্বন্ধে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল বলছেন, রেওয়ায়েতের সনদের হাফেজ সম্বন্ধে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল বলছেন, রেওয়ায়েতের সনদের হাফেজ সম্বন্ধে অপর কেউই তাঁর সমকক্ষ ছিলেন না।

(৫) আবদুল্লাহ বিন মোবারক। হাদীসশাস্ত্রে তিনি আমিরুল মুমিনীনরূপে পরিগৃহীত হয়েছেন।

(৬) এয়াহায়া বিন জাকারিয়া বিন আবী জায়েদা। ইমাম বোখারীর উস্তাদ তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী বলে আখ্যাদান করছিলেন।

এ সকল বুজর্গ ব্যক্তি শুধু নামমাত্র ইমাম সাহেবের শাগরেদ ছিলেন না। বরং তাঁরা বহুবছর পর্যন্ত তাঁর সাহচর্যে থেকে এলম ও ফয়েজ লাভ করেন।

আবদুল্লাহ বিন মুবারক বলতেন, খোদা যদি আমাকে ইমাম আবু হানীফা ও সূফীয়ান সওরী কর্তৃক সাহায্য প্রদানের সুবন্দোবস্ত না করতেন, তবে আমি একজন অতি সাধারণ লোকই থেকে যেতাম।

ওকী' ও এয়াহয়া বিন আবী জায়েদা এত দীর্ঘকাল ইমাম সাহেবের খেদমতে ছিলেন যে, লোকেরা তাঁদেরকে ইমাম পরিবারের লোক বলেই জানত। তাঁরা যার তার কাছে মাথা নত করার লোক ছিলেন না।

এজতেহাদের শর্ত ও মুজতাহেদরূপে ইমাম আবু হানীফা

ইমাম সাহেবের মৃত্যুর পর আজ বার শত বছর অতীতের গর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ মুজতাহেদ হিসেবে তাঁর সম্বন্ধে অবজ্ঞা ভরে একটি কথাও বলেনি।

আল্লামা নূদী প্রমুখ জ্ঞানীবৃন্দ এজতেহাদ সম্বন্ধে বলছেন, কোরআন হাদীস, সালফে-সালেহীনের বুদ্ধিমত্তা, লুগাত ও কেয়াস সম্বন্ধে অর্থাৎ শরীয়তের মাসআলা সম্বন্ধে কোরআনে যা কিছু আয়াত রয়েছে, এ সম্বন্ধে রাসূল (রাঃ) হতে যাকিছু বিধি বিধান রয়েছে, প্রায় সবগুলো যার জানা থাকে, এবং কারও মধ্যে এ সকলের কোন কিছুতেই যদি কিছু অপূর্ণতা থেকে থাকে, তবে তাকে, মুজতাহেদ বলা চলে না তার পক্ষে অপরের তকলীদ (অনুসরণ) করা চাই।

এ সম্বন্ধে আল্লামা ইবনে খলদুন হাদীসের জ্ঞান সম্পর্কে মুজতাহেদীনের প্রসংগক্রমে লিখেছেন–কোন কোন অবিবেকে ব্যক্তি বলে থাকে যে, হাদীস-শাস্ত্রে মুজতাহেদীন তত সুপরিপক্ক নন। এজন্যই তাঁরা কম রেওয়ায়েত করেন।

এ সকল ভ্রান্ত ধারণা ব্যতীত আর কিছুই নয়। মহান ইমামদের সম্বন্ধে এরূপ ধারণা পোষণ করা চলে না। হাদীস-শাস্ত্রে ইমাম আবু হানীফার অতি উচ্চ পর্যায়ের মুজতাহেদ হওয়ার প্রমাণ এই যে, মুহাদ্দেস সম্প্রদায় তাঁকে গভীর শ্রদ্ধার চোখে দেখে থাকেন।

ইমাম আবু হানীফা সম্বন্ধে মুহাদ্দেস জাহবী

অধিকাংশ মুহাদ্দেসই ইমাম আজমকে মহা শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। আল্লামা জহবী মুহাদ্দেসীনের মধ্যে মহামান্যব্যক্তি ছিলেন। হাদীস সংরক্ষণ সম্বন্ধে তিনি একটি নির্দিষ্ট কিতাব লিখে যান। তিনি ইমাম আবু হানিফা সম্বন্ধে তাতে ভুরি ভুরি প্রশংসা করছেন।

কাজী আবু ইউসূফ সাহেবকে হযরত এয়াহইয়া সাহেব 'হাদীস-বন্ধু' বলে আখ্যা দান করছেন। তিনি বলেন, আমার ইমাম আবু হানীফা সাহেবের সাথে মাসায়েল সম্বন্ধে তর্ক করতাম। তিনি যখন রায় প্রকাশ করতেন, তখন আমি সেই মজলিস হতে বের হয়ে কূফা-নগরের মুহাদ্দেসীনদের কাছে যেতাম। আমি তাঁদের কাছেও বহু হাদীস জিজ্ঞেস করতাম। তারপর আমি আবার ইমাম সাহেবের খেদমতে ফিরে আসতাম। ইমাম সাহেব তন্মধ্যে কতগুলো হাদীস সম্বন্ধে তাঁদের সাথে একমত হতেন। আর অপরগুলো ভুল বলে মত প্রকাশ করতেন। আমি বলতাম, আপনি কিরূপে এ সকল ভুল বুঝতে পারলেন? তিনি বলতেন, কূফায় যা কিছু এলম রয়েছে, তা আদৌ আমার জানার বাইরে নয়।

এ সকল হতে বুঝা যায়, এলমে হাদীস সম্বন্ধে ইমাম সাহেবের কিরূপ সুগভীর জ্ঞান ছিল। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, এ সকল ইমাম আবু হানিফাকে ইমাম আবু হানীফা রূপে পরিগণিত করে নি।

তিনি যদি হাফেজুল হাদীস হয়ে থাকেন, তবে আরও বহু হাফেজুল হাদীস ছিলেন। তাঁর যদি কয়েক শত শেখে-হাদীস থেকে থাকেন, তবে কোন কোন ইমামের কয়েক হাজার শেখ ছিলেন। তিনি যদি কূফা ও মক্কা মদীনার শিক্ষা-মজলিসে শিক্ষা পেয়ে থাকেন, তবে অপরাপরেরাও তথায় শিক্ষা লাভ করেছিলেন। ইমাম সাহেবকে অপরাপর হতে যদি কোনকিছু বিশেষত্ব দান করে থাকে, তবে তা অন্যকিছু হয়ে থাকবে। ইমাম সাহেবের পরে এলমে হাদীসের বহু উন্নতি হয়েছে। সত্য-মিথ্যা হাদীস বাছাই করা হয়েছে। ছেহাছিত্তা সঙ্কলিত হয়েছে। উসূলে হাদীস নামে একটি বিষয় কায়েম করা হয়েছে। এ সম্বন্ধে অসংখ্য কিতাব মুদ্রিত হয়েছে। কালে এ বিষয়ে এরূপ উন্নতি হয়েছিল যে, সূক্ষ্মদৃষ্টি ও সাময়িক প্রয়োজন কোনকিছুর দিক দিয়েই কোন প্রকার ত্রুটি ছিল না। কিন্তু হাদীস যাচাই, রেওয়ায়েত ধারা ইত্যাদি ইমাম সাহেবের জমানায় উন্নতির যে চরম সীমায় উপনীত হয়েছিল, আজ পর্যন্তও তা ডিঙিয়ে যাওয়া কারও পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। এর সুষ্ঠুতা তখনই আমাদের দৃষ্টিতে নিপতিত হবে, যদি আমরা

হাদীস শাস্ত্র কায়েম হবার পূর্বাবস্থা পর্যালোচনা করে দেখি। তখন আমরা বুঝতে পারবো যে, রেওয়ায়েতের ধারা কিরূপে স্থাপিত হয়েছিল। আর কোন্ পর্যায়ে এর কি কি পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। এতে এটা অনুমান করা সহজ হবে যে, হাদীস যাচাই প্রচেষ্টা তখন কিরূপ সুকঠিন কাজ ছিল।

হাদীস সঙ্কলনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

সনদ ও রেওয়ায়েতের ধারা যদিও রাসূল (সাঃ)–এর জমানাতেই শুরু হয়েছিল, কিন্তু তখন তা অতি সাদাসিদা ও স্বাভাবিক ধরনের ছিল। নবুওতের তের বছর পর্যন্ত তো ঘোর বিপদের দিন ছিল। তখন প্রাণে বেঁচে থাকাও কঠিন ব্যাপার ছিল। তখন সনদ ও রেওয়ায়েতের সময় কোথায়? তখন হুকুম-আহকাম ও কর্তব্যাবলীও কম ছিল। প্রথম অবস্থায় নামায ব্যতীত অন্য কোন ফরজ ছিল না। নামাযও তখন সংক্ষিপ্ত ছিল। জোহর, আসর, ও ইশা এই তিন ওয়াক্ত নামায পড়তে হতো। আর প্রতি ওয়াক্তে মাত্র দুই রাকায়াত ফরজ পড়তে হতো। নবুওতের ত্রয়োদশ বছরে রোযা ফরজ হয়। যাকাত কখন ফরজ হয়েছিস এ সম্বন্ধে মতবিরোধ রয়েছে। আল্লামা ইবনে কছীর লিখেছেন যে, নবম হিজরীতে রোযা ফরজ হয়েছে। হজ্ব ও সেই সনেই ফরজ হয়েছিল। অন্যান্য বিষয়ে হাদীস ও রেওয়ায়েত জারী হয়নি।

আবদুল্লাহ বিন আব্বাস বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আসহাবের চেয়ে উত্তম কোন জাতি দেখিনি। আমি সমগ্র নবুওতের জামানায় মাত্র তেরটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

যে সকল হুকুম ও ঘটনা ঘটতো, তাতেও রেওয়ায়েতের নিয়ম কম জারি ছিল। সাহাবাগণ নিজেরাই হযরতের (সাঃ) কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করে নিতেন। মধ্যস্থতা ও রেওয়ায়েতের কচিৎ প্রয়োজন পড়ত। হাদীসাবলীকে লিপিবদ্ধ করার তখন অনুমতি ছিল না।

হযরত আবু বকর (রাঃ) খলিফার আসনে সমাসীন হন, তখন তাঁকে ধর্মভ্রষ্ট আরববাসীদের বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এটা শেষ হওয়ার পর রোম ও ইরানের সাথে সংগ্রাম আরম্ভ হয়। তাঁর সংক্ষিপ্ত খিলাফতের সময় হাদীসের বহুল প্রচার সম্ভবপর হয়নি।

হযরত ওমর (রাঃ) সাত বছর খলিফার আসনে সমাসীন ছিলেন। তখন রাজ্যে পূর্ণ সুখ-শান্তি বিরাজ করছিল। কিন্তু তিনি হাদীসের বহুল প্রচারকে উৎসাহিত করতেন না।

হযরত ওমর ও হাদীস-প্রচার

আল্লমা জাহবী 'তবকাতুল হোফ্‌ফাজ' কিতাবে লিখছেন, রেওয়ায়েতকারী যেন আল্লাহ রাসূলের নামে কোন ভুল রেওয়ায়েত না করেন, এই ভয়ে ফারুক আজম হাদীস রেওয়ায়েতে উৎসাহ প্রদান করতেন না। সাহাবাদেরকে তিনি সব সময় হাদীস কম রেওয়ায়েত করতে বলতেন।

একদিন তিনি কতিপয় আনসারকে কূফায় প্রেরণ করেন। তাঁদের যাত্রাকালে তিনি বললেন; আপনারা এখন কূফায় রওয়ানা হয়েছেন। আপনারা সেখানে এমন এক কওমের সাথে মিলিত হবেন, যাঁরা তথায় আপনাদের উপস্থিতিতে মহা আনন্দিত হবেন। কিন্তু তাঁরা যখন আপনাদের কাছে উপস্থিত হয়ে হাদীস শ্রবণ করতে চাইবেন, তখন অধিক হাদীস বর্ণনা করবেন না।

এরূপে সাহাবাগণ যখন ইরাকে যেতে লাগলেন, তখন তিনি কিছুদূর পর্যন্ত তাঁদের সাথে অগ্রসর হতে লাগলেন। তিনি তাঁদেরকে বললেন, আপনারা কি জানেন, আমি কেন আপনাদের সাথে অগ্রসর হচ্ছি? তাঁরা জবাবে বললেন, হ্যাঁ। তবে আমার অন্য উদ্দেশ্যও রয়েছে। এটা এই যে, আপনারা যেখানে যাচ্ছেন, সেখানকার লোক উৎসাহিত করবেন না এবং আপনারা যেখানে যাচ্ছেন, সেখানার লোক অধিক কোরআন তেলাওয়াত করে থাকেন। তাঁদেরকে হাদীসের দিকে উৎসাহিত করবেন না এবং আপনারা হযরত (সাঃ) হতে কম রেওয়ায়েত করবেন।

সাহাবাবৃন্দ তথায় পৌছলে তাঁদের সাথে সাক্ষাৎমানসে লোকের মহা ভিড় পড়ে গেল এবং তাঁরা হাদীস শ্রবণ করার নিমিত্ত প্রবল আগ্রহ প্রকাশ করতে লাগলেন। এ সম্বন্ধে হযরত ওমর ফারুকের নিষেধ বাণী তখন তাঁরা শুনায়ে দিলেন।

আবু মুসলেম হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি হযরত ওমর ফারুকের জমানায়ও এরূপ হাদীস রেওয়ায়েত করতেন? তিনি বললেন, না। তাতে ওমরের দুররার ভয় ছিল।

হযরত ওসমান ও হযরত আলী (রাঃ)–এর খেলাফত বিশ একুশ বছর কাল পর্যন্ত ছিল। তখন হাদীসের বহুল প্রচার হয়েছিল। তখন সাহাবাগণ বহু দূরদরাজ পৌছেছিলেন। প্রয়োজনও তখন উত্তরোত্তর বেড়ে চলছিল। নব নব সমস্যা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল। এই সমস্ত কারণে হাদীস ও রেওয়ায়েত বহু বিস্তৃতি লাভ করে।

হযরত ওসমানের (রাঃ) রাজত্বকালে বিদ্রোহ দেখা দেয়। পরিণামে তিনি শহীদ হন। ইসলামের ইতিহাসে তখন হতে সর্বপ্রথম দলাদলি আরম্ভ হয়।

হযরত আলী করমুল্লাহ ওয়াজহাহুর খিলাফতের প্রথম দিক হতেই ঝগড়া-বিবাদ শুরু হয়ে গেল। সেই মত-বিরোধিতা অশান্তি-উপদ্রবের পাশাপাশি হাদীস-বিভ্রাটও আরম্ভ হয়। যদিও পরবর্তীকালে অশান্তি ও ঝগড়া-বিবাদ অধিক বিস্তৃতি লাভ করে, তথাপি অধিক ক্ষোভের বিষয় এই যে, স্বয়ং সাহাবাদের জমাতেই বেদাতী লোকেরা হাদীসের নামে অসংখ্য অ-হাদীস আমদানী করে। সহীহ মুসলেমের উপক্রমনিকায় বলা হয়েছে যে, একদিন বশীর আদুবী হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাসের কাছে এসে হাদীস বর্ণনা করতে শুরু করলেন। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ আব্বাস তৎপ্রতি কর্ণপাতও করলেন না। তখন বশীর বললেন, হে ইবনে আব্বাস, আমি আল্লাহর রাসূল হতে বর্ণনা করছি, আর আপনি তৎপ্রতি মনোযোগ দিতেছেন না, এ কেমন কথা? তিনি বললেন, এমন এক জমানায় আমার অবস্থা এরূপ ছিল যে, কাউকেও বলতে শুনলে, তখনই আমি তৎপ্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়তাম এবং কান লাগায়ে তা শুনতাম। কিন্তু যে সময় হতে লোক-সমাজে নেকী বদীর পার্থক্য উঠে গিয়েছে, তখন হতে আমি শুধু সেই সমস্ত হাদীস শুনে থাকি, যা আমি নিজেই জানি।

জবানী রেওয়ায়েতের ন্যায় লিখিত রেওয়ায়েতেও রদ-বদল শুরু হয়ে গেল। মুসলেম রেওয়ায়েত করছেন যে, একদিন আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ)–এর এক মীমাংসায় নকল নিচ্ছিলেন। মাঝে মাঝে শব্দ পরিত্যাগ করে যাচ্ছিলেন এবং বলছিলেন, "আল্লার কসম" আলী কখনও এই মীমাংসা করেননি।

এরূপ অন্য এক সময়ও আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস হযরত আলীর এক লিখিত রেওয়ায়েতে দেখে অল্প কিছু শব্দ ব্যতীত অন্যান্য সবকিছু মিটায়ে দিলেন।

হাদীস সঙ্কলনে অসাবধানতার কারণ

সনদ ও রেওয়ায়েতের কোন পন্থা না থাকায় নির্দিষ্ট হাদীসের নামে বহু অ-হাদীস প্রচার করা হয়েছিল। যে কোন লোক ইচ্ছা করলে বলে দিত; এতে কাউকেও সনদের ধার ধারতে হতো না।

তিরমিজি 'কিতাবুল ওলুল' এ ইবনে শিরীন হতে রেওয়ায়েত করেছেন পূর্ব জমানায় লোকেরা সনদ সম্বন্ধে কোন জিজ্ঞাসাবাদ করতেন না। এরপর এতে

যখন অনাচার ঢুকল, তখন আহলে সুন্নতদের হাদীস গ্রহণ এবং আহলে বেদাতদের অহাদীস বর্জনের নিমিত্ত সনদের প্রয়োজন হয়ে উঠল। কিন্তু হাদীস সম্বন্ধে অসাবধানতা শুধু বেদাতীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। পরিপূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন তখন সম্ভবপর হয়ে উঠে নাই। অ-হাদীস প্রচার তখন অব্যাহত রয়ে গেল।

বনু উম্মাইয়াদের শাসনকাল আরম্ভ হয়ে গেল। আর খুব জোরেসোরে হাদীস প্রচারও শুরু হয়ে গেল। সাহাবাগণ সংখ্যায় দিন দিন যতই কমতে লাগলেন, তাদের গুরুত্বও তত বেশি বেড়ে চললো সভ্যতার দিক দিয়েও দেশ বেশ অগ্রসর হয়ে চললো।

নূতন নূতন সম্প্রদায়ের লোক মুসলমান হতে আরম্ভ করল। এদিক দিয়ে তো নও-মুসলমানদের নব-প্রেরণা ছিল। অপরদিক দিয়ে বিজয়ী দল বিজিতদের মধ্যে নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার করার নিমিত্ত উঠে পড়ে লেগে গেল। এই সব পরিস্থিতির কল্যাণে ধর্ম সম্বন্ধে সবিশেষ জ্ঞান লাভ করার প্রেরণা লোকের মধ্যে এরূপভাবে পেয়ে বসল যে, তারা এ সম্বন্ধে আরববাসীদের চেয়ে অধিক আগ্রহী হয়ে উঠল।

মোটকথা এই যে, ইসলামী রাজ্যের প্রতি ঘরে ঘরে হাদীসও রেওয়াতের চর্চা আরম্ভ হয়ে গেল। ফলে শত শত মাদ্রাসা স্থাপিত হলো।

কিন্তু হাদীস প্রচার যতই দ্রুতগতিতে আরম্ভ হোকনা কেন রেওয়ায়েতের বিশ্বস্তা ও শুদ্ধতা ততই হ্রাস পেতে লাগল। রেওয়ায়েতকারীর সংখ্যা এত বেশী বেড়ে উঠল যে, ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাধারা কার্যধারা ও বিভিন্ন আকায়েদও এতে প্রবেশ-পথ পেল। শত গোত্রের লোক একত্রে সমবেত হলো। বেদাতীরাও সংখ্যায় বেড়ে চললো। আর প্রত্যেকেই নিজেদের মতবাদের উপর অধিক গুরুত্ব প্রদানে উঠে পড়ে লেগে গেল।

কিন্তু অতি দুঃখের বিষয় এই যে, এরূপে সুদীর্ঘ একযুগ অতীত না হওয়া পর্যন্ত এর কোন প্রতিকার হলো না। এর মারাত্মক পরিণাম এ দাঁড়াল যে, এত অসাধারণভাবে রেওয়ায়েত চলতে লাগল যে, হাদীসের নামে অ-হাদীস ও ভুল হাদীসের এক দপ্তর স্তূপীকৃত হয়ে গেল। এই সকল অনাচার বিদূরিত করার মানসে ইমাম বোখারী সাহেব স্বীয় জমানায় সহী হাদীস পৃথক করতে যেয়ে কয়েক লক্ষ হাদীস বাছাই করে জামেয়ে-সহী লিপিবদ্ধ করেন। এতে ৭৩৯৭ টি হাদীস স্থান পেয়েছে।

হাদীসের সাথে অ-হাদীস কিরূপে মিশল?

হাজার হাজার এমন কি লক্ষ লক্ষ অ-হাদীস জানা-বুঝা লোকের অসাবধানতার দরুণও হাদীসরূপে প্রচলিত হলো। কেউ কেউ হাজার হাজার, এমনকি এক ব্যক্তি নিজেই স্বীকার করছেন যে, তিনি চার হাজার এবং অপর এক ব্যক্তির অসাবধানতার দরুণ চৌদ্দ হাজার অ-হাদীস হাদীসরূপে প্রচলিত হয়েছিল। প্রত্যেকে যে শত্রুতা করে এইরূপ করছে, তা নয়। অনেকে নেক নিয়তে তত সাবধানতা অবলম্বন করেননি। এতে ধর্মের দিক দিয়ে বিরাট ক্ষতি সাধিত হয়েছিল।

ভুল বুঝাবুঝি ও অসাবধানতার দরুণ হাজার হাজার অ-হদীস হাদীস নামে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কথা বলে প্রচার করা হয়েছে। কোন কোন মুহাদ্দেসের রীতি এই ছিল যে, হাদীসের সঙ্গে তাঁরা তফসীরও বয়ান করতেন। আর তফসীরের বহু কথাই তাঁরা উহ্য রেখে যেতেন। তাতে শ্রোতাবর্গ ধোঁকায় নিপতিত হতো। আর তাতে কোন্‌টি হাদীসের কথা এবং কোন্‌টি তাফসীরের কথা তা বুঝে উঠা শ্রোতাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়িত। আর তাও যে শুধু সাধারণ লোকের দ্বারা সংঘটিত হতো, তা নয়। বরং কোরআন-হাদীস-বিশারদ বহু লোকের দ্বারাও তা সংঘটিত হতো। ইমাম জহুরী এবং ইমাম মালিকের মত লোকের মধ্যেও এই সকল ত্রুটি পরিলক্ষিত হতো। ইমাম জহুরী সম্বন্ধে আল্লামা সাখাবী লিখেছেন, "এরূপে জহুরী অধিকাংশ হাদীসের তফসীর করতেন এবং সে সকল হরফে সেই মর্মের তফসীর হওয়া ছিল, তা তিনি ছেড়ে দিতেন। তিনি প্রায়ই হাদীসের মধ্যে 'অর্থাৎ' বলে মতলব বয়ান করতেন। এবং কোন কোন সময় তিনি 'অর্থাৎ' শব্দও ছেড়ে দিতেন। এতে শ্রোতাবৃন্দ সন্দেহের দোলায় দোদুল্যমান হয়ে পড়ত। 'কুতুবে রেজাল' এবং 'উসুলে হাদীস' কিতাবে এই জাতীয় বহু দৃষ্টান্তই পাওয়া যায়।"

রদবদল ও রূপ পরিবর্তন

ইমাম আবু হানীফার জমানায় হাদীস শরীফের যে সঙ্কলন সঙ্কলিত হয়েছিল, তাতে হাজার হাজার 'মৌজু হাদীস, ভ্রম-ত্রুটি' দুর্বলতা ইত্যাদিও কম ছিল না। হাদীসকে যাঁচাই-বাছাই করার নিমিত্তে তখন ইমাম বোখারী ও মুসলেম কেউই ছিলেন না। একথা সত্য যে, ফিকাহ-শাস্ত্রের প্রতি ইমাম আবু হানীফার আপ্রাণ ঝোঁক থাকায়' তিনি হাদীস সঙ্কলনে পরিপূর্ণ মনযোগ দিতে পারেননি। তথাপি

তিনি রেওয়ায়েতকে সুপরিচালিত করবার ভিত্তি পত্তন করে যান। তজ্জন্য তিনি সমূহ আইন-কানুন ও বিধি-বিধান রেখে গিয়েছেন। তাঁর হাদীস-যাচাই মাপকাঠি অত্যন্ত কঠিন ছিল। এজন্য মুহাদ্দেসীন তাঁকে কঠিন রেওয়ায়েতকারী বলে উপাধি দান করেন। অন্যান্য মুহাদ্দেসীনদের তুলনায় ইমাম আবু হানীফা যে সর্বাপেক্ষা কম রেওয়ায়েত করছেন, এর কারণ তাই ছিল। আল্লামা ইবনে খলদুন লিখেছেন, "ইমাম আবু হানীফা রেওয়ায়েত বহু কম করছেন। এর কারণ এই ছিল যে, তাঁর রেওয়ায়েতের শর্তাবলী অত্যন্ত শক্ত ছিল।"

হাদীস সম্বন্ধে তাঁর মোটামোটি ধারণা জন্মিয়াছিল যে, এমন হাদীস অতি কম যা সহী। বা এমন হাদীস অতি বিরল' যার পিছনে যথেষ্ট দলীল রয়েছে বা সেই যুগও ছিল বহু যুদ্ধ-বিগ্রহ ও ঝড়-ঝঞ্ঝার যুগ।

সহী হাদীস অতি কম

এক হাদীস বর্ণনাকারীর সাথে অন্য হাদীস বর্ণনাকারীর আকাশ-পাতাল পার্থক্য ছিল। কিন্তু ইমাম সাহেব ছিলেন অন্য ধরনের লোক। তিনি তাঁর জমানার বহু শেখের সাথে মিলামিশা করেছিলেন। তাঁদের কাছ হতে হাদীস সম্বন্ধীয় যা কিছু উপকরণ ও তথ্য পাওয়া যেত, তিনি তা সংগ্রহ করতেন। তিনি মক্কা-মদীনার শিক্ষা-মজলিসে সুদীর্ঘকাল শিক্ষার্থী হিসেবে কাটায়ে দিয়েছেন। কূফা, বসরা, মক্কা ও মদীনায় যে সকল নামজাদা রেওয়ায়েতকারী ছিলেন তাঁদের জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতা হতে ইমাম সাহেব মৌলিক শক্তিমত্তা, স্বভাব-চরিত্র এবং জীবিকানির্বাহের উপায়াবলীর সাথে সুপরিচিত হতেন।

মোটকথা এই যে, যে কোন মসআলা সম্বন্ধে হাঁ বা না করার জন্য মুজতাহেদ হিসেবে যাকিছু জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক ইমাম-চরিত্রে সেই সবকিছুর সমন্বয় ছিল।

তিনি কার ভক্ত ছিলেন?

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মসউদ অত্যন্ত জবরদস্ত সাহাবা ছিলেন। হানফী মজহাব বিশেষ ভাবে তাঁর রেওয়ায়েতের উপর অধিক নির্ভরশীল।

আবদুল্লাহ্ বিন মসউদ যদিও জবরদস্ত মুহাদ্দেস ছিলেন, কিন্তু অন্যান্য মুহাদ্দেসীনের তুলনায় তিনি রেওয়ায়েত অতি কম করছেন। তিনি অত্যন্ত শক্ত ও সতর্ক লোক ছিলেন। আল্লামা জাহবী তাঁর প্রসংগক্রমে লিখেছেন, "আবদুল্লাহ্

বিন মসউদ রেওয়ায়েত ব্যাপারে পরিপক্ক লোক ছিলেন। তিনি হাদীসের রেওয়ায়েত অত্যন্ত কম করতেন।"

ইমাম সাহেব যদিও অন্যান্য বহু লোকের কাছ হতে শিক্ষালাভ করছিলেন, তথাপি তিনি যা কিছু শিক্ষা ও ভাব-ধারা প্রাপ্ত হন, সেগুলোর সবকিছুর কেন্দ্র ছিল সেই খান্দানী প্রেরণা, যিনি তাঁর হৃদয়ে এই ভাবধারা জন্মায়ে দিয়েছিলেন।

রেওয়ায়েতে ইমাম মালেক ও ইমাম আবু হানীফা

ইমাম মালেক রেওয়ায়েতের ব্যাপারে যে পদ্ধতি ও শর্ত আরোপ করছেন, তা ইমাম আবু হানীফার শর্তাবলীর প্রায় কাছাকাছি। এই জন্যই ইমাম আবা হানীফা ও ইমাম মালিকের নাম শক্ত রেওয়ায়েতকারীরূপে নেওয়া হয়ে থাকে।

ইবনে সালাহ লিখেছেন, "শক্ত রেওয়ায়েতকারীদের মজহাব এই যে, একমাত্র সেই হাদীসই গ্রহণযোগ্য, যা রাবী স্বীয় স্মৃতিপটে স্মরণ করে রেখেছেন। ইমাম মালেক এবং ইমাম আবু হানীফার মতও তাই।"

জনৈক মুহাদ্দেসীন লিখছেন, "ইমাম মালেক যখন প্রথম মুয়াত্তা লিখেন, তখন এতে দশ হাজার হাদীস লিপিবদ্ধ করা হয়। ইমাম মালেক যখন এর পর তাহকীক করতে থাকেন, তখন হাদীসের সংখ্যা কমতে আরম্ভ করে মাত্র ছয় সাত শত অবশিষ্ট থেকে যায়।"

ইমাম শাফেয়ী স্পষ্ট ভাষায় ইমাম আবু হানীফার ভাব-ধারা প্রকাশ করছেন।

সহী হাদীস ও ইমাম শাফেয়ী

ইমাম বায়হাকী রেওয়ায়েত করছেন যে, একদিন এক বুজুর্গ ইমাম শাফেয়ীকে বললেন, "আপনি কি সেই সকল হাদীস লিপিবদ্ধ করছেন, যা রাসূল (সাঃ) হতে সাবেত হয়েছে?" তিনি জবাব দিলেন, "মারেফাত অভিজ্ঞ বুজুর্গদের অভিমত এই যে, সহী হাদীসের সংখ্যা অতি কম। আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কাছ হতে যে হাদীস রেওয়ায়েত করছেন' এদের সংখ্যা সত্তরের অধিক নয়।

ফারুকে আজম (রাঃ) হযরত এর ইন্তেকালের পরও কিছুকাল জীবিত ছিলেন। অথচ তিনি পঞ্চাশের চেয়ে কম হাদীস রেওয়ায়েত করছেন। হযরত ওসমানের (রাঃ) অবস্থাও তথৈবচ। হযরত আলী (রাঃ) যদিও লোকদেরকে হাদীস শিক্ষা করার নিমিত্ত উৎসাহ প্রদান করতেন, তথাপি তিনি নিজে অতি কম

হাদীস রেওয়ায়েত করছেন। তাঁরা ব্যতীত অপরাপর সাহাবা হতে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু আহলে মারেফাতদের কাছে সেই সকল রেওয়ায়েত সহী সনদ দ্বারা প্রমাণিত হয়নি।

রেওয়ায়েতের নির্দিষ্ট শর্তাবলী

এ সকল কথা শুনে কেউ যেন এরূপ ধারণা না করেন যে, ইমাম আবু হানীফা সাহেব মু'তাজিলাদের ন্যায় হাদীসের অস্বীকারকারী ছিলেন। অথবা এমন ধারণাও যেন কেউ না করে যে, তিনি মাত্র দশ বিশটি হাদীসকে মান্য করতেন। তাঁর ছাত্রবৃন্দ তাঁর কাছ হতে অসংখ্য হাদীস বর্ণনা করছেন। অন্যান্য মুহাদ্দেসীনের তুলনায় তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা কম হওয়ার কারণ এই যে, তাঁর রেওয়ায়েতের শর্ত বড় কড়া ছিল।

ইমাম সাহেব রেওয়ায়েতের যে সকল শর্ত আরোপ করছেন, তন্মধ্যে এমন কতক শর্ত রয়েছে, যা অপরাপর মুহাদ্দেসীনদের কাছেও সমাদৃত হয়েছে। আর এমন কতক শর্তও রয়েছে যা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইমাম মালেক প্রমুখ কতিপয় মুজতাহেদীন একই মতাবলম্বী ছিলেন। তন্মধ্যে একটি মসআলা এই যে, একমাত্র সেই হাদীসই গ্রহণযোগ্য, যা রাবী স্বীয় কর্ণে শ্রবণ করছেন এবং রেওয়ায়েত-কাল পর্যন্ত তা তাঁর স্মরণ রয়েছে; এটা সুস্পষ্ট যে, এতে কারও কোন ওজর-আপত্তি হতে পারে না।

সাধারণ মুহাদ্দেসীন তাঁর সাথে একমত হতে পারেননি। তাঁদের রায় এই যে, ইমাম সাহেবের রায় অনুযায়ী রেওয়ায়েতকারীর রেওয়ায়েত ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। পাঠকবর্গ বিবেচনা করে দেখুক, প্রথম কি সতর্কতার প্রয়োজন, না রেওয়ায়েতের।

নিম্নে ইমাম সাহেবের পারিপার্শিকতা বর্ণনা করা হয়েছে, তাতেই বুঝা যাবে যে, তিনি কেন এ সম্বন্ধে এত কঠোর পন্থা অবলম্বন করছিলেন।

শেখদের বিরাট শিক্ষা-মজলিস থাকত। কোন কোন শিক্ষা-মজলিসে দশ হাজারের চেয়ে অধিক শ্রোতার সমাবেশ থাকত। এতে কতিপয় নকীব নিযুক্ত করতে হতো। তাঁদের মধ্যস্থতায় শেখের বক্তৃতা দূর দূর পর্যন্ত পৌঁছত। এমনও হতো যে, শ্রোতাদের কর্ণে শেখের একটি শব্দও পৌঁছত না। তাঁরা শুধু মধ্যস্থ ব্যক্তির মুখে শুনেই হাদীস রেওয়ায়েত করতেন।

এখন প্রশ্ন এই যে, যিনি শুধু মধ্যস্থ ব্যক্তির মারফত হাদীস শুনছেন, তাঁর

পক্ষে হাদীস বর্ণনা করা কতখানি সমীচীন! অধিকাংশ রেওয়ায়েতকারী তা সমর্থন করছেন। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা এর বিরোধিতা করছেন। হাদীসের ইমামদের মধ্যে হাফেজ আবু নয়ীম, ফজল বিন অকী' এবং জায়েদ বিন কেরামাহ ইমাম আবু হানীফা সাহেবের সাথে একমত।

ইমাম আবু হানীফা সাহেবের জমানায় অর্থ অনুযায়ী রেওয়ায়েতের বহুল প্রচার ছিল। আর অতি কম লোকেই হাদীসের শব্দাবলীর পাবন্দি করতেন। এই জন্য রেওয়ায়েত পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের সমূহ সম্ভাবনা থাকত। অন্ততঃপক্ষে এর সুনিশ্চিত যে, প্রথম যে ব্যক্তি রেওয়ায়েত করতেন, তা যত শক্তিশালী হতো, দ্বিতীয় অবস্থায় তা তত শক্তিশালী হতো না।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিরাট শিক্ষা মজলিসে কয়েকজন মধ্যস্থ ব্যক্তি নিযুক্ত করতে হতো। প্রায় ক্ষেত্রেই নকীব ব্যতীত কাজ চালায়ে যাওয়া সম্ভবপর হতো না। কিন্তু বিপদ এই ছিল যে, যে ব্যক্তি নকীবের মুখে হাদীস না শুনে স্বয়ং শেখের মুখে তা শুনতে পেতেন এবং আর যাঁরা নকীবের মারফত হাদীস শুনতেন, উভয়কে একই চোখে দেখা হতো।

গাফেল ও কম বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিও মাঝে মাঝে নকীবরূপে নিয়োজিত হতেন। এইজন্য ভুল-ত্রুটির অধিক সম্ভাবনা থাকত।

এর চেয়ে অধিক মারাত্মক বিষয় এই ছিল যে, "আমরা শুনেছি ও জেনেছি, শব্দগুলো অধিকাংশ মুহাদ্দেসীন নিতান্ত সাধারণ অর্থে ব্যবহার করতেন। ইমাম হাসান বছরী কয়েকটি রেওয়ায়েতে বলছেন, "আমি আবু হুরাইরার মুখে শুনেছি।" কিন্তু তিনি আবু হুরাইরার সাথে কখনও মিলিত হননি। তিনি এর ব্যাখ্যা দানে বলছেন যে, আবু হুরাইরা যে শহরে থেকে এই হাদীস বয়ান করছিলেন তিনি সেই শহরে ছিলেন।

এরূপে অন্যান্য শেখগণ ও সাহাবাবৃন্দ শব্দ ব্যবহার করতেন। আর এরা তাৎপর্য স্বরূপ বলতেন যে, তাঁদের শহরবাসীগণ সেই সকল শেখদের কাছ হতে তা শুনেছিল। অন্য এক মুহাদ্দেস বলছিলেন যে, হযরত হাসান বছরী যে সকল লোকের কাছ হতে এর রেওয়ায়েত করছেন তিনি সেই সকল ব্যক্তির সাথে মিলিত হয়নি। এর কৈফিয়ৎ স্বরূপ বলা হতো যে, তাঁর সম্প্রদায়ের লোক সেই সকল লোকের কাছ হতে উক্ত হাদীস শ্রবণ করছেন। এটাও এক প্রকার ভুল বিবৃতি। এতদ্ব্যতীত এটা হাদীসের সনদকে কিছুটা সন্দেহযুক্ত করে তোলে। কারণ রাবী যখন স্বয়ং শেখের মুখে হাদীস শুনেননি, তার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন না

কোন মধ্যস্থতা থাকবেই থাকবে। আর যেহেতু রাবী তাঁর নাম উল্লেখ করেননি, এই জন্যই তাঁর বিবৃতি দলীল হবার যোগ্যতা রাখে না! এমতাবস্থায় উত্তম ধারণাই একমাত্র সম্বল। তিনি যাঁর কাছ হতে তা শ্রবণ করছেন, তা অবশ্যই বিশ্বাসযোগ্য হবে, এটাই একমাত্র ভরসা। ইমাম আবু হানীফা এই তরীকাকে না-জায়েয বলছেন। হাদীসের অন্যান্য বহু ইমামও উক্ত মত পোষণ করছেন।

প্রধান রেওয়ায়েতকারীদের ধারা এইরূপ ছিল যে, তাঁরা যখন কারও কাছ হতে কোন হাদীস শুনে লিপিবদ্ধ করতেন, তখন তাঁদের কাছ হতে সর্বদা রেওয়ায়েত করা জায়েয মনে করতেন। রাবীর যদি হাদীসের শব্দাবলীও স্মরণ না থাকত, তখনও তাঁর কাছ হতে বর্ণনা করতে কোন দ্বিধাবোধ করা হতো না। ইমাম আবু হানীফা এই তরীকাকে কায়েম রাখলেন, কিন্তু শর্ত এই যে, হাদীসের শব্দসমূহ ও ভাবধারা অটুট থাকা চাই। অন্যথায় রেওয়ায়েত জায়েয হবে না।

যদিও সাধারণভাবে এটা প্রচলিত হয়নি, তথাপি মুহাদ্দেস সাখাবী তা সুপ্রচারিত করছেন এবং ইমাম মালেক ও অন্যান্য বহু ইমাম এর সমর্থন করছেন। বোখারীর জমানায় এর প্রয়োজনও তত সুপ্রকট ছিল না। কেননা, তখন শব্দসহ রেওয়ায়েত করা সাধারণ নিয়মে পরিণত হয়েছিল। ইমাম আবু হানীফা সময় পর্যন্ত বেশীরভাগ ভাব অনুযায়ী হাদীস বর্ণনা করা যেত। এজন্য রাবীর যদি হাদীসের শব্দ, হাদীস-ঘটনা, শানে নুজুল ইত্যাদি স্মরণ না থাকত, তখন রেওয়ায়েত অটুটভাবে বর্ণনা করা অসম্ভবের প্রায় কাছাকাছি হয়ে পড়ত। এজন্যই ইমাম আবু হানীফা সাহেব এর একটা সীমা-রেখা টেনে দেন। আর প্রকৃত কথা এই যে, এরূপ করার প্রয়োজনও ছিল তখন অত্যন্ত সুগভীর।

ভাব-ধারার ভিত্তিতে রেওয়ায়েত

ভাব-ধারার ভিত্তিতে রেওয়ায়েত বিধেয় কিনা, তা তখনকার দিনে অত্যন্ত গুরুত্ব সমস্যা ছিল। এ সম্বন্ধে সর্বদাই মতবিরোধ চলে আসছে। আজও এর জের থামেনি।

ইমাম শাফেয়ী বর্ণনা করছেন যে, কোন কোন তাবেয়ী একটি হাদীস বিভিন্ন ও কতিপয় সাহাবাদের কাছ হতে প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করলেন। জবাবে সাহাবা বললেন, "ভাবাধারায় যখন কোন বিভিন্নতা নাই, এমতাবস্থায় কোন ক্ষতি নাই।"

কিন্তু ইমাম শাফেয়ী তাবেয়ীর নাম উল্লেখ করেননি। নাম জানলে এর ভিত্তি সুদৃঢ়, নাকি দুর্বল, এর অনুমান করা যেত। সে যাহোক, এটা অস্বীকার করা চলে না, কোন কোন সাহাবা ভাব-ধারার ভিত্তিতে হাদীস বর্ণনা জায়েয মনে করতেন এবং সেই অনুযায়ী আমলও করতেন। কিন্তু আবদুল্লাহ্ বিন মসউদ প্রমুখ সাহাবাগণ অন্য মত পোষণ করতেন।

ভাব-ধারানুযায়ী রেওয়ায়েতের সতর্কতা

আল্লামা জাহবী 'তাযকেরাতুল হোফ্ফাজ' কিতাবে এই বিষয় সাহাবাদের মতামত সম্বন্ধে লিখেছেন যে, তাঁরা রেওয়ায়েতে কঠোরতা অবলম্বন করতেন। আর শাগরিদকে শাসাতেন যেন বেপরোয়াভাবে শব্দসমূহ উঠায়ে দেয়া না হয়।

আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ যখনই ভাবধারার ভিত্তিতে রেওয়ায়েত করতেন, তখন "আল্লাহর রাসূল এরূপ বলছেন, এভাবে ফরমায়েছেন, বা এর অনুরূপ বা এর সমজাতীয় বা এর চেয়ে কিছু কম বা বেশী বা এর কাছাকাছি ফরমায়েছেন" ইত্যাদি বলতেন। আবুদ্দরদার অবস্থাও তথৈবচ। তিনি বলতেন, "ব্যাপারে এটা বা এর মত বা এর অনুরূপ। হযরত ওমর (রাঃ) যিনি লোকদেরকে হাদীস রেওয়ায়েতে নিষেধ করতেন, তাঁর বাসনাও সম্ভবতঃ তাহাই ছিল। তিনি জানতেন যে, সব শব্দ স্মরণ থাকে না। আর সর্বসাধারণকে ভাব অনুযায়ী রেওয়ায়েত করার আদেশ দিলে, পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধনের সম্ভাবনা থাকে।

সাহাবাদের জমানার পরেও এ সকল সমস্যার সমাধান হয়নি। তাবেয়ীদের মধ্যে দুটি দল রয়েছে। পরবর্তী যুগে এটা প্রায় জনপ্রিয় অভিমত ছিল যে, ভাব অনুযায়ী রেওয়ায়েত জায়েয। মুজতাহেদীনের মধ্যে এক সম্প্রদায় রয়েছে। ইমাম মুসলেম, কাসেম বিন মুহাম্মদ, মুহাম্মদ বিন শিরীন আবুজরা এবং আবদুল মালেক বিন ওমর তাঁদের অন্তর্গত ছিলেন। তাঁরা শব্দসমূহসহ রেওয়ায়েতের পক্ষপাতী ছিলেন।

এতে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, অধিকাংশ তাবেয়ীন এবং সাহাবা ভাব অনুযায়ী রেওয়ায়েত করছেন। আর শুরু হতে যদি এই নিষেধ জারী করা হতো, তবে রেওয়ায়েতের ধারা এত সংকীর্ণ হয়ে যেত যে, মাসায়েল ও আহকামের নিমিত্ত কিছুই অবশিষ্ট থাকত না। কিন্তু এতেও অস্বীকার করা চলে না যে, ভাব অনুযায়ী রেওয়ায়েত দ্বারা মূল রেওয়ায়েতের মৌলিকতা রক্ষা করা এরূপ কঠিন যে, এটা প্রায় অসম্ভব। প্রত্যেকের কথা বলার ধারা এরূপ বিভিন্ন যে, একই কথা

বিভিন্ন লোকের মুখে বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। আর ভাব অনুযায়ী কথা বললে কোন না কোন পার্থক্য অবশ্যই ঘটে থাকে।

সাহাবাদের চেয়ে অধিক কোন ব্যক্তিই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের শব্দসমূহ ও উদ্দেশ্যাবলী অবগত নন। এটা নিঃসন্দেহে যে, তাঁরা উত্তম ভাষাবিদ এবং ভাষায় পণ্ডিতও বটে; তদুপরি রাসূলুল্লাহর সাহচর্যলাভ হওয়ায়ে কল্যাণে তাঁর ভাষা অনুযায়ী কথা বলায় তাঁরা অতুলনীয় ছিলেন। তা সত্ত্বেও হাদীসের কিতাবসমূহে এমন কয়েকটি দৃষ্টান্তও রয়েছে যে, স্বয়ং সাহাবাদের মধ্যেও উদ্দেশ্য বর্ণনাকালে কম বা বেশি হয়ে পড়ত।

উদ্দেশ্য সাধনে সাহাবাদের কম বেশী

ইবনে মা'জায় রেওয়ায়েত রয়েছে যে, আবু মুসা আশয়ারী (রাঃ) হযরত (সাঃ) হতে রেওয়ায়েত করছেন যে, মৃতব্যক্তির প্রতি যদি রোদন করা হয় তবে তাকে আজাব করা হয়।

কোন এক ব্যক্তি হযরত আয়েশা (রাঃ)–কে বললেন যে, ইবনে ওমর (রাঃ) এই হাদীস বর্ণনা করছেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, "আমি এটা বলি না যে, ইবনে ওমর মিথ্যা বলছেন। তবে তাঁর ভুল-ভ্রান্তি হতে পারে।"

ব্যাপার এই যে, একটি স্ত্রীলোক মরে গিয়েছিল। তার স্বামী তার জন্য রোদন করছে। আর কবরে তার উপর আজাব হচ্ছে। অপর একটি রেওয়ায়েত রয়েছে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) কোরআনের আয়াত 'একজনের বোঝা অপরজন বহন করবে না' এটা শুনে আপত্তি করলেন যে, একজনের কাজের জন্য যদি অপর দায়ী না হয় তবে স্বামী যদি রোদন করে থাকে, এটা তার অপরাধ। মৃতব্যক্তি তো কোন পাপ করেনি যে, তার উপর শাস্তি নিপতিত হবে?

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এক ঘটনা প্রসঙ্গে এক স্ত্রীলোকের শাস্তি প্রাপ্তির কথা উল্লেখ করছেন। রাবী রোদনকে এর কারণ বলে ঠাওরায়েছেন। আর তিনি হাদীসের বাণী উদ্ধৃত করছেন, 'জীবিতের রোদনের কারণে মৃত ব্যক্তিকে শাস্তি দান করা হয়েছে।'

এরূপে বদরের যুদ্ধ প্রসঙ্গে একটি সাধারণ রেওয়ায়েত এই যে, রাসূল (সাঃ) দণ্ডায়মান হয়ে বললেন, "হে লোক সকল, তোমরা কি তোমাদের প্রতিপালকের কথা সত্য পেয়েছ?" এটা শুনে লোকেরা আরজ করল, "হুজুর বললেন; "আমি যা বলছি, তারা তা শ্রবণ করছে।"

কিন্তু এই ঘটনা যখন হযরত আয়েশা (রাঃ)–এর সম্মুখে পেশ করা হলো, তখন তিনি বললেন, "আল্লাহর রাসূল তা বলেননি। বরং তিনি এই সকল শব্দ ব্যবহার করলেন–'তা পরিজ্ঞাত হয়েছে যে, তাদেরকে যা কিছু বস্তুর প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল তা সত্য।' এখানে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, এই বাক্য দুইটির অর্থের দিক দিয়ে কিরূপ তারতম্য রয়েছে।

ভাব-ধারানুযায়ী রেওয়ায়েতে ইমাম সাহেবের উসুল

ইমাম সাহেব সমূহ অসুবিধার প্রতি দৃষ্টিপাত করে এ সম্বন্ধে নিতান্ত ন্যায় পথ অবলম্বন করেন। তাঁর সময়ের পূর্ব হতে যে সকল হাদীস ভাব-ধারানুযায়ী রেওয়ায়েত করা হয়েছিল এবং মুহাদ্দেসীন যা প্রচার করে এসেছিলেন, তা গ্রহণ না করে কোন উপায় ছিল না। অন্যথায় রেওয়ায়েতের সবকিছু বিভাগ অচল হয়ে পড়ত। কাজেই ইমাম সাহেব সেই সকল হাদীস কবুল করলেন। কিন্তু তিনি তাৎপর্য ও উদ্দেশ্যাবলীর সাথে সুপরিচিত হতে হবে। উদ্দেশ্যানুযায়ী তাৎপর্য গ্রহণের সম্ভাবনা তাতেও পরিপূর্ণভাবে রয়ে গেল। বিপরীতমুখী কোন দলীল পাওয়া না গেলে, ভাব অনুযায়ী রেওয়ায়েত পন্থা গ্রহণযোগ্য বলে স্বীকৃতি পেল। যে সকল হাদীসের রেওয়ায়েত বিশ্বাসযোগ্য ইমাম সাহেব তা গ্রহণ করলেন। আর তাতে অনুভূতি-ধারার প্রতি সবিশেষ মনযোগ প্রদান করা হলো। ইমাম সাহেবের এই সকল নিয়ম সম্বন্ধে অন্যান্য ইমামগণও একমত হলেন। আল ফাকীহুল হাদীসে লিখিত রয়েছে যে, যে সকল লোক শব্দাবলীর মর্ম উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত না হবেন, তাঁদের পক্ষে শব্দসহ রেওয়ায়েত করা আবশ্যকীয়। আর যে সকল লোক অনুমানের উপর উদ্দেশ্য স্থির করে থাকেন, তাঁদের সম্বন্ধে অবশ্যই মত বিরোধ রয়েছে। অধিকাংশের মত এই যে, তাঁরা শব্দসমূহের পাবন্দ নন। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা সেই অনুমতি সাহাবা এবং তাবেয়ীনদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন। আর অপরাপরদের নিমিত্ত শব্দসহ রেওয়ায়েতের বিধান করে দিয়েছে।

আর ইমাম তাহাবী লিখছেন যে, শুধু সেই সমস্ত হাদীস রেওয়ায়েত করতে হবে, যা রেওয়ায়েত করার সময় স্মরণ থাকে। মুল্লা আলী কারী সেই রেওয়ায়েতকে নকল করে লিখছেন যে, এর সারকথা এই যে, ইমাম আবু হানীফা ভাব অনুযায়ী রেওয়ায়েতকে জায়েয রাখছেন।

ইমাম মালেক ও অন্যান্য মোহাদ্দেসীনও ইমাম সাহেবের সাথে একমত

হয়েছেন। কিন্তু সাধারণ রেওয়ায়েতকারীগণ এত কঠোর পন্থা অবলম্বনের পক্ষপাতী থাকতে পারেননি। কাজেই এক বিরাট দল ইমাম সাহেবের বিরোধিতা করছেন। আর ইমাম সাহেবকে কঠোর রেওয়ায়েতকারী বলে আখ্যা দিয়েছেন। তথাপি এটা সত্য যে, ইমাম সাহেব যে পন্থা অবলম্বন করছেন তা অত্যন্ত জরুরী। হাদীস শরীফেও আছে, "আল্লাহর রাসূল বলছেন খোদা সেই ব্যক্তিকে পুরস্কৃত করবেন, যে ব্যক্তি আমার কাছ হতে কিছু শুনছে এবং এটা হুবহু অপরের কাছে পৌছায়ে দিয়েছে।"

এ সম্বন্ধে এর চেয়ে উত্তম দলীলের আর কি প্রয়োজন থাকতে পারে? সাহাবাদের মধ্যে যাঁরা শব্দ শব্দ রেওয়ায়েতকে অনাবশ্যক ভেবে থাকেন, তাঁদের কাছে বোধ হয় এই হাদীস পৌছেনি। অনন্তর যে সাহাবার সম্পর্কে এটা প্রমাণিত হয়েছে, তিনি এই হাদীস শ্রবণ করছেন যেমন আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) এবং তিনি এই হাদীসের রাবী। তিনিও শব্দ শব্দ রেওয়ায়েতের পক্ষপাতী। ইমাম আবু হানীফার জমানায় এটা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

উসূল-অনুভূতি

হাদীস-বিষয় সম্বন্ধে ইমাম আবু হানিফা সর্বশ্রেষ্ঠ খেদমত এই করছেন যে, তিনি দেরায়ত (অনুভূতি) সম্বন্ধে বিধি-বিধান কায়েম করে গিয়েছেন। রেওয়ায়েত ব্যাপারে আমাদের আলেমবৃন্দ যেরূপ মনোযোগ দান করছে অতীত ইতিহাসে এর দৃষ্টান্ত মিলবে না। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, রেওয়ায়েতের সঙ্গে অনুভূতির ততখানি সংযোগ রক্ষা করেননি। হাফেজ ইবনে হাজরের লেখা হতে বুঝা যায় যে, এই বিষয়ে কোন কোন গ্রন্থকার গ্রন্থ লিখে গিয়েছেন। কিন্তু তা স্বল্প এবং এত পূর্বাপরশূণ্য যে, এটা আদৌ উল্লেখযোগ্য নয়।

উসূলে হাদীস একটি বিশিষ্ট বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়ে গিয়েছে। এ সম্পর্কে বড় বড় গ্রন্থ লিপিবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু এদের মধ্যে অনুভূতির প্রতি যথাযথ মনোযোগ দান করা হয়নি। অথচ হাদীস শাস্ত্রে এটা সবিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়। একা ইমাম আবু হানীফা সাহেব এই গৌরব অর্জন করছেন। তৎপূর্বে এটা নাম নিশানও ছিল না, ইমাম সাহেবের সূক্ষ্মদৃষ্টি যথাসময়ে তৎপ্রতি নিপতিত হলো। এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, সাহাবাদের সময়েই এর কিছু কিছু আভাস পাওয়া গিয়েছিল।

প্রকৃতপক্ষে তাই ইমাম সাহেবের জন্য দলীল স্বরূপ ছিল। কিন্তু তা অন্যান্য

সমস্যার নীচে এইরূপ চাপা পড়ে গিয়েছিল যে, তৎপ্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়নি।

এর সকল রাবী জবরদস্ত ও বিশ্বাসযোগ্য। কিন্তু ঘটনা সত্য নয়, হাদীসে এইরূপ অসংখ্য ঘটনা রয়েছে। এই জন্য এটা আবশ্যকীয় যে, শুধু রেওয়ায়েতের ভিত্তি দ্বারা হাদীসের মীমাংসা করা চাই না, বরং এটাও দেখা চাই যে, তা উসূলের দেরায়ত মুতাবিক কিনা।

দেরায়ত (বুদ্ধিমত্তা) শব্দের অর্থ এই যে, যখন কোন ঘটনা বর্ণনা করা হয় তখন চিন্তা করা আবশ্যক যে, মানুষের স্বাভাবিক বাসনা কামনা কি এবং সমসাময়িক প্রয়োজন কি! এ সকলের সাথে যদি খাপ না খায় তবে তা সন্দেহজনক। অর্থাৎ তখন বুঝতে হবে যে, রেওয়ায়েতের উলট পালট মূল ঘটনা বিকৃত হয়ে গিয়েছে। হাদীসের এই জাতীয় তত্ত্বানুসন্ধান ও সংশোধনের প্রতিও বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। এটাকেও রাসূলের রেওয়ায়েত বলা হয়। হাদীস-শাস্ত্রে বিশারদ আল্লামা ইবনে জুজী লিখছেন–যে হাদীসকে আপনি বুদ্ধির বিরোধী দেখতে পাবেন বা যা যদি উসূল-বিরোধী হয়, তবে বুঝতে হবে যে, তা মৌজু। সেই সম্বন্ধে অপর হাল-হাকীকত জানবার প্রয়োজন নেই। আর তা বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার বহির্ভূত হয়, তবে তাও মৌজু।

যে হাদীস অকাট্য বুদ্ধির বিরোধী তা সহী নয়

ইবনে জুজী সমগ্র উসূলে দেরায়তে শত প্রকার বুঝাতে চেষ্টা করছেন, যে হাদীস সুস্পষ্ট বুদ্ধির বিরোধী, তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। সেই সময়ে ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষা উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেছিল। আর দার্শনিক ভাবধারা জন-বোধগম্য হয়েছিল।

কিন্তু ইমাম আবু হানীফার জমানা পর্যন্ত ধর্মীয় ব্যাপারে বুদ্ধির নাম নেওয়া এক মহা পাপ বলে বিবেচিত হতো। ইমাম সাহেব যখন প্রথম প্রথম এই পথ অবলম্বন করতে চাইলেন এবং রেওয়ায়েতকে সুপরিচালিত করার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেলেন, তখন তাঁকে ঘোর বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এমন হাদীস যদি ইমাম সাহেবের সম্মুখে পেশ করা হতো যা অসম্ভব এবং পরিস্থিতির খেলাফ, তবে ইমাম সাহেব তা গ্রহণ করতেন না।

জনসাধারণ এ সকল বরদাস্ত করে উঠতে পারত না। রেওয়ায়েত সম্বন্ধীয় হাল অবস্থা দ্বারা তারা রেওয়ায়েতকে জানতে বুঝতে এবং সংশোধন করতে

প্রয়াস পেত। উসূলে দেরায়তের প্রতি তাদের কোন আগ্রহ ছিল না। অর্থাৎ বুদ্ধিমত্তার মাপকাঠিতে সবকিছুকে যাচাই করা তাদের অভ্যাসগত ব্যাপার ছিল না। পরবর্তী কালে যদিও তা উসূলে হাদীসে স্থান পায়, তথাপি রেওয়ায়েত-প্রধানগণ তৎপ্রতি গভীর গুরুত্ব প্রদান করেননি।

'এই ভূত অত্যন্ত সম্মানী এবং এর শাফায়াতের আশা করা যায়' এরূপ কথা বলে হযরত (সাঃ) ভূতের প্রশংসা করছেন এরূপ কথা প্রচারিত রয়েছে। অনেকের ধারণা, উক্ত বাণী হযরতের কর্ণে শয়তান ঢেলে দিয়েছিল। তিনি এটা পাঠ করার পর জিব্রাইল (আঃ) এসে অভিযোগ করলেন। "আমি-তো আপনাকে এটা শিক্ষা দেইনি? আপনি কোথা হতে এটা পাঠ করলেন?" এই হাদীসকে ইমাম আজম সাহেবের উসূল অনুযায়ী কাজী আইয়াজ ও আবু বকর বাইহাকী প্রমুখ মুহাদ্দেসীন ভুল বলে আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু মুহাদ্দেসীনদের এক বিরাট দল এখনও একে সহী বলে তসলীম করে থাকেন।

পরবর্তী কালে হাফেজ ইবনে হাজরের চেয়ে অধিক বিখ্যাত মুহাদ্দেস অপর কেউই ছিলেন না। তিনি বড় জোরেসোরে এই হাদীসের সমর্থন করছেন। তিনি বলেন, "এর রেওয়ায়েতকারী বিশ্বাসযোগ্য কাজেই একে অস্বীকার করা চলে না।

অন্য একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, একদিন হযরত আলীর (রাঃ) আসরের নামায কাজা হয়ে গিয়েছিল। এজন্য হযরতের দোয়ার ফলে সূর্য ডুবে যাওয়ার পর আবার তা উদিত হয়।

ইবনে জুজী একে মৌজু বলে মন্তব্য করছেন। কিন্তু হাফেজ ইবনে হাজর ও জালালুদ্দীন সউতী প্রমুখ অনেকে এর ঘোর প্রতিবাদ করছেন। ইমাম সাহেব এর বিরোধিতা করছেন। এটা ভুললে চলবে না যে, আজকাল জ্ঞানী-মানীদের ন্যায় ইমাম সাহেব এই সকল শব্দের প্রতি কোন গুরুত্ব প্রদান করেননি। একে স্বীকার করলে শরীয়তের বহু মৌলিক মসআলা বরবাদ হয়ে যায়।

হাদীস ও কেয়াস

ইমাম সাহেবের বর্ণনা হতে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, হাদীসের মুকাবেলায় তিনি কিয়াসের প্রতি আদৌ গুরুত্ব প্রদান করতেন না।

ইমাম মুহাম্মদের অভিমত এই যে, কোন ব্যক্তি যদি রমযান মাসে ভুলে কিছু পানাহার করে ফেলে, তথাপি রোযা বিনষ্ট হবে না। এবং এর কাজাও করতে হবে না।

হাঁ, এটা সত্য যে, হাদীসের প্রামাণ্য ব্যাপারে ইমাম সাহেব অত্যন্ত শক্ত ছিলেন। হাদীসের শর্তাবলী না পাওয়া পর্যন্ত তিনি তা কবুল করতেন না। আর শর্তাবলী অনুযায়ী হাদীস প্রমাণিত হলে কেয়াসের প্রতি তিনি কোনই গুরুত্ব প্রদান করতেন না।

কেয়াসের বিভিন্ন অর্থ

আমি যতখানি তত্ত্বানুসন্ধান করতে পেরেছি, তাতে আমার দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, ইমাম সাহেব কস্মিনকালেও হাদীসের চেয়ে কেয়াস ও ফিকাহর প্রতি অধিক গুরুত্ব প্রদান করেননি। কিন্তু তাঁর সময় পর্যন্ত কেয়াস শব্দটি অত্যন্ত প্রশস্ত অর্থে ব্যবহৃত হতো। আর এতে সন্দেহের অবকাশ নাই যে, কেয়াস শব্দের এই প্রশস্ততার দরুণই ইমাম সাহেব কেয়াসকে হাদীস নির্বাচনকারী রূপে গ্রহণ করেন।

মাসায়েল ও আহকামে শরীয়তের ব্যাপারে ইসলাম জগতে প্রথম হতেই দুইটি দল গড়ে উঠেছিল। এক দলের বিশ্বাস এই যে, শরীয়তের হুকুম-আহকাম কোন মংগল ও জ্ঞানবুদ্ধির সীমানায় সীমাবদ্ধ নয়। অপর দলের বিশ্বাস এই যে, শরীয়তের সমূহ আদেশ-নিষেধ মঙ্গলের উপর নির্ভরশীল। তন্মধ্যে কতকগুলো মঙ্গল অত্যন্ত সুস্পষ্ট। আর এমন কতকও রয়েছে যে, এর সমূহ মঙ্গল আমরা অবগত নেই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাও মঙ্গলশূন্য নয়।

এই সকল বিভিন্ন মতবিরোধের নিমিত্ত হাদীস রেওয়ায়েতের বিভিন্ন ধারা প্রচলিত রয়েছে। এমনও অনেকে রয়েছেন যে, যখনই তাঁরা কোন হাদীস শুনেন, তখন তাঁরা এতটুকু লক্ষ্য রাখেন যে, এর রেওয়ায়েতকারী বিশ্বাসযোগ্য কিনা, তাঁদের ধারণা মতে তা যদি গ্রহণযোগ্য ও প্রমাণসাপেক্ষ হয়ে থাকে, তখন তাঁরা অপর কোন কিছুর জন্য তত মাথা ঘামান না এবং অতি অনায়াসে হাদীস গ্রহণ করে থাকেন।

অপর যে দল জ্ঞান বুদ্ধি ও বিবেচনার প্রতি অধিক গুরুত্ব প্রদান করেন। তাঁরা দেখেন যে, মাসআলা হাদীসের আকীদা অনুযায়ী টিকে কিনা এবং তা বুদ্ধি ও মঙ্গলরসে ভরপুর কিনা। সেই গুণ যদি তাতে না থেকে থাকে, তখন তাঁরা সেই হাদীসগুলো সম্বন্ধে অধিক তত্ত্বানুসন্ধান নিয়ে থাকেন। এবং তা সংশোধন ব্যাপারে আপ্রাণ চেষ্টাসাধ্য করে থাকেন। রাবী বুদ্ধিমান কিনা এবং রেওয়ায়েত ব্যাপারে তাঁর কতখানি মর্যাদা রয়েছে; তা শব্দ শব্দ রেওয়ায়েত করা হয়েছে,

নাকি ভাব অনুযায়ী রেওয়ায়েত করা হয়েছে; কাকে লক্ষ্য করে তা বর্ণনা করা হয়েছে। তখন পারিপার্শ্বিকতা কিরূপ ছিল! মোটকথা এই জাতীয় কার্যকারণ ও ভিত্তি ভূমির প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হয়ে থাকে। এই সকল তথ্য হতে মূল সত্য প্রকাশিত হয়ে পড়ে।

তাহকীক ও বিস্তৃত ব্যাখ্যার পন্থা

সহী ইবনে মাজা ও তিরমিযীতে উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) রাসূল (সাঃ) হতে হাদীস রেওয়ায়েত করছেন, "অগ্নি যে বস্তুকে পরিবর্তিত করে দিয়েছে, তা ব্যবহার করলে অজু বিনষ্ট হয়ে যাবে।" এজন্য কোন কোন মুজতহেদের মত এই যে, গোস্ত খাইলেও অজু করতে হবে।

আবু হুরাইরা (রাঃ) যখন এই হাদীস বয়ান করছিলেন, তখন আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, "এই হাদীসের ভিত্তিতে তো গরম পানি ব্যবহার করলেও নতুন অজু করতে হবে।" আবু হুরাইরা (রাঃ) বললেন, হে ভ্রাত! আল্লাহর রাসূল হতে যখন কোন রেওয়ায়েত শুনতে পান, তখন এর উপর কোন দৃষ্টান্ত দিবেন না।' এরপরও আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) নিজের অভিমতের উপর কায়েম রইলেন।

ইবনে ওমর (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত 'আত্মীয় রোদন করলে মৃতব্যক্তি শাস্তির ভাগী হবে।' হযরত আয়েশা (রাঃ) এর প্রতিবাদ করেছেন। সাহাবাদের জীবনে এরূপ বহু ঘটনা রয়েছে।

ইমাম আবু হানীফাও এরূপ মত ছিল। লোকেরা তাঁর এই মতবাদকে কেয়াস নামে আখ্যা প্রদান করছে। শাহ ওলিউল্লাহ সাহেবের অতুলনীয় কিতাব এই বিষয় সম্বন্ধে যথেষ্ট। এখানে এতটুকু বলা যথেষ্ট যে, ইমাম গাজ্জালী, শাহ ওলি-উল্লাহ প্রমুখ মহাজ্ঞানী ওলমায়ে ইসলামদেরও একই অভিমত ছিল। ইমাম আবু হানীফা হাদীস সংশোধন ব্যাপারে এই নিয়মকে অতি আবশ্যক বোধে বাহাল রেখে দিয়েছেন। এমন দুটি হাদীস যদি রেওয়ায়েত হিসেবে সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে দাঁড়ায়, তবে তন্মধ্যে সেই হাদীসটির প্রতি অধিক গুরুত্ব প্রদান করতে হবে, যা উল্লেখিত উসুল অনুযায়ী টিকে।

ইমাম সাহেব সময় সময় শুধু এই উসুলের সাথে খাপ না খাওয়ায়ে কোন কোন হাদীসকে গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করছেন।

হাদীস বাছাই বা যাচাই কোনটাই সহজ-সরল কাজ নয়। এটা দুনিয়াদারীর

ব্যাপার নয়। দুনিয়া ব্যতীত অপর কোন কিছুর সাথে মোহাদ্দেসীনদের যোগাযোগ থাকে। একে একপ্রকার এলহাম বলা হয়। ইমাম বোখারীর উস্তাদ আলী বিনেল মদীনী খুব নামজাদা মোহাদ্দেস ছিলেন। তিনি বলছিলেন,–"এটা একপ্রকার এলহাম। বাইরের কোন লোক যদি এর দলীল চায় তবে তা পেশ করা সম্ভবপর হবে না।

এক ব্যক্তি মুহাদ্দেস আবু হাতেমের কাছে কয়েকটি হাদীস জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি তন্মধ্যে কতককে প্রচলিত কথা, কতককে বাতেল, কতককে অগ্রাহ্য এবং কতককে সহী বললেন।

প্রশ্নকারী বললেন, "আপনি কি প্রকারে তা বুঝতে পারলেন? এই সকল হাদীসের রাবী কি এ সম্বন্ধে আপনাকে কোনকিছু জ্ঞাপন করায়েছেন?" আবু হাতেম বললেন, "না, বরং আমি এভাবেই বুঝে নিই।"

প্রশ্নকারী বললেন, "তবে কি আপনি গায়েবের খবর জানেন বলে দাবী করে থাকেন?"

আবু হাতেম জবাবে বললেন, "আপনি অন্যান্য মুহাদ্দেসীনদের কাছে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করুন। তাঁরা যদি আমার সাথে একমত হন, তবে বুঝতে হবে যে, আমি অসমীচীন কিছুই বলিনি।"

সেই প্রশ্নকারী হযরত আবু জরআর কাছে যেয়ে সেই সকল হাদীস জিজ্ঞেস করলেন। তিনিও হুবুহু আবু হাতেমের মত বললেন। তখন প্রশ্নকারী শান্ত হলেন।

মুহাদ্দেসীনদের কেউ কেউ বললেন, "এটা একটি ভাবধারা। তা হাদীসের ইমামের অন্তরে ঢেলে দেয়া হয়। কিন্তু সেই ব্যক্তি তা প্রবাহিত করতে পারে না।"

মুহাদ্দেসীনদের এ সকল দাবী সম্পূর্ণ সত্য। এটা সন্দেহাতীত যে, রেওয়ায়েতকারীদের মধ্যে এমনই একটা প্রেরণা জাগে যা দ্বারা তাঁরা নিজেরাই বুঝতে পারেন যে, এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের বাণী হয় কিনা। শরীয়তের আহকাম মাসায়েল, রহস্য ও মঙ্গলের অনুকরণ ও অনুসরণের ফলে তাঁদের অন্তরে এমন একটি প্রেরণা জাগে যে, তাতে তাঁরা এটা আল্লাহর রাসূলের বাণী কিনা তা স্বাচ্ছন্দে উপলব্ধি করতে পারেন। কিন্তু এ সকল রহস্য এবং মঙ্গলের অনুকরণ-অনুসরণ মুহাদ্দেসদের সূক্ষ্ম দৃষ্টিপাত করেই ইমাম আজম সাহেব কতক হাদীসকে গ্রহণ করছেন এবং কতক হাদীসের বিরোধিতা করছেন।

অনেকের ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে যে, ইমাম সাহেব বুদ্ধির মাপকাঠিতে হাদীসের রদ করে থাকেন। মোটকথা এই যে, হাদীস গ্রহণ ও রদ করা সম্পর্কে যা কিছু জ্ঞান-গরিমা ও বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন, ইমাম আবু হানীফা সাহেবের মধ্যে সেই সকলের কোনকিছুরই অভাব ছিল না। তবে এটা সত্য যে, এটা অতি সূক্ষ্ম কর্তব্য ও গুরুদায়িত্ব পরিপূর্ণ কাজ। অতি বড় আলেম, মুজতাহেদ, মুহাদ্দেস, ফিকাহ-বিদ এবং আল্লাহ তায়ালার সাহায্যপুষ্ট লোক ব্যতীত অপর কারও পক্ষে এ কার্যের ভার গ্রহণ শোভা পায় না। এবং ইমাম আজম সাহেব এই সম্পর্কীয় সর্বগুণে ভূষিত ছিলেন।

হাদীসের সমূহ স্তর ও পার্থক্য

হাদীসাবলীর স্তরসমূহ নির্ণয় এবং সকলের সম্মুখে উহাদের পার্থক্য স্পষ্ট ও প্রকট করে দেওয়ায়ে ইমাম সাহেব বর্ণনাতীত জ্ঞান-গরিমা, সূক্ষ্ম ও দূরদৃষ্টি প্রদর্শন করছেন। শরীয়তের হুকুম-আহকাম এবং মসায়েল সম্পর্কে বর্ণনা করতে যেয়ে তিনি কোরআন শরীফকেই সর্বশ্রেষ্ঠ আধার বলে প্রতিপন্ন করছেন। তাঁর নির্বাচন যে অকাট্য ও ধ্রুব এটা সন্দেহাতীত। কোরআনের পরেই তিনি হাদীসের স্থান দিয়েছেন। কোরআন ও হাদীসের মধ্যে মৌলিকতার দিক দিয়ে খুব বেশী পার্থক্য নেই। হযরত জিব্রাইল আলাইহিচ্ছালামের মারফত কোরআন নাজিল হয় এবং তিনি স্বয়ং তা পাঠ করে হযরত (সাঃ)-কে শুনায়ে দেন। হাদীস ও অহী ব্যতীত আর কিছুই নয়। তবে তা জিব্রাইল (আঃ) হযরত (সাঃ)-কে পাঠ করে শুনাননি। এজন্য কোরআনকে 'অহী-মতলু' এবং হাদীসকে 'অহী গায়ের মতলু' বলা হয়। প্রামাণ্যের দিক দিয়েই স্তর বিন্যাস ও মত বিরোধ রয়েছে। কোন হাদীস যদি অকাট্য প্রমাণের দিক দিয়ে কোরআনের ন্যায় প্রমাণিত হয়, তবে আদেশ নির্ধারণে তা কোরআনের সমকক্ষ। কিন্তু প্রমাণের দিক দিয়ে হাদীসের বহু স্তর রয়েছে। কাজেই আদেশ নির্ধারণে এই সকল স্তর বিন্যাসের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। সহী, হুসন, জঈফ, মশহুর, আজীজ ও গরীব ইত্যাদি হাদীসের যা কিছু স্তর রয়েছে, এদের স্তর বিভিন্ন হলেও এদের প্রত্যেকটিরই আদেশ নির্ধারণের ক্ষমতা রয়েছে।

মোহাদ্দেসীন জঈফ হাদীসের প্রতি কোন গুরুত্ব আরোপ করেন না। এতদ্ব্যতীত তাঁরা অপরাপর সবগুলোকেই প্রায় কাছাকাছি গুরুত্ব প্রদান করে থাকেন। মোহাদ্দেসীনের পক্ষে এ সকলের প্রতি অধিক গুরুত্ব দেওয়ার কোন

প্রয়োজন ছিল না। কেননা আদেশ নির্বাচন ও মাসায়েলের শ্রেণীবিভাগ তাঁদের জন্য ফরজ নয়। ইমাম আবু হানীফা ফিকাহ্ শাস্ত্রের ভিত্তি স্থাপনকারী ছিলেন। এজন্য তাঁর পক্ষে অধিক সূক্ষ্মদৃষ্টি ও শ্রেণীবিভাগের পার্থক্য প্রদর্শন প্রয়োজনীয় ছিল। প্রকার ভেদে তিনি হাদীসকে মুতওয়াতের, মশহুর ও আহাদ এই তিন ভাগে বিভক্ত করছেন।

মুতাওয়াতের

অসংখ্য লোক রাসূল (সাঃ)–এর কাছ হতে যে সকল হাদীস রেওয়ায়েত করছেন এবং তা মিথ্যা হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নাই এবং সেই সকল লোক হতে আরম্ভ করে আখেরী জমানা পর্যন্ত অসংখ্য লোক তা রেওয়ায়েত করতে থাকবে, এদেরকে মুতাওয়াতের হাদীস বলা হয়।

মশহুর

যে সকল হাদীস প্রথম তব্কাতে বা পর্যায়ে অতি কম রেওয়ায়েত কিন্তু দ্বিতীয় তব্কা হতে শেষ সময় পর্যন্ত এত অধিক পরিমাণে রেওয়ায়েত হতে থাকবে যে, মুতাওয়াতের হাদীস এবং মশহুর হাদীস একই শর্তাধীনে হয়ে পড়ে।

আহাদ

যা মুতাওয়াতের ও মশহুর হাদীসের অনুরূপ নয়। মুতাওয়াতের দ্বারা ফরজ প্রমাণিত হয় না। কিন্তু কোরআন শরীফে যে সকল হুকুম মুতলক রয়েছে, মশহুর হাদীস দ্বারা তা নির্দেশিত হয়ে থাকে। হাদীসে সুস্পষ্ট কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ইমাম শাফেয়ী এবং কোন কোন মুহাদ্দেসীন এর বিরোধিতা করছেন।

এই মসআলা সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা কঠোর প্রতিবাদ এই হয়েছে যে, স্বয়ং ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর ছাত্রবৃন্দ মাসআলার পাবন্দি করেননি। শাহ ওলিউল্লাহ সাহেব 'হুজ্জতুল্লাহিল বালেগা' কিতাবে লিখেছেন যে, ইমাম মুহাম্মদকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনাদের রায় মতে কি খবরে ওয়াহেদ দ্বারা কোরানের চেয়ে অধিক গুরুত্ব প্রদান করা যায় না?" ইমাম মুহাম্মদ বললেন, "হাঁ, তাহা পারা যায়।" ইমাম শাফেয়ী বললেন, "কোরআন মজীদে উত্তরাধিকারীদের সম্বন্ধে অছিয়তের আদেশ রয়েছে। কিন্তু আপনার 'হাদীসে ওয়াহেদ' দ্বারা উত্তরাধিকারের জন্য অছিয়ত করাকে কিরূপে নাজায়েয বলে সাব্যস্ত করলেন?"

ইমাম শাফেয়ী সাহেবের গুণাবলী সম্বন্ধে বায়হাকি যে রেওয়ায়েত করেছেন, শাহ সাহেব সম্ভবতঃ সেই রেওয়ায়েত হতে তা গ্রহণ করেছেন। সেখানে আরও অন্তহীন রেওয়ায়েত রয়েছে। কিন্তু আমরা শাহ সাহেবের খেদমতে আরজ করেছি যে, হানফীদের কাছে কোন হাদীস দ্বারাই উত্তরাধিকারীদের অধিকার বিনষ্ট হয় না। এটা শুধু হানফীদের অভিমত নয়, বরং সকল তফসীকারদেরও মত তাই।

এই মাসআলা সম্বন্ধে আরও শত সহস্র তর্কের উদ্রেক হয়েছে। আমরা এখানে এর বিস্তৃত বিবরণ দিতে চাই না। কিন্তু 'আখবারে আহাদ' সম্বন্ধে তর্ক এবং এটা দ্বারা আকায়েদে ইসলামে যা কিছু প্রভাব পড়েছে, এখানে আমরা এটাকে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করছি।

আখবারে আহাদ সম্বন্ধে দুটি কথা

'আখবারে আহাদ' সম্বন্ধে যদিও মুহাক্কেকীন ও অধিকাংশ হাদীসের ইমামদের অভিমত এই যে, তথাপি একটি দল এর বিরোধিতাও করছেন। আল্লামা ইবনে সালাহ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি আখবারে আহাদের সকল হাদীসের অকাট্যতা স্বীকার করেননি তিনি সহী হাদীসকে সাতটি শ্রেণীতে বিভক্ত করছেন।

(১) যে সম্বন্ধে বোখারী ও মুসলেম একমত হয়েছেন।

(২) শুধু বোখারীর মত।

(৩) এটা শুধু মুসলেমের মত।

(৪) বোখারী ও মুসলেম তা রেওয়ায়েত করেননি। কিন্তু শর্তাবলীর সাথে তাঁরা এক মতাবলম্বী।

(৫) তা শুধু বোখারীর শর্তানুযায়ী।

(৬) তা শুধু মুসলেমের শর্তানুযায়ী।

(৭) তা বোখারী ও মুসলেমের শর্তাবলীর নয়; কিন্তু অন্যান্য মোহাদ্দেসীন এ সকলকে সহী বলে তসলীম করছেন।

এই সাত শ্রেণীর মধ্যে আল্লামা ইবনে সালাহ প্রথমটিকে অকাট্য বলে স্বীকার করছেন। ইবনে সালাহের উক্ত মত যদিও বাহ্যিকদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিদের কাছে এবং বিশেষভাবে আজকাল বহু লোকের সমর্থন লাভ করছেন, তথাপি এটা নিঃসন্দেহ যে, এটা ভুল এবং এটার পিছনে কোন দলীল নাই। আর স্বয়ং হাদীসের ইমামগণ এর বিরোধী।

আল্লামা নূদী সহীহ মুসলেমের শরাতে ইবনে সালাহের বাণী বিস্তৃতভাবে বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখছেন–শেখ ইবনে সালাহ এই প্রসঙ্গে যাকিছু বলছেন, তা মোহাক্কেকীন ও অন্যান্য অধিকাংশ লোকের মতের বিরোধী; কেননা, তা আখবারে আহাদ; এবং আখবারে আহাদ সম্পর্কে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, তা হতে শুধু ধারণার উদ্রেক হয় এবং এ সম্বন্ধে বোখারী-মুসলেম এবং অন্যান্য সকলে বরাবর। ইবনে সালাহের বাণীকে অন্যান্য শাস্ত্রবিশারদ ইমামগণও রদ করছেন। কিন্তু আমরা তা শুধু মৌখিকভাবে মীমাংসা করতে চাই না। আমাদেরকেও চিন্তা করে দেখতে হবে যে, আখবারে আহাদ দ্বারা 'একীন' পয়দা হয়, নাকি ধারণার উদ্রেক হয়।

হাদীসকে ধারণামূলক বলবার সমূহ কারণ

যে কোন পর্যায়ের কোন মুহাদ্দেস যখন কোন একটি হাদীসকে সহী বলেন, তখন তাঁর দাবী নিম্নলিখিত কয়েকটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে–

(১) রেওয়ায়েত ধারাবাহিক হওয়া চাই,

(২) তাঁর রেওয়ায়েত বিশ্বাসযোগ্য হওয়া চাই,

(৩) ধীর বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া চাই, এবং

(৪) রেওয়ায়েত এমন হয়ে চাইনা যে, অতি কম লোকে তা রেওয়ায়েত করছেন।

এই সবকিছু ধারণামূলক এবং এজতেহাদমূলক। এই সমস্তকে ভিত্তি করেই একীন গড়ে উঠে। কোন একজন ফকীহ যখন কোরআন বা হাদীস হতে কোন মাসআলা নির্বাচন করে নেন এবং স্বীয় ধারণা অনুযায়ী সহী বলে ধারণা করে নেয়, তা বিশ্বাসযোগ্য নাও হতে পারে। কারণ যে সকল কার্য-কারণের উপর নির্ভর করে একীন করা হয়, তা সমুদয় ধারণামূলক

হাদীসের অবস্থাও তাই। কোন হাদীসকে সহী বলতে হলে, মুহাদ্দেসকে ধারণা ও এজতেহাদের উপর নির্ভর করতে হয়। কোন একজন বা কতিপয় মুহাদ্দেস যদি কোন হাদীসকে সহী বলেন এবং অপর ব্যক্তি এর অকাট্যতা যদি স্বীকার না করেন, তবে সেই ব্যক্তি এতটুকু পাপী হবে যে, সেই ব্যক্তি সেই মুহাদ্দেসীনের অনুসন্ধান-ধারা নির্বাচন-পদ্ধতি, রেওয়ায়েত-পন্থা মোটকথা তাঁদের এজতেহাদের বিরোধী।

হাদীসের তত্ত্বানুসন্ধান ও সংশোধন ব্যাপারে মুহাদ্দেসীন যে সকল বিধি

বিধানানুযায়ী চলে থাকেন এবং সেই সকলের উপর নির্ভর করেই হাদীসের স্তর সমূহ নির্ণীত হয়ে থাকে, তৎসমুদয়ই বুদ্ধি প্রসূত এবং এজতেহাদী মাসায়েল। এবং এর কারণ যে, স্বয়ং মুহাদ্দেসীনের মধ্যে ঘোর মতবিরোধ থাকায় বাহ্যিক দৃষ্টিশক্তি-সম্পন্ন লোকের ধারণা এই যে, হাদীস শাস্ত্র একটি নকল বিষয়। কিন্তু যে ব্যক্তি উসূলে হাদীস সম্বন্ধে চিন্তা করেন, তিনি সেই ভ্রম ধারণাকে অনায়াসে বুঝতে পারেন।

দুরস্তি ও দুরস্তি-ত্রুটি সম্বন্ধে মতবিরোধ

ধারণা ও এজতেহাদের উপর উসূলে হাদীস নির্ভরশীল হওয়ায়ে ফল এই দাঁড়িয়েছে যে, মুহাদ্দেসীনদের মধ্যে হাদীসসমূহের দুরস্তি এবং এর ত্রুটি সম্পর্কে আপোসের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।

এক হাদীসকে একজন মাহাদ্দেস অত্যন্ত সহী, সনদযুক্ত এবং গ্রহণ যোগ্য মনে করে থাকেন। অপর মুহাদ্দেস একে সঈফ বরং মৌজু বলে থাকেন।

মুহাদ্দেস ইবনে জুজী বহু হাদীসকে মৌজু বলে সাব্যস্ত করছেন। অথচ অপরাপর মুহাদ্দেসীন এদেরকে সহী ও হুসন বলছেন। বোখারী ও মুসলেমের হাদীস ব্যতীত অপরাপর বহু হাদীসকে ইবনে জুজী মৌজু বলে উল্লেখ করছেন।

আল্লামা সাখাবী লিখছেন–বোখারী ও মুসলেমেও যে সকল উল্লেখ করছেন। নিশ্চয় ইবনে জুজী ভুল করছেন। কিন্তু সেই ভুলকেও এজতেহাদী ভুল বলতে হবে। তিনি এমনকি বোখারী ও মোসলেমের এজতেজাদকেও ভ্রমাত্মক বলছেন। সেই উসূলী মতবিরোধিতার ফলে হাদীসসমূহের দুরস্তি ও দুরস্তি-ত্রুটি সম্বন্ধে যা কিছু মতবিরোধ দেখা দিয়েছে, তা লিপিবদ্ধ করলে এক বিরাট গ্রন্থে পরিণত হবে।

রাসূল (সাঃ) পর্যন্ত জারী হলে এটাকে 'হাদীসে মরফু' বলা হয়। কিন্তু সংলগ্ন হওয়ার যে তরীকা নির্দিষ্ট রয়েছে, তন্মধ্যে প্রায়গুলোই ধারণামূলক এবং এজতেহাদী। 'এই কাজটি সুন্নত' অনেক সাহাবাকে এইরূপ বলতে শুনা যায়। আবার অনেকে বলেন, 'রাসূল (সাঃ)–এর জমানায় আমরা এরূপ কাজ করতাম'। বা কেউ কেউ বলেন, 'আমরা অমুক কাজকে মন্দ জানতাম'। অনেকে এতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছেন যে, সে সকল হাদীসে এই সকল শব্দ ছিল, সেই সকলকে শব্দসহ রেওয়ায়েত করে বলছেন, আল্লাহর রাসূল এরূপ বলছেন। অথচ সেই সকল শব্দ অকাট্য ছিল না। বরং তা সাহাবাদের ধারণা ও এজতেজাদের উপর নির্ভরশীল ছিল। সাধারণভাবে এ সকলকে তসলীমও করা হয়েছে।

অনেকে বলছেন, 'সাহাবাদের বুঝ কোন দলীল নয়'। এ সম্বন্ধে কোন কোন আলেম মতবিরোধ করছেন। আর এটাও বলছেন যে, এ সকল দ্বারা এটা বুঝা যায় না যে, তা রাসূল (সাঃ) পর্যন্ত জারী ছিল। ইমাম শাফেয়ী, ইবনে হজম জাহেরী ও আবু বকর (রাঃ) এবং অপরাপর মুহাক্কেকীন সাহাবাদের বাণী "এই কাজটি সুন্নত" কে 'হাদীস মরফু' বলে স্বীকার করেননি। হাদীসে এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে যেখানে সাহাবাবৃন্দ এই সকল শব্দ ব্যবহার করছেন। সেই সকল হাদীস নববী ছিল না; বরং তা তাদের কেয়াছ ও এজতেহাদ ছিল। কিন্তু অধিকাংশ মুহাদ্দেসীন এই সকলকে হাদীসে মরফু বলছেন। সেই ধারণা এই বিপদ ডেকে আনছিল যে, এই সকলকে কোন কোন রেওয়ায়েতকারী হাদীসে মরফু বলে জারী করে দিয়েছে। তাতে একটি সাধারণ সন্দেহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে।

একভাবাপন্ন হাদীস

এই জাতীয় বহু হাদীস রয়েছে। কিন্তু এদের মধ্যে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা কঠিন ব্যাপার। ইমাম বোখারীর অভিমত এই যে, একভাবাপন্ন হাদীসের মধ্যে যদি এটা প্রমাণিত হয় যে, রেওয়ায়েতকারী এবং যার কাছে রেওয়ায়েত করা হয়, উভয়ে যদি এক ভাষা-ভাষি হন এবং তাঁদের মধ্যে মাঝে মাঝে সাক্ষাৎ লাভও ঘটে, তবে সেই হাদীসকে ধারাবাহিক হাদীস বলে বিবেচনা করতে হবে।

ইমাম মুসলেম ইমাম বোখারীর ছাত্র ছিলেন। আর তিনি অধিক পরিমাণে তাঁরই পায়রবি করতেন। তথাপি তিনি কঠোরভাবে ইমাম বোখারীর শর্তের প্রতিবাদ করছিলেন। তিনি এক ভাষাবিদ হওয়াকেই যথেষ্ট মনে করতেন। এই বিরোধিতার ফল এই দাঁড়ায়েছিল যে, বোখারীর উসূল অনুযায়ী ইমাম মুসলেমের সকল একভাবাপন্ন রেওয়ায়েত যাতে সাক্ষাৎলাভের প্রমাণ নেই, এদের কোনটাই ধারাবাহিক নয় বলে ইমাম সাহেবের ধারণা ছিল। অথচ ইমাম মুসলেম এদেরকে ধারাবাহিক মনে করতেন। আর এতে তিনি এরূপ জোর দিতেন যে, তাঁর বিরোধী দলকে তিনি নিন্দা করতেন। ইমাম মুসলেম এ সম্বন্ধে খুব উদারতা প্রদর্শন করছেন।

কিন্তু ইমাম বোখারীর শর্তানুযায়ী ও একভাবাপন্ন রেওয়ায়েত ধারাবাহিক হওয়ার প্রমাণ শুধু ধারণা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এটা অপরিহার্য ছিল না যে, দুই ব্যক্তি এক ভাষাবিদ হবে এবং তাদের মধ্যে সাক্ষাৎ লাভ ঘটবে। কিন্তু

যেখানে রেওয়ায়েতকারী শব্দ দ্বারা রেওয়ায়েত করবেন, তখন তা ধারাবাহিক হওয়া অপরিহার্য। কিন্তু একে একীনী বলা চলবে না। হাদীস ও জীবন-চরিতে এরূপ বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে যে, দুইজন রেওয়ায়েতকারী একই জমানায় ছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে আপোষে মিলামিশাও ঘটত। তথাপি একজন অপরজনের মধ্যস্থতায় রেওয়ায়েত করছেন। প্রতিরোজই এইরকম ঘটনা ঘটে থাকে।

লোক-যাচাই

সর্বাপেক্ষা জরুরী এবং কঠিন প্রশ্ন, লোক-যাচাই। আখবারে আহাদের মূল ভিত্তি হলো লোক। কিন্তু লোক-নির্বাচন, লোক-যাচাই এমনই একটি ধারণামূলক ব্যাপার যে, যার চুল-ছেঁড়া মীমাংসা কঠিন ব্যাপার। আর এর সঠিক কোন মাপকাঠিও নেই। বহু লোকে কোন একজন লোককে অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য, অত্যন্ত ধর্ম-পরায়ণ অত্যন্ত সত্য পরায়ণ ভেবে থাকে। আবার সেই লোকটিকেই বহু লোকে দুর্বল রেওয়ায়েতকারী, অবিশ্বাসী এবং অনুপযুক্ত ভেবে থাকে। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, লোকটি যে উপযুক্ত এবং বিশ্বাসযোগ্য তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

ইমাম বোখারী ও মুসলেমের মধ্যে তেমন কোন ঘোর মতবিরোধ নেই। তথাপি রেওয়ায়েত ব্যাপারে এমনও দেখা গিয়েছে যে, তাঁদের একজন যে রেওয়ায়েতকে গ্রহণযোগ্য ভাবছেন অপর জন তা বর্জনীয় বলছেন।

আল্লামা নূদী সহী মুসলেমের শরার উপক্রমনিকায় এমন কয়জনের নামও লিপিবদ্ধ করছেন এবং মোহাদ্দেস হাকীমের 'কিতাবুল মুদখেল' হতে রেওয়ায়েত করছেন যে, এমনও বহু লোক রয়েছেন ইমাম মুসলেম মসনদে সহীতে যাঁদেরকে বর্জন করছেন, কিন্তু ইমাম বোখারী 'জামেয়ে সহীতে' তাঁদেরকে গ্রহণ করছেন।

রেওয়ায়েতের ত্রুটি ও শুদ্ধি সম্বন্ধে মতবিরোধ

এরূপ অসংখ্য রেওয়ায়েত রয়েছে, ত্রুটি ও শুদ্ধতা সম্বন্ধে মতবিরোধ রয়েছে এবং এদের পিছনে যুক্তিও রয়েছে। কারও দোষ-গুণ সম্বন্ধে অবগত হওয়া এবং যা রেওয়ায়েতকে শক্তিশালী বা দুর্বল করবে তা আয়ত্ত করতে হলে, রেওয়ায়েতকারীর সাথে তখন পরিচয় এবং অভিজ্ঞতার আবশ্যক। যাঁরা এই সম্বন্ধীয় দোষ-গুণ অনুসন্ধানে বিব্রত থাকেন, তাঁদের পক্ষে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ রেওয়ায়েত সম্বন্ধে বাঞ্ছিত গভীরে জ্ঞান সঞ্চয় করা অপরিহার্য হয়ে উঠে।

এজন্য বিভিন্ন পন্থা, বাহ্যিক প্রকাশ্য ভাল-মন্দ, জন-প্রচার এবং শুনা গিয়েছে এমন রেওয়ায়েতের উপরই অধিক নির্ভর করতে হয়। এসব ক্ষেত্রে অতি কম অকাট্য চূড়ান্ত মীমাংসা করা চলে। মুহাদ্দেসীন এ সব মতবিরোধের অবসানকল্পে বহু আইন-কানুনের বিধান দিয়েছেন। কিন্তু সেই বিধি-বিধানগুলো মূলেই এজতেহাদী এবং মতবিরোধ সম্বলিত। এতদ্ব্যতীত বহুক্ষেত্রে মুহাদ্দেসীন স্বয়ং স্বীয় উসূল সম্বন্ধে ও মত পরিবর্তন করছেন। আর অনেকে গুণের চেয়ে দোষকেই অধিক বড় করে দেখে। কিন্তু এমনও বহু রেওয়ায়েত রয়েছে, যেখানে এসব বিধি-বিধান কোনটাই প্রয়োগ করা চলে না। মুহাম্মদ বিন বশর মিছরী, আহমদ বিন সালেহ মিছরী এবং আকরমা বিন মওলা ইবনে আব্বাস (রাঃ) সম্বন্ধে একাধিক ত্রুটি রয়েছে। কিন্তু তাঁদের সেই দোষ ত্রুটি ধর্তব্য হয়নি।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ত্রুটিহীন ও ত্রুটিপূর্ণ উভয় প্রকার লোক রেওয়ায়েত-শাস্ত্রের ইমাম হয়ে থাকেন। আর তাঁদের অভিমত সম্বন্ধে এরূপ মতবিরোধ ঘটনা থাকে যে, তাতে আশ্চর্যের আর পরিসীমা থাকে না। জাবের জায়ফী কুফী সম্বন্ধে বিভিন্ন ইমাম যে বিভিন্ন মতামত পেশ করছেন, নিম্নে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

সূফীয়ান বলেন, হাদীস সম্বন্ধে জাবেরের চেয়ে আমি অপর কাকেও অধিক সতর্ক লোক দেখিনি।

শুয়বা বলেন, জাবের যখন বলেন, তখন মানুষের জন্য তা দলীল হয়ে যায়।

ইমাম সূফীয়ান সওরী শুয়বাকে বললেন, "আপনি যদি জাবের জায়ফী সম্বন্ধে কোন দোষারোপ করেন, তবে আমি আপনার সম্বন্ধেও দোষারোপ করব।" অকী' বলেন, "আপনারা যদি ইচ্ছা করেন, তবে অন্য কারও সম্বন্ধে সন্দেহ পোষন করতে পারেন; কিন্তু জাবের জায়ফী যে বিশ্বাসযোগ্য তাতে কোন সন্দেহ পোষণ করবেন না।"

অথচ অন্যান্য ইমামগণ তাঁরই সম্বন্ধে অভিমত পেশ করছেন যে, জাবের জায়ফী সমাজ বিতাড়িত, মিথ্যাবাদী এবং বাজে লোক। বহু মুহাদ্দেসীনই এই উপসংহারে পৌঁছেছেন যে, জাবের রেওয়ায়েত করার উপযুক্ত লোক নয়।

উদ্দেশ্যের পরিপূর্ণতা

মনে করুন, একটি হাদীস সকল মুহাদ্দেস ও মুজতহেদের উসূল অনুযায়ী ধারাবাহিক রেওয়ায়েতও বিশ্বাসযোগ্য। কিন্তু বর্ণনাকারী উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে

বর্ণনা করতে সমর্থ হয়েছেন কিনা, তা বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয়। পারিপার্শ্বিকতা, সম্ভাব্যতা এবং রেওয়ায়েতের সম্পূর্ণ শর্ত পালন হলো কিনা; উদ্দেশ্য প্রকাশে কোন ত্রুটি রইল কিনা বা নির্দিষ্ট পন্থা অনুসরণ কোন ত্রুটি হলো কিনা বা নির্দিষ্ট পন্থা অনুসরণে কোন ত্রুটি হলো কিনা, এ বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হয়। কেননা, এটা সর্ববাদীসম্মত যে, প্রায় হাদীসই ভাব-ধারানুযায়ী রেওয়ায়েত করা হয়। কাজেই পরিপূর্ণ ভাব প্রকাশ না হওয়ার সমূহ আশঙ্কা থেকে যায়। সাহাবাদের জমানায় যদি কোন রেওয়ায়েতের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে অস্বীকার করা হতো। অন্যথায় এটা স্পষ্ট যে, সাহাবাগণ সাধারণভাবে বিশ্বাসযোগ্য। আর তাঁদের রেওয়ায়েতের মধ্যে কোন প্রকার যোগহীনতার অভাব পরিলক্ষিত হতো না।

সহীহ মুসলেমের এতীমের অধ্যায়ে এক ব্যক্তি হযরত ওমরের কাছে মসআলা জিজ্ঞাসা করলেন, "আমার গোসলের আবশ্যক হয়েছে; কিন্তু পানি পাচ্ছি না।" হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, "নামায পড়বেন না।" হযরত আম্মার (রাঃ) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি সেই মসআলা সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল হতে একটি রেওয়ায়েত করলেন এবং বললেন যে, তখন আপনিও সেখানে ছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, হে আম্মার, আল্লাহকে ভয় করুন।"

এটা স্পষ্ট যে, হযরত ওমর (রাঃ) আম্মার (রাঃ)–কে মিথ্যা রেওয়ায়েতকারী বলে বিবেচনা করেননি। কিন্তু তাঁর বক্তব্য এই ছিল যে, উদ্দেশ্য পরিপূর্ণরূপে আদায়ে যেন কোন ভুল না হয়। কাজেই তিনি তাঁকে সতর্কতা মূলকভাবে তা বলছিলেন।"

অতঃপর হযরত আম্মার (রাঃ) বলছিলেন, "এটা যদি আপনার মর্জির খেলাফ হয়ে থাকে, তবে আমি এই হাদীস রেওয়ায়েত করব না।"

আখবারে আহাদের প্রসঙ্গকে আমি এই জন্য ইচ্ছাপূর্বক দীর্ঘ করছিলেন যে, মুহাদ্দেসীন বিশেষ করে আই মসআলার কারণেই ইমাম আবু হানীফা সম্বন্ধে বহু তর্ক-বিতর্ক করে থাকেন। অথচ ইমাম সাহেবের মতবাদ খুব সূক্ষ্ম অনুসন্ধান এবং পারিপার্শ্বিকতার প্রতি পরিপূর্ণরূপে নির্ভরশীল।

এ সকল সমূহ সতর্কতা ও এজতেহাদ আখবারে আহাদের সাথে সীমাবদ্ধ, মুতওয়াতের ও মশহুর হাদীসে এর কোন সম্ভাবনা নেই। এই সকল কারণেই আখবারে আহাদ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবিরোধ দেখা দিয়েছে।

মু'তজিলারা তো আগাগোড়া এ সকলকে অস্বীকার করে থাকে। তাঁদের

পাল্টা জবাব দিতে যেয়ে কোন কোন মুহাদ্দেস তো জোরেশোরে প্রচার করছেন যে, খবরে আহাদকে-তো অকাট্য বলে প্রমাণিত করে দেয়া হয়েছে। শুধু এতটুকু শর্তাধীন করা হয়েছে যে, রেওয়ায়েত খুব বিশ্বাসযোগ্য হওয়া চাই এবং রেওয়ায়েতে যোগ সূত্রহীনতা না থাকা চাই। কোন কোন মুহাদ্দেস যদিও বিধি-বিধানের ধারানুযায়ী আখবারে আহাদকে ধারণামূলক বলছেন, কিন্তু আদেশাবলীর অংশ বিশেষে এবং আকায়েদের মসায়েলে এর প্রতি তদ্রূপ খেয়াল রাখা হয়নি। ইমাম আবু হানীফা সাহেব এ সম্বন্ধে যে মতবাদ অবলম্বন করছেন, তা অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ এবং পারিপার্শ্বিকতার প্রতি যে, তাঁর সূক্ষ্মদৃষ্টি ছিল, এটা তারই প্রমাণ। মু'তাজেলাদের ন্যায় তিনি আগাগোড়াই এ সকল অস্বীকার করে বসেননি এবং বাহ্যিক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিদের ন্যায় একে অকাট্য বলেও স্বীকার করেন নি। এই সম্বন্ধে সাহাবাগণ এবং ইমান সাহেব এক মত।

খবরে ওয়াহেদ অকাট্য নয়

হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাঃ) বহু ব্যাপারে খবরে ওয়াহেদকে তসলিম করতে ইতস্ততঃ করছেন। এর কারণ এই যে, আখবারে আহাদকে তাঁরা অকাট্য মনে করছেন না। ফাতেমা বিনতে কাইস হযরত ওমরের (রাঃ) সম্মুখে আল্লাহর রাসূল হতে রেওয়ায়েত করলেন যে, হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, "একজন স্ত্রীলোকের রেওয়ায়েতকে ভিত্তি করে, যা ভুল নাকি সহী তাও জানা নেই' আল্লাহর কিতাবকে ছেড়ে দিতে পারি না। আখবারে আহাদ দ্বারা কোন আদেশের ফরজ কায়েম করা সম্ভবপর হয় না। কেননা, অকাট্য দলীল ব্যতীত ফরজ সাব্যস্ত করা যায় না। তবে ওয়াজিব, সুন্নত ও মুস্তাহাব সাব্যস্ত করা যায়। একে ভিত্তি করেই নামাযে কেরাত করে ফাতেহা পড়া ইমাম শাফেয়ী ফরজ বলে সাব্যস্ত করছেন এবং ইমাম আবু হানীফা একে ওয়াজিব বলে রায় দিয়েছেন।

এলমে কালামে এর প্রভাব

ফিকাহর চেয়ে এলমে কালামের প্রতি এর প্রভাব অধিক পড়ে এজন্যই ইমাম আবু হানীফা দীর্ঘকাল এর বিরোধিতা করছিলেন। ইমাম সাহেব নিয়ম নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন যে, যে মসায়েল ও আকায়েদ সম্বন্ধে ইসলাম এক মত, এদের বিরোধিতায় আখবায়ে আহাদ গ্রহণযোগ্য নয়। উদাহরণ স্বরূপ আম্বিয়াদের

পরহেজগারীর প্রসঙ্গ উল্লেখ করা চলে। এটা আহলে হকদের সর্ববাদীসম্মত মসআলা। এর বিপরীত যে সকল রেওয়ায়েত দ্বারা আম্বিয়াদের পাপ-সংঘটন প্রমাণিত হয়, ইমাম আবু হানীফার উসূল অনুযায়ী সেই রেওয়ায়েত গ্রহণযোগ্য নয়। সেই উসূল অনুযায়ী এমন সব বহু মুস্কিল ব্যাপার যা ধর্ম-ভ্রষ্টতার পথে পরিচালিত করে, তা হতে রেহাই পাওয়া যায়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, অনেক রেওয়ায়েতকারীই সেই সব অতুলনীয় উসূলের মর্যাদা বুঝতে চেষ্টিত হননি। বরং এদের বিরোধিতা করতেও তাঁরা দ্বিধাবোধ করেননি।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ফিকাহ্-বৈশিষ্ট্য

তফসীর ও হাদীস ইত্যাদি যদিও ইসলামের সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়েছিল, তথাপি এ সকল যে পর্যন্ত একটি বিশেষ বিষয়ে পরিণত না হয়েছিল, সেই পর্যন্ত তা কোন ব্যক্তি বিশেষের নামের সাথে বিজড়িত হয়নি। দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথমভাগে যখন সংশোধন ও শৃঙ্খলা-কার্যে অগ্রসর হলেন, তাঁরা সেই বিষয়ের প্রতিষ্ঠাতা বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এই হিসেবে ইমাম আবু হানীফাকে ফিকাহ্-শাস্ত্রের স্থাপতি বলা হয়। প্রকৃতপক্ষেও তিনি সেই উপাধি-লাভের উপযুক্ত লোক ছিলেন। আরস্ত-তালীস যদি এলমে মনতেকের প্রতিষ্ঠাতা হয়ে থাকেন, তবে এটা নিঃসন্দেহে যে, ইমাম আবু হানীফাও এলমে ফিকাহ প্রতিষ্ঠাতা। ইমাম সাহেবের শিক্ষাজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ দান হলো ফিকাহ্। এজন্য এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা, আমি বাঞ্ছনীয় মনে করি। সেই মহান কাজে অগ্রসর হবার পূর্বে, এলমে ফিকাহ্ কখন হতে আরম্ভ হয়েছে, সেই সম্বন্ধে সর্বপ্রথমে কিছু বলতে চাই। আর এটাও স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, ইমাম সাহেব যখন ফিকাহ্-শাস্ত্রের প্রতি মনোনিবেশ করেন, তখন কিরূপ পারিপার্শ্বিকতা ছিল।

ফিকাহ্র সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

এ সম্বন্ধে শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহঃ) অতি জ্ঞান-গর্ভ প্রবন্ধ লিখেছেন। পর্যালোচনা করলেই আমাদের বক্তব্য প্রকাশিত হবে।

তিনি লিখেছেন– রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জমানায় শরীয়তের হুকুম-আহকামের কোন শ্রেণীবিভাগ হয়নি। হযরত (সাঃ) সাহাবাদের

সম্মুখে কিছুই বলতেন না। এটা রুকন, এটা ওয়াজিব, এটা মোস্তাহাব ইত্যাদি বলতেন না। সাহাবাগণও হযরতকে দেখে অজু করে নিতেন।

নামাযের অবস্থাও তাই ছিল। কোন্‌টি ফরজ, কোন্‌টি ওয়াজিব, কোন্‌টি মুস্তাহাব, এ সম্বন্ধে সাহাবাগণ কিছুই জিজ্ঞাসা করতেন না। হুজুরকে যে ভাবে নামায পড়তে দেখতেন, তাঁরাও সেই ভাবে নামায পড়েন।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলছেন, রাসূল (সাঃ)-এর কওমের চেয়ে উত্তম কওম আমি আর কাহাকেও দেখিনি। কিন্তু তাঁরা হুজুরের জিন্দেগীতে তেরটি মসআলার চেয়ে অধিক মসআলা জিজ্ঞেস করেননি। আর এদের সবগুলোই কোরানে মজুদ ছিল।

কোন অসাধারণ ঘটনা যদি ঘটতো, তবে তাঁরা হযরতের কাছে ফতোয়া চেয়ে নিতেন। হযরত জবাব দিতেন। প্রায়ই এমনই হতো যে সাহাবাগণ কোন কাজ করতেন, হযরত তা পছন্দ বা না-পছন্দ করতেন। সাধারণতঃ জন-সভায় এ সকল মতামত ঘোষণা করা হতো। আর লোকেরা বিশেষ মনোযোগের সাথে তা শুনতেন এবং স্মরণ রাখতেন।

হযরতের ইন্তেকালের পরে দেশ-জয় অত্যন্ত জোরেসোরে আরম্ভ হয়েছিল। আর বহু দূরদেশে ইসলামী সভ্যতা বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। নিত্য-নতুন ঘটনা ঘটিত। এজতেহাদ ও সংশোধন আবশ্যকীয় হয়ে উঠল। তখন সমষ্টিগতভাবে কোন একটি আদেশের বিস্তৃত বর্ণনা অত্যাবশ্যকীয় হয়ে উঠল। ধরে নেয়া হোক, কোন একজন লোকে ভুলে নামাযের কোনকিছু তরক করে বসল। তখন সমস্যা দাঁড়াল যে, নামায আদায় হলো কিনা। এরূপ সমস্যা দেখা দেওয়ার পর এটাও কয়টি ফরজ, কয়টি ওয়াজিব, কয়টি মোস্তাহাব ইত্যাদি নির্ণয় করা সাহাবাদের পক্ষে জরুরী হয়ে উঠল। সেইসব সমস্যার সমাধানকল্পে যে সব নিয়মপদ্ধতি কায়েম করতে হয়েছিল, সেই সম্বন্ধে সকলে একমত হওয়া সম্ভবপর হয়নি। কাজেই মাসআলায় মতবিরোধ দেখা দিল। প্রায় মাসআলাতেই সাহাবাদের মধ্যে মতবিরোধ হতো। এমন ঘটনাও ঘটিতে লাগল যে, হযরতের জামানায় এর নাম-নিশানাও ছিল না। তখন সাহাবাদেরকে যাচাই, নির্বাচন ও কেয়াস ইত্যাদির আশ্রয় না নিয়ে কোন উপায় ছিল না। সেই সকল পন্থা কখনও একজাতীয় ছিল না; কাজেই তাঁদের মধ্যে অবশ্যই মতবিরোধ সৃষ্টি হয়ে গেল। মোটকথা এই যে, সাহাবাদের জামানাতেই আহকাম ও মাসায়েলের এক দপ্তর স্তূপাকৃত হয়ে উঠছিল। কাজেই ভিন্ন ভিন্ন সমস্যা ও সমাধান নিত্য নতুন ব্যাপারে পরিণত হলো।

সাহাবাদের মধ্যে যাঁরা যাচাই ও এজতেহাদের সাহায্যে কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হতেন, তাঁদেরকে মোজতাহেদ ও ফকীহ বলা হতো। তন্মধ্যে হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ) আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) এবং আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) এই চারজন সর্বাপেক্ষা নামজাদা ছিলেন। হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত আদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) প্রায়ই কূফায় থাকতেন। কাজেই সেখানে মসায়েল ও আহকামের অধিকতর চর্চা হতো। এরূপে কূফা শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হলো। আর হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের (রাঃ) অবস্থিতির দরুণ মক্কা মদীনা শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হলো।

হযরত আলী (রাঃ) শৈশব হতেই হযরতের সাহচর্যে লালিত-পালিত হয়েছিলেন। হযরতের কথা ও কাজের সাথে তিনি যেরূপ পরিচিত হয়েছিলেন, সেই সৌভাগ্যলাভ অপর কারও পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। একব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "অপরের তুলনায় আপনি রেওয়ায়েত অধিক করবার কারণ কি?" তিনি বললেন, "হযরতের কাছে কেউ কোন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে, তিনি উত্তর দিতেন। আর কোন কোন সময় তিনি চুপ থাকলে, আমি নিজেই এর জবাব দিতে থাকতাম।"

তদুপরি হযরত আলী (রাঃ) স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল। তাঁর নির্বাচন ও এজতেহাদী ক্ষমতা ছিল অপরিসীম। কাজেই কোন বিষয় জানতে হলে, লোকেরা হযরত আলীর (রাঃ) শরণাপন্ন হতেন।

হযরত ওমর (রাঃ) জনসমক্ষে বলতেন, "খোদা না করুক যে, কোন মুস্কিল মাসআলা এসে পড়ে, আর হযরত আলী বর্তমান না থাকেন।"

আবদুল্লাহ বিন আব্বাস নিজেই মোজতাহেদ ছিলেন অথচ তিনি বলা-কওয়া করতেন যে, হযরত আলীর (রাঃ) ফতোয়া মিলে গেলে, অন্য কিছুর আবশ্যক পড়বে না।

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) হাদীস ও ফিকাহ উভয়ে শাস্ত্রেই কামেল ছিলেন। তাঁর ন্যায় অতি কম লোকেই হযরতের সাথে প্রকাশ্য ও নির্জনে এবং অহোরাত্র কাল যাপন করার সুযোগ লাভ করেন। হযরতের বহুকিছু ভেদের কথাও তিনি জানতেন।

সহী মুসলেমে আবু মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, "আমি ইয়ামন হতে এসে মদীনায় অবস্থান করি। আমি আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) কে হযরতের

খেদমতে এইরূপ ঘন ঘন যাতায়াত করতে দেখে তাঁকে নবী পরিবারের লোক বলে মনে করতাম।"

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) দাবী করতেন, কোরআন মজীদের এমন কোন আয়াত নাই, যার শানে নুজুল আমার অবগত নেই। কি সম্বন্ধে এবং কখন আয়াতসমূহ নাযিল হয়েছে, আমি সমুদয়ই অবগত রয়েছি।

তিনি আরও বলতেন, কোরআন মজিদ সম্বন্ধে আমার চেয়ে কেউ যদি অধিক আলেম থাকতেন, তবে আমি তাঁর কাছে সফর করতাম।

সহী মুসলেমে বর্ণিত আছে যে, তিনি এক সভায় দাবী করলেন, "সকল সাহাবা অবগত রয়েছে যে, কোরআন সম্বন্ধে আমি সবচেয়ে বড় আলেম ছিলাম।"

শফীক সেই সভায় ছিলেন। তিনি বললেন, "তারপর হতে আমি বহু সভায় উপস্থিত ছিলাম। কিন্তু কাউকেও আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাঃ)-এর দাবী অস্বীকার করতে শুনি নাই।"

আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাঃ) যথারীতি কায়দানুযায়ী হাদীস ও ফিকাহ শিক্ষা দিতেন। তাঁর মাদ্রাসায় বহু ছাত্র উপস্থিত থাকত। তন্মধ্যে আসওয়াদ, ওয়াইদা, হারেস এবং আলকামা খুব নামজাদা ছিলেন।

আলকামা হযরত (সাঃ)-এর জীবিতকালেই জন্মগ্রহণ করেন। হযরত ওমর (রাঃ), হযরত ওসমান (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত আয়েশা (রাঃ), হযরত সাইদ (রাঃ), হযরত হুযাইফা (রাঃ), হযরত খালেদ বিন অলীদ (রাঃ), হযরত খাব্বার (রাঃ) এবং আরও বহু সাহাবা হতে তিনি হাদীস রেওয়ায়েত করেন।

বিশেষ করে তিনি প্রায় সব সময়েই হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাঃ)-এর সাহচর্যে থাকতেন। আর তাঁর রীতিনীতি ও কায়দা-কানুন এরূপ অনুকরণ ও অনুসরণ করতেন যে, লোকেরা বলত, কেউ যদি আলকামা (রাঃ)-কে দেখিয়ে থাকেন তবে তিনি যেন আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাঃ)-কেই দেখেছেন। স্বয়ং আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাঃ) বলছেন, "জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে আলকামা (রাঃ) আমার চেয়ে কোন অংশেই কম নন।" এর চেয়ে অধিক জ্ঞান ও সম্মান কি হতে পারে যে, সাহাবাগণ স্বয়ং তাঁর কাছে মসায়েল জিজ্ঞাসা করতে আসতেন। আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাঃ)-এর ছাত্রবৃন্দের মধ্যে এক আসওয়াদ (রাঃ) ব্যতীত অপর কেউই আলকামা (রাঃ)-এর সমকক্ষ ছিলেন না।

ইব্রাহীম নখয়ী (রাঃ)

আলকামা (রাঃ) ও আসওয়াদ (রাঃ)–এর মৃত্যুর পর ইব্রাহীম নখয়ী (রাঃ) তাঁদের স্থলাভিষিক্ত হলেন। তিনি ফিকাহ-শাস্ত্রের বহু উন্নতি বিধান করেন। পরিশেষে তিনি ইরাকের ফকীহ উপাধি লাভ করেন। এলমে হাদীসে তিনি এরূপ গভীর জ্ঞান লাভ করেন যে তাঁকে হাদীসের কষ্টিপাথর বলা হতো।

ইমাম শায়বী যিনি আল্লামাত্তায়েবীন নামে অভিহিত হতেন, তিনি ইব্রাহীম (রাঃ)–এর মৃত্যুর সময় বলছেন, "ইব্রাহীম (রাঃ) এমন কোন ব্যক্তিকে রেখে পরলোকগমন করেন নাই, যিনি তাঁর চেয়ে অধিক আলেম ও ফকীহ হবার দাবী করতে পারেন।"

এটা শুনে এক ব্যক্তি পরম আশ্চর্যের সাথে বললেন, "হাসান বসরী এবং ইবনে শিরীনও কি তাঁর সমকক্ষ নন?" শায়বী বললেন, "শুধু তাঁরা কেন সমগ্র বসরা, কূফা ও হেজাজ কোথাও বর্তমানে তাঁর চেয়ে জবরদস্ত আলেম নাই।"

ইব্রাহীম (রাঃ)–এর জমানায় ফিকাহ-সংক্রান্ত এক ছোটখাট গ্রন্থ প্রস্তুত হয়েছিল। হাদীসে নববী এবং হযরত আলী (রাঃ) ও আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাঃ)–এর ফতোয়া হতে তিনি তা সঙ্কলিত করেছিলেন। এই সঙ্কলন যদিও ধারাবাহিকরূপে লিপিবদ্ধ হয়নি, কিন্তু তাঁরা ছাত্র-মহল তা জবানী মুখস্থ করে রেখেছিলেন।

হযরত হাম্মাদের কাছে সর্বাপেক্ষা অধিক সঙ্কলন ছিল। আর তিনি হযরত ইব্রাহীম (রাঃ)–এর ছাত্র-মহলে সবচেয়ে অধিক নামজাদা ছিলেন। উস্তাদ সাহেবের মৃত্যুর পর হযরত হাম্মাদই ফিকাহশাস্ত্রের খলিফা পদে সমাসীন হন। হাম্মাদ যদিও ফিকাহশাস্ত্রের চরম উন্নতি সাধন করতে পারেননি, কিন্তু তিনি ইব্রাহীমের ফিকাহ-সঙ্কলনের বহু বড় হাফেজ ছিলেন। হাম্মাদ হিজরী ১২০ সনে ইন্তেকাল করেন। তাঁর পরে লোকেরা ইমাম আবু হানীফাকে ফিকাহ-শাস্ত্রের মসনদে আসন গ্রহণ করতে বাধ্য করে।

ইমাম সাহেবের পূর্বে ফিকাহ-সঙ্কলন মৌখিক ছিল। আর তাও তত ধারাবাহিকরূপে ছিল না। তখনও যাচাই ও সংশোধনের নিয়ম প্রচলিত হয়নি। আর আহকামেরও কোন কড়াকড়ি নিয়ম ছিল না। কেয়াস-শাস্ত্রও তত উন্নত হয়নি। একে পরিপূর্ণ করে তুলবার তখনও বহু কিছু বাকী ছিল।

ফিকাহ্-সঙ্কলন ও ইমাম সাহেব

তিনি এদিকে কিরূপ ঝুঁকিয়া পড়েন, ইতিহাসে এর কোন সঠিক প্রমাণ নাই। এ সম্বন্ধে জনৈক লেখক লিখছেন–দুই ব্যক্তি গোসলখানায় গোসল করতে গিয়েছিল। তারা গোসলখানার মালিকের কাছে কিছু আমানত রাখে। এক ব্যক্তি গোসল শেষ করে এসে আমানতদারের কাছ হতে বেরিয়ে এসে আমানত ফেরত চাইল। গোসলখানার মালিক সবকথা খুলে বললে দ্বিতীয় ব্যক্তি কাজীর এজলাসে যেয়ে নালিশ দায়ের করল।

কাজী সাহেব আসামীকে এই বলে দোষী সাব্যস্ত করলেন যে, দুই ব্যক্তি যখন সম্মিলিতভাবে তোমার কাছে আমানত রাখছিল, এমতাবস্থায় উভয়ের উপস্থিতি ব্যতীত শুধু এক ব্যক্তিকে তা ফেরত দিয়ে দেয়া নিতান্ত অনুচিত হয়েছে।

আসামী কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ইমাম আবু হানীফা সাহেবের শরণাপন্ন হলো। ইমাম সাহেব এটা শুনবামাত্র তাকে বলে দিলেন, "তুমি যেয়ে ফরিয়াদীকে বলে দাও যে, তুমি একাকী আসছেন কেন? তুমি তোমার সাথীকে নিয়ে এসে তোমাদের আমানত ফেরত নিয়ে যাও।"

কথিত আছে যে, এই ঘটনার পর হতে ইমাম সাহেব ফিকাহ শাস্ত্রের চরম উন্নতি সাধনে উঠে পড়ে লেগে গেল। তখন হতে একে ধারাবাহিক করতে যথাসাধ্য চেষ্টা চলতে থাকে।

ইমাম সাহেবের উস্তাদ, হযরত হাম্মাদের ইন্তেকালের পর তিনি বিশেষ কর্তব্যপরায়ণ হন। তখন মুসলিম-সাম্রাজ্য ও সভ্যতা-সীমা অসাধারণভাবে বেড়ে চলছিল। ইবাদত, ব্যবসা-বাণিজ্য ও রাজ্যশাসন ইত্যাদি ব্যাপার নিত্য-নতুন ঘটনা-ঘটিত। নির্দিষ্ট ও পরিকল্পিত আইন-কানুন ও বিধি-বিধান ব্যতীত দেশকে সুপরিচালিত করা অসম্ভব ব্যাপার। রাজ্য-বিস্তৃতি ও অপর সম্প্রদায়ের সাথে সংশ্রবের দরুন শিক্ষা-দান ও শিক্ষা-প্রাপ্তি সমধিক গুরুত্ব পরিপূর্ণ সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। জবানী সনদ ও রেওয়ায়েত কিছুতেই সেই প্রয়োজন মিটাতে পারে না।

এই সকল পরিস্থিতিতে আল্লাহ্ তায়ালা মানুষের অন্তরে এমনই একভাব জন্মাইয়ে দিলেন যে, মুসলিম সাম্রাজ্যের সমূহ সমস্যা সমাধান কল্পে যা কিছু নির্দিষ্ট ও ধারাবাহিক নিয়ম-কানুনের অপরিহার্য প্রয়োজন তা নির্ধারণে সুধীমণ্ডলী এমন কি জনসাধারণের মধ্যেও একটা প্রেরণা জেগে উঠল।

ইমাম আবু হানীফা সাহেবের প্রকৃতি ছিল মুজতাহেদ-সুলভ। আর তিনি ছিলেন অসাধারণ সূক্ষ্মদর্শী; তদুপরি ব্যবসা বাণিজ্যের বিস্তৃতি ও অপর রাজ্যের সাথে সংশ্রব সেই প্রয়োজনকে অধিকতর প্রকট করে তোলে।

ফিকাহ্-যাচাই এ ছাত্র-সহায়তা

যে রেওয়ায়েত-যাচাই কাজে ইমাম সাহেব অগ্রসর হয়েছিলেন, তা সহজ সরল ব্যাপারে ছিল না। তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলেন যে, তাঁর সেই বিরাট সঙ্কল্প সাধনে অপরাপর বহুলোকের সাহায্যে সহানুভূতির বিপুল প্রয়োজন। এ কাজে চরম উন্নতি সাধন করতে হলে, তিনি শুধু তাঁর ব্যক্তিগত অভিমত ও অভিজ্ঞতার প্রতি নির্ভরশীল হওয়া সমীচীন মনে করলেন না। কাজেই তাঁর ছাত্র-মহল হতে বিশিষ্ট কয়েকজনকে নিয়ে একটি দল গঠন করলেন। ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে তিনি ভিন্ন ভিন্ন ছাত্রের উপর দায়িত্ব অর্পণ করলেন। যার যে বিষয়ে স্বাভাবিক শক্তিমত্তা অধিক ছিল, ইমাম সাহেব তাঁকে সেই বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা দানে আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন।

এয়াহ্য়া বিন আবি জায়েদা, হেফজ বিন আইয়াছ, কাজী আবু ইউসূফ, দাউদতায়ী, হাব্বান ও মনদল হাদীসে সবিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ইমাম জাফর যাচাই ও নির্বাচন ব্যাপারে বিচক্ষণ ছিলেন। সাহিত্যে বিখ্যাত ছিলেন কাসেম বিন মায়ান ও ইমাম মুহাম্মদ।

ইমাম সাহেব তাঁদের সকলকে নিয়ে একটি মূল কমিটি কায়েম করলেন। আর তিনি ছিলেন সেই কমিটি পরিচালনের সর্বময় কর্তা। যথানিয়মে ফিকাহ-শাস্ত্রের যথাসম্ভব দ্রুত উন্নতির প্রচেষ্টা চলল।

ইমাম তাহাবী আসদ বিন ফুরাত হতে রেওয়ায়েত করেছেন যে, ইমাম সাহেব যে কতিপয় ছাত্রকে ফিকাহ-শাস্ত্রের চরম উন্নতির জন্য নিযুক্ত করেছিলেন, তাঁদের সংখ্যা ছিল চল্লিশ। তাঁদের মধ্যে আবু ইউসূফ, জাফর, দাউদতায়ী, আসদ বিন ওমর, ইউসূফ বিন খালেদ ও এয়াহয়া বিন আবি জায়েদা বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন।

ইমাম সাহাবী এটাও রেওয়ায়েত করেছেন যে, সবকিছু লিপিবদ্ধ করার ভার পড়েছিল এয়াহয়ার উপর। আর দীর্ঘ ত্রিশ বছরকাল তিনি সেই কাজে ব্রতী ছিলেন।

যাঁচাই-কষ্টিপাথর

কোন এক মাসআলা মীমাংসা করতে হলে, তা ছাত্র-মজলিসে পেশ করা হতো। আর প্রত্যেকেই পরম ও চরম স্বাধীনতার সাথে স্বীয় মতামত পেশ করতেন। আর ইমাম সাহেব সাগরের ন্যায় গভীর এবং আকাশের ন্যায় উদার ভাবে সবকিছু শুনে যেতেন। একটি বিষয়ে সকলে একমত হলে, তা অবিলম্বে লিপিবদ্ধ করা হতো। কখনও কখনও সেই তর্ক-সভা দীর্ঘকাল অবধি চলতে থাকত। এমনও হতো যে, ইমাম সাহেবের রায় প্রকাশ হবার পরও ছাত্রবৃন্দ নিজ নিজ রায় মুতাবেক চলতেন।

আফীয়া

জনৈক লেখক লিখেছেন, "ইমাম সাহেবের ছাত্র মহলে যখন কোন একটি বিষয় প্রসঙ্গে আলাপ-আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক চলত তখন আফীয়া উপস্থিত না থাকলে, ইমাম সাহেব বলতেন, আফিয়াকে আসতে দাও। তিনি আসলে আবার তর্ক সভা চলত। তখন সকলে একমত হলে, তা লিপিবদ্ধ করা হতো। এরূপে দীর্ঘ ত্রিশ বছর সাধনার ফলে ফিকাহ-শাস্ত্র উন্নতির চরম শিখরে উপনীত হলো। ইমাম সাহেবের শেষ-জীবন কারাগারে কাটে। কারারুদ্ধ জীবনেও সেই সাধনা অব্যাহত থেকে যায়।"

সভার সাধারণ নিয়ম

পবিত্রতা, নামায, রোযা, এবাদতপন্থা, আচার-ব্যবহার, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বাট-বাটোয়ারা ইত্যাদি ধারানুযায়ী সভার কার্য চলত। ইমাম সাহেবের জীবিত কালেই তিনি উক্ত মজলিসের সফলতা স্বচক্ষে দেখতে সমর্থ হন। যেকোন দুরূহ সমস্যার উদ্ভব হলে, কেয়াছ দ্বারা এটার স্বাচ্ছন্দ সমাধান হয়ে যেত। কোন একটি বিষয়ের চরম মীমাংসা হয়ে গেলে, রাজ্যময় এটা প্রচার করে দেয়া হতো।

ইমাম সাহেবের শিক্ষা-মজলিস একটি নিয়ম-নিষ্ঠার মাদ্রাসা ছিল তাঁর অসংখ্য ছাত্র রাজ্য সরকারে উচ্চ ও নিম্ন বিভিন্ন পদে চাকুরী করতেন তাঁদেরকে ডিঙ্গায়ে রাজ্য শাসন করা কর্তৃপক্ষের পক্ষে সম্ভবপর হতো না

একটি আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যে সকল লোক ইমাম সাহেবের বিরোধিতা করতেন, তাঁরাও ইমাম সাহেবের কিতাব পড়তেন। ইমাম সূফীয়ান সওরী তাঁরা বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও কিতাব লিখতে যেয়ে ইমাম সাহেবের কিতাব হতে বহু সাহায্য নিয়েছেন।

এক বুজর্গ বলেন, "একদিন ইমাম সূফীয়ানের বালিশের নীচে আমি একটি কিতাব দেখতে পেলাম। তিনি মাঝে মাঝে তা পাঠ করতেন। আমি তাঁর অনুমতি নিয়ে কিতাবখানা খুলে দেখলাম যে, তা রেহেন বিষয় সম্বন্ধে ইমাম আবু হানিফা সাহেবের একটি কিতাব। আমি পরম আশ্চর্যের সাথে জিজ্ঞেস করলাম যে, আপনি ইমাম আবু হানীফা সাহেবের কিতাব পড়ে থাকেন? জবাবে তিনি আক্ষেপের সুরে বললেন, 'তাঁর সবকিছু কিতাব যদি আমার হাতে পড়ত!"

এটাও কম আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, তাঁর জমানায় বহু বড় বড় ইমাম ও আলেম ছিলেন। আর অনেকে তাঁর বিরোধিতাও করছেন। কিন্তু তাঁর কিতাবকে রদ করার সাহস কেউ পান না।

ইমাম রাজী 'মুনাকেবেশ শাফেয়ী' কিতাবে লিখেছেন–ইমাম আবু হানীফা এবং তাঁর ছাত্রবৃন্দ যে সময় মসায়েল জারী করছেন, তখন দুনিয়া মুহাদ্দেসীন ও রেওয়ায়েতকারীদের দ্বারা ভরপুর ছিল। তখন ইমাম সাহেবের কথা, কাজ ও কিতাবের প্রতিবাদ করতে কারও সাহসে কুলায় না।

আবু ইউসূফ সাহেব লিখেছেন যে, ইমাম আবু হানীফা বার লক্ষ নব্বই হাজারের চেয়ে অধিক মসায়েল লিপিবদ্ধ করেছেন।

অধিকাংশ শাসনকর্তাই হানফী ছিলেন

এটা বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয় যে, রাজমুকুট যাঁদের শিরোপরি শোভা পেত, তাঁদের প্রায় সকলেই হানফী ফিকাহ-ভক্ত ছিলেন তবে আব্বাসিয়ার বংশধর এটার বরখেলাফ ছিলেন। তাঁরা যতদিন পর্যন্ত শাসনদণ্ড পরিচালনা করেছেন, ততদিন পর্যন্ত তলোয়ার ও কলম তাঁদের করায়ত্ত রেখেছেন। অর্থাৎ এজতেহাদও তাঁদের দাবী ছিল। আর তারা কোন দিন কারও তকলীদ [অনুকরণ অনুসরণ] করেননি। তাঁদের পতনের পর তাঁদের এমনই অধঃপতন হয়েছিল যে, জনগণের উপর তাঁদের কোন প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল না, সেই প্রশ্নও অবান্তর ছিল। তবে এতটুকু বলা চলে যে, তাঁরা যদি কারও তকলীদ করে থাকেন, তবে আবু হানীফাই তকলীদ করেছিলেন। আব্বাসীয় বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও সাহিত্যিক হানফী ছিলেন।

আব্বাসীয়দের পরে যাঁরা শাসনদণ্ডের অধিকারী হয়েছিলেন, তাঁদের অধিকাংশই হানফী ছিলেন। যে সেলজুকেরা দীর্ঘকাল অবধি রাজত্ব করেছিলেন এবং যাঁদের শাসনকালে মুসলিম রাজত্ব দৈর্ঘে কাশগড় হতে বায়তুল মুকাদ্দাস

পর্যন্ত এবং প্রস্থে কুসতুনতনিয়া হতে ঘরজ পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছিল, তাঁরাও হানফী মাজহাবভুক্ত ছিলেন। যে সুলতান মাহমুদ গজনবী ভারতবর্ষের প্রতিটি শিশুর পরিচিত, তিনিও হানফী ফিকাহর জবরদস্ত আলেম ছিলেন। ফিকাহ সম্বন্ধে তিনি একটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করে গিয়েছেন। এতে প্রায় ষাট হাজার মাসআলা ছিল।

নূরুদ্দীনের নাম কারও কাছে অপরিচিত নয়। তিনিও হানফী মাজহাবভুক্ত ছিলেন। বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়ী সালাহুদ্দীন আয়ুবী তাঁর দরবারেরই একজন কর্মচারী ছিলেন। তিনিই দুনিয়ার সর্বপ্রথম দারুল হাদীস কায়েম করেন। যদিও তিনি শাফেয়ী মালেকী-ফিকাহর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, তথাপি তিনিও তাঁর বংশধরেরা হানফী মাজহাবভুক্ত ছিলেন।

সালাহুদ্দীন স্বয়ং শাফেয়ী মাজহাবভুক্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁর বংশধরদের মধ্যে হানাফী মাজহাব প্রচলিত ছিল।

ঈসা ইবনুল মালেকুল আদেল একজন শক্তিশালী শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি এক বিরাট সাম্রাজ্যের অধিকারী ছিলেন। আল্লামা ইবনে খলকান তাঁর সম্বন্ধে লিখেছেন– তিনি অত্যন্ত সাহসী, জআনী ও হুশিয়ার শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি পরম দয়ালু ও মহা পরাক্রমশালী বাদশাহ ছিলেন। তিনি হানাফী মাজহাবের পরম ভক্ত ছিলেন। তুরস্কের শাসকবৃন্দ যাঁরা প্রায় ছয়শত বছর পর্যন্ত রুমের করতলগত ছিলেন এবং আজও ইসলামের ইজ্জত ও গৌরব রক্ষার্থে বিশ্ববাসী যাদের মুখপানে তাকিয়ে রয়েছে, তাঁদের প্রায় সকলই হানফী মাজহাবভুক্ত ছিলেন। ভারতবর্ষের শাসনকর্তার এবং তৈমুরের বংশধরেরাও হানফী মাজহাবভুক্ত। আর তাঁদের দীর্ঘ রাজত্বকালে হানফী বংশধরেরাও হানাফী মাজহাবভুক্ত। আর তাঁদের দীর্ঘ রাজত্বকালে হানফী মাজহাব ব্যতীত অন্য কোন মাজহাব এখানে প্রবেশপথ পায়নি।

হানাফী মাজহাবের জনপ্রিয়তা

অনেকের ধারণা এই যে, সরকারী সাহায্যই হানফী মাজহাবের জনপ্রিয়তার একমাত্র উৎসস্বরূপ ছিল। বিখ্যাত ইমাম ইবনে হাজম বলেন, "দুইটি মাজহাবই প্রথম হতে সরকারী সাহায্য-সহানুভূতি লাভ করে। তন্মধ্যে একটি হলো হানফী মাজহাব। কাজী আবু ইউসূফ যখন প্রধান কাজীপদে বরিত হন, তখন তিনি বহু হানফী লোককে উচ্চ চাকুরীতে নিযুক্ত করেন।"

ইমাম মালিকের মাজহাব দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। ইমাম মালিকের শাগরেদ এয়াহয়া খলীফার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁর পরামর্শ ব্যতীত খলীফা কাউকেও কাজীপদে নিযুক্ত করতেন না। তিনিও শুধু তাঁর মাজহাবভুক্ত লোককে উক্ত পদে নিযুক্ত করতেন।

এ সকল গেল ইবনে হাজমের বাহ্যিক দৃষ্টির কথা। হিজরী ১২০ সালে ইমাম আবু হানীফা সাহেব মসনদে-এজতেহাদে সমাসীন হন। কাজী আবু ইউসূফ হিজরী ১৭০ সালে প্রধান কাজীপদে নিযুক্ত হন। খলীফা হারুণুর রশীদের জমানায় আবু ইউসূফ সাহেবের ওয়াজ-নছিহত ও যশগৌরব বিকীর্ণ হতে আরম্ভ করে।

হারুণুর রশীদ হিজরী ১৩০ সালে সিংহাসনে সমাসীন হন। আবু ইউসূফের প্রভাব ব্যতীতই ইমাম আবু হানীফা সাহেবের আলোক দুনিয়াকে আলোকিত করেছিল। তাঁর মাজহাব জনসাধারণের কাছে অতি প্রিয় ছিল। তাঁর অসংখ্য ছাত্র উচ্চ রাজপদে সমাসীন হয়েছিলেন। কাজেই তাঁর সফলতা লাভের জন্য অপর কারও সাহায্য নেওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না।

তবে এটা নিঃসন্দেহ যে, কাজী আবু ইউসূফের কল্যাণে ইমাম আবু হানীফার মসায়েল সমধিক প্রচারিত হয়েছিল। কিন্তু হানফী মাজহাবের প্রচার মূলতঃ কাজী সাহেবের চেষ্টা ও কমর্ধারার উপর নির্ভরশীল ছিল না।

ইমাম রাজী ইমাম আজম সাহেবের বিরোধী মহলের লোক হওয়া সত্ত্বেও স্বীকার করেছেন যে, স্বীয় মত-পুষ্ট মাজহাব খুব শক্তিশালী হয়ে দাঁড়ায়েছে। আর এটা সুপ্রসিদ্ধিও লাভ করেছেন প্রচুর। মানুষের অন্তরদেশে এটা স্থান পেয়েছে। তদুপরি ইমাম আবু ইউসূফ ও ইমাম মুহাম্মদের যখন খলীফা হারুণুর রশীদের দরবারে পদোন্নতি হলো, তখন হানফী মাজহাবের শক্তি অধিক বৃদ্ধি পায়।

ইমাম আবু ইউসূফ সাহেবের প্রভাব খলীফা হারুণুর রশীদ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা সাহেবের প্রভাব প্রতিপত্তি চিরস্মরণীয় রইল কেন? বহু ইমামই তাঁদের জমানায় প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। ইমাম আওজায়ী তাঁর জীবিতকালে এমনকি তারপরও সমগ্র শামদেশে অদ্বিতীয় ইমামরূপে সম্মান লাভ করেছিলেন। তথাপি তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি সীমাবদ্ধ ছিল; কালে এটার নাম নিশানা পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। কাজেই এ সকল দ্বারা সুপ্রমাণিত হয় যে, ইমাম আবু হানীফা সাহেবের মাজহাবে এমন কোন অন্তর্নিহিত শক্তি ও সৌন্দর্য ছিল, যা অন্য কোন মাজহাবে ছিল না।

অন্যান্য ইমামদের প্রসার লাভের ভিত্তিভূমি

সমগ্র মুসলিম সাম্রাজ্যে ইমাম আবু হানীফা, মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ বিন হাম্বল সাহেবের ফিকাহ প্রসিদ্ধি লাভ করে। তাঁদের প্রত্যেকের ফিকাহ-শাস্ত্রের নিজস্ব গুণাগুণ এবং মৌলিকতা এদের গুরুত্ব পরিবর্ধনে অবশ্যই বিপুলভাবে সহায়ক ছিল। তদুপরি বাইরের পারিপার্শ্বিকতাও এদেরকে কম প্রভাবান্বিত করেননি। আমার মতে ইমাম আবু হানীফা ব্যতীত অন্যান্য প্রত্যেকের পারিপার্শ্বিকতাই তাঁদের প্রসিদ্ধি লাভে বিপুল সাহায্য করেছিল।

ইমাম মালেক মদীনাবাসী ছিলেন। এটা নবুওতের প্রাণকেন্দ্র ছিল। খোলাফায়ে রাশেদীনের জামানায়ও এটা রাজধানী ছিল। কাজেই সাধারণতঃ জনসাধারণ মদীনার ইমামের প্রতি বিশেষ আন্তরিকতা ও বিশ্বাস-ভক্তি রাখত। তাঁর বংশধরও একটি এলমী খান্দান ছিল।

তাঁর দাদা মালেক বিন আবি আমার নামজাদা সাহাবাদের কাছ হতে হাদীস শিক্ষা করেন। তাঁর চাচা শায়খুল হাদীস ছিলেন। ইমাম মালেক যখন হাদীস ও ফিকাহতে বিশেষ জ্ঞান লাভ করলেন, তখন তাঁর পারিপার্শ্বিকতা তাঁর প্রভাব বিস্তারে বিপুলভাবে সাহায্য করেছিল। তখন চারদিকে তাঁর যশঃ ও গৌরব বিস্তৃতি লাভ করে।

ইমাম শাফেয়ী সাহেবের পারিপার্শ্বিকতা তাঁর প্রসিদ্ধি বিস্তারে অধিকতর সাহায্য করেছিল। মক্কা-শরীফ ছিল তাঁর জন্মস্থান। তিনি কোরাইশ বংশের মুত্তলিবের বংশধর। মাতৃ-পক্ষের দিক দিয়ে তিনি হাশেমী ছিলেন। তাঁর সমগ্র গোষ্ঠী বীরশ্রেষ্ঠ ও চির সম্মানী ছিলেন। তাঁর দাদার পিতা বদরের যুদ্ধে হাশেমীদের পতাকাবাহী ছিলেন। তিনি মক্কাতেই জন্মগ্রহণ করেন। একটি লোককে প্রসিদ্ধ করে তুলতে এটার চেয়ে উত্তম পারিপার্শ্বিকতা আর কি থাকতে পারে?

ইমাম আবু হানীফা সাহেবের এইসব অনুকূল পারিপার্শ্বিকতা ছিল না। কোরাইশী বা হাশেমী হওয়া দূরের কথা, তিনি আরব দেশের অধিবাসী পর্যন্ত ছিলেন না। মুসলিম সমাজের নেতৃস্থানীয় হওয়ার মত উপযুক্ত লোক তাঁর বংশে জন্মগ্রহণ করেননি। ব্যবসা ছিল তাঁর বাপ-দাদার পেশা। তিনিও জীবনের এক বিরাট অংশ ব্যবসা-বাণিজ্যে কাটান। তাঁর জন্মভূমি কুফা নগর যদিও শিক্ষা-কেন্দ্র বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল, কিন্তু মক্কা মদীনার সাথে এটার কোন তুলনা হতে পারে না। এবম্বিদ কারণ ও অপ্রিয় পারিপার্শ্বিকতার দরুণ বহু মুহাদ্দেস ও

রেওয়ায়েতকারী তাঁর ঘোর বিরোধী ছিলেন। সংক্ষেপে এতটুকু বলা চলে যে, অতি অনায়াসে জনগণ কর্তৃক সমাদৃত এবং জনগণকে প্রভাবান্বিত করার নিমিত্ত যাকিছু পরিবেষ্টনে আবশ্যক, সেই সকলের কোনকিছুই তাঁর অনুকূলে ছিল না। এমতাবস্থায় তাঁর ফিকাহ্-শাস্ত্র যে, একদিন সমগ্র ইসলামী সাম্রাজ্যে প্রচারিত ও বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল, এটার মূলে নিশ্চয়ই কোন অন্তর্নিহিত শক্তি বিরাজ করে থাকবে। মানব-মনের দেহ-মনের খোরাক নিশ্চয়ই এতে ছিল। বিশ্ব সভ্যতার সাথে তাঁর ফিকাহ্-শাস্ত্রের যেরূপ গভীর যোগাযোগ ছিল, অপর কোন ইমামের বেলায় তা প্রজোয্য নয়। এইজন্যই যে সকল শহরে সভ্যতা অধিক বিস্তৃতি লাভ করেনি, সেই সকল শহরে অন্যান্য ইমামের ফিকাহ অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

আল্লামা ইবনে খল্‌দুন বলছেন যে, এই কারণেই ইমাম মালিকের মাজহাব পূর্বদেশে এবং উন্দুলুছে অধিকতর প্রসার লাভ করেছিল। সেখানে বন্ধুরা সংখ্যায় অধিক ছিল। আর সেখানকার লোকেরা তত উন্নতি লাভ করেনি। এই কারণেই সেখানে ইমাম মালিকের মাজহাব ব্যতীত অন্য কোন মাজহাব তত প্রসার করেননি।

হানফী ফিকাহতে ইমাম আবু হানীফা ব্যতীত তার অপরাপর নামজাদা ছাত্রদের মসায়েলও শামিল ছিল। তা সেই জমানার জন্য অতি মহান আইন বরং অমূল্য বিধি-বিধানের সমষ্টি ছিল।

তারপরও যখন হানফী ওলামায়ে কেরাম তৎসঙ্গে বহু কিছু যোগ করেন এবং শত দিক দিয়ে এটার অধিক উন্নতি লাভ হয়েছিল আর প্রাথমিক অবস্থায় হানফী-ফিকাহ যতদূর পর্যন্ত উন্নতি লাভ করেছিলেন, তখন এটার চেয়ে অধিক উন্নতি কিছুতেই আশা করা যেত না। সেই বিরাট গ্রন্থে ইবাদত ব্যতীত দেওয়ানী, ফৌজদারী, সাক্ষ্যপ্রদান, উত্তরাধিকারীত্ব, অছিয়ত ইত্যাদি বহু কিছু আইন-কানুন স্থান লাভ করেছিল।

বিশ্ববিখ্যাত খলীফা হারুণুর রশীদের বিশাল রাজত্ব তখন ভারতবর্ষ হতে এশিয়া ভূখণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছিল। সেই বিশাল রাজত্বও চলত হানফী আইন অনুযায়ী। তাঁর সময়কার সবকিছু ঘটনা ও সমস্যার সমাধন হতে এই হানফী মাজহাব অনুযায়ী। কাজেই হানাফী মাজহাবের গুরুত্ব কতখানি সুগভীর তা সহজেই অনুমেয়।

ফিকাহ্-সংক্রান্ত মাসায়েলের তফসীর

ফিকাহ মাসায়েল দুইভাগে বিভক্ত। এই হিসেবে এটাকে দুইটি ভাগ করা হয়েছে–

(১) শরীয়ত হতে যে মাসায়েল নেয়া হয়েছে তাকে শরীয়তী আহকাম বলা যায়।

(২) যেই সকল আদেশ সম্বন্ধে শরীয়ত চুপ, সভ্যতা এবং জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনের তাগিদে এটার ভিত্তি-পত্তন হয়েছে, শরীয়তে অবশ্য এ সম্বন্ধে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু এটা শরীয়তের প্রবাহ ধারা নয়।

প্রথম শ্রেণীর মাসআলা অনুযায়ী ফকীহকে শারেহ ও মুফাসসির নামে অভিহিত করা যায়। সেই যোগ্যতা লাভের জন্য তাঁদের মুবারক জবান কোরআন-অভিজ্ঞ, নির্বাচন ক্ষমতাশীল প্রতিভা ও বহু জিনিসের সংমিশ্রণ-সমাধান ক্ষমতা থাকা অত্যাবশ্যকীয়।

দ্বিতীয় শ্রেণীর আহকাম অনুযায়ী স্পষ্ট ফিকাহ-আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা থাকা চাই। দুনিয়ার অন্যান্য বিখ্যাত আইন প্রণয়নকারীদের ন্যায় ফিকাহবিদ ব্যক্তির ও তেমন উপযুক্ততা থাকা চাই। মুসলিম জাহানে এমন সব বহুলোক অতীত হয়ে গিয়েছেন, যাঁরা কোরআন ও হাদীসের সুবিখ্যাত ও সুযোগ্য মুফাসসের ও শারেহ ছিলেন। কিন্তু অতি কম লোকেরই আইন প্রণয়ন ক্ষমতা ছিল। এইরূপ লোকও বহু জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যাঁর আইন প্রণয়ন ক্ষমতাও ছিল, কিন্তু তাঁদেরকে কোরআনের শরীয়ত মুফাসসের বলা চলে না। আমি যতটুকু অবগত আছি তাতে আমার মনে হয়, মুসলিম জাহানের সেই সুদীর্ঘ ইতিহাসে এই উভয়বিধ জ্ঞানই আল্লাহতালা ইমাম আবু হানীফা সাহেবকে দান করেছিলেন, যার সমন্বয় আপন কোন মুজতাহেদ বা ইমামের মধ্যে পাওয়া যায়নি।

এলমে ফিকাহতে ইমাম সাহেবের সর্বশ্রেষ্ট দান এই যে, তিনি তাশরীয়ী ও গায়ের তাশরীয়ী আদেশের মধ্যে ভেদরেখা টেনে দিয়েছেন।

মাজহাবী ও অ-মাজহাবী হাদীসাবলীর পার্থক্য

শরীয়ত বর্ণনাকারীদের কথা ও কাজ যা রেওয়ায়েতরূপে প্রচলিত হয়ে আসছেন, এ সকলের মধ্যে এমন কতক আদেশও রয়েছে, মাজহাবের সাথে যাদের কোন সম্বন্ধ নেই। কিন্তু সাধারণভাবে এ সকলকে হাদীসের কথা বলে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। ফিকাহ বিস্তৃত বিবরণে একটি সাধারণ ও মহাভুল এই

হয়েছে যে, এই সবকিছুকে শরীয়তের অন্তর্গত বিষয় বলে বিবেচনা করা হয়েছে। সেই ধারণার বশবর্তী হয়ে এই সকলের উপর নির্ভর করে মসায়েল ও আহকাম কায়েম করা হয়েছে। অথচ এই সকল হাদীস শরীয়তের সাথে কোন সম্বন্ধ রাখে না।

শাহ ওলি-উল্লাহ সাহেব লিখেছেন, হযরত (সাঃ) যা কিছু ফর্মায়ে গিয়েছেন এবং হাদীসের কিতাবসমূহে এটা স্থান পেয়েছে তা দুই প্রকারের–

(১) তবলীগে রেসালতের সাথে যে সকল সম্বন্ধ রয়েছে। এই সম্বন্ধে আয়াত নাযিল হয়েছে। 'রাসূল যা প্রদান করেছেন, তা গ্রহণ কর এবং তিনি যা নিষেধ করেছেন, তা হতে বিরত থাক।'

(২) যা তবলীগে রেসালতের সাথে কোন সম্বন্ধ রাখে না। এ সম্বন্ধে হযরত (সাঃ) বলেছেন, "আমি একজন মানুষ মাত্র। আমি যখন কোন ধর্মীয় আদেশ করি, তখন তোমরা তা পালন করবে। আর যখন নিজের রায় অনুযায়ী কোন আদেশ করি, তখন আমি একজন মানুষ মাত্র।"

সেই সকল কাজ হাদীসের দ্বিতীয় অংশের অন্তর্ভুক্ত। এ সকল বর্ণনা ইবাদত হিসেবে, না ঘটনাক্রমে, না ইচ্ছাপূর্বক ঘটেছে। হযরত (সাঃ) নিজ সম্পদায়ের ধারণা অনুযায়ী যা বর্ণনা করছেন, এই সকল হাদীস এটার অন্তর্গত।

উম্মে জরার হাদীস, খরাফার হাদীস এবং সেই সকল কাজ এটার অন্তর্গত, যা হযরত (সাঃ) আংশিক মঙ্গলের খাতিরে গ্রহণ করতে বলছিলেন। তা সকলের জন্য আমল করা ওয়াজিব ছিল না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, সৈন্যদের প্রস্তুতির উল্লেখ করা যায়। এই ভিত্তিতে হযরত ওমর (রাঃ) বলছেন, "এখন রমল [এমন এক বিদ্যা যার সাহায্যে গায়েবের কথা বলা যায়] করার কোন আবশ্যক নেই। যাদেরকে দেখাবার মানসে আমরা রমল করতাম, খোদা তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন।"

হযরত (সাঃ)–এর বহু আদেশ উক্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা চলে যে, রাসূল (সাঃ) আদেশ করেছিলেন, "জেহাদে কোন ব্যক্তি যদি কাফেরকে নিহত করে, তবে সেই ব্যক্তি নিহত ব্যক্তির তলোয়ারের মালিক হবে।"

শাহ্ ওলিউল্লাহ্ সাহেব হাদীসের শ্রেণীবিভাগ করতে যেয়ে যে সূক্ষ্ম প্রভেদের কথা বর্ণনা করেছেন, সেই সবের প্রতি ইমাম সাহেবের দৃষ্টি সর্বপ্রথম আকৃষ্ট হয়েছিল।

জুমআর দিবসে গোসল, দুই ঈদের দিনে স্ত্রীলোকদের বের হওয়া, তালাকের আদেশ জারী হওয়া, জিজিয়া নির্ণয় ইত্যাদি সম্বন্ধে ইত্যাদি সম্বন্ধে যে সকল

হাদীস বর্ণিত হয়েছে, সেই সকলকে ইমাম আবু হানীফা সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

কিন্তু ইমাম শাফেয়ী ইত্যাদি এই সকল হাদীসকে তশরীয়ী হাদীস বলে বিবেচনা করেছেন।

হানফী-ফিকাহ এই সকল নিয়ম কানুনের অধীন। আর এতে আজাদীও রয়েছে। কিন্তু অন্যান্য ইমামের মাসআলায় তা পাওয়া যায়নি। হানফী ফিকাহ অত্যন্ত পরিষ্কার ও স্পষ্ট। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, অন্যান্য ইমামগণ এ সকলের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করেননি। খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে যদি এ সকল দৃষ্টান্ত না থাকত, তবে ইমাম আবু হানীফা সাহেবও বোধ হয় এই কাজে অগ্রসর হতেন না। ইমাম সাহেবের পরেও যদি কোন কোন ইমাম তাঁর বিরোধিতা করে থাকেন এবং তাঁর উসূলের পায়রবী না করে থাকেন এবং সেই সকল ভ্রম ধারণার উপরই কায়েম থেকে থাকেন, তথাপি এতে বিন্দু পরিমাণও সন্দেহ নাই যে, ইমাম সাহেবের রায় অত্যন্ত সহী এবং তাঁর ফিকাহও সহী ভিত্তির উপর সংস্থাপিতা রয়েছে।

যে মাসআলা তশরীয়ী নয়

খোলাফায়ে রাশেদীনের চেয়ে শরীয়তের হুকুম সম্বন্ধে অধিক সূক্ষ্মদৃষ্টি কার থাকতে পারে? তাঁদের কার্যকলাপ আমাদের পক্ষে বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। হযরত ওমরের (রাঃ) খেলাফতের পূর্ব পর্যন্ত যে দাসীর গর্ভে সন্তান জন্মিত, তাকে বেচাকেনা করা হতো।

হযরত ওমর সেই প্রথা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিলেন। হযরত (সাঃ) যখন গণীমতের মাল বণ্টন করতেন, তখন স্বীয় আত্মীয়-স্বজনের জন্য অংশ রেখে দিতেন। খেলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে অপরের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং হযরত আলী (রাঃ) ও হাশেমীদেরকে এটার কোন অংশ দেননি।

হযরত (সাঃ) জমানায় এমন কি হযরত আবু বকর (রাঃ) এর খেলাফতের সময়ও তিন তালাককে এক তালাকরূপে বিবেচনা করা হতো। হযরত ওমর (রাঃ) স্বীয় খেলাফতের সময় ঘোষণা করে দিলেন যে, তিন তালাককে বায়েন তালাক বিবেচনা করতে হবে।

হযরত (সাঃ)–এর জমানায় শরাব পানের কোন নির্দিষ্ট শাস্তি নির্ধারিত ছিল না। হযরত আবু বকর (রাঃ) চল্লিশ দুররা এটার শাস্তিস্বরূপ নির্দিষ্ট করে দেন।

এতেও শরাব পান কমছে না দেখতে পেয়ে হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর খেলাফতের জমানায় চল্লিশ দুররার পরিবর্তে আসি দুররা নির্দিষ্ট করে দেন।

এ সকল ঘটনা হাদীসের কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এটার প্রামাণ্য কেউই অস্বীকার থাকতে পারে যে, সেই সকল হুকুমকে তাঁরা তশরীয়ী আদেশ মনে করা সত্ত্বেও সেই সকলের খেলাফ কাজ করতেন? নাউযু বিল্লাহ, তাঁরা যদি তাই করতেন, তবে তাঁরা খোলাফায়ে রাশেদীন হওয়ার উপযুক্ত হতেন না।

প্রকৃত কথা এই যে, সাহাবাগণ রাত্রিদিন হযরত (সাঃ)–এর খেদমতে হাজির থাকতেন এবং তাঁর সাহচর্য হতে ফয়েজ লাভ করতেন। তাঁদের পক্ষে এটা জানা সহজ ব্যাপার ছিল যে, কোন্ কোন্ আদেশ তশরীয়ী শ্রেণীভুক্ত।

হযরত আয়েশা (রাঃ) হযরত (সাঃ)–এর ইন্তেকালের পর কোন এক ঘটনা সম্পর্কে বলেন, "আজ যদি আল্লাহর রাসূল বর্তমান থাকতেন, তবে তিনি স্ত্রীলোকদেরকে মসজিদে যাবার অনুমতি দিতেন না।"

এতে স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়েছে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) আল্লাহর রাসূলের সেই আদেশকে তশরীয়ী বলে বিবেচনা করতেন না এবং এটাকে অপরিহার্য বলেও বিবেচনা করতেন না। অন্যথায় সময় ও অবস্থার বিভিন্নতা এটার উপর কি প্রভাব খাটাতে পারে?

ইমাম আবু হানীফা সাহাবাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করতেন। সবকিছু ব্যাপারে তিনি খোলাফায়ে রাশেদীনেরই অনুকরণ অনুসরণ করতেন। কিন্তু যাদের দৃষ্টি এতদূর পর্যন্ত পৌঁছত না, তারা শুধু ইমাম আবু হানীফা কেন, খোলাফায়ে রাশেদীনকে পর্যন্ত মরদুদ বলে অভিহিত করতে দ্বিধাবোধ করেননি। তালাকের মাসআলা সম্বন্ধে হযরত ওমর (রাঃ)–এর অভিমত প্রসংগক্রমে জনৈক কাজী সাহেব লিখেছেন, "আল্লাহর রাসূলের মোকাবেলায় বেচারা ওমর (রাঃ)–এর কি হাকীকত থাকতে পারে?" কিন্তু সেই কাজী সাহেবের জানা উচিত ছিল যে, তাঁর চেয়ে হযরত ফারুক (রাঃ) অধিক অবগত ছিলেন যে, রাসূলের তুলনায় তাঁর কোন হাকীকতই থাকতে পারে না।

ফিকাহর পূর্বে শপথ সম্বন্ধে ইমাম আবু হানীফা সাহেব এক কষ্টি-পাথর দান পূর্বক সমাজের বিরাট মঙ্গল সাধন করেছেন। এটার দরুণই ফিকাহ, যা তখন পর্যন্ত মাসআলার কোন এক অংশবিশেষরূপে বিবেচিত হতো, তা কালে একদিন একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ বিষয় বস্তুতে পরিণত হয়। তাঁর সর্বাপেক্ষা বাহাদুরি এই যে, জ্ঞান-চর্চা যখন অত্যন্ত প্রাথমিক অবস্থায় ছিল, এমনকি নকল করা বা গ্রন্থ মুদ্রিত

করার প্রথাও চালু ছিল না, তখন এমন একটি অতি সূক্ষ্ম বিষয়ে ভিত্তি পত্তন করা প্রকৃতপক্ষে ইমাম আবু হানীফা সাহেবেরই কাজ ছিল।

অনেকের ধারণা এই যে, এই সকল নিয়ম-কানুন যা আজকাল ফিকাহ নামে পরিচিত, তা সকলের পূর্বে ইমাম শাফেয়ী এটার ভিত্তি পত্তন করেন। একদিক দিয়ে এই দাবী সত্য যে, ইমাম শাফেয়ীর পূর্বে তা কখনও লিখিতভাবে প্রকাশ পায়নি। কিন্তু ইমাম শাফেয়ীর বহু পূর্বেই এটার মূলভিত্তির পত্তন হয়েছিল। এই হিসেবে ইমাম আবু হানীফাকেই ফিকাহ-শাস্ত্রের ভিত্তি পত্তনকারী বলা চলে।

মাসআলা যাচাই কখন শুরু হয়?

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মাসআলা-যাচাই ও রেওয়ায়েত-নির্বাচন তাবেয়ীন, এমনকি সাহাবাদের জমানায়ই আরম্ভ হয়েছিল। কিন্তু তা তখন কোন ধারাবাহিক এলহী নিয়ম পদ্ধতির অধীন ছিল না। সাধারণ লোক কোনকিছু শ্রবণ করে যেমন কোন উপসংহারে বা নিজ নিজ প্রেরণা ও বুদ্ধি অনুযায়ী যেমন ইচ্ছে এটার তাৎপর্য গ্রহণ করে, অথচ জানেও না যে, তা কোন সাধারণ নিয়ম-তন্ত্রের অধীন কিনা এবং এটার শর্তাবলী এবং কায়দা-কানুন তারা কিছুই অবগত নয়, তদ্রূপভাবেই তাঁরাও ফিকাহ-সংক্রান্ত মাসায়েল যাচাই ও নির্বাচন করতেন। তখন কোন এলমী পরিভাষাও কায়েম হয়নি, কোন ধারাবাহিক উসূল ও তখন ছিল না।

ওয়াসেল বিন আতায়া ও ফিকাহর কতিপয় কায়দা

বনি ওমাইয়ার রাজত্বকালের শেষ ভাগে কিছু কিছু এলমী পরিভাষার সমাবেশ হয়েছিল। এলমে কালামের প্রতিষ্ঠাতা ওয়াসেল বিন আতায়া শরীয়তের আদেশাবলীর সর্বপ্রথম শ্রেণী বিভাগ করেন। সত্য-উদ্ধারে তিনি কোরআনের নাতেক, হাদীসে মোত্তাফিক আলাইহে, এজমায়ে উম্মত ও বুদ্ধিগত প্রমাণ এই চারটি পন্থা বের করলেন। বুদ্ধিগত প্রমাণ অর্থ কিয়াস। তদুপরি তিনি আরও কতিপয় মাসআলা ও পরিভাষা কায়েম করেন। তা এই যে, সাধারণ মানুষের বুদ্ধি ও বিশিষ্ট লোকের বুঝাপড়ায় বহু পার্থক্য রয়েছে। শুধু সৎকার্যে আদেশ ও অসৎ কার্যে নিষেধ সম্বন্ধে হতে পারে। আখবার ও ঘটনা সম্বন্ধে কোন হতে পারে না।

এ সকল দিক দিয়ে বিবেচনা করে দেখলে এটা বলা চলে যে, তখন হতে

উসূলে-ফিকাহর প্রারম্ভিক কাজ শুরু হয়েছিল। কিন্তু এই প্রারম্ভের উপর ততটুকু গুরুত্ব দেয়া চলে, যতটুকু গুরুত্ব প্রদান করা চলে যে, হযরত আলী (রাঃ) নহুর দুই তিনটি নিয়ম বর্ণনা করেন। অথচ সেই হিসেবে তাঁকে নহু-শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা বিবেচনা করা হয়ে থাকে। সে যাহা হোক ইমাম আবু হানীফা সাহেবের পূর্বে এ সম্বন্ধে যা কিছু হয়েছিল, তা এর চেয়ে অধিক ছিল না। ইমাম সাহেব ফিকাহ-শাস্ত্রকে মুজতাহেদসুলভ এবং একটি নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু হিসেবে একটি ধারাবাহিক রূপ দিতে চেয়েছিলেন। কাজেই তাঁর উদ্দেশ্যকে সাফল্যমণ্ডিত করার বাসনায় মাসআলা যাচাই এবং মাসআলা বের করার নিমিত্ত তিনি বহুকিছু নিয়ম-কানুন প্রণয়ন করেন।

উসূলে ফিকাহর ভিত্তিভূমি

পরবর্তী সময়ে উসূলে-ফিকাহ যদিও একটি বিরাট বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছিল এবং এইরূপে অসংখ্য মাসায়েলের ভিত্তি পত্তন হয়েছিল, অথচ ইমাম সাহেবের জমানায় এটা কোন বিষয়বস্তু বলে পরিগণিত হতো না, কিন্তু এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, এটার মূল-বীজ ইমাম সাহেবের জমানাতেই বপন করা হয়েছিল।

হাদীস-শৃঙ্খলা ও এদের সমূহ আদেশ, এদের সংশোধন ও সুনিয়ন্ত্রণ, উসূল সমূহের সামঞ্জস্য স্থাপন, কেয়াসের আহকাম ও শর্তাবলী, হুকুমের শ্রেণী-বিভাগ, সাধারণত ও অসাধারণের পার্থক্য, বিভিন্ন মতবিরোধের সমন্বয় সাধন ইত্যাদি উসূলে-ফিকাহর যে সকল মূলবস্তু রয়েছে সেই সবকিছু সম্বন্ধে ইমাম সাহেব জরুরী উসূল ও বিধি-বিধান প্রণয়ন করে গিয়েছেন।

হাদীস সম্বন্ধে ইমাম সাহেব উসূল প্রণয়ন করছেন, তা হাদীসের প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধেও তিনি সমূহ বিধি-বিধান দান করে গিয়েছেন। তিনি এ সম্বন্ধে যা কিছু বিধান দিয়ে গিয়েছেন, তা লিপিবদ্ধ করতে গেলে এক বিরাট গ্রন্থে যা কিছু বিধান দিয়ে গিয়েছেন, তা লিপিবদ্ধ করতে গেলে এক বিরাট গ্রন্থে পরিণত হবে। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে তা সম্ভবপর নয়। শাফেয়ী ও হানফী বহু কিতাবে এ সকলের বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে। এদের প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝা যায়, ইমাম আবু হানীফা এজতেহাদের একটি বিশিষ্ট পন্থার নির্দেশ দান করে গিয়েছেন। এ সকলের প্রতি সূক্ষ্ম দৃষ্টিপাত করলে বুঝা যায় যে, ইমাম মুহাম্মদ ও কাজী আবু ইউসূফের তরীকা ও ইমাম সাহেবের তরীকায়

কোন পার্থক্য নেই। এটা অবশ্য শিরোধার্য যে, মাসায়েলের কোন কোন অংশে তাঁর সাথে তাঁদের ঘোর ব্যবধান ছিল।

যদিও ইমাম শাফেয়ী ইত্যাদি তাঁর বিরোধিতা করছেন, তথাপি তাঁর উসূলে মাসআলা অত্যন্ত বিরাট ও সূক্ষ্ম-সত্য কায়েমে সহায়তা করেছিল। আক্ষেপের বিষয় এই যে, আমাদের এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে এদের সঙ্কুলান হবে না। উসূলী কিতাব সমূহে এই সকল আলাপ-আলোচনা অতি বিস্তারিতভাবে উল্লেখিত হয়েছে। কারও আগ্রহ থাকলে, সেই সকল কিতাব দেখে নিতে পারেন।

আমরা পূর্বেও উল্লেখ করেছি যে, ফিকাহ-শাস্ত্রে ইমাম সাহেবের দান হিসেবে তিনি একজন মুফাসসের এবং সঙ্কলনকারী। আর এটা নিঃসন্দেহ যে, এই প্রসঙ্গে তাঁর যা কিছু দান রয়েছে, তা শুধু ইসলামের ইতিহাসে নয়, বরং সমগ্র দুনিয়ার ইতিহাসে অতুলনীয়। আসমানী কিতাবওয়ালা আরও বহু জাতি রয়েছে। আর তাঁরা সেই সকল কিতাব হতে বহু কিছু আদেশ উপদেশ গ্রহণ করেও থাকেন। কিন্তু তাঁদের কেউই এটা দাবী করতে পারবেন না যে, তাঁরা সেই সকল সমস্যা সমাধানে কোন ধারাবাহিক বিধি-বিধানানুযায়ী এবং যথাযথ যুক্তিসংগতভাবে স্বীয় কর্তব্য পালন করে এটাকে একটি নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুরূপে পরিগণিত করে গিয়েছেন।

নবম পরিচ্ছেদ

হানফী ফিকাহ ও রাজ্য পরিচালনা

এটার যে অংশটুকু আইন-কানুনের সাথে বিজড়িত তা এটার অপরাপর অংশ হতে শতগুণে বিস্তৃত ও প্রশস্ত। আর এই দিক দিয়েই অপরাপর মুজতাহেদীনের তুলনায় তাঁর একটি অদ্বিতীয় শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। বরং এটা সত্য যে, ইসলামের ইতিহাসে কেউ যদি আইন প্রণয়নকারীরূপে জন্মগ্রহণ করে থাকেন তবে তিনি হলেন ইমাম আবু হানীফা সাহেব।

এই দিক দিয়ে তাঁর সমসাময়িকদের তুলনায় তাঁর অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে, তিনি পারলৌকিক সমস্যা-সমাধানের সঙ্গে সঙ্গে ইহলৌকিক সমস্যাসমূহ সমাধানেও পরিপূর্ণ গুরুত্ব প্রদান করছেন। মানব সভ্যতার দাবীও তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। রাজ্যবিস্তার ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার কল্যাণে বহু জটিল ও অপরিহার্য সমস্যার সমাধান করেছেন। তাঁর শিক্ষা সঙ্কট পরিপূর্ণ রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান হতো। রাজ্য পরিচালনায় এসবের কোন তুলনা নেই। তাঁর

হাজার হাজার ছাত্র বহু উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁরা প্রত্যেকেই শান্তশিষ্ট সুবোধ বালকের ন্যায় তাঁর পদপ্রান্তে বসে তাঁর উপদেশামৃত পান করতেন। তাঁর নির্দেশ মতই তাঁরা রাজ্য পরিচালনা করতেন।

তদুপরি তিনি স্বয়ং একজন বিরাট আইন প্রণয়নকারী ছিলেন। তিনি মানব জীবনের সমূহ সমস্যার সাথে পরিচিত ছিলেন। তিনি প্রত্যেকটি সমস্যাকে পরম বিচক্ষণতার দৃষ্টিতে দেখতেন। আর অতি সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে এদের সমাধান করতেন। ঐতিহাসিকগণ এ সম্বন্ধে বহুকিছু নজীর পেশ করছেন। আমরা নিম্নে দুই একটি উল্লেখ করলাম। এখন আমরা শুধু সেই সবেরই অবতারণা করব, যে কারণে হানফী ফিকাহকে অপরাপর ফিকাহর উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়ে থাকে।

হানফী ফিকাহ্ ও বুদ্ধি-কষ্টিপাথর

মাসআলা-রহস্য ও মঙ্গল সাধন প্রচেষ্টা হানফী মাজহাবের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। শরীয়তের বিধি-বিধান সম্বন্ধে ইসলামের ইতিহাসে প্রথম হতেই দুইটি দল কায়েম হয়েছিল। এক দলের অভিমত এই যে, শুধু ইবাদতের সাথেই ইসলামী শরীয়তের সম্বন্ধ রয়েছে। অর্থাৎ এতে অন্য কোন রহস্য বা মঙ্গলামঙ্গলের সম্পর্ক নেই। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁরা উল্লেখ করছেন যে, মদ্যপান জুয়া ও চুরি শুধু এই জন্য নিন্দনীয় যে, শরীয়ত এ সকল নিষেধ করছেন। আর জাকাত প্রদান ও দান দক্ষিণা এই জন্য প্রশংসনীয় যে, শরীয়ত এ সম্বন্ধে সবিশেষ জোর প্রদান করে থাকে। এতদ্ব্যতীত এটার নিজস্ব দিক দিয়ে ভাল বা মন্দ বলে কোন কিছু নেই। ইমাম শাফেয়ীরও এই দিকেই ঝোঁক ছিল। আর সম্ভবতঃ সেই একই কারণে আবুল হাসান আশআরী যিনি শাফেয়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে এল্‌মে কলামের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, তিনিও একে কেন্দ্র করেই এল্‌মে কালামের ভিত্তি পত্তন করেন।

দ্বিতীয় দলের অভিমত এই যে, শরীয়তের সমূহ আদেশ-নিষেধ মঙ্গলরসে ভরপুর। অবশ্য এমন কতিপয় প্রশ্নও রয়েছে যে, সাধারণ লোক এতে কি মঙ্গল নিহিত রয়েছে। তা বুঝে উঠতে পারে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এদের কোনটাই মঙ্গলশূন্য নয়। এই সমস্যা সম্বন্ধে যদিও উভয় দলেই বহু জবরদস্ত আলেম রয়েছেন এবং এটা একটি গুরুতর সমস্যারূপে দেখা দিয়েছে, তথাপি ন্যায়ের চোখে দেখতে গেলে, এতে আদৌ গুরুত্ব প্রদান করা চলে না। কালামে এলাহীর প্রতি লক্ষ্য করলেই আমাদের এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। পাক

কোরআনের এই সৌন্দর্যই কাফেরদের বিরুদ্ধে অমোঘ অস্ত্র। নামাযে কি মঙ্গল নিহিত রয়েছে, এ সম্বন্ধে খোদা স্বয়ং বলেছেন, "নিশ্চয় নামায নির্লজ্জতা ও অবাধ্যতা হতে ফিরায়ে রাখে।" আর রোযা যে ফরজ তা বলবার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্ বলছেন, "যেন তোমরা পরহেজগার হতে পারে।" জেহাদের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, 'এ পর্যন্ত যেন কোন অশান্তি-উপদ্রব না থাকে।' অর্থাৎ নামায একটি ইবাদতও বটে। কিন্তু এই ইবাদত দ্বারা যে শুধু আল্লাহর নৈকট্যই লাভ করা যায় তা নয়। বরং নৈতিক চরিত্রের উপরও এটার বিপুল প্রভাব প্রতিপত্তি নিহিত আছে। আর রোযা দ্বারা স্বাস্থ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সংযমী হওয়ারও পর্যাপ্ত সাহায্য হয়ে থাকে। আর জেহাদ দ্বারা যে শুধু ইসলামের শত্রুকুলই ধ্বংস হয়ে থাকে, তা নয়; বরং সত্যকে বিজয়ী ও অসত্যের ধ্বংস সাধনে এটাই একমাত্র অমোঘ অস্ত্র। এই মহান অস্ত্রের সাহায্যে অসত্যকে চির-বিনষ্ট করতে পারলে, অসত্য আর কোনদিন মাথা তুলতে পারে না। তখন এই ধরাপৃষ্ঠে সত্যের রাজ্যই শুধু চলতে থাকে। এইরূপে বিশ্বচরাচর এই মহা অনিষ্টের হাত থেকে রেহাই পেয়েই এক অদ্বিতীয় মহা মঙ্গল ধনে মহাধনী হয়ে উঠে। ইসলাম শুধু পরকালের গান গেয়েই এটার সুর নিঃশেষ করেনি। এটার প্রত্যেকটি আদেশ-নিষেধ ইহ-পরকালের মঙ্গলরসে ভরপুর। এটা কোন কবির কবিত্ব বা ভাবুকের ভাবাতিশয্য নয়। ইসলামের ইতিহাস এবং পবিত্র কোরআন-হাদীস এটা জ্বলন্ত প্রমাণ।

সত্য বটে; মুসলমানগণ ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক যুগে তাঁদের জন্মভূমি মক্কা-শরীফ পরিত্যাগ করে স্ত্রী-পুত্র পরিবার ও সহায়-সম্পত্তি বিসর্জন দিয়ে একদিন আবিসিনিয়া ও মদীনার হিজরত করেছিলেন এবং রাহমাতে আলমকেও একদিন জন্মভূমির মায়া পরিত্যাগ করতে হয়েছিল; কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবী-জীবনের মক্কায় তেরটি বছর এবং মদীনায় দশ বছরকাল, সিদ্দীকে আকবরের খেলাফতের দুই বছর এবং ফারুকে আজমের খেলাফতের দশ বছর এই পঁয়ত্রিশটি বছরের মধ্যে আবিসিনিয়া ও মদীনা হতে শক্তি সঞ্চয় করে মুসলমানদেরকে শুধু মক্কা বিজয়েই পরিতুষ্ট থাকতে দেখিনি, বরং তাঁদের সম্মিলিতভাবে প্রকৃত মুসলিম জীবন যাপনের ফলে স্পেন হতে সিন্ধুদেশ পর্যন্ত এক অপ্রতিহত বিরাট ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা লাভ দেখেছি। পবিত্র কোরআন-হাদীস এ সকল মহাসত্যে ভরপুর।

পবিত্র কোরআন শরীফে বজ্রগম্ভীর স্বরে ঘোষণা করা হয়েছে, যারা ইসলামের হুবহু অনুকরণ করবে, তাদের নিমিত্ত 'তাদের নিমিত্ত ইহ-পরকালের

পরম সুসংবাদ রয়েছে।' আর যারা ইসলামকে অমান্য ও অস্বীকার করবে তাদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে, 'অনন্তর যারা কাফের হয়েছে, আমি তাদেরকে ইহ-পরকালে চরম দুর্গতির ভাগী করব।' পাক-কোরআনের অন্যত্র ঘোষণা রয়েছে, "তাদের নিমিত্ত ইহ-পরকালে অপমান ও লাঞ্ছনা রয়েছে।

হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, 'ইসলাম ও রাজত্ব একই গর্ভের দুইটি যমজ সন্তান।' মাতৃগর্ভের যখন দুইটি সন্তান জন্মে, তখন একটি ভূমিষ্ট হয়, অপরটি ভূমিষ্ট হয়নি, এমন হয় না। তদ্রূপ ইসলাম যেইখানে থাকবে, রাজত্বও সেইখানে থাকবে। ইসলাম রয়েছে অথচ রাজত্ব নাই তা কস্মিনকালেও হতে পারে না।

বর্তমান মুসলিম জাহান এ সকল মহাসত্য ভুলে গিয়েছে। এটা জানবার বুঝবার স্পৃহাও তাদের মধ্যে সজীব নেই। তাদেরকে এ সকল বুঝায়ে দেওয়ার মত লোকেরও মহা অভাব পরিলক্ষিত হয়। শুধু তাই নয়, যাঁরা আজ এই বিশ্বচরাচরে পরহেজগার দীনদার বলে পরিচিত, এমনকি অতি নগণ্যসংখ্যক লোক ব্যতীত আলেম-ওলমাগণও নিজেরা পবিত্র কোরআন হাদীসের পরিপূর্ণ ইসলামী জিন্দেগানীর সাথে অপরিচিত হয়ে উঠছেন। মসজিদ, মাদ্রাসা, ঈদগাহ ও কবরস্থান ব্যতীত অপরাপর সবকিছু দুনিয়াদারদের হাতে ইজারা দিয়ে তাঁরা নীরবে সন্তুষ্টচিত্তে বসে রয়েছে। গৃহস্থালী, ব্যবসায়-বাণিজ্য, রাজ্য শাসন ও দেশরক্ষা ইত্যাদি সব কিছু হতে তাঁরা বহুদূরে সরে পড়েছেন। অপরাপর মুসলমানগণও যদি তাঁদের পথ অবলম্বন করতেন, তবে মুসলিম জাহান একটি পরিপূর্ণ পংগু জীবন-যাপন তথা বিধবা-জীবন যাপন করতে বাধ্য হতে। এমনকি তখন মুসলিম জাহানের বর্তমানেও যা কিছু নগণ্য অস্তিত্ব রয়েছে তাও রক্ষা পাবার কোন উপায় থাকত না। সে জাতির নেতা এইরূপ অধপতিত ও কর্তব্য-জ্ঞান বিবর্জিত তাদের ভবিষ্যৎ কখনও উজ্জ্বল হতে পারে না। ইমামে আজমের হৃদয়ে এ সত্য বড় রিনিঝিনি করে বেজে উঠেছিল। তিনি মুসলিম জাহানকে এই সর্বনাশী অধঃপতন হতে রক্ষা করার নিমিত্ত আপ্রাণ চেষ্টা করে গিয়েছেন। রাজসিংহাসনে উপবেশন না করলেও এবং রাজমুকুট মাথায় একদিনের নিমিত্ত পরিধান করতে সম্মত না থাকলেও তিনি তখনকার মুসলিম জাহানের একচ্ছত্র রাজত্ব করে গিয়েছেন। সত্য বটে, আপনহারা পথহারা তখনকার খলীফা মনসূর ইমাম আজমকে আক্রোশ বশতঃ কারারুদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু জনগণ, উচ্চ ও নিম্নস্থ রাজকর্মচারীবৃন্দ ইমামে আজমের নির্দেশ শিরোধার্য করে চলতেন। এই যে হীন উদ্দেশ্য সফল করার মানসে মনসূর তাঁকে জেলখানায় আবদ্ধ করেছিলেন।

ইমামে আজম জেলখানায় থাকলেও তাঁর মহান উদ্দেশ্য সফলকামে কোন ত্রুটি হচ্ছে না বুঝতে পেরে বোকাচণ্ডি মনসূর ইমাম আজমকে বিষ পান করালেন। ইমাম আজম বিষ-ক্রিয়া বুঝতে পেরে সেজদায় পতিত হলেন। সেই সেজদায় থেকেই তিনি শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করনে। তাঁর সেই সেজদা ব্যর্থ হয়নি। তাঁর মৃত্যুর পর রাজ্যময় তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি সমধিক প্রবল পরাক্রান্ত হয়ে উঠল। বিশ দিন পর্যন্ত হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোক ক্রমাগতভাবে তাঁর কবরকে সম্মুখে রেখে জানাযার নামায পড়েও তারা মনের সাধ মিটাতে পারল না। জগৎ যতদিন পর্যন্ত বর্তমান থাকবে, ইমাম সাহেবের প্রভাব-প্রতিপত্তিও তদ্রূপ চিরবিজয়ী থাকবে। ওলমায়ে কেরাম ও আশেকে রাসূল এবং আশেকে এলাহীবৃন্দ আবার যদি তদ্রূপ মরণ-পণ হয়ে উঠতে পারেন, তবে নিশ্চয় মুসলিম-শিরে আবার এলাহী রাজমুকুট শোভা পাবে।

মোহাদ্দেস ও মুজতাহেদ ইমাম তাহাবী এই সম্পর্কে 'শরেহ মাআনীল আসার' নামক এক বিখ্যাত কিতাব লিখেছেন। এতে আলোচনা করছেন যে, ইমাম সাহেব ফিকাহর মাসায়েল কোরআন-এর আয়াত ও হাদীসের দলীল দ্বারা প্রমাণিত করছেন। ইমাম তাহাবী সাহেব ফিকাহর বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করছেন। আর সত্যের খাতিরে যদিও তিনি কোন কোন বিষয়ে ইমাম সাহেবের বিরোধিতা করছেন, তথাপি তিনি প্রায় মাসআলার ব্যাপারেই মুজতাহেদসুলভ নিয়ম-নিষ্ঠা অনুযায়ী প্রমাণ করে দেখাছেন যে, ইমাম আবু হানীফা সাহেবের মাজহাব হাদীসানুযায়ী এবং বাহ্যিক দৃষ্টি অনুপাতেও সঠিক।

ইমাম মোহাম্মদ কিতাবুল হজ্জে প্রায় মাসআলা বুদ্ধিমত্তা দ্বারা প্রমাণিত করেছেন। এই উভয় কিতাবই মুদ্রিত হয়েছে। আর সর্বত্রই এটা পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে যাঁদের বিস্তারিত জানবার ইচ্ছা থাকে, তাঁরা যেন কিতাব দুইটি দেখিয়ে নেন।

ইমাম রাজীর মতামত

ইমাম রাজী (রাঃ) জাকাত প্রসঙ্গে লিখেছেন যে, ইমাম শাফেয়ীর মাজহাব ইমাম আবু হানীফার চেয়ে অধিক সহী। তাঁর যুক্তির অনুকূলে তিনি বলেছেন যে, ইমাম শাফেয়ীর মাজহাব বুদ্ধি ও কিয়াসের কোন ধার ধারে না। ইমাম রাজী সেই পথকেই অধিক পছন্দ করছেন। তাঁর অভিমত এই যে, যাকাতের মাসআলা এবং ইবাদতের মাসআলায় বুদ্ধি ও অভিমত প্রকাশের উপায় নেই।

অন্যান্য ইমামের তুলনায় ইমাম আবু হানীফার বৈশিষ্ট্যের কারণ এই যে, অন্যান্য যে সকল ইমাম ফিকাহ সম্বন্ধে সাধনা করছেন, ফিকাহর মাসায়েলকে ভিত্তি করেই তাঁদের সেই সাধনা আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু এলমে-কালাম ছিল ইমাম সাহেবের এলেম শিক্ষার ভিত্তি। এটাও তাঁর চিন্তাধারা এবং দৃষ্টিশক্তিকে অত্যন্ত শক্তিশালী করে তুলেছিল। মু'তাজেলারা বুদ্ধির নাম দিয়ে বহু কিছু করতে চেষ্টা করেছিল। কাজেই ইমাম সাহেব তাদেরকে এবং অপরাপরদেরকে বুদ্ধির অস্ত্র দ্বারাই কাবু করতে চেষ্টা করেন। বিতর্কমূলক মাসআলায় কি রহস্য ও মঙ্গল রয়েছে, তাও তিনি দেখাতে চেষ্টা করতেন। তিনি বিভিন্ন চিন্তাধারা, গবেষণা ও গুরুতত্ত্ব দ্বারা প্রমাণ করেই দিয়েছে যে, শরীয়তের প্রত্যেক বিষয় বুদ্ধিসম্মত। অপরাপর মাজহাবের সাথে হানফী মাজহাবের ফিকাহর তুলনা করলে, এই পার্থক্যই দেদীপ্যমান হয়ে উঠে। অন্যান্য ফকীহদের ধারণা, ইবাদত-তো ইবাদতই এতে আবার বুদ্ধির আমদানী কেন? ইমাম সাহেব বলেন, ইবাদতও বুদ্ধির বাইরে কোনকিছু নয়। ইবাদতও বুদ্ধি বিরোধী নয়।

চিন্তা করলে দেখা যায় যে, নামায, রোযা, হজ্ব ও জাকাত ইত্যাদি কোন মঙ্গলের জন্য শরীয়তে ফরজ করা হয়েছে। আর মঙ্গলের দৃষ্টিতে যদি দেখা যায়, তবে কোন্ পথ অপলম্বনীয়? অনুসন্ধানে এই পাওয়া যাবে যে, হানফী মাজহাব যা সমর্থন করছেন, তাই সেই পথ।

কয়েকটি কাজের সমষ্টির নাম নামায। এখন চিন্তা করে বের করতে হবে যে, নামাযের মধ্যে কোন্ কাজটি ফরজ, আর নামায আদায় করতে হলে কোন্ কাজের কি গুরুত্ব রয়েছে। এটা সর্ববাদী সম্মত যে, আল্লাহর ডর ভয়, আনুগত্য প্রদর্শন এবং আল্লাহর মহত্বের স্বীকৃতি নামাযের প্রাণ-কেন্দ্র।

নামাযের মধ্যে সবগুলো কাজ সমান গুরুত্ব রাখে না। তন্মধ্যে কতক জরুরী ও অপরিহার্য। সেইগুলো পালন করা না হলে, নামাযের মূল উদ্দেশ্যেই বিনষ্ট হয়ে যায়। শরীয়তের ভাষায় সেইগুলোকে ফরজ বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। নামাযের মধ্যে এমন কতক বিধানও রয়েছে, সেইগুলো পালন করলে, নামায অধিক সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়। কিন্তু সেইগুলো বাদ পড়লে নামাযের মূল উদ্দেশ্য নষ্ট হয়নি। এই শ্রেণীর কাজগুলো প্রথম শ্রেণীর কাজের চেয়ে কম মর্যাদা সম্পন্ন। কাজেই এইগুলো সুন্নত ও মোস্তাহাব বলে পরিগণিত হয়েছে।

আমরা পূর্বেই বর্ণনা করেছি যে, রাসূল (সাঃ) স্বয়ং নামাযের ফরজ, সুন্নত, ওয়াজিব ও মোস্তাহাব ইত্যাদি কোন বিষয়েই বিস্তৃত ব্যাখ্যা দান করেননি। কিন্তু

এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, নামাযের মধ্যে সবগুলো কাজ বরাবর নয়। প্রত্যেক মুজতাহেদই এদের শ্রেণী বিভাগে একমত হয়েছে। শ্রেণী-বিভাগে অবশ্য তাঁদের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। আর এদের নামকরণও বিভিন্ন রয়েছে। ইমাম সাহেবও সেই একই পথের পথিক হন। তবে অপরাপর ইমামদের সাথে তাঁর পার্থক্য এই যে, তিনি যে কাজটির যেরূপ গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজনীয় তদ্রূপ গুরুত্বই প্রদান করেছেন। নামাযের মধ্যে সবচেয়ে জরুরী হলো আরকান। অর্থাৎ এমন কতক কাজ রয়েছে, যেগুলো ব্যতীত নামায আদায় হতে পারে না। কেননা, আনুগত্যের স্বীকার ও ভয়-প্রকাশ প্রকৃতপক্ষে নামাযের প্রাণবস্তু। প্রত্যেক মুজতাহেদই একমত হয়েছেন যে, নিয়ত, তকবীর, কেরাআত, সেজদা ইত্যাদির চেয়ে আনুগত্য স্বীকার এবং ভয় প্রকাশের অন্য কোন উৎকৃষ্ট উপায় নেই। কাজেই এ সকল ফরজ এবং অনিবার্য প্রয়োজন। স্বয়ং শরাহকারীগণ এ সকলকে অপরিহার্য ও জরুরী হওয়া সম্বন্ধে ইশারা করছেন; বরং কোন কোন স্থলে তাঁরা এ সম্বন্ধে বিস্তৃত ব্যাখ্যাও বর্ণনা করেছেন। অন্যান্য ইমামগণ অধিক বাড়াবাড়ি করে আরকান আদায় করার বিশেষত্বকেও ফরজ বলে সাব্যস্ত করছেন। অথচ সেই সকল বিশেষত্ব অপরিহার্য ছিল না। এজন্যই ইমাম আবু হানীফা সাহেব এ সকল বৈশিষ্ট্য আদায়কে ফরজ বলে স্বীকার করেননি। তাঁর মত এই যে, তকবীর তাহরীমা 'আল্লাহু আকবর' না বলে এটার পরিবর্তে অন্য শব্দ বললেও তা আদায় হয়ে যাবে। তবে সেই শব্দগুলো এটার সম অর্থবোধক হওয়া চাই।

ইমাম শাফেয়ী এ সম্বন্ধে তাঁর সাথে একমত নন। ইমাম আবু হানাফীর মত এই যে, তকবীর যদি ফারসী ভাষায়ও বলে দেয়া হয়, তথাপি তা জায়েয। ইমাম শাফেয়ী বলেন যে, তাতে নামায বাতেল হয়ে যাবে। ইমাম আবু হানীফার মতে কোরআনের যে কোন একটি সূরা পাঠ করলেই কেরাআত পড়বার ফরজ আদায় হয়ে যায়। ইমাম শাফেয়ীর মতে সূরা ফাতেহা পাঠ না করলে নামাযই হবে না। ইমাম আবু হানীফার মতে কোন ব্যক্তি যদি আরবীতে কোরআন পাঠ করতে অসমর্থ হয়, তবে অপারগ বশতঃ তর্জমা পাঠ করে নিতে পারে। ইমাম শাফেয়ীর মতে তর্জমা দ্বারা কোন অবস্থাতেই নামায আদায় হতে পারে না।

কিন্তু এ সকল হতে কেউ যেন এমন ধারণা না করেন যে, ইমাম আবু হানীফা বা অন্য কোন মুজতহিদ শুধু বুদ্ধি ও কেয়াস দ্বারাই নামাযের আরকান সাব্যস্ত করেছেন। ইমামগণ এই সকল আরকান সাব্যস্ত করার নিমিত্ত সাধারণতঃ

হাদীসের বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও ইশারাসমূহকেই অবলম্বন করে থাকেন। এজন্যই প্রত্যেক মুজতাহিদের নকলী প্রমাণাদি ফিকাহর কিতাবসমূহে বিস্তারিতভাবে উল্লেখিত রয়েছে। এ সকল বলার উদ্দেশ্য এই যে, ইমাম সাহেবের দাবী সমর্থন করার নিমিত্ত যে সকল নকলী প্রমাণাদি রয়েছে, তদ্রূপভাবে বুদ্ধিগত প্রমাণাদিও সেই অনুপাতেই লিপিবদ্ধ রয়েছে। এ সকল দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, ইমাম সাহেব শরীয়তের গুরুতত্ত্ব ও মঙ্গলামঙ্গলকে কতখানি সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখতেন।

হানফী ফিকাহ ও জাকাতের মাসায়েল

জাকাতের মাসআলার অবস্থাও তদ্রূপ। মানবজাতির প্রতি সাহায্য সহানুভূতির এবং দয়া প্রদর্শন জাকাতের মূল উদ্দেশ্য। এজন্য জাকাত প্রাপ্তির জন্য সেই লোককে নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে, যারা দয়া ও অনুগ্রহ প্রাপ্তির জন্য সকলের চেয়ে অধিক উপযুক্ত। ফকীর, মিসকীন, জাকাত আদায় করার কর্মচারী, যাদেরকে ইসলামের-দিকে আকৃষ্ট করা হয়েছে, ঋণীব্যক্তি, মূসাফের, গাজী ও মক্তবসমূহ জাকাত পাবার সমধিক উপযুক্ত পাত্র। কোরআন শরীফে তাদের সম্বন্ধে বিস্তৃত ব্যাখ্যা রয়েছে। কাজেই সকল মুজতাহিদ এ সম্বন্ধে একমত যে, এই সকল লোক জাকাত প্রাপ্তির সমধিক উপযুক্ত।

ইমাম শাফেয়ীর মত এই যে, এই সকল লোক ব্যতীত অপর লোককে জাকাত দিলে জাকাত আদায় হবে না। ইমাম আবু হানীফাও বলছেন যে, জাকাত যেন আট ব্যক্তির বাইরে না যায়। এখন প্রশ্ন রইল যে, জাকাত কি উক্ত আট ব্যক্তিকে দিতে হবে, নাকি তাদের মধ্যে কয়েক ব্যক্তিকে দিতে হবে। সাময়িক প্রয়োজনের উপর নির্ভর করে এ সমস্যার সমাধান করতে হবে। আর সেই সময়কার বিচারক কাকে জাকাত দিতে হবে, তাও বলে দিবেন।

হানফী ফিকাহ অতি সহজ ও সরল

এটার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, এটা অন্যান্য ফিকাহর তুলনায় অত্যন্ত সরল। কোরআন মজিদের কয়েক জায়গায় বলা হয়েছে, "খোদা তোমাদের সাথে সদয় সস্নেহ ব্যবহার করতে চান। তিনি কাঠিন্য চাহেন না।" আল্লাহর রাসূল বলছেন, 'আমি কোমল সহজ শরীয়ত নিয়ে আসছিল' এটা সন্দেহাতীত যে, অন্যান্য ধর্মের তুলনায় ইসলামের বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যে, এটা বৈরাগ্যমুক্ত। এটার বিধান অত্যন্ত সহজ সরল। এটা অতি সহজসাধ্য।

ইমাম আবু হানীফার মাসায়েলের বৈশিষ্ট্য এই যে, এটা অতি কোমল ও সহজ সরল, আর অপরাপর ইমামদের অত্যন্ত শক্ত এবং তা পালন করা সহজ সরল ব্যাপার নয়। উদাহরণস্বরূপ 'কিতাবুল খিয়ানত' ও 'কিতাবুল হুদুদ' এর উল্লেখ করা যায়। সেখানে চুরির আদেশ রয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এ সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয় পেশ করছি।

এ সম্বন্ধে-তো সকলেই একমত যে, হাত কেটে ফেলাই চুরির শাস্তি। কিন্তু মুজতাহেদীন চুরি সম্বন্ধে কয়েক শ্রেণীবিভাগ করেছেন। সেই শর্তগুলো পাওয়া না গেলে, চুরির শাস্তিস্বরূপ হাত কাটা যায় না। সেই সকল শর্ত অনুযায়ী আদেশাবলীর প্রতি যেরূপে ক্রিয়া করে, তাতেই বুঝা যাবে যে, ইমাম সাহেবের মাজহাব কিরূপ সহজ এবং তা কতখানি সভ্যতার সমর্থনকারী।

ইমাম আবু হানীফার মতে কমের পক্ষে এক আশরাফী চুরি করলে তাকে চুরির শাস্তি দিতে হবে। সেই পরিমাণ চুরিতে যদি কয়েক ব্যক্তি শামিল হয়ে থাকে, তবে কারও হাত কাটা যাবে না। ইমাম আহমদের মত এই যে, এক আশরাফীর চার ভাগের এক ভাগ চুরি করলেই প্রত্যেকের হাত কাটা যাবে।

ইমাম আবু হানীফা বলেন, অজ্ঞ বালকের হাত কাটা যাবে না। ইমাম মালিকের মতে তারও হাত কাটা যাবে।

ইমাম সাহেব বলেন, কাফন চোরের হাত কাটা যাবে না। অন্যান্য ইমামদের মতে তারও হাত কাটা যাবে।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একে যদি অপরের মাল চুরি করে, তবে তার হাত কাটা যাবে না। এটা হলো ইমামে আজমের অভিমত। ইমাম মালিকের মতে তারও হাত কাটা যাবে।

পুত্র যদি বাপের ধন চুরি করে, তবে ইমাম সাহেবের মতে তার হাত কাটা যাবে না। ইমাম মালিকের মতে তারও হাত কাটা যাবে।

চাচা, ভাই ইত্যাদি চুরি করলে, ইমাম সাহেবের হাতও কাটতে হবে।

কোরআন মজিদ চুরি করলে, তার হাত কাটা যাবে না। এটা ইমাম সাহেবের মত। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালিকের মতে তার হাত কাটা যাবে।

লাকড়ি বা যে বস্তু সহজে নষ্ট হয়ে যায়, তা চুরি করলে, তার হাত কাটা যাবে না। এটা ইমাম সাহেবের মত। অন্যান্য ইমামের মতে হাত কাটা যাবে।

হানাফী ফিকাহ অত্যন্ত প্রশস্ত ও সভ্যতা-মুখী

মানবজীবনের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। মানবজীবনের বহুকিছু সমস্যার সমাধান হয়ে থাকে এই ব্যবসা-বাণিজ্য উৎস হতে। এ সম্বন্ধে বিভিন্ন মুজতাহেদের কি কি বিভিন্ন মতামত রয়েছে, তা পর্যালোচনা করলে কার দৃষ্টি কতখানি সুদূরপ্রসারী তা হৃদয়ঙ্গম করা যাবে।

ইমাম শাফেয়ী সবকিছু ব্যাপারে গোপনভাবে সাক্ষ্য-প্রদানকে না-জায়েয বলে সাব্যস্ত করছেন। তিনি বিবাহের সাক্ষ্যপ্রদান ব্যাপারে সাক্ষী বিশ্বাসযোগ্যও ন্যায়পরায়ন হওয়া অপরিহার্য বলে প্রকাশ করেছেন। অমুসলিমরা নিজেদের মধ্যেও একে অপরের সাক্ষ্যপ্রদানকে তিনি না-জায়েয বলে রায় দিয়েছেন।

যে সকল সভ্যতা চূড়ান্ত সীমায় উপনীত হয় নাই, সেই সকল দেশে এ সকল চলতে পারে। অথবা জীবিকা নির্বাহ বা ব্যবসা-বাণিজ্য যেখানে প্রাথমিক অবস্থায় রয়েছে, তথায় এ সকল ব্যবস্থা চালু হতে পারে। কিন্তু যে সকল দেশে সভ্যতা চরম সীমানায় উপনীত হয়েছে, জীবিকা-নির্বাহ ও ব্যবসা-বাণিজ্য যেখানে সঙ্কটে পরিপূর্ণ, সেখানে সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও সুদূর প্রসারী সমাধান ব্যতীত উপায় নেই। এই কারণেই এ সকল ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা সাহেব ইমাম শাফেয়ী সাহেবের বিরোধিতা করেছেন।

ঐতিহাসিক ইবনে খাল্‌দুন লিখেছেন– ইমাম মালিকের মাজহাব সেই সকল দেশে প্রচলিত হয়েছে, যেখানে সভ্যতা উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেনি। এই কারণেই ইমাম মালিকের মাসআলায় সভ্যতার দাবী সম্বন্ধে চূড়ান্ত মীমাংসা দেখতে পাওয়া যায় না।

ইমাম আবু হানীফা সাহেব তখনকার দিনে জীবন-সংগ্রাম ও ব্যবসা-বাণিজ্যে যে দূরদৃষ্টি ও সূক্ষ্ম মীমাংসার পরিচয় দান করছেন, তাতে তাঁর জ্ঞানবত্তা ও বুদ্ধিমত্তার চরম পরাকাষ্ঠাই প্রতিপন্ন করে দেয়।

বিবাহ

জীবন-সংগ্রামে বিবাহ অত্যন্ত গুরুত্ব পরিপূর্ণ সমস্যা। ফকীহদের পরিভাষায় এটাকে অবশ্যই ইবাদত বলা হয়েছে। আর বাস্তবক্ষেত্রে ইসলামী বিধান মতে মানব জীবনের যে কোন সমস্যার সমাধান করা হয়, তখন এদের প্রত্যেকটিই ইবাদতে পরিগণিত হয়। বিবাহ সম্বন্ধে পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে। (১) কোন্ কোন্ লোকের সাথে বিবাহ সম্পাদিত হওয়া উচিত। (২) কোন্ ভিত্তির

উপর নির্ভর করে বিবাহ সম্পাদন করা উচিত? (৩) এটা স্থায়ী রাখতে হলে কোন্ পথ অবলম্বনীয়? (৪) স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি কি দাবী-দাওয়া রয়েছে? (৫) কোন্ কোন্ নিয়ম প্রথানুযায়ী কাজ করলে বিবাহ কায়েম হয়?

বিবাহ-ব্যাপারকে কোন্ সীমানায় আবদ্ধ রাখা সমুচিত। অল্প-বিস্তর মতবিরোধ ব্যতীত সমগ্র মাজহাব এই সম্বন্ধে প্রায় একমত। প্রত্যেক ধর্মই কতেক লোককে বিবাহ করা নিষেধ ভেবে থাকে। এটার কারণ এই যে, তাদের সাথে বিবাহে প্রত্যেক ব্যক্তির বিবেকই নিষেধ করে। পবিত্র কোরআন-হাদীস এ সম্বন্ধে অত্যন্ত স্পষ্ট। কোরআনে তাদের নাম উল্লেখ করেই দেয়া হয়েছে। এই মূল মাসআলা সম্বন্ধে সকল মুজতাহেদীন একমত। কিন্তু বাহ্য দৃষ্টিতে যা প্রত্যেকের চোখে ধরা পড়ে না, সেই সম্বন্ধেই যতসব মতবিরোধ। জেনা করলে তার সাথে বিবাহ জায়েয কিনা এ সম্বন্ধে বহু মতবিরোধ রয়েছে।

ইমাম শাফেয়ীর মাজহাব এই যে, জেনা করলে তাকে বিবাহ করা হারাম সাব্যস্ত হয় না। উদাহরণস্বরূপ বলা হয়েছে যে, বাপ কোন স্ত্রীলোকের সাথে ব্যভিচার করলে, সেই স্ত্রীলোকের সাথে তার পুত্রের বিবাহ না-জায়েয হবে না। ইমাম শাফেয়ী সাহেব এ সম্বন্ধে এইরূপ উদার যে, একব্যক্তি যদি কোন একজন স্ত্রীলোকের সাথে ব্যভিচার করে এবং তাতে কন্যা-সন্তান জন্মে, তবে সেই ব্যক্তি নিজে সেই বালিকাকে বিবাহ করতে পারবে। এতে দলীল স্বরূপ তিনি বলছেন যে, ব্যভিচার একটি হারাম কার্য। এটা হালালকে হারাম করতে পারে না।

ইমাম আবু হানীফা এটার ঘোর বিরোধী। তাঁর মত এই যে, স্ত্রী-পুরুষের স্বামী-স্ত্রী হিসেবে মিলনের পর তাদের মধ্যে যে স্বাভাবিক ভাব জন্মায়, এটা শুধু বিবাহের সাথেই সীমাবদ্ধ নয়। আর এটাও অকাট্য সত্য যে, যে কারণে মা-বোনকে বিবাহ করা হারাম তা শুধু বিবাহ ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ নয়। স্বীয় শুক্র হতে যে সন্তান জন্মে, যদিও ব্যভিচারের ফলেই হোক, তার সাথে বিবাহ এবং তার সাথে স্বামী-স্ত্রীরূপে জিন্দেগানী জায়েয রাখা স্বাভাবিক নিয়মের খেলাফ। বাপের শুক্র হতে যে সন্তান জন্মে, তার অবস্থা ও একই।

বিবাহে পাত্রীর অধিকার

বিবাহ-সম্পাদনে কার কতটুকু অধিকার রয়েছে, এখন এর আলোচনা করা হবে। এটাও কম গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নয়। এটার উপর বিবাহের ভাল বা মন্দ বহুকিছু নির্ভর করে। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের মত এই যে,

স্ত্রীলোক যদিও বুদ্ধিমতি ও বালেগা হয়, তথাপি সে নিজের বিবাহের মালিক হতে পারে না। কোন অবস্থাতেই সে নিজের বিবাহ নিজে সম্পাদন করতে পারে না। তার জন্য একজন অলির আবশ্যক।

উক্ত বুজর্গদ্বয় একদিক দিয়ে তো স্ত্রীলোকের ক্ষমতা খুবই খর্ব করেছেন, অপরদিক দিয়ে অলিকে তাঁর এমনই ক্ষমতা দান করেছেন যে, অলি বলপূর্বক স্ত্রীলোককে আপন ইচ্ছানুযায়ী যার তার সাথে বিবাহ দিয়ে দিতে পারে। স্ত্রীলোক কোন অবস্থাতেই তা অস্বীকার করতে পারে না।

ইমাম আবু হানীফার মতে বালেগা স্ত্রীলোক নিজেই নিজের বিবাহের মালিক। বরং না-বালেগ অবস্থায় যদি অলি বিবাহ দিয়ে দেয়, তবে সে বালেগ হওয়ার পর বিবাহ নষ্ট করে দিতে পারে।

এই বিষয় প্রসঙ্গে ইমাম শাফেয়ী বহু দলীল পেশ করেছেন। কিন্তু সেই ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা কারও পিছনে না। অলি ব্যতীত বিবাহ হতে পারে না, এটাই ছিল ইমাম শাফেয়ী সাহেবের ভিত্তিভূমি। আর বিবাহ ব্যাপারে পাত্রীই মূল মালিক, এটাই ছিল ইমাম আজম সাহেবের ভিত্তিভূমি। অন্যত্র এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা হবে।

তৃতীয় বিতর্ক এই যে, বিবাহ সম্পাদন কিরূপ সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হওয়া উচিত এবং এটার কড়াকড়ি-সীমানা কতটুকু। বিবাহ-বন্ধনে সৌন্দর্য সম্বন্ধে যাকিছু বলা হয়েছে, অর্থাৎ মানব-সভ্যতা এটার উপর কতখানি নির্ভরশীল এবং এটা ব্যতীত মানবজীবন যাপন কিরূপ দুর্বিষহ হয়ে উঠে, তা বিশেষভাবে তলিয়ে দেখা আবশ্যক। অ-মুসলিম জাহান উক্ত সমস্যার সমাধান করতে না পেরে কিরূপ বিভ্রাটে নিপতিত তা তলায়ে দেখবার বিষয় বটে। পথ কোন্ দিকে রয়েছে, তা বুঝতে না পেরে তাদের একদল বিবাহ-প্রথার মূল উচ্ছেদ-সাধনে উঠে পড়ে লেগে গিয়েছে। স্বামী-স্ত্রী বলে কোন কিছু থাকবে, তাও তারা বরদাশ্‌ত করতে রাজী নয়। মানব-সমাজেও তা তারা প্রচলন করবার পূর্ণ পক্ষপাতী। সেই পথে তারা বহুদূর অগ্রসর হয়েছে। স্বামী-স্ত্রী উপভোগ ব্যতীত অ-স্বামী স্ত্রী উপভোগ আধুনিক জগতের এক বিরাট লোভনীয় ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। বিচিত্র অনুষ্ঠান, ক্লাব, আন্তর্জাতিক নাচ-গানের আসর তাদের সেই চেষ্টাকে 'সাফল্যমণ্ডিত' করতে বিপুলভাবে সাহায্য করে আসছে। পাকিস্তান তথা মুসলিম জাহানেও উক্ত আন্দোলনের বহু শাখা-উপশাখা বিরাজ করছে। কর্তৃপক্ষ ও নেতৃস্থানীয় লোকেরা, বিশেষ করে শাসনদণ্ড যাঁদের হাতে রয়েছে, তাঁরা

অপরাপর দিক দিয়ে অন্যান্য দেশের চেয়ে শতগুণে অনগ্রসর থাকলেও এদিক দিয়ে তাঁদের অগ্রগতি কোন দেশের তুলনায় কম সন্তুষ্টিজনক নয়। কিন্তু এটার বিষময় পরিণাম-ফল সম্বন্ধে এতটুকু চিন্তা করে দেখবার অবসর তাঁদের কোথায়! এই অন্ধকার-জগতের অধিবাসীদের সম্বন্ধে চিন্তা করলে, আমরা বুঝতে পারব, ইমাম শাফেয়ী বা আবু হানিফা সাহবের মত মহান ব্যক্তিদ্বয় কেন এই বিষয়ে এত বেশী মাথা ঘামাচ্ছেন! এই মহাসত্য উদ্ধারে তাঁরাও হয়ত কিছুটা এদিক সেদিক ঝুঁকে পড়ছেন। কিন্তু একথা ধ্রুব সত্য যে, এই মহাসমস্যার সমাধানই তাঁদের অন্তরতম উদ্দেশ্য ছিল। এজন্যই তাঁরা এ সম্বন্ধে একটি রাজপথ খুলে দিবার প্রচষ্টোয় কোন ত্রুটি করেননি। একে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করার মানসে তাঁরা বিবাহে ইজাব-কবুল, মোহর, তালাক ইত্যাদির উপর সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করছেন। এ সকল প্রত্যেকটিই যে যথাযথ স্থানে কতখানি মূল্যবান সাধারণ দুনিয়া কৃমি-কীটদের পক্ষে তা বুঝে উঠা কঠিন ব্যাপার। অন্যথায় কবি নজরুল ইসলামের 'বিশ্ব যখন উন্নতির পথে মাভৈ মাভৈ অগ্রসর হয়েছে, আমরা তখন বিবি তালাকের ফতোয়া অনুসন্ধানে মহাব্যস্ত' বুলি তাদের কাছে মনমুগ্ধকর হতো না। বিশ্ব-উন্নতির মূলে বিবি-তালাকের ফতোয়ায় যে কি মহাসত্য নিহিত রয়েছে, তা অ-স্বামী-স্ত্রী-উপভোগে অন্ধ দিশাহারাদের পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন ব্যাপার বটে। এখন আমরা ইমাম সাহেবের আলোচনায় ফিরে যাবো।

এ সম্বন্ধে তালাক-প্রশ্নের প্রতি ইমামগণ বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করছেন। তাঁদের অনেকের অভিমত এই যে, 'স্বামী-স্ত্রী যখন প্রীতিরবন্ধনে আবদ্ধ থাকে, তখন তালাক দেয়া জায়েয রাখা হয়েছে। অবস্থানুযায়ী তালাক দেয়া জায়েয রাখা হলেও এটার মূল উদ্দেশ্য সংশোধন। সংশোধনের পর এতে প্রত্যাবর্তন পথও খোলা রাখা হয়েছে। অর্থাৎ তালাক একেবারে না দিয়ে যেন তিন বারে তালাক দেয়া হয়। এক তালাক হতে অপর তালাক যেন একমাস পরে হয়। তাতে যেন স্বামী ইচ্ছা করলে স্ত্রীকে আবার গ্রহণ করতে পারে। আর স্ত্রীও স্বামীকে ইতিমধ্যে জানবার বুঝবার সুযোগ পাবে। স্বামী যদি তখন তালাক-স্পৃহা পরিত্যাগ করতে চায়, তবে সেইপথও তার নিমিত্ত উন্মুক্ত রয়েছে। আর সেই স্পৃহা পরিত্যাগ করাই অধিক মঙ্গলজনক। আর এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যেও স্ত্রী যদি সংশোধিত না হয়, তখন অভিজ্ঞতা দ্বারা বুঝা যাবে যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মিল মোহাব্বত হওয়া সুদূর পরাহত। তখন স্বামী অবস্থার চাপে নিপতিত হয়ে আরও এক তালাক দিবে। তালাক দেওয়ার পর স্বামী মোহর আদায় করে দিবে। আর

তিন মাস পর্যন্ত স্বামীকে সেই স্ত্রীলোকটির খোরপোশের বন্দোবস্ত করতে হবে। এই বিধানের গুরুত্ব এই যে, স্ত্রীলোকটির অপর স্বামীর সাথে বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত যেন তার কোন কষ্ট না হয়। আর মোহরের টাকা দ্বারা যেন সে তার অপরাপর প্রয়োজন মিটাতে পারে।

এ সম্বন্ধে ইমাম সাহেবের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যা কিছু বিধি-বিধান রয়েছে, তা এখন আলোচিত হবে। তাতেই বুঝা যাবে যে, অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় এ বিষয়েও ইমাম সাহেবের দূরদৃষ্টি কত সুদূর প্রাসারী। আর প্রতি অবস্থাতেই মানবজীবনের সুখ-দুঃখের সাথে তা কতদূর বিজড়িত রয়েছে, তা সহজেই অনুমিত হবে।

ইমাম সাহেবের মত এই–স্বামী-স্ত্রী যতক্ষণ পর্যন্ত প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত তালাক দেয়া হারাম। ইমাম শাফেয়ীর মতে তা হারাম নয়।

ইমাম আজম বলেন, মোহরের পরিমাণ কোন অবস্থাতেই দশ দেরহামের চেয়ে কম হওয়া সমীচীন নয়। তার উদ্দেশ্য এই যে, তাতে যেন প্রয়োজনবোধে স্বামীকে তালাক প্রদানে বিশেষ কষ্ট ভোগ করতে না হয়। গরীব ও নিঃস্বদের জন্য এই বিধান করা হয়েছে। তবে ধনীদের পক্ষে দশ বিশ হাজার টাকা আদায় করা যেমন কষ্টকর ব্যাপার, গরীবের পক্ষেও দশ বিশ টাকা আদায় করা তদ্রূপ কঠিন ব্যাপার।

ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম হাম্বলের মতে এদের চেয়ে কম পরিমাণেও মোহর ধার্য হতে পারে। ফলে স্বামী ইচ্ছে করলে অতি অনায়াসে কোন প্রকার চিন্তা-ভাবনা না করেই স্ত্রীকে তালাক দিতে পারবে। আর স্ত্রীলোকটি তখন শুধু দাম্পত্য জীবন যাপন হতে বিচ্ছিন্ন হবে না; বরং তাকে আর্থিক অনটনেও পতিত হতে হবে। তখন তার জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠবে।

বিবাহের পরে স্বামী-স্ত্রীর মিলনের পর পূর্ণ মোহর আদায় করা ওয়াজিব। এটাই ইমাম সাহেবের অভিমত। ইমাম শাফেয়ীর মতে অর্ধেক মোহর আদায় করা ওয়াজিব।

শ্বেতকুষ্ঠ ইত্যাদি শারীরিক রোগে বিবাহ নষ্ট হয় না। তাই ইমাম সাহেবের মত। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালিকের কাছে উক্ত কারণে বিবাহ নষ্ট হয়ে যায়।

ইমাম সাহেব বলেন, কোন ব্যক্তি যদি মুমূর্ষু অবস্থায় তালাক দেয় এবং স্ত্রীর ইদ্দতের জমানায় সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে স্ত্রীলোকটি উত্তারিধারী সূত্রে অংশপ্রাপ্ত হবে। ইমাম শাফেয়ীর মতে সে সম্পত্তির মালিক হবে না।

ইমাম সাহেবের মতে 'তালাকে রজ্‌য়ী' অবস্থায় স্ত্রী-সহবাস হারাম নয়। অর্থাৎ তাঁর মত এই যে, স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ এইরূপ মামুলী অসন্তুষ্টির জন্য বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। ইমাম শাফেয়ীর মতে তা হারাম।

ইমাম সাহেব বলে স্ত্রীকে ফিরায়ে পেতে হলে, মুখে কোনকিছু বলবার আবশ্যক পড়ে না। যে কোন কাজ দ্বারা মনের মিল প্রকাশ পায়, রেজাআতের নিমিত্ত তাই যথেষ্ট। ইমাম শাফেয়ীর মতে মৌখিকভাবে প্রকাশ করে কোনকিছু না বলে রেজাআত সম্ভবপর হতে পারে না।

রেজাআতে কোন সাক্ষীর প্রয়োজন পড়ে না। অন্যথায় এমনও অবস্থা হতে পারে যে, সাক্ষী পাওয়া গেল না এবং রেজাআতের সময়ও ফুরায়ে গেল, তখন তা 'বায়েন' তালাকে পরিণত হবে। এটাই ইমাম সাহেবের মত। ইমাম মালিকের মতে সাক্ষী ব্যতীত রেজাআত দুরস্ত হবে না।

বিবাহের নিয়ম-পদ্ধতি প্রবর্তিত করার জন্য এটা অত্যাবশ্যকীয় যে, উভয় পক্ষের দাবী-দাওয়া অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণতার সাথে সাব্যস্ত করা। পুরুষের উপর স্ত্রীলোকের যে দাবী-দাওয়া রয়েছে, তা যেন নষ্ট না হয়। স্ত্রীলোরে নিরাপত্তা, আশ্রয় ও সুখ-শান্তির নিমিত্তই বিবাহের প্রয়োজন। এ সকল উপভোগে যেন কোন প্রকার বাধাবিপত্তি না থাকে। অন্যান্য ধর্মের তুলনায় এটা ইসলামের একটি বৈশিষ্ট্য যে, ইসলাম নারীদের মান-মর্যাদা ও দাবী-দাওয়াকে পরম শ্রদ্ধার চোখে দেখে থাকে। ইমাম আবু হানীফা সাহেবের মাজহাবে এসব কিছুর প্রতি কড়া দৃষ্টি রাখা হয়েছে। এ সকল কারণেই হানফী মাজহাব মুসলিম জাহানে বিপুলভাবে সমাদৃত হয়েছে।

বিবাহের মূল প্রয়োজন

এখন আলোচ্য বিষয় হলো যে, বিবাহ-সম্পাদনে কি কি প্রয়োজন। উভয় পক্ষের পরিপূর্ণ সম্মতি এবং বিবাহ-সম্পাদন সুপ্রচারিত হওয়া বিবাহ-ব্যাপারে অপরিহার্য অংশ। উক্ত উদ্দেশ্য দুইটি সাধনার্থে ইমাম আবু হানীফা সাহেব অতি উত্তম পন্থার বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলছেন যে, উভয় পক্ষের এমন শব্দ উচ্চারণ করতে হবে যদ্বারা বুঝা যায় যে, যারা মনেপ্রাণে বিবাহ-সম্পাদিত করতে হবে। উভয় শর্ত খুব সহজ ও সরল। এটা প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সমপ্রযোজ্য। কিন্তু কোন কোন ইমাম এ সম্পর্কে এমন শক্ত শর্তাবলীর আরোপ করছেন, যা কার্যে পরিণত করা দুরূহ ব্যাপার। ইমাম শাফেয়ীর মাজহাব অনুযায়ী বিবাহের সাক্ষী

ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি হওয়া বাঞ্ছনীয়। অন্যথায় বিবাহ সহী হবে না। মুজতাহেদীন এবং বিশেষ করে ইমাম শাফেয়ী ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি সম্বন্ধে যে বর্ণনা দান করেছেন, তেমন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি হাজারের মধ্যে দুই একজন পাওয়াও দুষ্কর। উক্ত শর্ত মেনে নিলে, বিবাহ-সম্পাদন আর সম্ভবপর হয়ে উঠবে না। সাক্ষী পুরুষ হতে হবে, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বল তৎপ্রতি বিশেষ জোর দিয়েছেন। ইমাম আবু হানীফার মতে স্ত্রীলোকও সাক্ষী হতে পারে।

জিম্মিদের অধিকার

মুসলিম রাষ্ট্রে যে সকল অমুসলমান অনুগত প্রজা হিসেবে বসবাস করে, তাদেরকে জিম্মি বলা হয়। হানফী মাজহাব তাদের সম্বন্ধে অতি উদার নীতি অবলম্বন করছে। অপরাপর কোন মাজহাবই এত উদার নীতি অবলম্বিত হয়নি। হানফী মাজহাব তাদের সম্বন্ধে অতি উদার নীতি অবলম্বন করছেন। অপরাপর কোন মাজহাবেই এত উদার নীতি অবলম্বিত হয়নি। হানফী মাজহাব তাদেরকে অধিকার পরিপূর্ণরূপে রক্ষা পাবার নিমিত্ত শরীয়তের বহু বিধি-বিধান রয়েছে। কিন্তু সব স্থলে তা স্পষ্ট না হওয়ায়ে এটার তাৎপর্য সম্বন্ধে বহু মতবিরোধ দেখা যায়। তবে এটা নিঃসন্দেহে যে, এ বিষয়ে ইমাম সাহেব যা কিছু বিস্তৃত ব্যাখ্যা করছেন, তা সহী। সমগ্র দুনিয়ার নিমিত্ত ইসলাম অবতীর্ণ হয়েছে। এটার অধীনে অসংখ্য মুসলমান বসবাস করে থাকে। অমুসলমানদের নিমিত্ত যদি যথাযথ রক্ষা-কবচ না থাকে, তবে একদিনের নিমিত্তও শান্তি বজায় থাকতে পারে না। ইমাম আবু হানীফা সাহেব জিম্মিদেরকে যে অধিকার প্রদান করছেন, এই দুনিয়ায় কোন সরকার বিজাতীয়দেরকে তা প্রদান করেনি। নিজেদের আইন-কানুন ও ন্যায়পরায়ণতা সম্বন্ধে ইউরোপ খুবই গর্ব করে থাকে। এটা নিঃসন্দেহ যে, তা শুধু তাদের মৌখিক দাবী। কার্যক্ষেত্রে তাদের তদ্রূপ দাবী করার কোন সমর্থন নেই।

ইমাম আবু হানীফা সাহেবের ব্যবস্থাপত্র বহু মুসলিম রাষ্ট্রে অনুশাসন রূপে গৃহীত হয়েছে। বিশ্ববিখ্যাত ন্যায়পরায়ণ ও অদ্বিতীয় শক্তিশালী শাসনকর্তা খলীফা হারুণুর রশীদ হানফী মাজহাব অনুযায়ীই স্বীয় রাজ্য পরিচালনা করতেন।

হত্যা ও এটার প্রতিশোধ রাজ্যশাসনে অতি গুরুত্ব পরিপূর্ণ সমস্যা। ইমাম আবু হানীফার মতে জিম্মিদের রক্ত মুসলমানদের রক্তের বরাবর। কোন মুসলমান যদি ইচ্ছাপূর্বক কোন জিম্মিকে হত্যা করে, তবে মুসলমানকেও এটার বিনিময়ে হত্যা করা হবে। আর ভ্রমবশতঃ যদি জিম্মিকে হত্য করা থাকে, তবে কোন

মুসলমানকে ভুল বশতঃ হত্যা করলে যে রক্ত-মূল্য দিতে হয়, জিম্মির ব্যাপারেও সেই এই প্রতিনিধান করতে হবে।

ইমাম রাজী তাঁর 'মুনাকেবে শাফেয়ী' কিতাব হানফীদেরকে নিন্দাবাদ করে বলছেন যে, তাদের বিধান মতে আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর রক্ত এবং একজন সাধারণ জিম্মির রক্ত বরাবর। অর্থাৎ আবু বরক সিদ্দীক (রাঃ) যদি কোন নিরপরাধ জিম্মিকে হত্যা করেন, তবে হানফীদের বিধান মতে তাকেও তদ্‌বিনিময়ে হত্যা করা যেতে পারে। হানফীগণ কখনও এইরূপ ধারণা পোষণ করেন না। ইমাম রাজী হানফীদের মুখ ম্লান করার মানসেই সেইরূপ উদাহরণ পেশ করছেন। তবে আমরা এটা গৌরবের সাথে স্বীকার করি যে, ন্যায়পরায়ণ ও সত্য অনুশাসনের চোখে রাজা ও প্রজা, মকবুল ও মরদুদ একই সমান। এটা নিঃসন্দেহে যে, ইসলামের পরম ন্যায়পরায়ণতার সামনে রাজা-প্রজা, প্রভু-ভৃত্য সকলেরই সমান অধিকার। ইসলাম এই জন্য গর্ব করার অধিকারী। কিন্তু এতে ইমাম রাজীকে যদি মাথা হেঁট করতে হয়, তবে এটা করতে হয়, তবে এটা অন্য কথা।

এখন সাহাবাদের কথা ও কাজের আলোচনা করা হবে। হযরত আলী (রাঃ) বলছেন, অর্থাৎ, জিম্মিদের খুন আমাদের খুন; আর তাদের দীয়ত, আমাদের দীয়ত। এটা যে শুধু হযরত আলীরই (রাঃ) মতামত তা নয়। মুহাজেরীন ও আনসার সম্প্রদায় এ সম্বন্ধে একই মত পোষণ করতেন। কথা ও কাজে তাঁরা এক ছিলেন।

ওবাইদুল্লাহ হযরত ওমর ফারুকের (রাঃ) পুত্র ছিলেন। ফারুকে আজম (রাঃ) আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার পর ওবাইদুল্লাহ্ দুইজন ফকীরকে সন্দেহবশতঃ হত্যা করলেন! হযরত ওসমান (রাঃ) যখন খলীফা পদে সমাসীন হন তখন মুহাজেরীন ও আনসারদেরকে আহ্বান করে তিনি এ সম্বন্ধে তাঁদের মতামত জিজ্ঞেস করলেন। সকল মুহাজেরীন সর্বসম্মতিক্রমে রায় দিলেন যে, ওবাইদুল্লাহ্‌কে খুন করতে হবে।

অন্যান্য বিষয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধেও জিম্মিদের ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা অত্যন্ত উদারপন্থী ছিলেন। মুসলমানদের ন্যায় তারাও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে আজাদ ছিল। তারাও অবাধ ব্যবসা-বাণিজ্য করার অধিকারী ছিল। তাদেরকে মুসলমানদের অনুরূপ টেক্স দিতে হতো, তাও তাদের প্রত্যেকের সামর্থানুযায়ী সাব্যস্ত করা হতো। নিঃস্ব ব্যক্তি যদি জিজিয়া কর অনাদায় রেখে

মারা যেত, তবে তাকে তা মাফ করে দেয়া হতো। জিম্মিগণ জিম্মিদের জীবনপদ্ধতি তাদের ধর্মানুযায়ীই পরিচালিত করার অধিকারী। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, কোন অগ্নিপূজক যদি স্বীয় কন্যাকে বিবাহ করে, তবে তা যদি তাদের ধর্মানুযায়ী সমর্থনযোগ্য হয়ে থাকে, তখন ইসলামী সরকার তাই অনুমোদন করবে। এক জিম্মির জন্য অপর জিম্মির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করা হতো। তারা এরূপ আজাদ ছিল যে, পবিত্র হেরেমেও তারা যেতে পারত। পবিত্র মক্কা মদীনায়ও তারা বসবাস করবার অধিকার ছিল। সকল মসজিদে তারা বিনানুমতিতে প্রবেশ করতে পারবে। যে কতিপয় বিশিষ্ট শহর মুসলমানগণ আবাদ করছে, এতদ্ব্যতীত অন্যান্য সব জায়গায় তারা উপসানালয় নির্মাণ করতে পারবে।

এই জাতীয় অন্যান্য ব্যাপারেও এটা প্রমাণিত হয়েছে যে ইমাম আবু হানীফা প্রায় সকল ক্ষেত্রেই জিম্মিদেরকে মুসলমানদের বরাবর অধিকার প্রদান করছেন। কোন জিম্মি যদি জিজিয়া আদায় না করে, বা মুসলিম নারীর সাথে ব্যভিচার করে বা কাফেরদের সাহায্য করে, বা কোন মুসলমানকে যদি কুফরীর প্রতি আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করে, বা খোদা ও রাসূল সম্বন্ধে বেয়াদবি করে, তবে প্রত্যেকটি কাজের জন্য সে শাস্তির ভাগী হবে। কিন্তু তাদেরকে বিদ্রোহী বলে বিবেচনা করা হবে না। আর তাতে তাদের অধিকারও নষ্ট হবে না।

এখন আমরা অন্যান্য ইমামদের অভিমত পেশ করব। ইমাম শাফেয়ীর মত এই যে, কোন মুসলমান যদি বিনা অপরাধে বা ইচ্ছাপূর্বক কোন জিম্মিকে হত্যা করে, তথাপি কোন প্রতিশোধ নেয়া যাবে না। শুধু দীয়ত দিয়েই তারা রেহাই পাবে। আর সেই দীয়তের পরিমাণও মুসলমানদের দীয়তের এক তৃতীয়াংশ। আর ইমাম মালিকের মত অর্ধেক দীয়ত দিতে হবে। ব্যবসা সম্বন্ধেও তারা এরূপ কঠোর নীতি অবলম্বন করছেন যে, জিম্মিগণ যদি এক শহর হতে অন্য শহরে মাল নিয়ে যায়, তবে বছরের মধ্যে তারা এরূপে যতবার মাল আনা-নেওয়া করবে, প্রত্যেক দফার জন্য নতুন ট্যাক্স আদায় করতে হবে।

জিজিয়া সম্বন্ধে ইমাম শাফেয়ীর মত এই যে, কোন অবস্থাতেই জিজিয়া করের পরিমাণ এক আশরফীর চেয়ে অধিক হবে না। বৃদ্ধ, অন্ধ, কাংগাল ও সংসারবিরাগী কেউই জিজিয়া হতে রেহাই পাবে না। তিনি আরও বলছেন, "যে ব্যক্তি অর্থাভাবে জিজিয়া আদায় করতে অসমর্থ হবে, সে ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করতে পারবে না।" হযরত ওমরের (রাঃ) তাদের উপর যে কর ধার্য হয়েছিল,

তা বৃদ্ধি করা চলবে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই তা কমান যাবে না। জিম্মিদের সাক্ষী মুসলমানদের ব্যাপারে গ্রাহ্য হওয়া দূরের কথা, জিম্মিদের ব্যাপারেও তাদের সাক্ষী গ্রাহ্য হবে না। এ সম্বন্ধে ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালিক এক মত।

জিম্মি কখনও হেরেমে প্রবেশ করতে পারবে না। তারা কখনও মক্কা-মদীনায় বসবাস করতে পারবে না। ইমাম শাফেয়ীর মতে তারা সাধারণ মসজিদে অনুমতিসহ প্রবেশ করতে পারবে। কিন্তু ইমাম মালিক ইমাম হাম্বলের মতে তারা কোনমতেই তথায় প্রবেশ করতে পারবে না। জিম্মিগণ ইসলামী রাজ্য-সীমানা ও ইসলামী শাসনাধীনে কোথায়ও তাদের উপাসনালয় নির্মাণ করতে পারবে না। জিম্মিদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না। তাদেরকে ইসলামী সৈন্যভুক্ত করা যাবে না। জিম্মি যদি কোন মুসলমানকে ইচ্ছাপূর্বক হত্যা করে, বা তার বিরুদ্ধে কোন মুসলিম নারীর সাথে ব্যভিচার করার অভিযোগ থাকে, তবে তখনই তার নাগরিক অধিকার নষ্ট হয়ে যাবে। ইহুদী ও খৃষ্টানদের সম্বন্ধেও একই কথা। ইমাম শাফেয়ীর মতে ভূত-পূজারীগণ জিজিয়া আদায় করলেও তারা ইসলামী রাজ্যে বসবাস করতে পারবে না।

এই সকল আদেশাবলী এইরূপ কঠিন যে, যে কোন দুর্বল জাতির পক্ষেও তা বরদাস্ত করা সম্ভবপর হয় না। এই কারণেই কোন মুসলমান শাসনকর্তা শাফেয়ী মাজহাবকে সরকারী মাজহাবরূপে গ্রহণ করেননি। অবশ্য মিসরে কিছুকাল অবধি এটা সরকারী মাজহাব রূপে গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু এটা ফল এই দাঁড়ায়েছিল যে, খৃষ্টান ও ইহুদী সম্প্রদায় প্রায়ই বিদ্রোহ করত।

এই প্রসঙ্গে এটাও বলে দেয়া আবশ্যক যে, হানফী ফিকাহর কিতাবে জিম্মিদের সম্বন্ধে এমন কয়েকটি আদেশ রয়েছে যা, প্রকৃতপক্ষে কঠিন ও সংকীর্ণতা পরিপূর্ণ। আর সেই সকল এইরূপভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, যেন এটা ইমাম আবু হানীফা সাহেবের নিজের বক্তব্য। এজন্য শুধু হানফী মাজহাব নয় বরং খোদ ইসলামের প্রতিও তাতে আক্রমণ করার সুযোগ মিলে।

হেদায়া কিতাবে বর্ণিত আছে, "জিম্মিদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে, তারা পোশাক ও চালচলনে মুসলমানদের অনুরূপ চলতে পারবে না। তারা অশ্বারোহণ করতে পারবে না। তারা অস্ত্র ব্যবহার করতে পারবে না। তাদের ঘরে এমন চিহ্ন থাকা আবশ্যক যা দ্বারা বুঝা যায় যে, তা মুসলমানদের বাড়ী নয়; ইত্যাদি।" হেদায়ার গ্রন্থকার এই হিসেবে এই সকল লিখেছেন যে, জিম্মিদেরকে অবশ্যই লাঞ্ছিতভাবে দেখতে হবে।

ফতোয়ায়ে আলমগীরীতেও এটার চেয়ে অধিক কঠিন ও দয়াহীন আদেশাবলী রয়েছে। কিন্তু এ সকল যা কিছু রয়েছে, তা পরবর্তী ফিকাহদের অভিমত। এ সবের সাথে ইমাম আবু হানীফার কোন সম্পর্ক নেই।

শরীয়ত ও হানফী মাজহাব

কোরআন-হাদীসের মাল-মসলা হতেই মুজতাহেদীন আদেশ উপদেশ গ্রহণ করছেন। এ সম্পর্কে যে সকল পন্থা গ্রহণ করা হয়েছে, সেই সম্বন্ধে মতবিরোধ রয়ে গিয়েছে। হানফী মাজহাবের বিশেষত্ব এই যে, ইমাম আবু হানীফা সাধারণতঃ অত্যন্ত শক্তিশালী ও দলিলযুক্ত পন্থা অবলম্বন করেছেন। শব্দ দ্বারা সাধারণতঃ কোরআন হাদীসকে বুঝান হয়ে থাকে। কোরআন ব্যতীত যা হাদীস হতে গ্রহণ করা হয়, তাকেও বলা হয়। কিন্তু এখানে সেই প্রসঙ্গে কোন আলোচনা করা হবে না। এটার কতকগুলো কারণও রয়েছে। প্রথম কারণ এই যে, এই জাতীয় মাসআলার সংখ্যা খুব বেশী। এদের একটি মাসআলা উল্লেখ করা যায়, তবে তখনও মন্দ ধারণা করার সুযোগ থাকবে যে, কয়েকটি শক্তিশালী মাসায়েল নেয়া হয়েছে এবং দুর্বলগুলো বাদ দেয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, আজকাল মোজতাহেদসুলভ কোনকিছুই মীমাংসা করা হয় না। হাদীসটি কি ভাবে, কার রেওয়ায়েত হতে পাওয়া গিয়েছে, তাই হলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। মোজতাহেদীনদের মধ্যে শতবিধ মতবিরোধ হবার এটাই মূল কারণ। এক ইমামের কাছে একটি হাদীস প্রামাণ্য বলে গৃহীত হয়ে থাকে। অপর ইমাম সেই সম্বন্ধে অন্যমত পোষণ করেন। কাজেই এই সবকিছুর মীমাংসার জন্য আমাদের কাছে যাকিছু সম্বল রয়েছে, তা আদৌ যথেষ্ট নয়। কাজেই কোন মাসআলা সম্বন্ধে মোজতাহেদসুলভ মীমাংসা করা সম্ভবপর হচ্ছে না।

আমাদের দেশে এ সম্বন্ধে তাহজীবুল কামাল, তাহজীবুল তাহজীব, মীজানুল এ'তেদাল, তবকাতে হাফ্ফাজ, তাহজীবুল আসমা এবং আল-লুগাত ইত্যাদি কিতাব রয়েছে। এইগুলোতে, মতবিরোধ ও মতানৈক্য সম্বন্ধে ইমামদের যাকিছু মতামত বর্ণিত রয়েছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এদের সনদের ধারাবাহিকতার উল্লেখ নেই। কাজেই মোহাদ্দেস সুলভ প্রমাণাদি দ্বারা এ সকলের চরম মীমাংসা করা সম্ভবপর নয়।

এতদ্ব্যতীত অধিকাংশ মতবিরোধই সংশয়পূর্ণ। মুফাসসেরগণ এদের যে

মীমাংসা করছেন, তাও সংশয়শূন্য নয়। হানফী উলমায়ে কেরাম এ সম্বন্ধে বহুকিছু কিতাব লিখছেন। এ সম্বন্ধে কারও বিস্তৃত জানবার ইচ্ছা থাকলে যেন তাঁরা সে সকল কিতাব দেখে নেন।

এই সকল বিষয়ে মীমাংসার নিমিত্ত কোরআন অমোঘ অস্ত্র। কারণ কোরআন দ্বারা যা কিছু মীমাংসা হয়ে যায়, সেই সম্বন্ধে কারও কোন সংশয় থাকতে পারে না। কাজেই এটা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, কোরআন দ্বারা যা কিছু মীমাংসিত হয়, তা অকাট্য।

হানফী ফিকাহ হাদীস-বিরোধী নয়

যদি আমরা শুধু সেই সকল মাসআলা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে হতে পারি, যা কোরআন দ্বারা প্রমাণিত হয়, তথাপি হাদীস সম্বন্ধেও আমাদের বহু কিছু বলবার রয়েছে, যে সম্বন্ধে কারও মন্দ ধারণা পোষণ করার কোনকিছুই নেই। অনেকে এইরূপও ধারণা করে থাকে যে, ইমাম সাহেবের বহুকিছু অভিমত সহী হাদীসের বিরোধী। অনেকে এমন অভিযোগও করছেন যে, ইমাম সাহেব জ্ঞাতসারেই বহু হাদীসের বিরোধিতা করেছেন। অনেকের খোশ খেয়াল এই যে, ইমাম সাহেবের জমানা পর্যন্ত হাদীস সঙ্কলন সুনিয়ন্ত্রিত হয়নি। এই জন্য বহু হাদীস তাঁর কাছে পৌছে নাই। কিন্তু এ সকল খেয়াল অবান্তরও ও ভিত্তিহীন। আমরা যদি স্বীকার করি যে, তখনও হাদীস সংকলিত হয়নি। তবে এটা কিরূপে সম্ভবপর হলো যে, হাদীস যখন সঙ্কলিত হলো, তখন নামজাদা মোহাদ্দেসীন তাঁর সহী বোখারীতে বিপুলভাবে স্থান পেয়েছে এবং যাঁর রেওয়ায়েতসমূহ সহী বোখারীতে বিপুলভাবে স্থান পেয়েছে এবং যাঁর সম্বন্ধে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল বলতেন, "আমি তাঁর চেয়ে অধিক দেখি নাই।" তিনি ইমাম আবু হানীফা সাহেবের তকলীদ (অনুসরণ) করতেন।

রেওয়ায়েত যাচাই ও সংশোধনের প্রতিষ্ঠাতা এয়াহয়া বিন সাইদ বিনেল কেত্তান অধিকাংশ মাসআলা সম্বন্ধেই ইমাম সাহেবের তকলীদ করতেন। ইমাম তাহাবী হাফেজুল হাদীস ছিলেন। তিনি মাজহাব সম্বন্ধে মুজতাহেদ হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তিনি প্রথমে শাফেয়ী ছিলেন। অতঃপর তিনি ইমাম আবু হানীফার মাজহাব অবলম্বী হন। তিনি ইমাম বোখারী ও মুসলেমের সমসাময়িক ছিলেন। আর তখন হাদীস সংকলন পূর্ণত্ব লাভ করেছিলেন। পরবর্তী জমানায় আল্লামা মারেদীনী, হাফেজ রমলায়ী ইবনে ইলহাম কাছেম, বিন

কতলুবগা ইত্যাদিকে কে অদূরদর্শী বলবার সাহস রাখে! তাঁদের প্রায় সকলই হানফী মাজহাবের সমর্থক ছিলেন।

তাঁরা ব্যতীত অপরাপর যে সকল লোককে হাফেজুল হাদীস বলে তসলীম করা হয়ে থাকে, তাঁরাও ইমাম আবু হানীফার মাসআলা-ভক্ত ছিলেন।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল প্রথম শ্রেণীর জবরদস্ত মুহাদ্দেস ছিলেন। ইমাম বোখারী ও মুসলেম পরম গৌরভের সাথে তাঁকে উস্তাদ বলে স্বীকার করতেন। তাঁর সম্বন্ধে বহু হাদীস ইমাম শাফেয়ীর বিরোধী ছিলেন এবং ইমাম আবু হানীফার পক্ষাবলম্বন করতেন।

খাওয়ারজানী লিখেতেন, ছোটখাট শাখা উপশাখা ব্যতীত মূল ফিকাহ সংক্রান্ত দেড় শত মাসআলা সম্বন্ধে তিনি ইমাম আবু হানীফা সাহেবের সাথে একমত এবং সেই অনুপাতে তিনি ইমাম শাফেয়ী সাহেবের বিরোধী। সুফিয়ান সওরীকে মুহাদ্দেসীন ইমামুল মুহাদ্দেসীন বলে তসলীম করতেন। তাঁর মাসায়েল ইমাম আবু হানীফার মসায়েল অনুযায়ী ছিল।

কাজী আবু ইউসূফ বলেন, খোদার কসম, সুফিয়ান আমার চেয়ে ইমাম আবু হানীফা সাহেবের অধিক ভক্ত। সহী তিরমিযীতে সুফিয়ান সওরীর বহু মাসআলা স্থান পেয়েছে। তন্মধ্যে প্রায়গুলোই ইমাম শাফেয়ীর বিরোধী এবং ইমাম হানীফার সমর্থনকারী।

এক তায়াম্মুমে কয়টি ফরজ আদায় হতে পারে

ইমাম আবু হানীফার মাজহাব মতে এক তায়াম্মুম দ্বারা কয়েকটি ফরজ আদায় হতে পারে। ইমাম শাফেয়ীর মত এই যে, প্রত্যেক ফরজের জন্য নূতন তায়াম্মুম জরুরী। ইমাম সাহেবের দলীল এই যে, অজুর আদেশের যেরূপ ক্ষমতা তায়াম্মুমের আদেশেরও সেই একই ক্ষমতা রয়েছে। প্রত্যেক নামাযের জন্য যেরূপ নতুন অজু জরুরী নয়, প্রত্যেক নামাযের জন্য তায়াম্মুমও তদ্রূপ। কিন্তু যাদের মাজহাব এই যে, এক অজু দ্বারা কয়েক নামায আদায় হতে পারে না, তিনি তায়াম্মুমের জন্যও সেই একই আদেশ আরোপ করতে পারেন। কিন্তু অজু ও তায়াম্মুমের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে বলে কেউই প্রমাণ করতে পারবে না।

পানি ও তয়ম্মুম

ইমাম আবু হানীফার মত এই যে, পানি পাওয়া গেলে তায়াম্মুম চলে যাবে।

ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বল এটার বিরোধী। ইমাম সাহেব দলীল স্বরূপ বলেছেন যে, কোরআনে তায়াম্মুমকে 'যখন পানি পাওয়া যাবে না' এই শর্তের সাথে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। পানি যখন পাওয়া গেল, তখন শর্ত আর রইল না। কাজেই তায়াম্মুম ও রইল না।

প্রতিশোধ গ্রহণ

এ সম্বন্ধে কোরআন শরীফে যাকিছু বর্ণিত হয়েছে, ইমাম আবু হানীফা এর অতুলনীয় তাৎপর্য গ্রহণ করছেন। মূর্খ-যুগে অত্যন্ত অন্যায়ভাবে হত্যার প্রতিশোধ নেওয়া হতো। ইসলাম অতি মনোরমভাবে এটার প্রতিবিধান করেছেন। আর ইসলাম এমন সব বিধান জারী করেছেন, যার চেয়ে উত্তম বিধান আর কিছুই হতে পারে না।

মূর্খতার যুগে নিহত ও হত্যাকারীর পদমর্যাদানুযায়ী প্রতিশোধ নেয়া হতো। যারা সম্মানিত সম্প্রদায়ের লোক ছিল, তারা অপর সম্প্রদায়ের লোক হতে এরূপ প্রতিশোধ নিতো যে, স্বীয় গোলামের পরিবর্তে তাদের পুরুষকে এবং স্বীয় পুরুষের পরিবর্তে অপর সম্প্রদায়ের দুইজন পুরুষকে হত্যা করত। খোদা প্রতিশোধ সম্বন্ধে সাধারণ আদেশ প্রচার করলেন। এর সারমর্ম এই যে, প্রতিশোধের আদেশ কোন সীমানায় সীমাবদ্ধ নয়। হত্যাকারী প্রতি অবস্থায় নিহত ব্যক্তির পরিবর্তে বাধ্য হবে, ভদ্র-অভদ্র, স্ত্রী-পুরুষ, গোলাম ও স্বাধীন এবং মুসলমান ও জিম্মি প্রত্যেক একই নিয়মের অধীন। তৎপূর্বে আরবদেশে এ সম্বন্ধে যা কিছু অবিচার ছিল, তা অধীন। তৎপূর্বে আরবদেশে এ সম্বন্ধে যা কিছু অবিচার ছিল, তা রহিত হয়ে গেল। আল্লাহ-পাক কোরআন শরীফে ঘোষণা করছেন, 'নিহত ব্যক্তির পরিবর্তে তোমাদের নিমিত্ত প্রতিশোধ লিপিবদ্ধ হলো; আজাদের পরিবর্তে আজাদ, গোলামের পরিবর্তে গোলাম এবং স্ত্রীলোকের পরিবর্তে স্ত্রীলোক।'

মূর্খ-যুগে এটাও প্রচলিত ছিল যে, ইচ্ছাপূর্বক খুনের পরিবর্তে আর্থিক দণ্ড দেয়া যথেষ্ট মনে করা হতো। এটাকে দীয়ত বলা হয়। ইসলাম এটাকে বাতেল করে দিল। আর দীয়ত, যা একপ্রকার জরিমানা, তা শুধু ইচ্ছাপূর্বক কিনা সন্দিগ্ধ ব্যাপারে এবং ভুলবশতঃ হত্যার অবস্থায় জায়েয রাখা হয়েছে। আর এটার পরিমাণ মুসলমান ও জিম্মির ব্যাপারে এক বরাবর। অনন্তর কোরআনে ঘোষণা রয়েছে–

"এবং মুসলমানদের পক্ষে উচিত নয় যে, কোন মুসলমানকে খুন করবে। কিন্তু কেউ ভুলবশতঃ যদি কোন মুসলমানকে খুন করে, তার উচিত যে, সে একজন মুসলমান গোলামকে মুক্ত করে দিবে এবং ক্ষমা না করলে নিহত ব্যক্তির আত্মীয়কে দীয়ত দিতে হবে এবং নিহত ব্যক্তি যদি সেই দলের অন্তর্ভুক্ত হয় যারা মুসলমানদের দুশমন এবং সে নিজে মুসলমান, তবে এক মুসলমান গোলামকে মুক্ত করে দিতে হবে। আর নিহত ব্যক্তি যদি সেই দলের অন্তর্ভুক্ত হয় যে, তাঁদেরও তোমাদের মধ্যে সন্ধি রয়েছে, তবে নিহত ব্যক্তির আত্মীয়কে দীয়ত দিতে হবে এবং এক মুসলমান গোলামকে মুক্ত করে দিতে হবে।"

এই সকল আদেশ অত্যন্ত পরিষ্কার ও সুস্পষ্টভাবে কোরআন দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে। ইমাম আবু হানীফাও এই মতেরই সমর্থনকারী। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী ইত্যাদি এ সম্বন্ধে বিরোধিতা করছেন। এমতাবস্থায় আমাদেরকে অত্যন্ত আক্ষেপের সাথে বলতে হয়েছে যে, এই সকল তাঁদের ভ্রান্ত ধারণা।

প্রথম মতোবিরোধ এই যে, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালিক এবং ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের মত এই যে, গোলামের পরিবর্তে আজাদকে নিহত করা বিধেয় নয়। স্বাধীন ও পরাধীনের মধ্যে এরূপ নির্দয় বিধান কখনও কোরআন দ্বারা প্রমাণিত হয় না। (স্বাধীনের পরিবর্তে স্বাধীন) দ্বারা যদি কেউ এটা প্রমাণ করতে চান, তবে (স্ত্রীলোকের দ্বারা স্ত্রীলোক) দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, স্ত্রীলোকের পরিবর্তে পুরুষকে খুন করা যায়। অথচ এরকম দাবী কেউই করেননি।

দ্বিতীয় মতবিরোধ এই যে, ইমাম শাফেয়ী জিম্মিদের দীয়ত মুসলমানদের দীয়ত হতে কম সাব্যস্ত করছেন। অথচ খোদা মুমিনের দীয়ত সম্বন্ধে যে কয়টি শব্দ ব্যবহার করেছেন, মুসলমানদের সাথে যারা সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ তাদের সম্বন্ধেও সেই একই শব্দ ব্যবহার করেছেন। এটা অবশ্য ইসলামের অতি উদার নীতি যে, তাতে মুসলমান ও জিম্মিদের সম্বন্ধে একই নীতি অবলম্বন করা হয়েছে। কিন্তু আক্ষেপ এই যে, এরূপ উদার নীতি সম্বন্ধেও অনেকে ভ্রমাত্মক ব্যাখ্যা করেছেন।

তৃতীয় মতবিরোধ এই যে, ইমাম শাফেয়ী ইচ্ছাপূর্বক খুনের পরিবর্তেও অর্থ-দণ্ড আদায় করাই যথেষ্ট মনে করেছেন। অথচ কোরআন-মজীদে ইচ্ছাপূর্বক খুনের ব্যাপারে প্রতিশোধের বিধান রেখে দেয়া হয়েছে। সেই অবস্থায় দীয়তের কোথাও বন্দোবস্ত রাখা হয়নি। আর বিবেক তাই সমর্থন করে থাকে। মূর্খযুগে হত্যাকে একটি দেওয়ানী ব্যাপার বলে বিবেচনা করা হতো। এটার কারণ এই

যে, অর্থের পরিবর্তেই এই দায় হতে রক্ষা পাওয়া যেত। কিন্তু ইসলাম কখনও এরূপ ভ্রমাত্মক নীতির সমর্থন করেনি।

চতুর্থ মতবিরোধ এই যে, ইমাম শাফেয়ী সাহেব একইভাবে হত্যার পরিবর্তে হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার বিধান দিয়েছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, কোন ব্যক্তি যদি কাউকেও পাথর দ্বারা মাথা ফুটায়ে মেরে থাকে তবে তাকেও পাথর দ্বারা মেরে ফেলতে হবে বা কোন ব্যক্তি যদি অগ্নি দ্বারা কাউকেও জ্বালায়ে মেরে থাকে, তবে তাকেও অগ্নি দ্বারা জ্বালায়ে মারতে হবে। কিন্তু কোরআনের কোথাও এটার সমর্থন পাওয়া যায় না।

পঞ্চম মতবিরোধ এই যে, ইমাম আবু হানীফার মতে ইচ্ছাপূর্বক হত্যার ব্যাপারে কাফ্ফারার কোন বিধান নেই। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী প্রতিশোধ ও কাফ্ফারা উভয়েরই বিধান রেখেছেন। অথচ কোরআন-মজিদে ভুলবশতঃ খুনের ব্যাপারে কাফ্ফারা সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। ইচ্ছাপূর্বক খুনের পরিবর্তে কোথাও কাফ্ফারা সীমাবদ্ধ উল্লেখ নেই।

অংশ বণ্টন

অংশ বণ্টনের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সম্বন্ধে ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম শাফেয়ীর মধ্যে ঘোর মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা সাহেব সেইসব প্রশ্নের সমাধানকল্পে যে নীতির অনুসরণ করেছেন, কোরআন-মজিদে এটার সমর্থন রয়েছে। অংশ বণ্টন সম্বন্ধেও ইসলাম সে নীতির অনুসরণ করেছে, তা দুনিয়ার অন্যসব নীতি হতে পৃথক। ইসলামের প্রতি এরূপ সূক্ষ্ম ও সুন্দর যে, তা দেখেই মনে হয়, খোদা ব্যতীত অপর কেউই বিধান দান করতে পারে না। বণ্টনের মূল আইন এই যে, মৃত্য ব্যক্তি যদি কাউকেও কোন সম্পত্তি দিয়ে যায়, তবে সে তা পাবে। আর মৃতব্যক্তি যদি তেমন কিছু বলে না যায়, তবে খেয়াল রাখতে হবে যে, স্বভাবতঃ তার কাছে-আত্মীয় কে কে রয়েছে ও যে যত বেশী তার কাছে-আত্মীয় হবে, সে তত বেশী মালের অধিকারী হবে। আর মৃতব্যক্তি যদি তদনুযায়ী কাজ করতে বলে যেয়ে থাকে, তখনও একই কথা। অন্যান্য জাতির ধারণা এই যে, সম্পত্তি বহু লোকের মধ্যে বণ্টন হয়ে গেলে, সে সম্পত্তি দ্বারা কেউই তেমন কোন উপকার লাভ করতে পারে না।

খৃষ্টানদের আইনমতে বড় ছেলে সম্পত্তির মালিক হয়ে থাকে। অপর ভাই সেই সম্পত্তি হতে বঞ্চিত হয়ে থাকে। হিন্দু সমাজে শুধু পুত্র পিতৃ সম্পত্তির

অধিকারী হয়ে যায়। মেয়েরা কোন সম্পত্তির ভাগী হয় না। মৃতব্যক্তির বাপ-ভাই এটার কোন অংশপ্রাপ্ত হয় না। কিন্তু ইসলাম এ সকলকে অতি সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখে থাকে। ইসলামের এ সম্বন্ধে তিনটি শ্রেণীভাগ রয়েছে। যথা–উক্ত তিন শ্রেণীর বিস্তারিত বিবরণ কোরআন মজিদে রয়েছে।

দশম পরিচ্ছেদ

ইমাম সাহেবের নামজাদা ছাত্র

ইমাম সাহেবের অসংখ্য ছাত্র ছিল। তন্মধ্যে নির্বাচিত বিশিষ্ট চল্লিশজনকে নিয়ে তিনি কমিটি গঠন করেন। নিম্নে তাঁদের কয়েক জনের নাম দেয়া হলো। কাজী আবু ইউসূফ, জাফর আসাদ বিন ওমর, আকীয়তুল আজাদী, দাউদ তায়ী, কাসেম বিন মায়াম, আলী বিন মসহার, এয়াহয়া বিন জাকারিয়া, হাব্বান ও মন্দেল। তাঁদের কয়েকজন সম্বন্ধে নিম্নে আমরা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

মুহাদ্দেস-ছাত্র

১। হযরত এয়াহয়া বিন ছাইদ আল-কিত্তান :

তিনি সর্বপ্রথম কে একটি ধারাবাহিক বিষয়বস্তু হিসেবে কায়েম করতে চেষ্টিত হন। আল্লামা জাহবী 'মীজানুল এয়দাল' কিতাবের উপক্রমনিকায় লিখেছেন যে, সম্বন্ধে এয়াহয়া বিন ছাইদ আল-কিত্তান সর্বপ্রথম কলম ধরেন। তারপর তাঁর ছাত্রবৃন্দ হতে এয়াহয়া বিন মইন, আলী বিনেল মদনী, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ওমর বিন আলীউল ফালাস এ সম্বন্ধে বহু খেদমত করেন। তারপর ইমাম বোখারী ও মুসলেমের এ বিষয়ে বিরাট দান রয়েছে।

হাদীস সম্বন্ধে এয়াহয়া বিন্ ছাইদের দৃষ্টি এতদূর সুদূর প্রসারী ছিল যে, তিনি যখন হাদীসের-মজলিসে উপবেশন করতেন, তখন ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, আলী ইবনেল মদনী ইত্যাদি তাঁর কাছ হতে হাদীসের তাহকীক করার জন্য আদবের সাথে দণ্ডায়মান থাকতেন।

আসরের নামাযের পর হতে মাগরেবের পূর্ব পর্যন্ত সেই মজলিস চলত। তাঁরা সেই সময় পর্যন্ত দণ্ডায়মান থাকতেন। রেওয়ায়েত সম্বন্ধে তাহীকক, যাচাই ও নির্বাচন সম্বন্ধে তিনি এরূপ পূর্ণত্ব লাভ করেছিলেন যে, হাদীসের অধিকাংশ ইমামের মত এই যে, তিনি যে হাদীসকে ছেড়ে দিয়েছেন, আমরাও তা ছেড়ে দিব।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল মহা জোরেসোরে বলতেন, "আমার চক্ষু দুইটি দ্বারা এয়াহয়ার অনুরূপ কাউকেও দেখিনি।"

তাঁর এতসব গুণ গরিমা থাকা সত্ত্বেও তিনি ইমাম আবু হানীফা সাহেবের শিক্ষা-মজলিসে প্রায়ই যোগদান করতেন। আর তিনি যে ইমাম আবু হানীফা সাহেবের ছাত্র এ সম্বন্ধে গৌরব করে বেড়াতেন। তখনও কারও তকলীদ করা ধারাবাহিকরূপে প্রচলিত হয়নি। তথাপি অধিকাংশ মাসআলার ব্যাপারে তিনি ইমাম সাহেবের তকলীদ করতেন।

তিনি নিজেই লিখেছেন, "অধিকাংশ মাসায়েল সম্বন্ধেই আমি ইমাম আবু হানীফা সাহেবের তকলীদ করেছি।

আল্লামা জাহবী 'তাজকেরাতুল হাফ্‌ফাজ' কিতাব ওকী' বিন জরাহের প্রসঙ্গক্রমে বলেছেন, ওকী' ইমাম আবু হানীফা সাহেবের মতানুযায়ী ফতোয়া দিতেন।

এয়াহয়া বিন ছাইদ আল-কিত্তান হিজরী ১৩০ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং বসরা শহরে হিজরী ১৯৮ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

২। হযরত আবদুল্লাহ্ বিনেল মুবারক :

মোহাদ্দেস নূদী 'তাহজীবুল আসমা ওয়াললুগাত' কিতাবে হযরত আবদুল্লাহ বিনের মুবারক সাহেব সম্বন্ধে প্রশংসা করতে যেয়ে লিখেছেন, "তিনি এমন একজন ইমাম যে, তাঁর নেতৃত্ব ও তেজস্বীতা সম্বন্ধে সকল ইমাম ও ফকীহগণ একমত। তাঁর প্রসঙ্গ বর্ণনা করলে, খোদার রাহমত নাযিল হতো। তাঁর সাথে ভালবাসা জন্মাতে পারলে, আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রাপ্তির আশা করা যেত।

মুহাদ্দেসীন তাঁকে 'আমীরুল মুমেনীন ফিল হাদীস' বলে অভিহিত করতেন। এতে বুঝা যায়, হাদীসে তাঁর কিরূপ প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। তাঁর জনৈক ছাত্র তাঁকে একদিন 'হে আলেমূল মশরেক' বলে আহ্বান করলেন। বিখ্যাত মুহাদ্দেস ইমাম সুফিয়ান সওরী তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি এটা শুনে বললেন, "আপনি বড় কৃপণতা করলেন। তিনি শুধু 'আলেমূল মশরেক' নন, তিনি আলেমূল মগরেবও বটে।"

ইমাম আহমদ হাম্বল বলেন, "হযরত আবদুল্লাহ্ বিনেল মুবারকের জমানায় তাঁর চেয়ে অপর কেউই হাদীস সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করার জন্য অধিক চেষ্টা করেননি।"

হযরত আবদুল্লাহ্ বিনেল মুবারক স্বয়ং বর্ণনা করেছেন, 'আমি চার হাজার শেখের কাছ হতে হাদীস শিখেছি।' তন্মধ্যে শুধু এক হাজার শেখের কাছ হতে হাদীস রেওয়ায়েত করেছি।'

সহী বোখারী ও মুসলেমে হযরত আবদুল্লাহ্ বিনেল মুবারক হতে অসংখ্য হাদীস রেওয়ায়েত করা হয়েছে। রেওয়ায়েত শাস্ত্রে তিনি একজন মহা স্তম্ভ স্বরূপ ছিলেন। হাদীস ও ফিকাহ সম্বন্ধে তাঁর বহু গ্রন্থ রয়েছে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, এসব কিতাব আজকাল পাওয়া যাচ্ছে না।

পরহেজগারী, দীনদারী, জ্ঞান-গরিমা ও বুজুর্গী কামালিয়াতে তিনি এইরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন যে, নামজাদা আমীর ওমরা ও রাজা-মহারাজা তাঁর তুলনায় অতি তুচ্ছ ছিলেন।

বিশ্ববিখ্যাত খলীফা হারুণুর রশীদ একদিন কোন এক স্থানে যান। সেখানে হযরত আবদুল্লাহ্ বিনেল মুবারকের পৌছবার সংবাদ ঝড়বেগে চারদিকে ছড়ায়ে পড়ল। তখন অসংখ্য লোক তাঁকে স্বাগত সমাদর করার নিমিত্ত উন্মাদ প্রায় ছুটে চলল। বহু লোকের জুতা ও জামা-কাপড় ছিঁড়ে গেল। কিন্তু তৎপ্রতি কারও লক্ষ্য নেই। কে কার পূর্বে আমীরুল হাদীসকে দেখবে, এটা ব্যতীত লোকদের অন্য কোন খেয়াল ছিল না।

খলীফা হারুণুর রশীদের জনৈক বিবি অট্টালিকার শিখর দেশ হতে এ দৃশ্য দেখে কার শুভাগমনে জনগণ এরূপ উন্মাদ হয়েছে জানতে চাইলে লোকেরা বললো, "মগরেব ও মশরেকের আলেমের শুভাগমন হয়েছে তখন বিবি সাহেবা বলে উঠলেন, "প্রকৃতপক্ষে এটাকেই বাদশাহী বলা চলে। এটার তুলনায় হারুণুর রশীদের রাজত্ব অতি তুচ্ছ ব্যাপার। পুলিশ-পেয়াদা ব্যতীত জনগণ রাজা-মহারাজাকে স্বাগত-সমাদর করার জন্য কবে এইরূপ উন্মাদ অধীর হয়ে উঠে!"

হযরত আবদুল্লাহ্ বিনেল মুবারক ইমাম আজম সাহেবের একজন নামজাদা ছাত্র ছিলেন। উস্তাদের প্রতি তিনি পরম শ্রদ্ধাশীল ও ভক্তিভাজন ছিলেন। তিনি বলতেন, "আমি যাকিছু হাসিল করেছি, তা ইমাম সাহেব ও সুফিয়ান সওরী সাহেবের অনুকম্পাক্রমেই হাসিল করেছি।" একদিন তিনি মনের আবেগে বলছিলেন, "আল্লাহ তায়ালা যদি আবু হানীফা ও সুফিয়ান সওরী কর্তৃক আমাকে সাহায্য প্রদান না করতেন, তবে আমি একজন সাধারণ মানুষের চেয়ে অধিক কোনকিছু হওয়ার আশা করতে পারতাম না।"

এয়াহয়া বিন জাকারিয়া বিন আবি মায়েদা

এয়াহয়া বিখ্যাত মুহাদ্দেস ছিলেন। আল্লামা জাহবী 'তাজকেরাতুল হোফ্‌ফাজ' কিতাবে শুধু সেই সকল লোকের নাম লিপিবদ্ধ করেছেন, যাঁদেরকে 'হাফেজুল হাদীস' বলা হতো। সেই কিতাবে হযরত এয়াহয়া বিন জাকারিয়া বিন আবি মায়েদার নামও স্থান পেয়েছে। ইমাম বোখারীর বিখ্যাত উস্তাদ আলী বিনেল মদনী বলতেন, "এয়াহয়ার জমানায় তাঁর সমকক্ষ আলেম অপর কেউই ছিলেন না। তাঁর রেওয়ায়েত হতে সেহাসিত্তার বহু হাদীস নেয়া হয়েছে। তিনি মুহাদ্দেস ও ফকীহ উভয়ই ছিলেন। বহু বিষয়েই তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ছিল।"

তিনি ইমাম আবু হানীফা সাহেবের ছাত্র ছিলেন। দীর্ঘকাল তিনি তাঁর উস্তাদের সাহচর্য্যে ছিলেন। আল্লামা জাহবী তাজকেরাতুল হোফ্‌ফাজ কিতাবে তাঁকে ইমাম সাহেবের পরিবারস্থ লোক বলেই উপাধি দান করছেন। ফিকাহ-সঙ্কলনে তিনি ইমাম সাহেবের কমিটি-ভুক্ত ছিলেন। তাতে তিনি প্রধান অংশ গ্রহণ করেন।

ইমাম তাহেবী লিখেছেন যে, তিনি তাতে ত্রিশ বছর পর্যন্ত লিপ্ত ছিলেন। গ্রন্থ রচনা ও লিপিবদ্ধ করার ভার তাঁর উপরই সমর্পণ করা হয়েছিল।

'মিজানুল এ'তেদাল' কিতাবে বর্ণিত আছে, কূফানগরে তিনিই সর্বপ্রথম হাতে কলম নেন। লোকেরা তাঁকে একজন বিখ্যাত লেখক হিসেবেই ভক্তি করত। তিনি মাদায়েনে প্রধান কাজীপদে নিযুক্ত হন। তিনি ৬৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

হযরত ওকী' বিনেল জরাহ

হাদীস শাস্ত্রে তাঁকে বিশিষ্ট স্তম্ভ হিসেবে গণনা করা হতো। আহমদ বিন হাম্বল তাঁর ছাত্র হিসেবে পরম গৌরবানুভব করতেন। এয়াহয়া বিন মাইন যাঁকে বিষয়ে নামজাদা বলে উপাধি দান করেছিলেন, তিনি বলতেন, "হযরত ওকী'র চেয়ে উপযুক্ত বলে উপাধি কাউকেও দেখিনি। এবং তাঁর রেওয়ায়েত ও মতামত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হতো।"

তিনিও ইমাম আবু হানীফা সাহেবের বিশেষ ছাত্র ছিলেন। ইমাম সাহেবের কাছ হতে তিনি বহু হাদীস শুনেছিলেন। প্রায় মাসআলাতেই তিনি ইমাম সাহেবের তকলীদ করতেন। তাঁর মতানুযায়ীই তিনি ফতোয়া দান করতেন। তিনি হিজরী ১৯৭ সালে ইন্তেকাল করেন।

হযরত দাউদ তায়ী

খোদা তাঁকে ভাল ও সৎকর্মকে গ্রহণ করার ক্ষমতা দান করেছিলেন। সুফিয়ানে কেরাম তাঁকে কামেল মুর্শিদ হিসেবে মান্য করতেন। 'তাজকেরাতুল আউলিয়া' কিতাবে তাঁর উচ্চ প্রশংসা করা হয়েছে। ফকীহগণ এবং বিশেষভাবে হানফী ফকীহগণ তাঁর এজতেহাদের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করছেন।

বিখ্যাত মুহাদ্দেস মুহারিক বিন আত্তার বলতেন, "হযরত দাউদ তায়ী যদি পূর্ব জমানায় জন্মগ্রহণ করতেন, তবে কোরআন মজিদে তাঁর কাহিনী বর্ণিত হতো।"

প্রাথমিক জীবনেই তিনি ফিকাহ ও হাদীস সম্বন্ধে পাণ্ডিত্য লাভ করেন। অতঃপর এলমে কালাম সম্বন্ধে তিনি উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হন। তখন হতে তিনি তর্ক-বিতর্ক শাস্ত্রে বিশেষ মাতিয়া উঠেন।

একদিন এক ব্যক্তির সাথে কোন এক বিষয়ে তর্ক করতে করতে তিনি সেই ব্যক্তির প্রতি কঙ্কর নিক্ষেপ করেন। তখন লোকটি বলে উঠল, "দাউদ, আপনার জবান ও হাত অধিক বর্দ্ধিত হোক।"

এই শব্দ কয়টি তাঁর জীবনে বহু পরিবর্তন আনয়ন করল। তিনি তখন হতে তর্ক ও বচসা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করলেন। কিন্তু জ্ঞান-তৃষ্ণা তখনও তিনি পরিহার করেননি। এটার সবকিছুর সাথে তিনি সম্বন্ধ ত্যাগ করলেন। ইমাম মুহাম্মদ বলেন, "আমি প্রায়ই হযরত দাউদের কাছে মাসআলা জিজ্ঞেস করতে যেতাম। জরুরী ও আমলী মাসআলা হলে তিনি জবাব দিতেন। অন্যথায় বলে দিতেন, "ভাই আমার অন্য জরুরী কাজ রয়েছে।"

তিনি ইমাম আবু হানীফা সাহেবের একজন নামজাদা ছাত্র ছিলেন। তিনি ইমাম সাহেবের নির্বাচিত কমিটির অন্যতম সভ্য ছিলেন। তিনি হিজরী ১৬০ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

উপরে উল্লেখিত বুজুর্গগণ ব্যতীত ফজল বিন ওকীম, হামজা ইবনে হাবীবেজ্জাইয়াত, ইব্রাহীম বিন তুমহান, সাইদ বিন আউস, ওমর বিন মাইমুনা এবং আফজাল বিন মুসা ইত্যাদি বহু বুজুর্গও ইমাম সাহেবের ছাত্র ছিলেন। আমরা এখানে শুধু সেই সকল ছাত্রের কতিপয় নাম উল্লেখ করেছি, যাঁরা খুব নামজাদা এবং ইমাম সাহেবের সাথে সর্বকাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

ফিকাহ্-বিশারদ কাজী আবু ইউসূফ

তাঁর উপযুক্ততা, উচ্চ মর্যাদা এবং পদ-গৌরব সম্বন্ধে একটি পৃথক বই লিখলে, তিনি যে কে ছিলেন এবং তাঁর জ্ঞানগভীরতা কতখানি ছিল, তা প্রকাশ করা সম্ভবপর হতো। কাউকেও যদি খোদা সেই তৌফিক দেন, তবে আমাদের সেই বাসনা পূর্ণ হতে পারে। এই কিতাবের বিষয়বস্তু হিসেবে আমাদের উপর এতখানি ফরজ যে, তাঁর সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে পারবে।

তিনি আনসার-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্ব-পুরুষ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ও ওয়াসাল্লামের আসহাবের অন্তর্গত ছিলেন। তাঁর পিতা একজন অতি দরিদ্র লোক ছিলেন। শারীরিক পরিশ্রম করে তিনি জীবিকা-নির্বাহ করতেন। তিনি হিজরী একশত তের বা সতের সনে কূফা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শৈশবেই লেখাপড়ার প্রতি ঝুঁকে পড়েন।

কিন্তু তাঁর পিতার তাতে সম্মতি ছিল না। ছেলে কোন কাজকর্ম করে দুই চার পয়সা অর্জন করে সংসারের সুখ-বৃদ্ধি করবে, এটাই তাঁর আব্বাজানের কামনা ছিল। কিন্তু বালক আবু ইউসূফ একটু অবসর বা সুযোগ পেলেই আলেমদের সাহচর্যে যেয়ে বসতেন। বালকটি একদিন ইমাম আবু হানীফা সাহেবের শিক্ষা-মজলিসে উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় তাঁর পিতা তাঁকে জোর জবরদস্তিতে সেখান হতে নিয়ে আসলেন। ঘরে যেয়ে পুত্রকে বুঝায়ে বললেন, "বাবু, ইমাম আবু হানীফাকে আল্লাহ্-পাক ইল্ম ও ধন সবকিছুই দান করেছেন। তোমার মত গরীবের ছেলের পক্ষে কি সেই পথের পথিক হওয়া সম্ভব?"

বালকটি বাধ্য হয়ে লেখাপড়া বন্ধ করল। পিতার সাথে তাঁকেও তখন পরিশ্রম করতে হতো। দুই চার দিনের পর ইমাম সাহেব লোকদেরকে বালক আবু ইউসূফের অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞেস করলেন। ইমাম সাহেব সবকিছু জেনে বালকটিকে ডেকে এনে সবকিছু অবগত হলেন। তিনি চুপচাপ বালকের হাতে একটি থলে দিয়ে দিলেন। বালক বাড়ীতে এসে খুলে দেখে যে, এতে একশত দেরহাম রয়েছে। বালকটিকে তখন ইমাম সাহেব এটাও বলে দিয়েছিলেন যে, এই অর্থ যখন ফুরায়ে যাবে' তখনই আমাকে তা জানাবে। তিনি বরাবরই এইরূপে তাঁকে সাহায্য করে যেতে লাগলেন। পরিশেষে আবু ইউসূফ তাঁর শিক্ষার পরিসমাপ্তি করলেন।

কাজী সাহেব ইমাম আবু হানীফা ব্যতীত অপরাপর বহু ইমামের কাছেও

শিক্ষা লাভ করেন। তিনি আরমাশ, হাশেম বিন আরওয়া, সুলাইমান কাছ হতে হাদীস রেওয়ায়েত করেন। হযরত মুহাম্মদ বিন ইসহাক হতে মগাজী ইত্যাদি কিতাব পড়েন। তিনি মুহাম্মদ বিন আবি লাইলা হতে মাসআলা শিক্ষা করেন। আল্লাহ তাঁকে এমনই মেধা ও স্মৃতি দান করেন যে, তিনি একই সময়ে সবকিছু এলেম হাসিল করেন।

বিখ্যাত মুহাদ্দেস হাফেজ ইবনে আবদুল বারী লিখেছেন, "ইমাম আবু ইউসূফ হাদীস-ক্লাসে যোগদান করে প্রতিরোজ পঞ্চাশ ষাটটি হাদীস শিখে নিতেন। ইমাম সাহেব যতদিন পর্যন্ত জীবিত ছিলেন, ততদিন পর্যন্ত কাজী সাহেব তাঁর শিক্ষা-মজলিসে প্রতিদিন যোগদান করতেন। তাঁর ইন্তেকালের পর কাজী সাহেব রাজ-সরকারের সাথে যোগ-স্থাপন করেন।

খলীফা মাহদী আব্বাস হিজরী ১৬৬ সনে তাঁকে কাজী পদে নিযুক্ত করেন। তাঁর মৃত্যুর পর পরবর্তী খলীফাও ইমাম আবু ইউসূফকে কাজী পদে বহাল রাখেন। পরিশেষে খলীফা হারুণুর রশিদ তাঁর উপযুক্ততার প্রমাণ পেয়ে তাঁকে মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রধান কাজী পদে নিযুক্ত করেন। আর উক্ত পদ তখন এমনই গুরুত্ব পূর্ণ ছিল যে, মুসলিম ইতিহাসে এটার তদ্রূপ গুরুত্ব তৎপূর্বে আর কখনও দেখা যায় যে জ্ঞান-গরিমা ও শক্তিমত্তার পরিচয় তিনি দান করেছিলেন, তাঁর জীবন-চরিতে তা বর্ণনা করা সম্ভবপর হতে পারে।

তিনি হিজরী ১৮২ সনে রবিউল আউওয়ালের পাঁচ তারিখ বৃহস্পতিবার জোহরের সময় মৃত্যুমুখে পতিত হন।

মুহাম্মদ বিন সামায়ার বর্ণনা করেন যে, তিনি মৃত্যুকালে নিম্নলিখিত কয়েকটি কথা বলে শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করেন, "হে খোদা, তুমি জান যে আমি জানা সত্ত্বে কোন মীমাংসা ঘটনার বিপরীত করিনি। আমি যা কিছু মীমাংসা করেছি, তোমার কিতাব ও তোমার পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লমের তরীকা অনুযায়ী করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। কখনও যদি মুস্কিলে পড়েছি, তখন ইমাম আবু হানীফা সাহেবের পথ অবলম্বন করেছি। আমি যতটুকু অবগত রয়েছি তাতে আমার সুনিশ্চিত বিশ্বাস এই যে তিনি তোমার পথ অতি উত্তমরূপেই চিনিতেন এবং ইচ্ছাপূর্বক তিনি তোমার পথ ছেড়ে যাননি।"

কাজী সাহেব ধনাঢ্য লোক ছিলেন। তিনি সেই ধনের সদ্ব্যবহারও করতে জানতেন। মৃত্যুর সময় তিনি অসিয়ত করে গেলেন যে, মক্কা-মদীনা 'কূফা ও বাগদাদের দরিদ্রের মধ্যে যেন চার লক্ষ দেরহাম বিলায়ে দেয়া হয়।

কাজী সাহেব বিভিন্ন বিষয়ে সুগভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, যদিও তিনি ফিকাহ-শাস্ত্রের উন্নতি বিধানের নিমিত্ত সুবিখ্যাত ছিলেন, তথাপি অন্যান্য বিষয়েও তাঁর সমকক্ষ লোক সেই সময় ছিল না।

ঐতিহাসিক ইবনে খলকান হেলাল ইবনে এয়াহরার বাণী উদ্ধৃত করেছেন–"তফসীরে মগাজী ও আইয়ামুল আরবের হাফেজ ছিলেন আবু ইউসূফ সাহেব। আর ফিকাহ শাস্ত্র তাঁর পক্ষে অত্যন্ত সহজ সরল বিষয় ছিল। হাদীস সম্বন্ধে তিনি এমনই পারদর্শী ছিলেন যে, তিনি ও হোফফাজে হাদীসের মধ্যে পরিগণিত হয়েছেন।"

আল্লামা জাহবী 'তাজকেরাতুল হোফ্ফাজ' কিতাবে লিখেছেন, "এয়াহয়া বলতেন যে, আহলে-রায়দের মধ্যে হযরত আবু ইউসূফের চেয়ে অধিক হাদীস আর কেউই রেওয়ায়েত করেননি।"

বাগদাদের খতীব স্বীয় ইতিহাসে ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের বাণী উদ্ধৃত করছেন "এলমে হাদীসে জ্ঞান লাভ করার জন্য আমার যখন বাসনা জাগল, আমি তখন হযরত আবু ইউসূফের খেদমতে হাজির হলাম। এয়াহয়া বিন ময়ীন, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল এবং হাদীসের আরও বহু ইমাম কাজী সাহেবের কাছ হতে হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন। তাঁর জ্ঞান গরিমা ও পদ-মর্যাদা সম্পর্কে এটার চেয়ে অধিক প্রমাণ আর কি থাকতে পারে।"

ফিকাহ শাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য, কোন অর্বাচীনই অস্বীকার করবে না। স্বয়ং ইমাম সাহেবও তা অম্লানবদনে স্বীকার করতেন। কাজী সাহেব একদিন পীড়িত ছিলেন। ইমাম সাহেব তাঁকে দেখবার পর বাড়ী ফিরবার পথে সাথীদের সঙ্গে বললেন, "খোদা না করুক, এই লোকটি যদি মারা যায়, তবে দুনিয়া অপূরণীয় ক্ষতির ভাগী হবে।"

অন্যান্য ইমামগণও কাজী সাহেবের অসাধারণ স্মৃতি ও বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে পঞ্চমুখে প্রশংসা করতেন।

ইমাম আয়মাশ সেই জমানার একজন বিখ্যাত মুহাদ্দেস ছিলেন। তিনি একদিন কাজী সাহেবের কাছে কোন একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করছিলেন। কাজী সাহেব এটার জবাব দিলেন। ইমাম আয়মাশ বললেন, "আপনার জবাবের কোন সনদ আছে কি?"

তিনি বললেন "হ্যাঁ, সনদ এই যে, উক্ত হাদীসটি আপনি আমাকে অমূক ঘটনা সম্বন্ধে অমুক দিন বয়ান করেছিলেন।"

ইমাম আয়মাশ বললেন, "কাজী সাহেব, এই হাদীসটি আমার তখন হতে স্মরণ রয়েছে, যখন আপনার পিতা বিবাহও করেননি। কিন্তু এটার প্রকৃত উদ্দেশ্য আজ আমার বুঝে আসছেন।"

ফিকাহ হাদীস সম্বন্ধে কাজী সাহেবই সর্বপ্রথম গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করেন। বিভিন্ন বিষয়ে তিনি বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর সেই সকল কিতাবের মধ্যে আমরা শুধু 'কিতাবুল খেরাজ' সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করব।

খলীফা হারুণুর রশীদ খেরাজ (কর), জিজিয়া ইত্যাদি সম্বন্ধে ইমাম সাহেবের বিস্তৃত অভিমত জানতে চাইলে, কাজী সাহেব তাঁর কাছে জবাব স্বরূপ কয়েকটি চিঠি প্রেরণ করেন। এই কিতাব সেই চিঠি কয়েকটিরই সমষ্টি মাত্র। এতে বহু বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। তবে খেরাজ সম্বন্ধেই এতে অধিক মাসআলা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এই জন্যই এই কিতাবকে খেরাজ সম্বন্ধে মূল আইন গ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। এতে জমির ফসল উৎপাদনে জমির বিভিন্ন শক্তি, এবং এতে এই জাতীয় বহু মনোরম রীতি এবং সময়োপযোগী দুরদর্শিতার সমাবেশ রয়েছে। সেই সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যবস্থাও রয়েছে। সেই জমানায় তিনি যে অপূর্ব দূরদর্শিতার পরিচয় দান করছেন, তা কম আশ্চর্যের বিষয় নয়। এটার রচনা চাতুর্য এই যে, অত্যন্ত স্বাধীনভাবে অথচ উপদেশমূলকভাবে সব কিছুকে যথাস্থানে বিন্যস্ত করা হয়েছে। তদুপরি অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণতার সাথে খলীফার দৃষ্টিও আকৃষ্ট হয়েছে।

কাজী সাহেবের জীবন-ইতিহাসে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, খলীফা হারুণুর রশিদের ন্যায় পরম শক্তিশালী ও স্বেচ্ছাচারী বাদশার দরবারেও তিনি স্বীয় কর্তব্য এইরূপ স্বাধীন ও বেপরোয়াভাবে পালন করেছেন যে, এটার তুলনা এই দুনিয়ায় অতি বিরল।

'কিতাবুল খেরাজ' গ্রন্থের এক স্থানে রয়েছে যে, তিনি খলীফা হারুণুর রশিদকে লিখেছেন, 'হে আমীরুল মু'মিনীন, আপনি যদি আপনার প্রজা সাধারণের প্রতি ন্যায়পরায়ণতা দেখাতে চান, তবে মাসে যদি একবারও যান যে, আপনার রাজ্যে প্রজা-বিদ্রোহ হবে না।

এরূপে দুই একটি দরবারে যদি করেন, তবে রাজ্যময় তা প্রচার হয়ে যাবে, তাতে মাথা তুলতে কেউই সাহস পাবে না। আর সুবাদারদের কাছে যদি এ সংবাদ পৌছে যে, আপনি বছরে একবার বিচার করবেন, তবে তাতেও তাদের অত্যাচার স্পৃহা আপনা আপনি দমিয়া যাবে।

হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রাঃ)

তিনি ছিলেন হানফী ফিকাহর দ্বিতীয় স্তম্ভ। দামেস্কের নিকটবর্তী এক পল্লীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা জন্মভূমি পরিত্যাগ করে ওয়াস্তা চলে আসেন এবং তথাই বসবাস আরম্ভ করেন। ইমাম মুহাম্মদ হিজরী ১৩৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

কূফা নগরে তাঁর শিক্ষা আরম্ভ হয়। তিনি মাসআলা বিন কেরাম, ইমাম সুফিয়ান সওরী, মালেক বিন দীনার, ইমাম আওজায়ী ইত্যাদির কাছ হতে হাদীস রেওয়ায়েত করেন। দুই বছরকাল তিনি ইমাম আবু হানীফা সাহেবের খেদমতে কাটান। ইমাম সাহেবের মৃত্যুর পর তিনি কাজী আবু ইউসূফ সাহেবের শিক্ষাধীন ছিলেন। তারপর মদীনায় যেয়ে তিনি তিন বছর ইমাম মালেকের কাছে হাদীস পড়েন। যৌবনের প্রারম্ভেই তাঁর জ্ঞান-গরিমা ও যশ-গৌরব চুতর্দিকে বিকীর্ণ হয়ে পড়ল। বিশ বছর বয়সেই তিনি শিক্ষকের-আসনে উপবেশন করলেন। লোক-সমাজ অচিরেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ল। খলীফা হারুণুর রশিদ তাঁর জ্ঞান-বল ও পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে অবগত হয়ে তাঁকে কাজীপদে নিযুক্ত করলেন। আর খলীফা প্রায়ই তাঁকে নিজের সঙ্গে রাখতেন।

খলীফা একদিন কাজী সাহেব প্রায়ই তাঁকে নিজের সঙ্গে রাখতেন। খলীফা একদিন কাজী সাহেব সহ বিদেশ ভ্রমণে বের হলেন। সেই ভ্রমণেই কাজী সাহেব ইন্তেকাল করেন। বিখ্যাত নুহুবী কাসয়ীও খলীফার সঙ্গে ছিলেন। তিনিও সেই ভ্রমণে ইন্তেকাল করেন।

হারুণুর রশিদ তজ্জন্য বিশেষ দুঃখিত হলেন। তিনি মহা আক্ষেপের স্বরে বললেন, "আজ আমরা ফিকাহ ও নুহু উভয়েরই সমাধি রচনা করে আসলাম।" খলীফার সঙ্গে একজন সাহিত্যিকও ছিলেন। তিনিও শোকান্বিত হয়ে বললেন, "আমাদেরকে সঙ্কটের সময় কে রক্ষা করবে?"

ইমাম মুহাম্মদ যদিও জীবনের অধিকাংশ সময় রাজ-দরবারে কাটায়ে দিয়েছেন, তথাপি তিনি আজাদীর রসি কখনও তাঁর হাত-ছাড়া হতে দেননি।

এয়াহয়া উলুভী নামক একব্যক্তি বিদ্রোহ ঘোষণা করল। হারুণুর রশিদ তাকে যথাসময়ে দমন করলেন। সেই প্রজা তখন খলীফার সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হলো। সন্ধিপত্র লিপিবদ্ধ হলে, প্রজার মন সন্তুষ্ট করার মানসে সেই সন্ধিপত্রে বড় বড় আলেম ওলামা, ফূকাহা ও মুহাদ্দেসীনের দস্তখত প্রদান করা হলো। এয়াহয়া সন্ধিপত্রে রাজী হয়ে বাগদাদে উপস্থিত হলো।

এটার কিছুদিন পর হারুণুর রশীদ সেই সন্ধি ভঙ্গ করতে চাইলেন। খলীফার ভয়ে সকল আলেম ফতোয়া দিলেন যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে সন্ধি বাতেল করা দুরস্ত কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ প্রকাশ্যভাবেই এটার বিরোধিতা করলেন। তিনি শেষ পর্যন্ত তাঁর নিজের অভিমতের উপর কায়েম রইলেন।

আইম্মায়ে মুজতাহেদীনদের নিম্নলিখিত অভিমত হতে বুঝা যাবে যে, ইমাম মুহাম্মদ কোন্ উচ্চ শ্রেণীর লোক ছিলেন।

কোন এক ব্যক্তি ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকে জিজ্ঞেস করছেন, "আপনি এই রূপ সূক্ষ্ম প্রশ্নের সমাধান কোথা হতে শিখলেন?" তিনি বললেন, "মুহাম্মদ বিনেল হাসনের কিতাব হতে।"

ইমাম মুহাম্মদের শিক্ষা-মজলিস হতে অসংখ্য ছাত্র শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েছিল। তন্মধ্যে ইমাম শাফেয়ীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইমাম শাফেয়ী ইমাম মুহাম্মদের সাহচর্য হতেই অগাধ জ্ঞান ও অপূর্ব বুজুর্গীর অধিকারী হন। ইমাম শাফেয়ী নিজেই তা অম্লান-বদনে স্বীকার করতেন। হাফেজ ইবনে হাজর ইমাম শাফেয়ীর বাণী উদ্ধৃত করেছেন। তা এই– "মুহাম্মদ বিনেল হাসন খলীফা সমীপে মহা সম্মানিত লোক ছিলেন। আমি প্রায়ই তাঁর খেদমতে যাতায়াত করতাম। ফিকাহতে তাঁর জ্ঞানের গভীরতা উপলব্ধি করে আমার মন তাঁর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধায় ভরপুর হয়ে উঠত। তাঁর শিক্ষা-মজলিসে যোগদান করা আমি অপরিহার্য করে নিলাম। তাঁর পাক-মুখে আমি যাকিছু শুনতে পেতাম, তাই লিপিবদ্ধ করে নিতাম।

ইমাম মুহাম্মদ স্বয়ং ইমাম শাফেয়ীকে বিশেষ শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতেন। ছাত্রবর্গের মধ্যে ইমাম শাফেয়ীকে তিনি অপরিসীম স্নেহের দৃষ্টিতে দেখতেন। একদিন তিনি খলীফা হারুণুর রশিদের দরবারে রওয়ানা হন। ইমাম শাফেয়ী ও তাঁর সাথে সাক্ষাৎলাভ মানসে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে ছাত্র শাফেয়ীকে দেখতে পেয়ে ইমাম মুহাম্মদ সাহেব ঘোড়া হতে নেমে পড়লেন। তারপর চাকরকে বললেন, "তুমি খলীফার দরবারে যেয়ে আপত্তি জানায়ে দাও যে, আজ কোন কারণবশতঃ আমি দরবারে উপস্থিত হতে পারব না।"

ইমাম শাফেয়ী বললেন, "আমি অন্য সময় না হয় আপনার খেদমতে হাজির হবো।" ইমাম মুহাম্মদ বললেন, "না, দরবারে আজ তেমন কোন কাজ নেই।"

তাঁরা দুইজনে মাঝে মাঝে আপোসে তর্ক-বিতর্কও করতেন। বেশ সুদীর্ঘকাল তাঁদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক চলত। এজন্য অনেকে তাঁদেরকে ছাত্র

শিক্ষক বলে স্বীকার করতেন না। কিন্তু তখনকার জমানায় ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে এইসব বিষয়ে ওজর-আপত্তি ছিল না। আর প্রকৃতপক্ষে তাতে দোষের কোন কিছুই নেই।

ইমাম মুহাম্মদ সাধারণতঃ ফিকাহর জন্য বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন। এ বিষয়ে তিনি বহু গ্রন্থও রচনা করে গিয়েছেন। কিন্তু তাফসীর, হাদীস ও সাহিত্য ইত্যাদিতেও তিনি বিশেষ জ্ঞান রাখতেন।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, "কোরআন মজিদ সম্বন্ধে ইমাম মুহাম্মদের চেয়ে অভিজ্ঞ আলেম আমি অপর কাউকেও পাইনি।

সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর কোন গ্রন্থ আজকাল পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু ফিকায় যে সকল মাসায়েল নূহুর অংশ হিসেবে পরিগণিত, 'জামেয় কবীর' গ্রন্থে প্রায়ই এদের বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায়। তাতেই বুঝা যায়, সেই বিষয়েও তাঁর কিরূপ প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। ইবনে কলকান প্রমুখ অনেকে বিশেষভাবে এ সকলের উল্লেখ করেছেন।

হাদীস সম্বন্ধে তাঁর কিতাবে 'মুয়াত্তা একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। তদুপরি তিনি তাঁর 'কিতাবুল হুজ্জ' গ্রন্থও বহু হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি অসংখ্য কিতাব লিখে গিয়েছেন। আজও তাঁর কিতাব হানফী মাজহাবের শক্তি বৃদ্ধি করছে। যে সকল কিতাবে ইমাম আবু হানীফা সাহেবের মসায়েল রয়েছে, নিম্নে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

মব্‌সূত ঃ প্রকৃতপক্ষে এটা কাজী আবু ইউসূফ সাহেব লিখেছেন। তাঁর মাসআলাগুলোকে ইমাম মুহাম্মদ অধিকতর সুস্পষ্ট ও সুচারুরূপে লিপিবদ্ধ করেছেন। ইমাম মুহাম্মদ তাতেই সর্বপ্রথম কলম ধরেন।

জামেয়ে সগীর

এই কিতাবে ইমাম মুহাম্মদ কাজী আবু ইউসূফের রেওয়ায়েত হতে ইমাম আবু হানীফা সাহেবের সবকিছু মাসআলা লিপিবদ্ধ করছেন। এতে ৫৩৩ টি মাসআলা স্থান পেয়েছে। তন্মধ্যে একশত সত্তরটি মাসআলা সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবিরোধেরও উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত কিতাবে তিন রকমের মাসআলা স্থান পেয়েছে ঃ

(১) এই কিতাব ব্যতীত অন্য কোথাও এই সকল মাসআলা পাওয়া যায় না।

(২) অন্যান্য কিতাবেও এই সকল মাসআলা বর্ণিত রয়েছে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ অন্যান্য কিতাবে এই সকল মাসআলা সম্বন্ধে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেননি। কারণ এটার পিছনে তিনি এই যুক্তি প্রদর্শন করছেন যে, এই সকল বিশেষভাবে ইমাম সাহেবের মাসআলা।

(৩) এই সকল মাসায়েল অন্যান্য কিতাবেও রয়েছে। কিন্তু এই কিতাবে যে ভাষায় তা বর্ণিত হয়েছে, তা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। সেই ভাষাতে কি যেন পৃথক সুর রয়েছে। এই কিতাবে ত্রিশটি হাদীসের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। 'কাশফুল জুনুন' ইত্যাদি কিতাবে এটার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়।

জামেয়ে কবীর

এটা জামেয়ে সগীরের পরবর্তী কিতাব হতে ইমাম আবু হানীফা সাহেবের মাসআলার সঙ্গে কাজী আবু ইউসূফ এবং ইমাম সাফরের মাসআলাও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এটার প্রত্যেক মাসআলার সাথেই দলীল দেয়া হয়েছে। হানফী মাজহাবের ঐতিহাসিকগণ ফিকাহর মাসায়েল সম্বন্ধে যা কিছু উসূল লিপিবদ্ধ করেছেন, এদের অধিকাংশই উক্ত কিতাবের ধারানুযায়ীই নেয়া হয়েছে। বহু নামজাদা ব্যাখ্যাকারীগণ এটার ব্যাখ্যা লিখেছেন। 'কাশফুল জুনুন' কিতাব এদের চল্লিশটির নাম উল্লেখিত রয়েছে।

জিয়াদত

'জামেয়ে কবীর' রচিত হবার পর যাকিছু মাসায়েল স্মরণে আসছেন, তাই এতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এজন্য এদের নাম জিয়াদত রাখা হয়েছে।

কিতাবুল হজ্জ

ইমাম সাহেবের মৃত্যুর পর ইমাম মুহাম্মদ মদীনায় গমন করেন। তিনি তিন বছরকাল তথায় অবস্থান করে ইমাম মালিকের কাছ হতে মুয়াত্তা পড়েন। মদীনাবাসীগণ অন্য পথ অবলম্বনকারী ছিলেন। বহু মাসআলা সম্বন্ধে তাঁরা ইমাম আবু হানীফার সাথে মতবিরোধ করতেন। ইমাম মুহাম্মদ মদীনা হতে ফিরে এই কিতাব লিখেছেন। এতে সর্বপ্রথম ইমাম সাহেবের মাসআলা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। অতঃপর মদীনাবাসীদের অভিমত বর্ণনা করার পর হাদীস, আসর ও

কেয়াছ দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে যে, আবু হানীফার মাসআলা সহী ও অন্যান্যগুলো সহী নয়। ইমাম রাজী 'মুনাকেবেশ শাফেয়ী' কিতাবে এটার বর্ণনা দিয়েছেন। এটা মুদ্রিত হয়েছে এবং সর্বত্র পাওয়া যায়। আমি এটার একটি হস্ত লিখিত কপিও দেখেছি।

সীয়রে সগীর ও কবীর

এটা তাঁর সর্বশেষ রচনা। সর্বপ্রথমে সীয়রে সগীর লেখা হয়। এটার এক কপি ইমাম আওজায়ীর নজরে পড়ে। এটা দেখে ইমাম আওজায়ী কিছুটা অবজ্ঞাভাবে বললেন, "ইরাকবাসীরা এ সম্বন্ধে কিতাব লিখবার ক্ষমতা রাখে?" ইমাম মুহাম্মদ ইহা শ্রবণ করিয়া অপর একখানা ছীয়র লেখা শুরু করলেন। তা সমাপ্ত হওয়ার পর মোট ষাট খণ্ড হল। ইমাম মুহাম্মদ সেসব কিতাব একটি খচ্চরের উপর উঠিয়ে হারূনূর রশীদের দরবারে নিয়ে চললেন। খলীফা প্রবর তা শুনতে পেয়ে ইমাম সাহেবের পরিশ্রম ও পাণ্ডিত্যের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থে শাহজাদাদেরকে ইমাম সাহেবকে এগিয়ে আনার জন্য পাঠালেন।

এ সমস্ত কিতাব ছাড়াও ইমাম মুহাম্মদের বেশ কিছু কিতাব রয়েছে। তাঁর গ্রন্থরাজি আজকাল অপ্রাপ্য হওয়ায়ে এবং তাঁর সম্বন্ধে লোকসমাজ তেমন পরিজ্ঞাত না থাকায় জনসমাজে তাঁর যথাযথ পরিচয় ঘটে না।

তিনি আরবের অধিবাসী ছিলেন। প্রথম থেকেই তিনি হাদীসের খেদমত করতে শুরু করেন। তিনি সাহেবুল হাদীস উপাধি লাভ করেন।

তিনি কীয়াসে অতুলনীয় পাণ্ডিত্য লাভ করেছিলেন। স্বয়ং ইমাম আবু হানীফা সাহেব তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করতেন। তিনি কাজী পদেও বরিত হয়েছিলেন। তিনি হিজরী ১১০ সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

ইমাম মালেক (রাঃ)

[জন্ম–হিজরী ৯৩, মৃত্যু–হিজরী ১৭৯]

বৈশিষ্ট্য

* তিনি ছিলেন পবিত্র মদীনার সর্বশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দেস, আলেম ও ফকীহ।
* বৈরাগ্য অতুলনীয়, রাসূল-প্রেমে মাতোয়ারা এবং সুন্নতে নববীর পরম ভক্ত।
* বিখ্যাত 'মুয়াত্তা' কিতাবের লেখক। জ্ঞানীগণ তাঁর কিতাবকে অদ্বিতীয় কিতাব বলে বিবেচনা করে থাকেন। পাক-কোরআনের পরই এর স্থান।
* তিনি কখনও মদীনার বাইরে যেতেন না। তাঁর শিক্ষা-মজলিস ছিল ইসলামী শিক্ষার নিমিত্ত মদীনার সর্ববৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয়।
* তিনি আল্লাহ-প্রেম-জ্ঞানের জ্ঞানী ছিলেন। সেই সময়কার খলীফাও তাঁর মজলিসে সাধারণ শ্রোতা হিসেবে যোগদান করতেন।
* তিনি জোরজবরদস্তি তালাকের বিরুদ্ধে ফতোয়া দেন। পরোক্ষভাবে তিনি জোরজবরদস্তি আনুগত্য স্বীকার করবারও বিরোধী ছিলেন।

কাজেই সরকার তাঁর বিরোধী হয়ে উঠল। তিনি বন্দী হন। মুখে চুনকালি মাখায়ে তাঁকে প্রকাশ্যে অপমান করা হয়; তাঁকে কোড়া (বেত্রাঘাত) মারা হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত কথা বলবার ক্ষমতা ছিল, ততক্ষণ কোড়ার আঘাতের তালে তালে তিনি বলছিলেন, "আমি মালেক বিন আনছ ফতোয়া দিচ্ছি যে, জোর জবরদস্তি তালাক হারাম।"

জন্ম, বংশ ও শৈশব

নাম মালেক ডাক নাম আবদুল্লাহ। 'নির্জনবাসী ইমাম' উপাধি। পিতার নাম আনাছ। বংশের ধারাবাহিকতা–মালেক বিন আনছ-বিন মালেক-বিন আবি আমের বিন ওমর-বিন হারেছ-বিন গীমান-বিন জসীল-বিন, ওমর-বিন আবি আমের বিন ওমর-বিন হারেস জী আসবাহ্।

তিনি খাঁটি আরব-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। মূর্খ-যুগের ন্যায় ইসলামী যুগেও তাঁর বংশধরেরা পরম সম্মানিত লোক ছিলেন। তাঁর পূর্ব-পুরুষের এয়মনের অধিবাসী ছিলেন। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর মদীনাতুন্নবীতে বসবাস আরম্ভ

করেন। এয়মনের শেষ শাহী খান্দান 'আছবাহ' এর সাথে তাঁদের রক্তমাংসের সম্বন্ধ ছিল।

তাঁর প্রপিতা আবু আমের হযরতের (সাঃ) জমানায় ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি হিজরী ৯৩ সনে জন্মগ্রহণ করেন।

তখন বনি উম্মাইয়াদের শাসন উন্নতির চরম শিখরে উপনীত হয়েছিল। উম্মাইয়া মরওয়ানী শাসনের তৃতীয় বাদশা ওলীদ বিন আবদুল মালেক তখন দামেস্কের সিংহাসনে সমাসীন। মুসলিম সাম্রাজ্যের বন্যা তখন পূর্বে তুর্কীস্থান কাবুল ও সিন্ধু এবং পশ্চিমে আফ্রিকা হতে স্পেনের ভূমি প্লাবিত করে দিয়েছিল। এটি একটি আশ্চর্যজনক সমন্বয় ছিল যে, যে জমানায় ইমাম সাহেব পয়দা হন, তখনকার মুসলিম শাসনকর্তা যে সকল দেশকে তলোয়ার দ্বারা জয় করেছিলেন, ইমাম সাহেবের কলম সেই সকল দেশের তদপেক্ষা শতগুণ অধিক উপকার সাধন করেছিল।

শিক্ষা, লালন-পালন, ফিকাহ্-জ্ঞান ও হাদীস-সঙ্কলন

ইমাম সাহেবের শৈশবেই এলম শিক্ষার সুবর্ণ সুযোগ ঘটেছিল। তাঁর ঘরে বাইরে এবং প্রতি শহরে আলেম ওলমা দ্বারা আলোকিত ছিল। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লমের ইন্তেকালের পর অসংখ্য সাহাবা দূর দুরান্তে পৌঁছে যান। সমগ্র সাহাবাকুল যাঁরা শরীয়তের পরম হেফাজতকারী ছিলেন, কোরআন ও সুন্নতকে যাঁরা নিজেদের জীবনের চেয়ে শত সহস্রগুণে বেশী ভালবাসতেন, তাঁদের অনেকেই মদীনায় বসবাস করেছিলেন। নবুয়তের জমানা ও তৎপরবর্তী জমানায়ও চব্বিশ পঁচিশ বছর পর্যন্ত মদীনা মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র ছিল। এখানকার ফুকাহা ও সাহাবাদের মজলিস হতে আদেশাবলী ফতোয়া মীমাংসা হওয়ার পর সমগ্র মুসলিম সাম্রাজ্যে তা ছড়ায়ে পড়ত।

মদীনার ফকীহ সাহাবা

হযরত আবু হুরাইরা, (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ্ বিন ওমর, (রাঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও হযরত জাইদ বিন সাবেত (রাঃ) তখন মদীনাকে আলোকিত করছিলেন। হযরত আদুল্লাহ্ বিন ওমরের (রাঃ) চেয়ে উত্তম রাবী অপর কেউই ছিলেন না। হযরত জাইদ বিন সাবেত (রাঃ) ওহী লিখে রাখতেন। তাঁদের কাছ হতে হাজার হাজার লোক ওহী ও সুন্নতের এলমের উত্তরাধিকারী বনিয়া দুনিয়ার বুকে ছড়ায়ে পড়তেন।

সাহাবাদের ছাত্রবৃন্দ

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর উত্তরাধিকারী হন তাঁর কন্যা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)। হযরত আয়েশা সিদ্দীকার (রাঃ) বিশিষ্ট ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম ছাত্র ছিলেন, তাঁরই ভ্রাতুষ্পুত্র কাসেম বিন মুহাম্মদ বিন আবু বকর (রাঃ) তাঁর ভাগিনা আরওয়া বিন জুবায়ের (রাঃ)।

ফারুকে আজম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর লতাসূত্র ছিলেন আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাঃ) এবং আবদুল্লাহ্ বিন ওমর (রাঃ)। হযরত ইবনে ওমরের (রাঃ) বিশিষ্ট ছাত্র ছিলেন, নাফেয় (রাঃ) এবং আবদুল্লাহ্ বিন দীনার (রাঃ)।

হযরত জায়েদ বিন সাবেতের (রাঃ) সম্পত্তির অধিকারী হন, তাঁরই পুত্র খারেজা বিন জায়েদ। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) স্বীয় আমানত তাঁর জামাতা সাইদ বিন মুসাইবের উপর সোপর্দ করেন।

আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস যদিও স্বীয় সম্পত্তির বিরাট অংশ মদীনার বাইরে মক্কা, কূফা ও বসরায় ব্যয় করেন, এরপরও মদীনায় যাকিছু সম্পত্তি রয়ে গিয়েছিল, এর মালিক হন সাইদ বিন মুসাইব।

সাহাবাদের ছাত্রদেরকে ইসলামী পরিভাষায় তাবেয়ীন বলা হয়। তাঁরা সমগ্র মুসলিম সাম্রাজ্যে ছড়ায়ে পড়েন। আমরা এখানে শুধু মদীনাবাসী তাবেয়ীনদের কথা উল্লেখ করব।

তন্মধ্যে বিশিষ্ট কয়েকজনের নাম উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত হিসেব বিন আরওয়া, মুহাম্মদ বিন মুনকাদের, আবদুল্লাহ্ বিন ওতবা বিন মাসঊদ, মুহাম্মদ বিন মুসলিম বিন শাহা বুজ্জহুরী, আমের বিন আবদুল্লাহ্ জাফর সাদেক, রবিউর রায়ী, আবু সুহাইল নাফের বিন মালেক, সুলাইমান বিন লাইয়র রাদিয়াল্লাহু আন্হুম প্রমুখ আরও কতিপয় বিশিষ্ট বিখ্যাত লোক মদীনায় তখন বাস করতেন।

সাত ফকীহের মজলিস

তাঁদের মধ্যে নিম্নলিখিত সাতজন ফকীহকে নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়। তাঁদের জন্ম তারিখও সংগে দেয়া হয়েছে। তাঁরা মদীনার 'সাত ফকীহ' বলে অভিহিত হতেন। সাহাবাদের পরে তাঁরই সকল ফতোয়া' মাসআলা ও ঝগড়া-বিবাদ ও মুকদ্দমার চূড়ান্ত মীমাংসা করতেন। তাঁরা সাতজন মিলেমিশেই সবকিছু মীমাংসা করতেন।

সেই সময়ের জন্য এটাই সর্বোচ্চ বিচারালয় ছিল। এটাই মদীনার ফিকাহ বলে পরিচিত হতো। নিম্নে এর বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাবে।

ফকীহদের নাম	জন্ম তারিখ
১। সুলায়মান বিন ইয়াসের	১০৭ হিজরী
২। আবু বকর বিন হারেস	৯৪ হিজরী
৩। খারেজ বিন জায়েদ	৯৯ হিজরী
৪। কাসেম বিন মুহাম্মদ	১০১ হিজরী
৫। সইদ বিন মুসায়েব	১০১ হিজরী
৬। আবদুল্লাহ্ বিন ওতবা	১০২ হিজরী
৭। সালেম বিন আবদুল্লাহ্	১০৬ হিজরী

ইমাম মালেকের উস্তাদবৃন্দ

ইমাম সাহেবের জ্ঞান-চক্ষু উন্মিলিত হবার পরই তিনি দেখতে পেলেন, মদীনার আকাশ-বাতাস জ্ঞানলোকে উজ্জ্বল সমুজ্জ্বল। প্রায়ই প্রত্যেক আলেম ওলমাই শিক্ষাদানে লিপ্ত থাকতেন। ইমাম মালেক তাঁদের প্রায় সকলের কাছ হতেই উপকার লাভ করেন।

এরূপে যে জ্ঞান এতদিন পর্যন্ত বিভিন্ন বুকে বিরাজ করেছি, তা এক ইমাম মালেকের বুকে আশ্রয় পেল। ইমাম সাহেব অহোরাত্র এমনভাবেই জ্ঞানচর্চায় লিপ্ত ছিলেন যে, লোকেরা তাঁকে 'কামরা-ভক্ত ইমাম' বলে আখ্যা দান করে। তিনি বহু লোকের কাছে হতে রেওয়ায়েত করেন। কিন্তু মুয়াত্তা' গ্রন্থে তিনি যে সকল লোকের কাছ হতে রেওয়ায়েত করেন তন্মধ্যে কয়েক জন ব্যতীত প্রায় প্রত্যেকেই মদীনাবাসী ছিলেন।

এলম শিখবার জন্য ইমাম সাহেবকে কখনও মদীনার বাইরে যেতে হয়নি। আর বাইরে যাবার তাঁর কারণই বা কি থাকতে পারে? মদীনা তখন বিশ্ব-শিক্ষাকেন্দ্র।

সুতরাং মদীনাবাসীর পক্ষে এলম শিখিবার নিমিত্ত মদীনার বাইরে যাবার কোন প্রয়োজনই থাকতে পারে না। অন্য সময় না হলেও বছরে একবার হজ্ব করার নিমিত্ত লোকেরা যখন মক্কা শরীফে আসতেন, তখন মদীনা জিয়ারত না করে বাড়ী ফিরতে কারও মন চাইত না।

ইমাম সাহেবের আত্মীয় মুহাদ্দেছ

ইমাম মালেকের বাপ, চাচা ও দাদা প্রত্যেকেই মুহাদ্দেস ছিলেন। ইমাম সাহেবের যখন হাদীস জানবার বাসনা জাগল, তখন স্বীয় বাড়ীকেই তিনি শিক্ষা-কেন্দ্ররূপে পেলেন। ইমাম সাহেবের বয়স যখন দশ বছর তখন তাঁর দাদা ইন্তেকাল করেন।

আবু সুহাইল নাফের নামে ইমাম সাহেবের একজন চাচা ছিলেন। তিনি রেওয়ায়েত ও হাদীসের শেখ ছিলেন। তিনি ইমাম জহুরীর উস্তাদ ছিলেন। ইমাম মালেক তাঁর কাছ হতে শিক্ষা করেন। ইমাম মালেকের পিতা আনাস এবং অপর চাচা রবীয় উভয়েই তাঁদের পিতার কাছ হতে রেওয়ায়েত করেন। কিন্তু ইমাম মালেক তাঁদের কোন রেওয়ায়েতই 'মুয়াত্তা' কিতাবে গ্রহণ করেননি।

ইমাম মালেক মদীনার কেরাআতের ইমাম হযরত নাফেয় বিন আবদুর রহমান সাহেবের কাছ হতে এলমে কেরাআত শিক্ষা করেন। সেই কেরাআতের উপর ভিত্তি করেই দুনিয়ার আজ এলমে কেরাআত রয়েছে। ইমাম মালেকের নিজ বর্ণনানুযায়ীই জানা যায় যে, তিনি হযরত নাফেয় বিন আবদুর রহমানের কাছ হতে কেরাআত শিক্ষা করেন। কিন্তু কোন সময়ে বা তাঁর কত বছর বয়সের সময় তিনি তা শিক্ষা করেন, এটার তথায় কোন উল্লেখ নেই। মুসলমান সমাজে বালক বালিকা শৈশবেই এলমে কেরাআত শিখে থাকে। সম্ভবতঃ ইমাম সাহেবও অতি শৈশবেই এলমে কেরাআত শিক্ষা করেছিলেন।

এলমুল হাদীস

এলমুল হাদীসও তিনি খুব শৈশবেই শিক্ষা করতে আরম্ভ করেন। উপরের বর্ণনা হতেও সেই আভাস পাওয়া যায়। আর এটাও বুঝা যায় যে, ইমাম সাহেবের সর্বপ্রথম এলমুল হাদীসের শেখ ছিলেন হযরত নাফেয় অথবা এটাও সম্ভবপর হতে পারে যে, তিনি নিজ ঘরে তাঁর চাচা হযরত আবু সুহাইলের কাছ হতেই সর্বপ্রথম এলমুল হাদীস শিক্ষা করতে আরম্ভ করেন। কিন্তু এটা অনুমান মাত্র। এটার কোন সঠিক প্রমাণ নেই।

হযরত নাফেয়

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন ওমরের (রাঃ) নাম কারও কাছে অপরিচিত নয়। তাঁর শৌর্যবীর্যের জন্য তিনি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। জওহারীই জওহারী চিনেন।

হযরত নাফেয়ের মত লোক চির গোলাম থাকবেন, এটা তিনি বরদাস্ত করতে পারলেন না। তিনি তাঁকে মুক্ত করে আনলেন।

ইউরোপের অভিধানে ক্রীতদাসকে যেরূপ ঘৃণীতরূপ দান করা হয়েছে, মুসলিম ইতিহাসে এটার নামগন্ধ নেই। ইসলামের অভিমত এই যে, প্রভু ও ভৃত্য এটা দুনিয়ার সম্বন্ধ। এতে কোন কিছুই আসে যায় না। মানুষ মানুষের প্রভু নয়। মানুষ মানুষের দাস নয়। মানুষ এক আল্লাহ ব্যতীত অপর কারও চেয়ে ছোট নয়।

কাজেই যোগ্যতা থাকলে ইসলাম গোলামকেও ইজ্জত ও শিক্ষকের আসনে বসাতে কোন আপত্তি করে না। এমনকি তাকে নেতার আসনে বসাতেও ইসলামের কোন দ্বিধাবোধ নেই।

হযরত আকরাম (রাঃ) হযরত ইবনে আব্বাসের (রাঃ) এমন একজন গোলাম ছিলেন যে, তিনিই এলমে তফসীরের প্রথম ভিত্তি স্থাপন করেন। আর এখন আমরা আলোচনা করেছি, হযরত ইবনে ওমরের (রাঃ) গোলাম হযরত নাফেয় সম্বন্ধে। হযরত নাফেয় ছিলেন হাদীস ও রেওয়ায়েতের উস্তাদ ও শেখ।

হযরত নাফেয় হযরত ইবনে ওমরের (রাঃ) খেদমতে সুদীর্ঘ ত্রিশ বছর কাল ছিলেন। তিনি হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) ব্যতীত আরও কতিপয় সাহাবা যেমন হযরত আয়েশা (রাঃ) হযরত উম্মে সালমা (রাঃ), হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ), হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতেও রেওয়ায়েত করেন।

ইমাম আওজায়ী, ইমাম জহুরী এবং ইমাম মালেক প্রমুখ হাদীসের ইমামগণ কেন হযরত নাফেয় সাহেবের ছাত্র বলে পরিচয় দানে পরম গৌরব অনুভব করতেন, তা নিম্নলিখিত ঘটনা দ্বারাই বুঝা যাবে।

খলীফা ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (রাঃ) নিজেও একজন মুজতাহেদ ছিলেন। তিনি হযরত নাফেয় (রাঃ) কে মিসরবাসীদেরকে শিক্ষা দান করার জন্য প্রেরণ করলেন। হযরত নাফেয় (রাঃ) হিজরী ১১৭ সনে ইন্তেকাল করেন।

হযরত নাফেয় (রাঃ) যতদিন পর্যন্ত জীবিত ছিলেন, ইমাম মালেক ততদিন পর্যন্ত তাঁর শিক্ষা মজলিসে যথারীতি যোগদান করেন। শিক্ষা মজলিসে উপস্থিত হয়ে ইমাম সাহেব তাকে জিজ্ঞেস করতেন, "এই মাসআলা সম্বন্ধে ইবনে ওমর (রাঃ) কি বলছেন?" হযরত নাফেয় (রাঃ) তার বাণী শুনায়ে যেতেন। উস্তাদের এলম ও ফজল সম্বন্ধে শাগরেদ এইরূপ গর্বিত ছিলেন যে, ইমাম মালেক বলতেন, "আমি যখন হযরত নাফেয়ের (রাঃ) জবানে হযরত ইবনে ওমরের

(রাঃ) হাদীস শুনতাম, তখন অপর কারও কাছ হতে এটার সমর্থন পাবার জন্য কোন পরোয়া করতাম না।" ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে মধুর সম্পর্ক বুঝাবার নিমিত্ত এটার চেয়ে উত্তম দলীল আর কি থাকতে পারে যে, দুনিয়াবাসী চিরকাল রেওয়ায়েত করে থাকবে যে, মালেক নাফেয় (রাঃ) হতে এবং নাফেয় ইবনে ওমর (রাঃ) হতে রেওয়ায়েত করতেছেন।

হযরত নাফেয় (রাঃ) ব্যতীত ইমাম মালেক সাহেব মদীনার অন্যান্য খ্যাতনামা শেখদের কাছ হতেও হাদীস শিক্ষা করেন। তন্মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন মুহাম্মদ বিন শেহাবুজ্জহুরী, জাফর সাদেক বিন মুহাম্মদ, মুহাম্মদ বিন মুনকাদের, মুহাম্মদ বিন এয়াহয়াল আনসারী, আবু হাজেম এবং এয়াহয়া বিন সাঈদ।

হযরত মুহাম্মদ বিন শেহাবুজ্জহুরী

তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মদ বিন মুসলেম বিন ওবাইদুল্লাহ বিন শেহাবুজ্জহুরী আল-কুরাইশ। কিন্তু তিনি শুধু ইবনে শেহাবুজ্জহুরী নামেই পরিচিত ছিলেন। সাহাবাদের পরে তাবেয়ীদের মধ্যে রেওয়ায়েত ও হাদীসের ব্যাপারে যাদেরকে বিশেষ স্তম্ভ বলে বিবেচনা করা হয় তন্মধ্যে হযরত সাঈদ বিন মুসাইব ব্যতীত ইমাম জহুরীর চেয়ে অপর কারও প্রতি অধিক গুরুত্ব দেয়া চলে না। সেহা সিত্তাহ ইসলামী ইতিহাসে পরম গৌরবের বিষয় বলে পরিগণিত হয়েছে। সেই সেহা সিত্তাহও ইবনে শেহাবুজ্জহুরীর রেওয়ায়েতে ভরপুর। আবু বকর বিন হাজমের পরে তিনি এলমে হাদীসের দ্বিতীয় সংগ্রহকারী বলে পরিচিতি লাভ করেন।

তিনি সাহাবাদের মধ্যে হযরত আনাস (রাঃ), জাবের (রাঃ) ইবনে ওমর (রাঃ), ছেহেল বিন সাঈদ (রাঃ) ইত্যাদি আরও কতিপয় সাহাবার সাথে সাক্ষাৎ করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। তিনি তাঁদের কাছ হতে রেওয়ায়েত করার সৌভাগ্যও অর্জন করেন। সাত ফকীহ এবং মদীনার অপরাপর শেখদের বুকে যা কিছু এলম এতদিন পর্যন্ত বিরাজ করছিল, তা ইমাম জহুরীর পরে ইমাম মালেকের হৃদয়ে স্থান লাভ করল।

ইমাম মালেক নিজ মুখে বর্ণনা করছেন, "হযরত ইবনে শেহাবুজ্জহুরী যখন মদীনায় আসতেন, আমরা ছাত্রবৃন্দ তখন তাঁর দরজায় মহা ভিড় করতাম। এই ভিড় হতে রেহাই পাবার নিমিত্ত তিনি মদীনা পরিত্যাগ করে শামদেশে নির্জনবাস আরম্ভ করেন।" কিন্তু ইমাম মালেকের কাছে এই দূরত্ব সহে উঠল না। একদিন

শাগরেদ্ উস্তাদের সমীপে অভিযোগের সুরে বললেন, "আপনি মদীনায় থেকে এলম শিক্ষা করেছেন। অতঃপর পূর্ণত্ব লাভের পর আপনি মদীনা ছেড়ে আরাম গ্রহণ করলেন।"

ইমাম লাইস মিসরী অম্লানবদনে স্বীকার করতনে, "জহুরীর চেয়ে সর্বজ্ঞানে জ্ঞানী লোক আমি অপর কাউকেও জানি না।"

ইমাম জহুরী নিজ মুখে বলছেন, "একবার যা আমার অন্তরে স্থান পেয়েছেন, তা কস্মিনকালেও আমার অন্তর হতে তিরোহিত হয়নি।" হাদীসের পরীক্ষকগণ বলছেন, মতন ও সনদের অধিক হাফেজ ইমাম জহুরীর চেয়ে অপর কেউই ছিলেন না।

ইমাম মালেক ব্যতীত ইমাম লাইস মিসরী, ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আওজায়ী, আতা বিন আবি রব্বাহ, ওমর বিন দীনার, সুফিয়ান বিন আলীয়া, ইবনে জরাহ প্রমুখ মুহাদ্দেসগণ ইমাম জহুরীর ছাত্র ছিলেন। কিন্তু তন্মধ্যে ইমাম মালেক সকলের চেয়ে অধিক কৃতিত্ব লাভ করেন।

হযরত আহমদ বিন হাম্বলের চেয়ে অধিক সূক্ষ্ম পরীক্ষক আর কে ছিলেন? একদিন তাঁর পুত্র তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "ইমাম জহুরীর ছাত্রদের মধ্যে কে অধিক উপযুক্ত?" জবাবে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল বললেন, "ইমাম মালেক তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।" সেই জমানার লোক ন্যায়পরায়ণতাকে এমনই ভালবাসতেন যে, ইমাম জহুরী স্বয়ং জ্ঞানের সাগর হওয়া সত্ত্বেও শাগরেদদের কাছ হতে ফায়দা লাভ করতেও লজ্জাবোধ করেননি। আর এমনও ব্যাপার ঘটত যে, ছাত্র শিক্ষক উভয়ে মিলে মিশে বহু সৎকাজ করে গিয়েছে। ইমাম জহুরী হিজরী ১২৪ সনে ইন্তেকাল করেন।

হযরত জাফর সাদেক

তাঁর পূর্ণ নাম জাফর বিন মুহাম্মদ বিন আলি বিন হুসাইন (রাঃ) বিন আবু তালেব মা'রুফ। তিনি ইমাম জাফর সাদেক নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ইমাম মুহাম্মদ বাকের, আরওয়া বিন জুবাইর, আত্তার এবং মুহাম্মদ বিন মুনকদের হতে হাদীস রেওয়ায়েত করেন।

ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক, সুফিয়ান বিন আলীয়া, সুফিয়ান সওরী, শুয়বা, আবু আসেম, এয়াহয়া আনসারী তাঁর ছাত্র ছিলেন। আবু খাতেম বলছেন, "জাফর সাদেক কিরূপ বুজুর্গ লোক সেই সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করাও তাঁর সম্মান

লাঘবজনক।" ইবনে হাব্বান বলেন, "তিনি হযরত আলীর (রাঃ) বংশধর ছিলেন। তিনি তাবেয়ীনদের অন্তর্গত ছিলেন। তিনি মদীনার একজন বিখ্যাত আলেম ছিলেন।"

ইমাম জাফর সাদেক মাঝে মাঝে ছাত্রদেরকে পরীক্ষা করতেন। একদিন তিনি ইমাম আবু হানীফাকে বললেন, "বল-তো কেউ যদি এহরামের সময় হরিণের উপরে মাড়ির চারটি দাঁত ভেঙ্গে ফেলে, তবে তার কিরূপ শাস্তি বিধান হতে পারে?" ইমাম আবু হানীফা আরজ করলেন, "হে রাসূলের বংশধর, আমি তা অবগত নই।" ইমাম জাফর আরজ করলেন, "হে আবু হানীফা, তুমি-তো বড় হুশিয়ার লোক দেখছি। তুমি কি জান না যে, হরিণের উপরের মাড়িতে কখনও চার দাঁত থাকে না?"

আল্লামা জাহবী 'মীজানুল এয়তেদাল' হতে মাসআব বিন আবদুল্লাহর দুইটি রেওয়ায়েত নকল করছেন যে, ইমাম মালেক বনি উম্মাইয়ার রাজত্বকাল পর্যন্ত ইমাম জাফর সাদেক হতে কোন রেওয়ায়েত করেননি। আব্বাসীয়দের রাজত্ব আরম্ভ হলে, তিনি ইমাম জাফর সাদেকের কাছ হতে রেওয়াতে শুরু করেন। এটা সহিহও হতে পারে। কিন্তু যে ভয়ে তিনি উম্মাইয়াদের রাজত্বকালকে বর্জন করেছিলেন। আব্বাসীয়দের রাজত্বকালেও সেই ভয়ই বিরাজ করছিল।

অপর একটি রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, ইমাম জাফর ছাদেকের অপর একজন সমর্থনকারী না পাওয়া পর্যন্ত ইমাম মালেক তাঁর কাছ হতে কোন রেওয়ায়েত গ্রহণ করতেন না। এটা ভুল ও ভিত্তিহীন। আমার কাছে 'মুয়াত্তা' কিতাব মজুদ রয়েছে। ইমাম মালেক অপরের রেওয়ায়েত সমর্থন ব্যতীতও ইমাম জাফরের বহু রেওয়ায়েত এতে গ্রহণ করছেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আল্লামা জাহবীও এটার কোন প্রতিকার করেননি। ইমাম জাফর সাদেক হিজরী ১৪৮ সালে ইন্তেকাল করেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে দেখতে পাওয়া যায় যে, ইমাম জাফর সাদেকের মৃত্যুর সময় তিনি ইমাম মালেককে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে যান। কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাসসমূহে এ সম্বন্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

মুহাম্মদ ইবনুল মুনকাদের আল-মাদানী তাবেয়ীনদের মধ্যে একজন বিখ্যাত লোক ছিলেন। তিনি তাঁর পিতা মুনকাদের বিন আবদুল্লাহ্, হযরত আয়েশা (রা), হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত আবু আয়ুব, (রাঃ) এবং হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) প্রমুখ সমসাময়িক জবরদস্ত সাহাবাদের কাছ হতে রেওয়ায়েত

করেছিলেন। ইমাম আবু হানীফা, হযরত ইমাম মালেক শুয়বা, সুফিয়ান বিন আলীয়া, সুফিয়ান সওরী এবং অপরাপর হাদীসের ইমামদের রেওয়ায়েতের তিনি শেখ ছিলেন। ইবনে আলীয়া বলেন, "মুহাম্মদ বিন মুনকদের অত্যন্ত সত্য ও সরলতা প্রিয় ছিলেন। মদীনার সালেহীন তাঁর খেদমতে জড় হয়ে থাকতেন। তিনি হিজরী ১৩১ সালে ইন্তেকাল করেন।"

হযরত মুহাম্মদ বিন এয়াহয়া

মুহাম্মদ বিন এয়াহয়া আনসারী একজন জবরদস্ত তাবেয়ী ছিলেন। তিনি তাঁর পিতা এয়াহয়া বিন হাব্বান এবং তাঁর চাচা ওয়াসের বিন হাব্বান ব্যতীত অপরাপর জবরদস্ত সাহাবাদের মধ্যে হযরত আনাস (রাঃ), রাফেয় বিন খরীহ (রাঃ) প্রমুখের কাছ হতেই রেওয়ায়েত করেন। তিনি মসজিদে নববীতে শিক্ষা দান করতেন। তাঁর শিক্ষা-মজলিসে বহু ছাত্রের সমাবেশ হতো। তিনি মদীনায় ফতোয়া দিতেন। নেসায়ী, ইবনে ময়ীন এবং আবু হাতেম তাঁর সম্বন্ধে উচ্চ প্রশংসা করছেন। হিজরী ১২১ সালে ৭৪ বছর তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

হযরত আবু হাজেম

হযরত সেহেল বিন সাঈদ (রাঃ) মদীনার সর্বশেষ সাহাবা ছিলেন। তিনি হিজরী ৮৮ সনে একশত বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। হযরত আবু হাজেম সলমা বিন দীনার তাঁর কাছ হতে রেওয়ায়েত করবার সৌভাগ্য অর্জন করেন। হযরত আবদুল্লাহ্ বিন ওমর (রাঃ) এবং ইবনে ওমর (রাঃ)-এর কাছ হতেও তিনি রেওয়ায়েত করেন। কিন্তু তিনি তাঁদের কাছ হতে হাদীস শ্রবণ করেননি। তাবেয়ীনদের মধ্যে মুহাম্মদ বিন মুনকাদের, সাঈদ বিন মুসায়েব প্রমুখের কাছ হতে তিনি শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ইমাম জহুরীর চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন। তথাপি তিনি ইমাম জহুরীর কাছ হতে হাদীস শিক্ষা করতেন। ইমাম মালেক, ইবনে আলীয়া, সওরী ও হাম্মাদ প্রমুখও তাঁর ছাত্র ছিলেন।

মুহাদ্দেসীনদের মধ্যে তিনি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ছিলেন। তিনি বহু হাদীস বর্ণনা করেন। কোন কোন সময় মসজিদে নববীতে তিনি ওয়াজ করতেন। তাঁর শিক্ষা-মজলিসে বহু শ্রোতার সমাবেশ হতো। সময় সময় এমনও ঘটিত যে, দেরীতে আসলে সভাস্থলে স্থানও পাওয়া যেত না। এমনই একদিনে মালেক তথায় হাজির হলেন। স্থান ভরে গিয়েছিল। তিল পড়বার স্থানও ছিল না। ইমাম

সাহেব চলে আসলেন। লোকেরা তাঁরা ফিরে আসবার কারণে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, "আমি পছন্দ করলাম না যে, হাদীসে নববী আমি দণ্ডায়মান অবস্থায় শুনব।" তাঁর এইরূপ বলবার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, শান্তির সাথে কাছে বসতে না পারলে বিশেষ মনোযোগের সাথে কোন কিছুই শ্রবণ করা যায় না।

হযরত আবু হাজেম ১৪০ হিজরীতে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

হযরত এয়াহয়া বিন সাঈদ

হযরত আবু সাঈদ বিন সাইদেল আনসারী হযরত আনাস (রাঃ), আদী বিন সাবেত এবং আলী বিন জয়নাল আবেদীন বিন হুসাইনের (রাঃ) কাছ হতে শিক্ষা লাভ করেন। ইমাম মালেক, শুয়বা, সওরী, ইবনে আলীয়া, হাম্মাদ বিন জইদ, হাম্মাদ বিন সালমা এবং লাইস প্রমুখ তাঁর কাছ হতে রেওয়ায়েত করেন।

তিনি মদীনার কাজীপদে নিযুক্ত ছিলেন। ইবনে মদনী সুনিশ্চিতভাবে বলেছিলেন যে, তিনি তিন শত হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন। তাঁর প্রসঙ্গে ইবনে সাঈদ লিখেছেন, "যিনি বিশ্বাসযোগ্য এবং বহুহাদীস বর্ণনা করেছেন।" সুফিয়ান সওরী এবং সুফিয়ান আলীয়া তাঁকে হোফ্‌ফাজদের শ্রেণীভুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন। ইমাম আহমদ বলছেন, "সাঈদ খুব বেশী নির্ভরযোগ্য। তিনি হিজরী ১৪৩ সালে ইন্তেকাল করেন।"

ইমাম মালেকের শেখ-সংখ্যা

ইমাম মালেক মক্কা, মদীনা, বসরা, খুরাসান ও জজীরাহ ইত্যাদি স্থানের শেখদের কাছে হতে রেওয়ায়েত করেন। ইমাম সাহেব যে সকল শেখের কাছ হতে, 'মোয়াত্তা' কিতাবে রেওয়ায়েত করেছেন, তাঁদের সংখ্যা 'মসাবী' কিতাবের উপক্রমনিকায় পঁচাত্তর বলে শাহ ওলিউল্লা সাহেব উল্লেখ করেছেন। অপর একজন বুজুর্গ তাঁদের সংখ্যা ৯৫ বলে উল্লেখ করেছেন। ইমাম সাহেব 'মুয়াত্তা' কিতাবে সহী ও গায়ের সহী মিলায়ে ১০ হাজার হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন। যাঁচাই ও সংশোধনের পরে প্রায় আট হাজার হাদীস তিনি বাদ দিয়েছেন।

শেখুল ফিকাহ রবীয়াররায়ী

ইমাম মালেক যদিও হযরত নাফেয় ও অন্যান্য শেখদের কাছ হতে ফিকাহ শাস্ত্র শিক্ষা করেন, তথাপি তিনি বিশেষভাবে তা হযরত আবু ওসমান

রবীয়াররায়ীর কাছ হতে শিক্ষা করেন। ইমাম মালেক, এয়াহয়াল আনসার, শুয়বা, আওজায়ী, লাইস প্রমুখ মহামান্য মহাত্মাগণ তাঁর ছাত্র ছিলেন। তাঁর সাথে ইমাম সাহেবের এইরূপ গভীর ভক্তিশ্রদ্ধার সম্বন্ধ ছিল যে, ইতিহাস ও 'রেজাল' কিতাবে তাঁকে 'শেয়খ মালেক' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 'শেয়খ মালেক' ও তাঁর নামের অংশ-বিশেষে পরিণত হয়। এজতেহাদ, নির্বাচন, সংশোধন এবং মত প্রকাশে তিনি এইরূপ কৃতিত্ব লাভ করেন যে, তিনি 'রায়ী' উপাধি লাভ করেন।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল তাঁকে মহামহিম ব্যক্তি বলে অভিহিত করতেন। ইবনে শী'বার মত এই যে, তিনি মহা বিশ্বাসযোগ্য এবং মদীনার অন্যতম মুফতী খতীব লিখেছেন, অর্থাৎ তিনি ফিকাহর আলেম এবং ফিকাহ ও হাদীস উভয়ের হাফেজ ছিলেন।

হযরত রবীয়াররায়ী বিশেষভাবে মসজিদে নববীতে শিক্ষাদান করতেন। ইমাম মালেক, হাসান বছরী, শুয়বা, আওজায়ী, লাইস, মিসরী এবং এয়াহয়াল আনসারী প্রমুখ ওলামা ও ফুজালা তাঁর শিক্ষা-মজলিসে যোগদান করতেন। মদীনা তখন সর্বশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দেসীন ও ফুকাহাদের কেন্দ্র ছিল। তথায় ফতোয়া দেয়া বিশেষ জ্ঞানী ও উপযুক্ত লোক ব্যতীত অপর কারও পক্ষে শোভা পেত না। জ্ঞানে ও উপযুক্ততায় তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন বলেই তাঁর পক্ষে তখনকার মদীনায় ফতোয়া দেয়া সম্ভবপর হয়েছিল। তখনকার খলীফা তাঁকে কাজী পদে নিযুক্ত করেন। তিনি হিজরী ১৩৬ সনে ইন্তেকাল করেন।

রবীয়াররায়ী সাহেবের মাসআলা ও এজতেহাদ অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর ছিল। একদিন ইমাম মালেক মদীনায় শিক্ষাকার্যে নিযুক্ত ছিলেন, তখন তিনি হযরত রবীয়াররায়ীর হাদীসাবলী ও এজতেহাদের উল্লেখ করেন। লোকদের কাছে এ সকল এইরূপ হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল যে, তিনি যখন বর্ণনা শেষে চুপ হয়ে যেতেন, তখন লোকেরা তা আরও শুনবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করত। ইমাম সাহেব তখন আরও হাদীস ও এজতেহাদ বর্ণনা করতেন। তাতেও লোকদের আগ্রহ কমলো না। তারা আরও অধিক হাদীসও এজতেহাদ শুনতে চাইত।

ইমাম মালেক প্রায়ই বলতেন, "হযরত রবীয় মৃত্যুমুখে নিপতিত হওয়ার পর ফিকাহর স্বাদও চলে গিয়েছে।

হযরত রাবীয়ের জীবনের এক অতি অদ্ভুত ঘটনা রয়েছে। তখনও তিনি মাতৃগর্ভে। তাঁর পিতা ফররুখ সাহেব সৈন্য হিসেবে খুরাসানের যুদ্ধে যোগদান করেন। বিবির হাতে তিনি তখন চল্লিশ হাজার দেরহাম দিয়ে যান। তিনি ২৮

বছর পরে বাড়ী ফিরেন। ইতিমধ্যে তাঁর পুত্র পূর্ণ যৌবনে পদার্পণ করেন। মসজিদে নববীতে তখন তিনি শিক্ষাদান কার্যে নিযুক্ত হয়েছেন। মা সকল অর্থ পুত্রের শিক্ষাদানে নিঃশেষ করেছেন।

ফররুক সাহেব বাড়ী পৌঁছে নিজের বাড়ীতে প্রবেশ করতে অপর কারও জন্য অপেক্ষা করা বা অনুমতি চাওয়া নিষ্প্রয়োজন ভেবে বাড়ীর ভিতরে কয়েক পদ অগ্রসর হয়েছেন এমন সময় হযরত রবীয় দেখতে পেলেন যে, কে এক অপরিচিত ব্যক্তি কোন প্রকার বলা কওয়া না করেই তাঁদের বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করছেন। হযরত রবীয় বললেন, "খবরদার! আর একপদও সম্মুখে অগ্রসর হবেন না।"

তাঁর ঘরে এক অপরিচিত লোককে দেখতে পেয়ে ফররুক সাহেবও অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। বাপ বেটা তখন উভয়েই আস্তিন গুটাতে আরম্ভ করলেন। পাড়াপড়শীতে তখন একটা মহা শোরগোল পড়ে গেল।

এ সংবাদ ইমাম সাহেবের কর্ণে প্রবেশ মাত্র তিনি দৌড়ে তথায় উপস্থিত হলেন। ইমাম সাহেবকে দেখে লোকেরা তখন খামোশ হলো।

তিনি বললেন, "বুড়ো মিয়া, আরও তো ঘর রয়েছে। আপনি সেখানে যেয়ে আশ্রয় নিতেছেন না কেন?"

আগন্তুক ব্যক্তি বললেন, "এটা তো আমারই বাড়ী। আমার নাম ফারুখ।" বিবি তখন স্বামীর আওয়াজ চিনে ফেললেন। তিনি তখন ঘর হতে বাইরে এসে পিতা-পুত্রের মধ্যে পরিচয় করায়ে দিলেন। পিতা পুত্র তখন একের গলায় অপরে জড়ায়ে ধরলেন।

পরিস্থিতি শান্ত হবার পর স্বামী স্ত্রীকে টাকা পয়সা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। বিবি বললেন, "আমি এটা পরম যত্নের সাথে পুঁতে রেখেছি।"

ফররুখ সাহেব যখন মসজিদে নববীতে নামায পড়তে গেলেন, তখন সেখানে তাঁর পুত্রের মান-ইজ্জত ও প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখে সুখ-অশ্রুতে তাঁর গণ্ডস্থল ভিজে গেল। তিনি বাড়ী ফিরলে তাঁর বিবি বললেন, "আপনার কাছে এই পুত্র অধিক প্রিয়, নাকি আপনার ধন?"

তিনি বললেন, "আমার এই পুত্রের সাথে দুনিয়ার কোন ধন দৌলতেরই তুলনা হতে পারে না।"

বিবি তখন বললেন, 'এই পুত্রের শিক্ষাদানেই আমি সকল সম্পদ ব্যয় করেছি।'

শেখ-নির্বাচন

তখনকার দিনে প্রত্যেক ইমামেরই অসংখ্য শেখ থাকত। কিন্তু ইমাম মালেকের ব্যাপারে এটার অন্যথা দেখা যায়। লোকেরা তখন তাতে যথেষ্ট আশ্চার্যান্বিত হয়েছিল। কারণ অধিক শেখ থাকাও তখন একটা শুভ ও বরকতযুক্ত ব্যাপার বলে ধারণা করা হতো।

সাহাবাদের পর তাবেয়ীনদের জমানা আরম্ভ হয়। এটা দ্বিতীয় সর্বশ্রেষ্ঠ সময় ছিল। আর যদিও তখন জনসাধারণের চরিত্র তেমনভাবে পবিত্রতা, সভ্যতা ও বরকত হতে খালি ছিল না, তথাপি এমন লোকও তখন বিরল ছিল না যে, মিথ্যা বলতে তাদের প্রাণে তেমন কোন আপত্তি ঠেকিবে। এমন লোকও বিরল ছিলেন না যে, নিজের বৈরাগ্যের কল্যাণের এবং নিজেদের সহজ সরল মনোভাব থাকায় যে কোন বর্ণনাকারীকে তাঁরা সত্য বর্ণনাকারী বিবেচনায় নিজেদের কাছে আহ্বান করতেন।

এইরূপ নিজেরা অজ্ঞাতসারে মিথ্যার আশ্রয়দাতা হিসেবে গণ্য হবে। এমনও অসংখ্য রেওয়ায়েতকারী দেখা দিল যে, তারা নিজেরাই সেই রেওয়ায়েতের গুঢ়মর্ম অবগত থাকা দূরের কথা, সেই সম্বন্ধে তাদের মোটামুটি বুঝও ছিল না। ইমাম সাহেব এইজন্য খুব দেখে শুনে শেখ সাব্যস্ত করতেন।

ইমাম সাহেবের শেখ-নির্বাচন-বৈশিষ্ট্য

ইমাম সাহেব শুধু সেই সকল উস্তাদের কাছ হতে রেওয়ায়েত গ্রহণ করতেন যাঁদের উপযুক্ততা, সত্যতা, বুদ্ধিমত্তা ও বুজুর্গী সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না। তাঁদের স্মৃতিশক্তি প্রখর ও ফিকাহ সম্বন্ধে অগাধ জ্ঞান না থাকলে, তিনি কখনও তেমন লোকের মজলিসে বসতেন না। তিনি প্রায়ই বলতেন, "ফিকাহবিদ না হলে আমি কস্মিনকালেও কোন বুজুর্গের মজলিসে উপবেশন করতাম না।" ইমাম আহমদ বিন হাম্বল বলতেন, "এই বিশেষ গুণ হযরত ইমাম মালেকের চরিত্রে চরমভাবে প্রকাশ পেয়েছিল।

ইমাম সাহেব প্রায়ই বলতেন, "আমি এই মসজিদে নববীর খামের সন্নিকটে সত্তরজন শেখকে দেখেছি, রাসূল বলেছেন বলে তারা বলতেন। কিন্তু তাঁদের কোন একজনের কাছেও আমি কোনদিন বসিনি।" সময় সময় এমনও বলতেন, "মদীনায় এমনও বহু লোক ছিলেন, লোকেরা যাঁদের কাছ হতে এলম শিখত, কিন্তু আমি তাঁদের কাছ হতে কোন এলম শিখিনি।"

তখন অনেক প্রকারের লোকই দেখা যেত। কত লোক অজ্ঞাতসারে মিথ্যা বলত। অনেকে প্রকৃত জ্ঞানের খবরও রাখত না। আর অনেকে পূর্ণ মুর্খ ছিল।

আবদুল ওহ্হাব নামে ইমাম সাহেবের একজন নামকরা ছাত্র বলতেন, "ইমাম সাহেব বলছেন, মদীনায় এমন লোকও বহু রয়েছে, যাঁরা বৃষ্টির জন্য আল্লাহর কাছে দো'আ করলে, তাঁদের দো'আ কবুল হবে এবং তাঁরা বহু হাদীস এবং মাসআলাও অবগত রয়েছেন, কিন্তু আমি কখনও তাঁদের কাছ হতে কোন ফায়দা উঠাই নাই। কারণ তাঁরা শুধু মুত্তাকী ও জাহেদ সংসার বিরাগী ছিলেন। কিন্তু রেওয়ায়েত ও ফতোয়ার কাজ শুধু পরহেজগারী, বৈরাগ্য ও সরল অন্তঃকরণ থাকলেই চলে না। পরহেজগারীর সঙ্গে এলম এবং বুদ্ধিরও বিশেষ প্রয়োজন। রেওয়ায়েত ও ফতোয়ার কাজ সহজ ব্যাপার নয়। অজ্ঞ ও অসতর্ক লোকেরা কেয়ামতের দিবস অতি উত্তমরূপে এটার পরিণাম ফল জানতে পারবে।"

ইমাম মালেক ভাগিনা ইসমাঈল বলছেন, "আমি আমার মামুজীকে বলতে শুনেছি। এই এলমে হাদীসও দীন। কাজেই কার কাছ হতে তা শিক্ষা করা হয়েছে তা বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয়। আমি মসজিদে নববীত সত্তরজন লোককে বলতে শুনেছি। কিন্তু আমি তাঁদের কাছ হতে একটি অক্ষরও শিক্ষা করিনি। অথচ তাঁদের মধ্যে এমন একজনও ছিলেন না যে, তাঁদের কাছে লক্ষ টাকা আমানত রাখলে একটি কর্পদকও বিনষ্ট হবার আশঙ্কা থাকবে। কিন্তু বাস্তব সত্য এই যে, তাঁরা এ বিষয়ের জন্য উপযুক্ত লোক নয়।"

মুতাররফ বিন আবদুল্লাহ্ বলতেন, "আমি ইমাম সাহেবকে এরূপ বলতে স্বকর্ণে শুনেছি, "আমি এই শহরে বহু নেক ও সালেহ লোককে পেয়েছি। কিন্তু তাদের কাছ হতে হাদীস আমি শুনিনি।"

লোকেরা এটার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেন, "তারা যা কিছু বলেন, নিজেরাই এটার অর্থ বুঝেননি।"

ইরাকী রেওয়ায়েতকারী

ইমাম সাহেব কোন ইরাকী শেখ ছিলেন না। আবু মাসআব ইমাম সাহেবের একজন ছাত্র ছিলেন। তিনি বলছেন, "কোন এক ব্যক্তি ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আপনি ইরাকী লোকের কাছ হতে কোন রেওয়ায়েত গ্রহণ করেন না কেন?' তিনি জবাবে বললেন, 'আমি কিরূপে তাঁদের কাছ হতে রেওয়ায়েত গ্রহণ করতে পারি? আমি তাঁদেরকে দেখেছি যে, তাঁরা এমন লোকের কাছ হতে হাদীস শিক্ষা করেন, যাঁদের উপর কখনও কোন বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না।"

আবু মাসআবও এ সম্বন্ধে একমত যে, ইরাকী লোকেরা তাঁদের নিজেদের দেশেও এমন লোকের কাছ হতেই এলম শিখিয়া থাকেন।

শুয়াইব বিন হারবও ইমাম সাহেবকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে, তিনি জবাবে বলছিলেন, "আমাদের বুজুর্গগণও তাঁদের বুজুর্গদের কাছ হতে কোন রেওয়ায়েত গ্রহণ করি না।" মদীনার বাইরের শেখদের কাছ হতে গ্রহণ করতে হলে ইমাম সাহেব খুব দেখে শুনেই গ্রহণ করতেন। তবে ইরাকের অন্তর্গত বসরার অধিবাসী হযরত আইয়ুব সাহেবের কাছ হতে তিনি কতক রেওয়ায়েত গ্রহণ করেন। তিনি বিখ্যাত তাবেয়ী ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে সাঈদ বহু উচ্চ প্রশংসা করেছেন। হযরত শুয়বা তাঁকে সাইদুল ফুকহা বলছেন। রেজাল কিতাবেও তাঁকে নামজাদা ইমামদের মধ্যে একজন বলা হয়েছে।

ইমাম সাহেব বলছেন, "আমি হজ্বের মৌসুমে তাঁকে মক্কা শরীফে দুই হজ্বে দুইবার দেখেছি। কিন্তু তাঁর কাছ হতে কোন হাদীস লিখিনি। তৃতীয় বছর আমি তাঁকে জমজম কূপের নিকটবর্তী স্থানে সমাসীন দেখতে পেলাম। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নাম শুনামাত্র তিনি এরূপ রোদন করতে লাগলেন যে, তাঁদের প্রতি আমি পরম শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠলাম। তাঁর এই অবস্থা দেখবার পর হতে আমি তাঁর কাছ হতে হাদীস লিখতে আরম্ভ করি।"

দাদা ও সাত ফকীহ্ থেকে রেওয়ায়েত না করার কারণ

ইমাম সাহেবের দাদা মালেক বিন আবি আমের যখন মৃত্যুমুখে পতিত হন তখন ইমাম মালেকের বয়স বার তের বছর। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ইমাম সাহেব তাঁর কাছ হতে কোন হাদীস গ্রহণ করেননি। সাত ফকীদের মধ্যে সালেম বিন আবদুল্লাহ্ যখন হিজরী একশত সনে মৃত্যুমুখে পতিত হন, তখন ইমাম সাহেবের বয়স ষোল। সুলাইমান বিন এয়াসের হিজরী ১০৭ সনে ইন্তেকাল করেন। তখন ইমাম সাহেবের বয়স তেইশ। তথাপি অন্য কোন মধ্যস্থতা ব্যতীত তিনি তাঁদের কারও কাছ হতে কোন রেওয়ায়েত গ্রহণ করেননি। এটার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে ইমাম সাহেব বলছেন যে, মদীনাতে আমি এমনও বহু লোক দেখেছি যে, তাঁরা একশত বছর বা একশত পাঁচ বছর পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। কিন্তু এরূপ বৃদ্ধ লোকের কাছ হতে কোন রেওয়ায়েত নেয়া চলে না। আর যদি রেওয়ায়েত নেয়া হয়, তবে তাতে দোষ-ত্রুটিও থেকে যেতে পারে।

এটা অতি খাঁটি সত্য কথা কারণ বার্ধক্যে স্মৃতিশক্তি ও বুদ্ধি যে হ্রাস পেতে পারে কে তা অস্বীকার করতে পারে? ইমাম সাহেবের সতর্কতা ও সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিণাম এরূপ দাঁড়াল যে, ইমাম মালেক যাঁর কাছ হতে রেওয়ায়েত গ্রহণ করতেন, তাঁকে এরূপ বিশ্বাসযোগ্য ও ন্যায়পরায়ণ মনে করা হতো যে, হাদীস শাস্ত্রের ইমাম এয়াহয়া বিন মঈন বলেন, "আমরা ইমাম মালেককে সম্মুখে রেখে সবকিছু কাজ করে যেতাম। আমরা তাঁকেই প্রতি পদক্ষেপে অনুসরণ করতাম। যখনই কোন শেখের নাম আমাদের সম্মুখে পেশ হতো, তখন আমরা লক্ষ্য করতাম যে, ইমাম মালেক তাঁর কাছ হতে কোন রেওয়ায়েত গ্রহণ করেছেন কিনা। তিনি যদি তাঁর কাছ হতে কোন রেওয়ায়েত নিয়ে না থাকতেন, তবে আমরাও সেই শেখের কাছ হতে কোন রেওয়ায়েত গ্রহণ করতাম না। আর তিনি তাঁর রেওয়ায়েত নিয়ে থাকতেন, তবে আমরাও সেই শেখের কাছ হতে কোন রেওয়ায়েত গ্রহণ করেছেন কিনা। তিনি যদি তাঁর কাছ হতে কোন রেওয়ায়েত নিয়ে না থাকতেন, তবে আমরাও সেই শেখের কাছ হতে কোন রেওয়ায়েত গ্রহণ করতাম না। আর তিনি তাঁর রেওয়ায়েত নিয়ে থাকলে, আমরা তা গ্রহণ করতে বিন্দুমাত্রও সঙ্কোচ বোধ করতাম না।"

হযরত আহমদ বিন হাম্বলের কাছে কোন এক ব্যক্তি জনৈক রাবী সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেন, "আমার বিবেচনায় তিনি গ্রহণযোগ্য; কেননা, ইমাম মালেকও তাঁর কাছ হতে রেওয়ায়েত গ্রহণ করছেন।"

ইমাম মালেকের স্মৃতিশক্তি স্বভাবতঃ অত্যন্ত প্রখর ছিল। তিনি নিজেই বলছেন, "কোনকিছু আমার মস্তিষ্কে একবার স্থান পেলে চির জীবন আমি তা আর ভুলিনি।" অন্যান্য লোকেরাও তা অম্লানবদনে স্বীকার করতেন।

ইমাম মালেকের উস্তাদ হযরত রবীয় একদিন ইমাম সাহেব সহ ইমাম জহুরীর মজলিসে যোগদান করেন। সেইদিন ইমাম জহুরী চল্লিশের চেয়ে অধিক হাদীস বর্ণনা করেন। দ্বিতীয় দিবসও মজলিস আরম্ভ হয়ে গেল। ইমাম মালেক সেইদিনও উস্তাদের সঙ্গে তাতে যোগদান করলেন।

ইমাম জহুরী বললেন, "কিতাব নিও। আমি কিতাব দেখে বর্ণনা করব। আমি গতকাল তোমাদেরকে যে কয়েকটি হাদীস শুনিয়েছিলাম, তাতে তোমাদের কতটুকু উপকার লাভ হয়েছে আমি তাই আজ পরীক্ষা করব।" হযরত রবীয় বললেন, এই মজলিসে এমন এক ব্যক্তি আছেন যে, গতকল্যকার বর্ণিত সব কয়টি হাদীস মৌখিক বর্ণনা করতে পারবেন। "হযরত জহুরী বললেন, "তিনি

কে?" হযরত রবীয় বললেন, "তিনি ইবনে আবি আমের।" ইমাম জহুরী ইশারা করলেন, ইমাম মালেক গতকল্যকার বর্ণিত সব কয়টি হাদীস মৌখিকভাবে বর্ণনা করলেন। ইমাম জহুরী আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন, "আমার ধারণা ছিল যে, আমি ব্যতীত অপর কারও এ সকল হাদীস এয়াদ নাই।"

জ্ঞান-স্পৃহা ও উদার হৃদয় অতি কম ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়। ইমাম বোখারীর জীবনে এমন এক ঘটনা ঘটেছিল যে, বনের ফল ব্যতীত তিন দিন পর্যন্ত অন্য কিছুই আহার করেননি। সেইদনি তাঁর জীবনের এক অতি বড় দিন ছিল। ইমাম মালেকও এ বিষয়ে পশ্চাদপদ ছিলেন না। তাঁর জীবনেও অভাব এইরূপ প্রকটরূপে দেখা দিয়েছিল যে, জঙ্গল হতে কাষ্ঠ কেটে বাজারে বিক্রয় করে তাঁকে জঠর জ্বালা নিবারণ করতে হয়েছে। তথাপি ইমাম সাহেব এলমের খেদমত করতে সঙ্কোচ বোধ করনেনি। এই জন্যই ইমাম সাহেব বললেন, "দারিদ্র্য নিষ্পেষিত না হওয়া পর্যন্ত কেউই কায়মনোবাক্যে জ্ঞান-শিক্ষা ও জ্ঞান দানে আত্মনিয়োগ করতে পারে না। তখন যদি সেই ব্যক্তি জ্ঞান-শিক্ষা ও বিস্তারের প্রতি অধিক মনোযোগ প্রদান করতে পারেন, তবেই বুঝা যাবে যে, তাঁর জ্ঞান স্পৃহা মৌলিক ও অদম্য।"

এলমের খাতিরে তিনি হজ্বের মৌসুম ব্যতীত অন্য কোন সময়ই মদীনার বাইরে যেতেন না। কিন্তু তাতে কেউ কেউ যেন এইরূপ মনে না করেন যে, তজ্জন্য তাঁকে কোন কষ্ট স্বীকার করতে হয়নি।

হযরত ইবনে সাঈদ বলছেন, ইমাম মালেক ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় হযরত নাফেয় সাহেবের খেদমতে উপস্থিত হতেন। সেখান হতে রৌদ্রে পুড়ে তাঁকে বাড়ী পৌছতে হতো। হযরত ইবনে হরমুজ নামে মদীনায় একজন ফকীহ ছিলেন। তাঁর কাছে অধ্যয়ন কালে ইমাম সাহেব সকালে ওস্তাদের কাছে যেতেন এবং সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরতেন।

উস্তাদরূপে ঃ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, ইমাম সাহেবের জ্ঞান ও সাধনার প্রতি জনসাধারণের কিরূপ গভীর শ্রদ্ধা ছিল। তাঁর উস্তাদ জীবিত থাকতেই তিনি শিক্ষাদান কার্যে ব্রতী হন। তিনি হিজরী ১৩৬ সালে ফিকাহ ও ফতোয়ার কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হন। তখনও তাঁর উস্তাদ হযরত রবীয় জীবিত ছিলেন। আর উস্তাদের মৃত্যুর পর তাঁর গুরুত্ব সমধিক বৃদ্ধি পেল। ইবনে লহীয়াহ একজন শেখ ও মুহাদ্দেস ছিলেন। তিনি মদীনার শেখ আবুল আসওয়াদ নয়ীম বিন আরওয়া বিন জুবায়রকে জিজ্ঞেস করলেন, "হযরত রবীয়ের পরে মদীনায় ফিকাহ ও

এজহেতাদের কে নেতৃত্ব করবেন?" জবাবে তিনি বললেন, "নও-জোয়ান ইমাম মালেক তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন।"

হযরত ইবনে ওমরের মজলিস্

হাদীস শাস্ত্রে ইমাম সাহেবের বিশিষ্ট উস্তাদ ছিলেন, হযরত নাফেয় মওলা ইবনে ওমর (রাঃ)। হযরত আবদুল্লাহ্ বিন ওমর (রাঃ) সাহাবাদের মধ্যে হযরত (সাঃ)-এর আমল ও সুন্নত সম্বন্ধে সবচেয়ে অধিক ওয়াকিফহাল ছিলেন। আমীর মায়াবিয়া (রাঃ) এবং হযরত আলী কররমল্লাহু ওয়াজহাহুর মধ্যে মন কষাকষি দেখা দিলে, অনেকের অভিমত এই ছিল যে হযরত ইবনে ওমরকেই (রাঃ) খলীফা পদে বরণ করে নেয়া হোক।

তিনি বললেন, "এমন খেলাফত যাতে একবিন্দু রক্তপাত করবারও প্রয়োজন হতে পারে, তা কস্মিনকালেও আমার কাম্য নয়।"

প্রায় সাহাবাই বলতেন যে, হযরতের ইন্তেকালের পর হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) ব্যতীত প্রায় সকলেই কিছু না কিছু পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। হযরত (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) ষাট বছর পর্যন্ত হাদীস, ফিকাহ, ফতোয়া এবং ওয়াজ নসীহতের প্রাণকেন্দ্রস্বরূপ ছিলেন।

হযরত নাফেয়ের মজলিস্

হযরত নাফেয় পূর্ণ ত্রিশ বছর কাল হযরত ইবনে ওমরের (রাঃ) সঙ্গে দিবারাত্র দেশ বিদেশ এবং নির্জন ও লোকালয়ে বসে কাটিয়ে দেন। হযরত ইবনে ওমরের (রাঃ) ইন্তেকালের পর তিনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। হিজরী ১১৭ সনে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইমাম মালেক অন্ততঃপক্ষে বার বছর হযরত নাফেয় সাহেবের খেদমতে অতিবাহিত করেন।

ইমাম মালেকের মজলিস্

হযরত নাফেয়ের মৃত্যুর পর ইমাম মালেক তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। হযরত শুয়বা কুফার সর্বশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দেস ছিলেন। তিনি বলেন, "আমি হযরত নাফেয়ের মৃত্যুর পর মদীনায় এসে দেখলাম যে, ইমাম মালেক ধর্ম জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ পদে সমাসীন রয়েছেন।" এই ঘটনা দ্বারা বুঝা যায় যে, ইমাম সাহেব হিজরী ১১৮ সনে তাঁর শিক্ষা-মজলিস্ কায়েম করেন।

ইমাম সাহেবের শিক্ষা-মজলিস্ সর্ব সময়েই অত্যন্ত মূল্যবান আসবাব পত্রে সুসজ্জিত থাকত। হাদীস-ক্লাস যখন আরম্ভ হতো, তখন বহু সুগন্ধি দ্রব্য জ্বালান হতো। ইমাম সাহেব এক উচ্চাসনে সমাসীন থাকতেন। সেই মজলিসে এত অসংখ্য লোকের সমাবেশ হতো যে, তিল ধরবার স্থানও পাওয়া যেত না। হাদীসে নববী বয়ান করার পালা আসলে ইমাম সাহেব অজু গোসল করে অতি উত্তম মূল্যবান পোশাক পরিধান করতেন। তখন তিনি কেশ বিন্যাশ ও খোশবু ব্যবহার করতেন। এই সকল কর্তব্য পালন করার পর এলমী মজলিসের সভাপতিত্ব করার জন্য ইমাম সাহেব বাড়ী হতে বের হতেন।

শ্রোতৃবর্গ তখন অবনত মস্তকে নীরবে বসে যেতেন। এমনকি ইমাম আবু হানীফা সাহেবও যখন সেই শিক্ষা মজলিসে যোগদান করতেন, তখন তিনিও তদ্রূপ বিনীতভাবেই সেখানে বসে যেতেন। সভায় পবিত্র নীরবতা বিরাজ করত।

ইমাম শাফেয়ী বলেন, "আমরা কিতাবের পাতাও অতি সতর্কভাবে উল্টাতাম যেন এটার আওয়াজে সভার নীরবতা বিনষ্ট না হয়।" এই সকল নিয়ম-নিষ্ঠা ও শান-শওকত দেখে রাজ-দরবারও এটার কাছে ম্লান হয়ে যেত।

ছাত্রদের মহা ভিড়, ফতোয়ার জবাব, প্রার্থীদের শুভ আগমন এবং ওলামা-সমাগম এবং গেইটে গাড়ী-ঘোড়ার আমদানী দেখে লোকদের তাক লেগে যেত।

সেই শিক্ষা-মজলিসের প্রশংসা করতে যেয়ে এক কবি বলছেন, "ইমাম সাহেব যদি জবাব না দিতেন, তবে তাঁরা প্রভাব-প্রতিপত্তির দাপটে কেউই কোন প্রশ্ন করতে সাহস পেত না। প্রশ্নকারী প্রশ্ন করবার পর অবনত মস্তকে তা শুনে যেত। তিনি এইরূপ গুরুগম্ভীর ছিলেন যে, তাঁর গাম্ভীর্যের প্রতি সকলেরই গভীর শ্রদ্ধা ছিল। তেজ ও প্রভা তাঁর এমনই প্রদীপ্ত ছিল যে, তাঁর সাথে অপর কারও কোন তুলনাই হতে পারে না।"

লোকেরা তাঁকে ভয় করত; অথচ তাঁর মাথায় কোন রাজমুকুট ছিল না। হ্যাঁ, একথা সত্য যে, তাঁর হাতে কোন রাজদণ্ড ছিল না! এবং একথা অধিক সত্য যে, রাজদণ্ডের অধিকারীরা তাঁর খেদমতে এসে বিনীত ভদ্রভাবে উপবিষ্ট থাকতেন।

খলীফা হারুণুর রশীদ যখন মদীনায় আসলেন, তখন তিনি 'মুয়াত্তা' কিতাবের ব্যাখ্যা শুনবার বাসনা জ্ঞাপন করলেন। ইমাম সাহেব বললেন, "আগামীকল্য এ সম্বন্ধে আলোচনা হবে।"

হারুণুর রশীদের ধারণা ছিল যে আগামীকল্য ইমাম সাহেব খলীফার দরবারে হাজির হবেন। তৎপরবর্তী দিবস ইমাম সাহেব নিয়মিতভাবে নিজ

শিক্ষা-মজলিসেই শিক্ষা দান আরম্ভ করলেন। হারুণুর রশীদ এ সম্বন্ধে সবিশেষ জানতে চাইলে ইমাম সাহেব বললেন, "এলমের কাছে লোক আসবে; কিন্তু লোকের কাছে এলম আসবে না।'

খলীফা হারুণুর রশীদের সবকিছু শান-শৌকত থাকা সত্ত্বেও ইমাম সাহেবের খেদমতে হাজির হতে হলো। সেই মজলিসে সাধারণ শ্রোতা ও অসাধারণ শ্রোতার কোন পার্থক্য ছিল না। হারুণুর রশীদ পরিবেশে সেই দরবারে উপস্থিত হওয়া স্থির করলেন। তিনি তখন জনসাধারণকে সেই মজলিস হতে বের করে দিতে বললেন। ইমাম সাহেব বললেন, "ব্যক্তিগত পছন্দের কল্যাণে জন কল্যাণ বরবাদ করা চলে না।" আল্লাহ্ আকবর! তাদের রূহ কত পাক-পবিত্র ছিল!

শিক্ষা-মজলিস

হাদীসের চর্চা ও লেখাপড়া মসজিদে নববী ও শিক্ষা-মজলিসের বাইরে করা হতো না। হারুণুর রশীদ খলীফার শিবিরে হাদীসের চর্চা শুনবার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। কিন্তু ইমাম সাহেব তা অস্বীকার করলেন।

ত্বরা সহকারে বা কোন কাজে ব্যস্ত থাকলে বা রাস্তায় চলবার সময় তিনি হাদীস বয়ান করতেন না। এটাকে তিনি আদবের খেলাফ মনে করতেন। আর এটা বাস্তব সত্য যে, কোন কিছু পরিপূর্ণরূপে শ্রবণ করতে হলে ও বুঝতে হলে, শান্তি ও পূর্ণ আন্তরিকতার প্রয়োজন। ইমাম সাহেব এ সকলের প্রতি পূর্ণ গুরুত্ব প্রদান করতেন।

ওলামাদের মজলিসে জোরে জোরে কথা বলাও আদবের খেলাফ। খলীফা মনসূর কোন এক সময় ইমাম সাহেবের মসজিদে তর্ক বিতর্ক কালে তাঁর আওয়াজ অত্যন্ত উচ্চ হয়ে যায়। ইমাম সাহেব তখন শাসালেন এবং নিম্নলিখিত আয়াত পাঠ করলেন। "পয়গম্বরের আওয়াজের চেয়ে তোমাদের আওয়াজ অধিক উচ্চ করিও না।"

ইমাম সাহেবের অভ্যাস এই ছিল যে, ফজরের নামাযের পর সূর্য উদয় পর্যন্ত তিনি নামাযের বিছানাতেই দরুদ শরীফ ও অজিফা ইত্যাদি আদায় করতেন। সূর্যোদয়ের পরই লোক সমাগম আরম্ভ হয়ে যেত। ইমাম সাহেব তখন লোকজনের দিকে মনোযোগ দান করতেন। প্রথমে তিনি দুই চারজনের মঙ্গলামঙ্গল জিজ্ঞেস করতেন। মজলিসের ধারা এইরূপ ছিল যে, খুব মেধাবী, বুদ্ধিমান, ও সমমর্যাদার কতিপয় ছাত্র তাঁর পাশে উপবেশন করতেন। সভার

প্রারম্ভে এটাও বলে দেয়া হতো, "জ্ঞান-চাতক ও সমমর্যাদাগণ সন্নিকটে এসে বসুন।"

ইমাম সাহেব আস্তে আস্তে ও গুরু-গম্ভীর আওয়াজে বক্তৃতা করতেন। এক হাদীস শেষ না করে অন্য হাদীস তিনি আরম্ভ করতেন না।

ভিন্ন ভিন্ন শেখ ভিন্ন ভিন্ন ধারায় শিক্ষা প্রদান করতেন। অধিকাংশ শেখের এই অভ্যাস ছিল যে, তাঁরা বিশিষ্টস্থানে বসে যেতেন বা দণ্ডায়মান হতেন। ছাত্রবৃন্দ যথাসময়ে দোয়াত-কলম নিয়ে বসে যেত। শেখ সাহেব মৌখিকভাবে বা স্বরচিত লেখা বা হাদীস হাতে নিয়ে বক্তৃতা দিতেন। ছাত্রগণ তা লিপিবদ্ধ করত। সভায় যদি লোক-সমাগম অত্যধিক হতো তবে কিছু দূর দূর নকীব নিযুক্ত করা হতো। নকীব হুবহু সেই শব্দগুলো শ্রোতাদের কর্ণে পৌছে দিতেন। ইমাম মালেকও সময় সময় এইরূপভাবে শিক্ষা দান করতেন। ইবনে আলীয়া নামে ইমাম সাহেবের জনৈক ছাত্র তাঁর নকীবরূপে নিযুক্ত হন।

অধিকাংশ শেখের নিয়ম এই যে, নিজেদের হাদীস, ফতোয়া এবং রচনা লিপিবদ্ধ করে নিতেন বা কোন কোন বুদ্ধিমান ও মেধাবী ছাত্রকে লিখবার আদেশ দিতেন। সেই লিপিবদ্ধ কপি নকলকারীর হাতে দেয়া হতো এবং মজলিসে তা পাঠ করে শুনান হতো।

শেখ মাঝে মাঝে এতে বিস্তৃত ব্যাখ্যা শুনায়ে দিতেন। নকলকারীর কোন কোন স্থানে ভুল হলে, শেখ তা সংশোধন করে দিতেন। ইমাম সাহেবের নকলকারীর নাম ছিল ইবনে হাবীব। তিনি একজন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দেস ছিলেন। মায়ান বিন ঈষাও কখন কখন ইমাম সাহেবের নকল নবীসের কাজ করতেন।

ইমাম সাহেব কঠোর ভাবে এই সকল বিধি-বিধান মেনে চলতেন। এয়াহয়া বিন সালাম তাতে অসন্তুষ্ট হয়ে মজলিস হতে উঠে চলে যেতেন। তিনি বলতেন, "শেখ নিজে পাঠ করে শুনান না। ছাত্রগণ কর্তৃক পাঠ করায়ে শুনায়ে থাকেন।" আজ দীর্ঘকালের পরও মাদ্রাসায় একই নিয়ম পদ্ধতি পরিদৃষ্ট হয়েছে।

উক্ত তরীকার মাহাত্ম্য

মদীনাবাসী শেখদের এই সকল কতিপয় শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। জনসভার কোন লোক যখন কোনকিছু বলতে দণ্ডায়মান হয়, তখন বহুলোকের বহু মতামত ও পছন্দ অপছন্দ থাকায় তা বলবার কায়দার উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করে থাকে। আর বহু ক্ষেত্রে সময় ও সুযোগ অনুযায়ী কথাও বলতে হয়। কিন্তু পূর্বে যদি তা

লিপিবদ্ধ করা হয়, তখন শান্তমধুরভাবে, স্থির ধীর মস্তিষ্কে কারও কোন পরোয়া না করেই সবকিছু লিপিবদ্ধ করে নেয়ে যায়। আর মুহাদ্দেস যদি নিজে কেরআত না পড়ে অপরের দ্বারা পাঠ করান, তবে দ্বিতীয় দফা নিজের পাণ্ডুলিপিকে শুদ্ধ করে নেয়ার সুযোগ মিলে। কারণ নিজের লেখা নিজে পাঠ করলে, প্রায়ই দেখা যায় যে, নিজের স্মৃতি-শক্তির কল্যাণে উচ্চারণ ও দৃষ্টিতে ভুল ধরা পড়ে না। দ্বিতীয় সুবিধা এই যে, অপর লোককে বারংবার একই সতরের মধ্যে থামতে হয়। তাতে লেখক নিজকে সংশোধন করবার সুবর্ণ সুযোগ পান। কিন্তু এটার চেয়ে অপর একটি সুবিধা এই যে, প্রায় অধিকাংশ মুহাদ্দেস ও ফকীহই হাদিসাবলী ও তাফসীর বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে নিজস্ব তথ্য সংগ্রহ, অভিমত ও ব্যাখ্যা সুদীর্ঘভাবে আলোচনা করে থাকেন।

ইমাম জহুরী ও উক্ত পন্থা অবলম্বনকারী ছিলেন। কিন্তু এতে অসুবিধা এই যে, প্রায় ছাত্রই মূল বিষয় এবং এটার শাখা প্রশাখার পার্থক্য বুঝতে পারে না। মতন, ও হাদীস ও শেখের কালামের মধ্যে কোন্‌টা কি তা বুঝে উঠে সম্ভবপর হবে না। এ সম্বন্ধে ইমাম মালেক অতি উত্তম পন্থা অবলম্বন করছেন। মূল বস্তু কাতেব পাঠ করে শুনতেন। আর এটার ব্যাখ্যা ও অন্যান্য সবকিছু প্রসঙ্গ ইমাম সাহেব নিজ মুখে বলে দিতেন। এটাতে শ্রোতৃবর্গের মূল বস্তু এবং শাখা-উপশাখা স্বাচ্ছন্দে হৃদয়ঙ্গম করতে কোন প্রকার অসুবিধা হতো না।

মদীনা-তো এক দিক দিয়ে ইসলামের দোলনা শয্যা ছিল এবং বংশানুক্রমে এটা এলমে দীনের প্রাণকেন্দ্ররূপে বিবেচিত হয়ে আসছিল। এটার উপর বিশেষত্ব এই যে, মদীনাবাসী এলমের সাথে বংশানুক্রমে বরাবর সম্বন্ধ রেখেই চলে এসেছি। এই সকল গুণাবলীর উপরে ও ইমাম সাহেবের ব্যক্তিত্ব মদীনাকে মুসলিম সাম্রাজ্যে এক অদ্বিতীয় গুরুত্ব পরিপূর্ণ দেশে পরিণত করে।

ছাত্র ও ভক্তদের মজলিস

তাঁর শিক্ষা-মজলিস কিরূপ লোক পয়দা করেছিল? আর এই সাধারণ কল্যাণ সমাজের কোন্ স্তর পর্যন্ত পৌঁছেছিল? তাঁর ছাত্র ভক্তদের সংখ্যা ও কার্যকলাপ দেখলে এটা সঠিকভাবে অনুমান করা সম্ভবপর হবে। মুহাদ্দেস জাহবী বলছেন, "ইমাম মালেক হতে এত লোক রেওয়ায়েত করেছেন যে, তাঁদের সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভবপর নয়। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে এমন কতকও রয়েছেন, যাঁরা অন্যান্য আলেমদের মজলিস হতেও জ্ঞান গরিমা ও ব্যুৎপত্তি লাভ করেছেন।"

তাঁর ছাত্র ও ভক্তদেরও এমন কতকগুলো বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তাতেই বুঝা যাবে কতসংখ্যক লোক, কোন্ শ্রেণীর লোক এবং কোন্ স্তরের লোক তাঁর ছাত্র এবং ভক্তদের দলে ভিড়লেন। অপরাপর কোন মুহাদ্দেস ও ফকীহদের ভাগ্যে এত সংখ্যক ছাত্র কখনও জোটে নেই। কোরআনে-পাকে বলা হয়েছে।

ছাত্র-সংখ্যা

অধিকাংশের গণনা মতে তাঁর ছাত্র-সংখ্যা ছিল তের শতের চেয়েও অধিক। ইমাম বোখারী সাহেবের ছাত্র-সংখ্যা ছিল নয় হাজার। কিন্তু ইমাম মালেক সাহেবের উপযুক্ত ছাত্রদের সংখ্যা বেশী ছিল।

ফকীহ ও মোহাদ্দেসের পার্থক্য

একজন মুহাদ্দেসের চেয়ে একজন মুফতী ও ফকীহের কর্তব্য সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। মুহাদ্দেস একটি মূলধনের অধিকারী। ফকীহকে সেই মূলধন নিয়ে বাস্তব-জগতে ঝাঁপায়ে পড়তে হয়। তাঁকে খড়-কুটার পার্থক্য হুকুম আহকামের বিস্তৃত ব্যাখ্যা, জনগণের বৈশিষ্ট্য, জনগণের প্রতি বিশিষ্টদের নির্দেশ, গুঢ়তত্ত্ব-উদ্ধার, বন্দীকে মুক্ত করা, নাসেখ ও মনসুখের পার্থক্য, ফরজ সুন্নত ও মুস্তাহাবের শ্রেণী বিভাগ, অস্পষ্ট আদেশাবলী সম্বন্ধে কেয়াস, আদেশাবলীর ত্রুটি ও মঙ্গলের অনুসন্ধান, শরীয়তের আদেশ প্রচারের সময় মানুষের স্বাভাবিক দাবীর প্রতি লক্ষ্য রাখা, শাসক ও শাসিতের বিধি-বিধান,—এই সকল হলো ফকীহ ও মুফতীদের সাধারণ কর্তব্য। মুহাদ্দেসকে শুধু হাদীস নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হয়। অন্যকিছুতে তত মাথা ঘামাতে হয় না।

নবীজীর জমানা

হযরতের (সাঃ) জমানায় মুসলমানদের সংখ্যা ষাট হাজার হতে এক লাখের মত ছিল বলে অনুমান করা হয়। তন্মধ্যে শুধু মদীনায় ত্রিশ হাজার লোক বাস করতেন। অবশিষ্ট লোক বাহরাইন, এয়মন, মক্কা ও তায়েফ ইত্যাদি আরবের বিভিন্ন শহরসমূহে বসবাস করতেন।

আসহাবে সুফফা

মদীনা হতে অন্যান্য শহরবাসীদের হেদায়তের নিমিত্ত ফকীহদেরকে প্রেরণ করা হতো। তন্মধ্যে প্রায় ফকীহই আসহাবে সুফ্ফার অন্তর্গত ছিলেন। ফকীহদের

মধ্যে দুই একজন হযরত (সাঃ) নিজের কাছে রেখে ধর্ম সম্বন্ধে শিক্ষা দান করে তাঁদেরকে অন্যত্র প্রেরণ করতেন। মদীনার সুধীবৃন্দ বলছেন, হযরত (সাঃ)-এর জমানায় ত্রিশ হাজার মুসলমান মদীনায় বসবাস করতেন। তন্মধ্যে একশত বা এক শতের বা কাছাকাছি সাহাবা মসজিদে নববীতে এলম শিক্ষা করার নিমিত্ত দিবারাত্র পড়ে থাকতেন। হযরতের (সাঃ) ইন্তেকালের পর ৪৪৪ বছর বা ৪৫ বছর পর্যন্ত মদীনা সমগ্র মুসলিম জাহানের প্রাণ কেন্দ্র ছিল। মদীনায় সর্বপ্রকার হুকুম-আহকাম ও ফতোয়ার মীমাংসা করা হতো। সাহাবাদের প্রায় সকলেই মদীনায় অবস্থান করতেন।

সাহাবা ফকীহদের শ্রেণী বিভাগ

সাহাবাদের মধ্যে ওমর বিনেল খত্তাব (রাঃ) আলী বিন আবি তালেব (রাঃ), আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাঃ), উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ), জায়েদ বিন সাবেত (রাঃ), আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাঃ) এবং আবদুল্লাহ্ বিন ওমর (রাঃ) এই ছয়জন সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁদের ফিকাহ, ফতোয়া, এবং আদেশাবলী সম্বন্ধে পৃথকভাবে লিখতে গেলে এক বিরাট কিতাবের দরকার হবে।

নিম্নলিখিত সাহাবাগণ ও ফিকাহ শাস্ত্রের সুপণ্ডিত ছিলেন না। তাঁদের ফতোয়া, আহকাম ও তর্ক-বিতর্ক লিপিবদ্ধ করলেও এক একটি পুস্তকাকারে পরিণত হবে। তাঁরা সংখ্যায় প্রায় বিশজন ছিলেন। নিম্নে তাঁদের নাম দেয়া হলো। আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ), উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালমা (রাঃ), আনাস বিন মালেক (রাঃ), আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ), আবু হুরাইরা (রাঃ), ওসমান বিন আফ্ফান (রাঃ), আবদুল্লাহ্ বিন ওমর বিনেল আছ (রাঃ), আবদুল্লাহ্ জুবাইর (রাঃ), আবু মুসা আশআরী (রাঃ), সঈ'দ বিন আবি আককাস (রাঃ), সালমান ফারসী (রাঃ), জাবের বিন আবদুল্লাহ্ (রাঃ), মায়াজ বিন জবল (রাঃ), জুবাইর বিনেল আওয়াম (রাঃ), আবদুর রহমান বিন আউফ (রাঃ), ইমরান বিন হাসান (রাঃ), এবং মোয়াবিয়া বিন আবি সুফিয়ান।"

মদীনায় ও মদীনার বাইরে সাহাবাগণ

হযরত আলী (রাঃ) তাঁর খেলাফতের চারটি বছর কূফায় অতিবাহিত করেন। তখন হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) ও তাঁর সাথে ছিলেন। ফেৎনার পরে হযরত আনাস (রাঃ) এবং ইবনে মাসউদ (রাঃ) শেষ বয়সে কূফায় চলে যান।

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাঃ), হযরত আলীর (রাঃ) খেলাফতের সময় বসরার ওয়ালীরূপে নিযুক্ত হন। খেলাফতের সময় হযরত ইবনে জুবাইর (রাঃ) মক্কা ও তায়েফে অবস্থান করেন। আমীর মায়াবীয়া (রাঃ) বরাবরই শাম দেশেই অবস্থান করছিলেন। এতদ্ব্যতীত উপরে বর্ণিত অন্যসব সাহাবা মদীনাতুয়সুলে কালাতিপাত করতেন।

তাবেয়ীনদের স্থান

সাহাবাদের পরেই তাবেয়ীনদের স্থান। তাবেয়ীনদের মধ্যে বহু মোহাদ্দেস ছিলেন। ইমাম মালেকের শেখদের তালিকাতে তাঁদের অনেকের নামই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ফকীহদের মধ্যে সর্ব প্রসিদ্ধ ছিলেন' খারেজা বিন জাইদ বিন সাবেত (রাঃ), সালেম বিন আবদুল্লাহ্ বিন ওমর বিন খত্তাব (রাঃ), কাসেম বিন আবিবকর সিদ্দীক (রাঃ), আরওয়া বিন জুবাইর (রাঃ), ওবায়দুল্লাহ বিন ওতবা (রাঃ), আবু বকর বিন হারেস (রাঃ), সুলাইমান বিন ইয়াসের (রাঃ), আবু সলমা, আবু বকর বিন আবদুর রহমান (রাঃ), আবু বকর বিন ওমর (রাঃ), খলীফা ওমর বিন আবদুল আজীজ (রাঃ) এবং সাঈদ বিন মুসাইব (রাঃ)। তাঁরা সকলই তখন মদীনায় অবস্থান করতেন। তাঁদের সম্মিলিত দরবারে সর্বপ্রকার ঝড়গা-বিবাদ, আহকাম ও ফতোয়ার মীমাংসা হতো।

হযরত ওমর বিন আবদুল আজীজ (রাঃ) যখন মদীনার রক্ষকরূপে নিযুক্ত হন, তখন তিনি এই মজলিসকে অধিকতর শক্তিশালী ও সুপরিচালিত করেন। তিনি আরওয়া বিন জুবাইর (রাঃ), ওবাইদুল্লাহ বিন ওতবা (রাঃ), আবু বকর বিন আবদুর রহমান (রাঃ), আবু বকর বিন সুলায়মান (রাঃ), সুলায়মান বিন ইয়াসের (রাঃ), কাসেম বিন মুহাম্মদ এবং সালেম বিন ওবাইদুল্লাহ (রাঃ)-কে আহ্বান করে স্বীয় পরামর্শ সভার সভ্য নিযুক্ত করলেন। এই পরামর্শ-সভার রায় অনুযায়ী তখন সবকিছু ব্যাপার মীমাংসা হতো। উক্ত পরামর্শ সভা অধিকাংশ হযরত ওমরের (রাঃ) আইন অনুযায়ীই পরিচালিত হতো। কেননা, ফারুকে আজমের জমানায় বহু রাজ্য মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায়, তখন নব নব সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল এবং ফারুকে আজকের শাসনে সবকিছু সমস্যার সমাধানও সাহাবা ফকীহদের দরবারেই ফারুকে আজমের জমানায় এই সকল সমস্যার সমাধান হতো। ওমর ইবনে আবদুল আজিজের (রাঃ) জমানায়ও সেই ফারুকী অনুশাসন বিপুলভাবে গ্রহণ করা হয়েছিল।

মালেকী-ফিকাহ্

মদীনার সেই ফিকাহর উপর ভিত্তি করেই ইমাম মালেকের ফিকাহর ভিত্তি পত্তন হয়। শাহ্ ওলীউল্লাহ্ সাহেব 'মসওয়া' কিতাবের উপক্রমণিকায় লিখেছেন, "ইমাম মালেক সাহেবের ফিকাহকে হযরত সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের ছায়া বলে মনে হয়।" নবী-রাসূলদের গন্ধে এটা ভরপুর ছিল। এতে স্থান পেয়েছিলেন ফারুকে আজমের শাসনপদ্ধতি। এটার ফতোয়াসমূহে সুর প্রতিধ্বনিত করত, হযরত ইবনে ওমরের (রাঃ) ফতোয়া এবং সাহাবা কেরামদের ফতোয়া। তাঁর পরামর্শ-সভায় স্থান পেয়েছিলেন, ফুকাহায়ে মদীনা সাঈদ বিন মুসাইব, আরওয়া বিন জুবাইর, কাসেম ও সালেম, সলমান বিন ইয়াসের, আবু সালমা বিন আবদুর রহমান, আবু বকর বিন আবদুর রহমান, আবু বকর বিন ওমর এবং ওমর বিন আবদুল আজিজ রাদিয়াল্লাহু আন্হুম্।

'মুয়াত্তা কিতাবের' দলীলাদি, হাদীসসমূহ ও আছার গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠ করলে, এটাই প্রতিপন্ন হবে যে, ইমাম মালেক সাহেবের ফিকাহ ও ফতোয়া হুকুমতে ইলাহীর প্রতিধ্বনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না।

মদীনার শেখবৃন্দ ইমাম মালেক সাহেবের ফজল ও কালামকে মনেপ্রাণে স্বীকার করতেন। তথাপি মদীনার সত্তর জন আলেম সর্বসম্মতিক্রমে ইমাম সাহেবের কার্যকলাপ ও ফতোয়া সমর্থন না করা পর্যন্ত তিনি অস্বস্তি বোধ করতেন। তাঁর অভ্যাস এই ছিল যে, যখনই তিনি কোন ফতোয়ার জবাব দিতেন তখন তিনি সর্বপ্রথমে বলতেন।

সরকারী-ঘোষণা

শুধু মদীনা ও হেজাজ নয় বরং বিভিন্ন দেশ হতে ইমাম সাহেবের খেদমতে প্রশ্নকারীদের মহা ভীড় থাকত। হজ্বের মৌসুমে মুসলিম জাহানের সকল মুসলমান যখন আরাফার ময়দানে সমবেত হতেন এবং কূফা, বসরা ও খোরাসানের ওলমায়ে কেরামও যখন মক্কাশরীফের হেরম মুবারকে সম্মিলিত হতেন, তখন সরকারীভাবে ঘোষণা করে দেয়া হতো যে, ইমাম মালেক এবং ইবনে আবি জেয়ব ব্যতীত যেন অপর কেউ ফতোয়া না দেন।

জোরজবরদস্তিতে তালাক ও ইমাম মালেক

প্রশ্ন উঠল, কোন ব্যক্তিকে যদি তার স্ত্রীকে তালাক দিবার নিমিত্ত জোর প্রয়োগ করা হয় এবং সেইব্যক্তি যদি ভয়ে তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়, তবে

ইমাম আবু হানীফা অন্যান্য ইমামের মতে সেই স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম মালেক এবং অধিকাংশ মুহাদ্দেসের মত এই যে, তাতে তালাক সাব্যস্ত হবে না।

মদীনার রক্ষক জাফর বিন সুলায়মান আব্বাসীয় বংশের সন্তান ছিলেন। তিনি খলীফা মনসূরের চাচাত ভাই ছিলেন। তিনি ইমাম মালেকের উপর হুকুম জারী করলেন যে, তিনি যেন তালাক সম্বন্ধে তাঁর পূর্ব অভিমত অনুযায়ী ফতোয়া না দেন। কিন্তু ইমাম সাহেব স্পষ্টভাবে প্রকাশ্যভাবে স্বীয় মত ঘোষণা করলেন। এজন্য ইমাম সাহেবকে সরকারী আদেশ মতে কোড়ার আঘাতও সইতে হয়েছিল। কিন্তু তাতে কোন সুফল হলো না। তাঁকে বেদম কোড়া মারা হচ্ছিল। কিন্তু ইমাম সাহেবের যতক্ষণ পর্যন্ত কথা বলবার শক্তি ছিল, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি কোড়া মারবার তালে তালে বলছিলেন, "মালেক বিন আনস ফতোয়া দিতেছে যে, জোর-জবরদস্তিতে তালাক হারাম।"

আমি জানিনা

এই-তো গেল, হুকুমতের মুকাবিলায় স্বাধীন মুক্ত মতামত পেশ এবং সত্য ঘোষণা। কিন্তু তাঁর নফসের বিরুদ্ধে এটার চেয়ে অধিক প্রবল পরাক্রান্ত ঘোষণা জারী করেন। মুফতিদের নিমিত্ত রাজ-সরকারের বিরুদ্ধে যেরূপ বজ্রকঠোর হওয়া আবশ্যক। স্বীয় নফসের বিরুদ্ধে এটার চেয়ে শত সহস্র গুণ অধিক বজ্রকঠোর হওয়া বাঞ্চনীয়। ইমাম সাহেবের চরিত্রে এসব কিছুরই স্বর্ণ-সমন্বয় ছিল।

ইমাম সাহেবের কাছে যখন কোন ফতোয়া জিজ্ঞেস করা হতো এবং উপস্থিত ক্ষেত্রে এটার জবাব যদি তাঁর খেয়ালে না আসত, তখন তিনি অত্যন্ত সহজ সরলভাবে বলে দিতেন, আমি জানিনা।

ইমাম সাহেবের শাগরেদ ইবনে ওহ্হাব বলেন, 'আমি যদি ইমাম সাহেবের 'আমি জানিনা' কোন খাতায় লিখে রাখতাম, তবে তা এক বিরাট গ্রন্থে পরিণত হতো।

দূর-দরাজের ফতোয়া ও ইমাম সাহেব

দূর দেশের শহর বন্দর হতে লোকেরা ফতোয়া চাইলে, ইমাম সাহেব যতদূর সম্ভব তা এড়ায়ে চলতে চেষ্টা করতেন।

ইবনে আবদুল্লাহ্ রেওয়ায়েত করেন, "এক ব্যক্তি দূর দরাজ হতে ইমাম

সাহেবের খেদমতে ফতোয়ার জন্য উপস্থিত হলো। সেই ব্যক্তি ইমাম সাহেবের কাছে একটি মাসআলা জিজ্ঞেস কর। ইমাম সাহেব বললেন, 'আমি এই মাসআলা পরিপক্কভাবে অবগত নই।' প্রশ্নকারী বলল, 'আমি ছয় মাসের পথ হতে শুধু এই মাসআলা জানবার জন্য আপনার খেদমতে হাজির হয়েছি। যে সকল লোক আমাকে আপনার খেদমতে প্রেরণ করেছেন, আমি তাঁদেরকে কি জবাব দিব? 'ইমাম সাহেব বললেন, 'আপনি তাঁদেরকে জানায়ে দিবেন যে, মালেক বলছেন আমি এই মাসআলার জবাব দিতে পারছি না।'

আবু নয়ীম এই জাতীয় অপর একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এক ব্যক্তি ইমাম সাহেবের কাছে ফতোয়া চাইল। ইমাম সাহেব বললেন, "আমি এটার সদুত্তর দিতে পারছি না।" সেই লোকটি বলল, "আমি এত দূরের পথ হতে শুধু এই জন্যই আসছিলাম।" ইমাম সাহেব বললেন, "আপনি যখন বাড়ী পৌছবেন, তখন বলে দিবেন, মালেক বলছেন, আমি সুচারুরূপে এটার উত্তর দিতে পারছি না।"

আবদুর রহমান বিন মাহদী নামক ইমাম মালেকের অপর এক ছাত্র বলছেন, "এক ব্যক্তি কোন একটি বিষয়ে ফতোয়ার জন্য ইমাম সাহেবের খেদমতে উপস্থিত হয়। একদিন সেই ব্যক্তি বলল, "আমি আগামী কল্য দেশে চলে যাব। হযরত, আপনি এটার যে কোন জবাব দিয়ে দিন।" তখন ইমাম সাহেব মাথা অবনত করলেন। অতঃপর মাথা তুলে বললেন, "আমি আপনার মাসআলার জবাব দিচ্ছি যে, আমি এটার পরিষ্কার উত্তর দিতে অসমর্থ।"

চুলছেঁড়া পরহেজগারী ও অতি সূক্ষ্ম দৃষ্টির দরুণই তিনি এ সকল এড়ায়ে চলতেন। মূফতীদের অবস্থা এইরূপ দেখা যায় যে, আজ একটি মাসআলা সম্বন্ধে এক অভিমত পোষণ করছেন, দুইদিন পরে সেই অভিমতের পরিবর্তন ঘটে। সেই সকল ক্ষেত্রে নিজ শহর বা পার্শ্ববর্তী লোকদেরকে সেই ভুল জানায়ে দেয়া সম্ভবপর। কিন্তু সেই জমানায় দূর-দরাজের লোকদেরকে প্রয়োজন হলেও কোন কিছু জানায়ে দেয়া সহজ সরল ব্যাপার ছিল না।

ইমাম সাহেবের এক মিসরীয় বন্ধু আশ্চর্যের সাথে বললেন, " লোকেরা এই দূর-দরাজ হতে আপনার খেদমতে মাসআলার মীমাংসার জন্য এসে থাকে, অথচ আপনি কোন সদুত্তর প্রদান না করেই বেচারাদেরকে ফেরৎ দিয়ে দেন, এ কেমন কথা?" জবাবে ইমাম মালেক বললেন, "মিসরীয় লোক মিশর হতে, শামদেশের লোক শাম হতে এবং ইরাকী ইরাক হতে এসে আমার কাছে মাসআলা জিজ্ঞেস

করে থাকেন। আজ আমি যা জবাব দিই, হতে পারে কিছুকাল পরে অন্য জবাবও আমার খেয়ালে আসতে পারে। তখন সেই জবাব তাঁদেরকে জানায়ে দেয়া আমার পক্ষে সম্ভবপর নাও হতে পারে।"

হযরত লাইছ মিসরী ইমাম সাহেবের এই জবাব শুনে রোদন করতে করতে বললেন, "ইমাম মালেক আমাদের কত উর্দ্ধে!"

ফতোয়ার জবাবের সময় ইমাম সাহেব প্রায়ই বলতেন, 'হযরত (সাঃ) এরূপ বলছেন।' এক প্রশ্নকারী বললেন, "এ সম্বন্ধে আপনার মতামত কি?" ইমাম সাহেব জবাবস্বরূপ কোরআনের নিম্নলিখিত আয়াতটি পাঠ করলেন–

"ফাল-ইয়াহজিরিল্লাজিনা ইউখালেফূনা আন আ-মুরুহূ আন-তুছীবাহুম ফিতনাতুন আও-ইউছীবাহুম আজাবুন আলীম।"

অর্থ : যারা তার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদের উপর আপতিত হবে অথবা আপতিত হবে তাদের উপর মর্মন্তুদ শাস্তি।

তিনি যখন কোন কেয়াসী মাসআলা বয়ান করতেন, তখন প্রথমেই এই আয়াত পাঠ করতেন–

"ইন-নাজুননু ইল্লা জোননান ওয়া-মা নাহনু বিমুসতাবিক্বীনা।"

অর্থ : আমরা মনে করি ইহা (কেয়ামত) একটি ধারণা মাত্র এবং আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত হই।

জবাবে চিন্তা ও অনুসন্ধিৎসা

তিনি মসায়েল ও ফতোয়াা দেওয়ার সময় সময়োপযোগী দৃষ্টি এবং বহু চিন্তা ও খোঁজ-খবর নিয়ে জবাবে দিতেন। ইবনে আবী হাবীস বলেন, একদিন ইমাম সাহেব বললেন, মাঝে মাঝে এমন মাসআলা পেশ হয় যে, তাতে আমার আহার-নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মায়।" ইবনে আবী আবীছ বললেন, "আপনার কথা লোকেরা পাথরে খোদিত বাণীর ন্যায় শিরোধার্য করে থাকে। তথাপি আপনি এত মাথা ঘামান কেন?" তখন ইমাম সাহেব অতি সূক্ষ্ম উত্তর দিলেন, " হে ইবনে আবী আবীস, এই জন্যই-তো আমার পক্ষে অধিক সতর্ক ও সাবধান হওয়া উচিত।"

ন্যায় প্রিয়তা

তাঁর কোন মাসআলার যদি ভুল হতো এবং কেউ যদি তা সংশোধন করে দিতেন, তখন তিনি তা অবিলম্বে শিরোধার্য করে নিতেন। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস

করলেন, আচ্ছা অজুর সময় কি পায়ের আঙ্গুলি খিলাল করা আবশ্যকীয়?" ইমাম সাহেব বললেন, আঙ্গুল খিলাল করা মানুষের ওপর জরুরী নয়।

ইবনে ওহ্হাব নামে ইমাম সাহেবের এক ছাত্র সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সভাশেষে তিনি বললেন, "খেলাল সম্বন্ধে আমার কাছে একটি হাদীস রয়েছে। ইমাম সাহেব তা শুনে বললেন, "হাদীস বিশ্বাসযোগ্য" তারপর হতে তিনি সর্বদা সেই হাদীস অনুযায়ী ফতোয়া দিতেন।

ইমাম সাহেব প্রায়ই ষাট বছর কাল ক্রমাগতভাবে ফিকাহ ও ফতোয়ার কাজে লিপ্ত ছিলেন। ইমাম সাহেবের ছাত্র বৃন্দ তাঁর ফিকাহর মাসআলা ও ফতোয়া একত্র জমা করছেন। আফ্রিকার কাজী আসদ বিনের ফেরাত 'আছদীয়া নামে সর্বপ্রথম কিতাব লিখেন। ইবনে কাসেম সঙ্কলিত 'আল-মদূনা কিতাব সর্ব প্রসিদ্ধ। ইমাম সাহেবের জীবিতাবস্থাতেই তা সঙ্কলিত হয়েছে। 'আল-মদূনা' কিতাবের সঙ্কলনকারী ইবনে কাসেম সম্বন্ধে বর্ণিত আছে যে, ইমাম সাহেবের চল্লিশ হাজার মাসআলা তাঁর জবানী এয়াদ ছিল।

ইমাম সাহেবের ফজল ও কামাল-পরিচিতি

দুনিয়ার ফিকাহ-শাস্ত্র ও হাদীস শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যপূর্ণ জ্ঞান গরিমার যদি কোন মাপকাঠি থেকে থাকে, তবে, এটা স্বচ্ছেন্দ বলা চলে যে, সেই মাপকাঠি অনুযায়ী ইমাম মালেকের স্থান অতি উচ্চে। ইমাম মালেক মত-বিশিষ্টে অন্তর্গত বলে ধরা হতো। কিন্তু মুহাদ্দেসীন তাঁদের প্রতি অধিক গুরুত্ব দান করেন না। কিন্তু ইমাম মালেক মতবিশিষ্টদের অন্তর্গত লোক হওয়া সত্ত্বেও অন্যান্য মুহাদ্দেসীনের গুণ-গরিমাকে তাঁরা যেমন স্বীকার করে থাকেন, ইমাম মালেককেও তাঁরা তদ্রূপ দৃষ্টিতে দেখতেন।

এয়াহয়া বিন মঈদ হাদীস ও রেজালের পরীক্ষক ছিলেন। তিনি ইমাম মালেককে 'আমিরুল মুমিনীন ফিল হাদীস' বলে অভিহিত করতেন। তিনি হাদী-রাজ্যের বাদশাহ ছিলেন। সুফিয়ান বিন আলীয়া একজন নামজাদা মুহাদ্দেস ছিলেন। তিনি বলতেন, "ইমাম মালেকের তুলনায় আমরা অতি নগণ্য। আমরা-প্রতি পদক্ষেপে তাঁকে অনুসরণ করে থাকি। ইমাম মালেক যে শেখের কাছ হতে রেওয়ায়েত গ্রহণ করতেন, আমরাও তাঁর কাছ হতে রেওয়ায়েত গ্রহণ করতাম। তিনি যাদের কাছ হতে রেওয়ায়েত গ্রহণ করতেন না, আমরাও তাদের কাছ হতে কোন রেওয়ায়েত গ্রহণ করতাম না।

আবদুর রহমান বিন মাহদী বলেন, "এই বিশ্বচরাচরে ইমাম মালেকের চেয়ে হাদীসে নববীর অধিক আমানতদার অপর কেউই ছিলেন না।"

ইবনে নহীক বলেন, এ ইমাম মালেকের চেয়ে অপর কারও উপর অধিক গুরুত্ব দেয়া চলে না।

ইমাম আহমদ-বিন হাম্বলকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, সেই ব্যক্তি যদি কারও হাদীস জবানী এয়াদ করতে চান, তবে কার হাদীস তিনি এয়াদ করবেন? জবাবে তিনি বললেন, "মালেক বিন আনসের হাদীস জবানী এয়াদ করবে।"

ইমাম মাহদী একজন বিখ্যাত মুহাদ্দেস ছিলেন। তাঁকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, "আমি শুনেছি যে, আপনি বলে থাকেন, ইমাম মালেক ইমাম আবু হানীফার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ফকীহ।" তিনি বললেন, "আমি তা বলি না। কিন্তু আমি একথা বলে থাকি যে, ইমাম মালেক ইমাম আবু হানীফা সাহেবের উস্তাদ হযরত হাম্মাদের চেয়ে বড় ফকীহ।"

ইমাম আবু হানীফা সাহেবের শিক্ষা-মজলিসে যখন এলম ও ফজল এবং হালাল ও হারাম সম্বন্ধে আলোচনা হতো, তখন সুফিয়ান আলীয়া সেই মজলিসে যেয়ে বসতেন। তারপর তিনি নিজ শিক্ষা মজলিসে যেয়ে স্বীয় ছাত্র ও ভক্ত মহলে উপবেশন করতেন।

সুফিয়ান সওরী (রাঃ) একজন বিখ্যাত মুজতাহেদ ছিলেন। তিনি হজ্ব ভ্রমণে ইমাম সাহেবের সহচর থাকতেন।

ইবনে মঈন হাদীস-পরীক্ষার ইমাম ছিলেন। তিনি বলেন, "জহুরী বন্ধুদের মধ্যে ইমাম মালেকের চেয়ে অধিক নির্ভরযোগ্য অপর কেউই ছিলেন না।" তিনি আরও বলছেন, "মালেক খোদার তরফ হতে সৃষ্ট জগতের জন্য একটি প্রমাণ-স্বরূপ।"

হাদীসের ইমাম এয়াহয়া সাঈদ আল-কত্তান বলছেন, "মালেক উম্মতে মোহাম্মদীর জন্য একটি রহমতস্বরূপ।" অপর এক বুজর্গ লোক বলেছেন, "ইমাম মালেকের চেয়ে বড় আলেম আমি অপর কাকেও দেখি নাই।"

জীবিকা, ব্যক্তিত্ব ও গৌরব

আমরা এখন শিক্ষা-ক্ষেত্র পরিত্যাগ করে শাসন-ক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হবো। ইমাম সাহেব ৯৩ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তখন ওলীদ দামেস্কের

খলীফা ছিলেন। পঁচিশ বছর বয়সের সময় ইমাম সাহেব যখন শিক্ষা সমাপ্ত করে বের হন এবং চারদিকে তাঁর যশঃ প্রতিভা বিস্তারিত হয়ে পড়ল, তখন হেশাম বিন আবদুল মালেকের শাসনের অবসান ঘটে। তিনি ১৩৬ হিজরীতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এটার পর আট বছরের মধ্যে ওলীদ বিন ওলীদ, ইব্রাহীম বিন ওলীদ, মরওয়ান বিন মুহাম্মদ এবং বিন মরওয়াম হতভাগ্য শাসনকর্তার রদ-বদল ঘটে। ১৩৩ হিজরীতে হেলফতে আব্বাসীয়দের শাসনকালে নব যুগের সূচনা হয়।

খেলাফতে আব্বাসীয়া

আব্বাসীয় বংশের প্রথম খলীফা ছিলেন আবু আল-আব্বাস সফ্ফাহ। তিনি সাড়ে চার বছর খলীফার আসনে সমাসীন ছিলেন। নব যুগের নিয়ম-শৃঙ্খলা; চেষ্টা সাধনা এবং আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা দূরী করণার্থে তাঁর সময় অতিবাহিত হয়ে যায়।

তাঁর খেলাফতের শেষভাগে ১৩৬ হিজরীতের তাঁর ভাই আবু জাফর মনসূর সালারে হেজাজ পদে নিযুক্ত হন। হেজাজে কিছুকাল অবস্থানের পর তিনি খলীফা পদে সমাসীন হন। কিন্তু আবু মূসা খোরাছানী নিহত না হওয়া পর্যন্ত আবু জাফর মনসূর প্রকৃতপক্ষে খলীফা হতে পারেননি।

১৩৯ হিজরীতে বাগদাদের ভিত্তি পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আব্বাসীয় শাসনেরও মূল ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত করা হয়। তখন হতে আব্বাসীয় শাসন দৃঢ় হয়। মনসূর তখন একটু অবসর পেয়ে ১৪০ হিজরীতে মক্কা-মদীনা জেয়ারত ও হজ্জের জন্য বের হন।

তখন আব্বাসীয় বংশ ক্রমান্বয়ে উন্নত হয়েছিল। কয়েক বছর পূর্বে তা কোরাইশদের একটি ঘরোয়া ব্যাপার ছিল। এজন্য মনসূর তালেবুল এলমদের সাহচর্য এবং এলমী মজলিসে বরাবরই যোগদান করে আসছিলেন। মনসূর মদীনার মাদ্রাসায় ইমাম মালেকের সহপাঠী ছিলেন।

খেলাফত লাভের পর মনসূরের এটাই ছিল সর্বপ্রথম হজ্ব। শহরের আমীর ওমরা ও আলেম ওালমা খলীফাকে অভ্যর্থনা করার নিমিত্ত বের হয়ে আসলেন। সুফিয়ান সওরী, সুলাইমান খাস এবং ইমাম মালেক খলীফাকে সম্বর্ধনার জন্য আগায়ে গেলেন। কিছুদিন পূর্বে যে মনসূর ইমাম সাহেবের সাথে হাদীসের মজলিসে অংশগ্রহণ করতেন, আজ খলীফার আসনে সমাসীন হওয়ার তাঁর জীবনে কোন পরিবর্তন ঘটেছে কিনা, তা বিশেষভাবে লক্ষ্য করাই ইমাম

সাহেবের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। হেজাজের সকল আলেম ও ফকীহ এটা জানবার জন্য উদগ্রীব ছিলেন।

খলীফা ইমাম সাহেবকে লক্ষ্য করে বললেন, "হে আবু আবদুল্লাহ্ (ইমাম সাহেবের ডাক-নাম), আমি ফকীহদের মতবিরোধের জন্য মহা চিন্তিত। ইরাকে প্রশংসনীয় কোন কিছুই নেই। শাম দেশে জেহাদ-প্রেরণা অত্যন্ত প্রবল। সেখানে কোন বড় আলেম নেই। এখন হেজাজের উপর একমাত্র ভরসা। আর আপনি হলেন, হেজাজ-আলেমকুল-নেতা। আপনার সঙ্কলিত 'মুয়াত্তা' অনুযায়ী ফতোয়া দিতে ঘোষণা প্রচার করে দিব।"

কেউ কেউ বলেন যে, এমন এক কিতাব-রচনার বাসনা জ্ঞাপন করলেন যে, তাতে ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও ইবনে মাসউদ (রাঃ) এবং ইবনে ওমরের (রাঃ) উসুলে ফিকাহর সমন্বয় থাকবে।

খলীফা-সংঘর্ষ

স্বার্থান্বেষী আলেমের নিমিত্ত খলীফার কাছ হতে সুখ-সুবিধা আদায়ের জন্য এটার চেয়ে অধিক সুবর্ণ-সুযোগ আর কিছুই থাকতে পারে না। কিন্তু ইমাম সাহেব এতে টলিবার পাত্র ছিলেন না। তিনি বললেন, "সাহাবাবৃন্দ একদিন সমগ্র দেশে বিরাজ করতেন। নিজ নিজ স্থানে তাঁদের ফতোয়া ও আদেশাবলী জারী রয়েছে। আলেম-ওলামা বিশেষভাবে এ সকল বহু কিছু স্মরণ রেখেছেন। এমতাবস্থায় এমন একজন লোকের বুদ্ধি ও মতামতের উপর নির্ভর করে যাতে ভুল-ভ্রান্তি হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে, তা সমগ্র লোকের উপর চাপায়ে দেয়া আমি সমীচীন মনে করি না।"

মনসূর বললেন, "আপনার সম্মতি পেলে আমি তাই করতাম।" একদিন খলীফা ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার চেয়ে অধিক জবরদস্ত আলেম কেউ আছেন কি?" ইমাম সাহেব বললেন, "তাঁর নাম আমার এয়াদ নেই।" মনসূর বললেন, "আমি শিক্ষা-কার্যে বহুদিন কাটায়েছি। আমি সব আলেমেরই খবর রাখি।"

খলীফা শুধু ইমাম সাহেবের সম্মুখেই তাঁর ফজল ও কামালকে স্বীকার করতেন না, তাঁর অনুপস্থিতিতেও তিনি তা সর্বান্তকরণে স্বীকার করতেন। সুফিয়ান সওরী ও সুলাইমান খাস একদিন মনসূরের সাথে সাক্ষাৎ করতে যান। খলীফা তাঁদের শিবিরের মধ্যে আহ্বান করলেন। সুফিয়ান সওরী বললেন,

"আপনার ফরাশ (বিছানার চাদর) তুলে না দেয়া পর্যন্ত আমি আপনার শিবিরে প্রবেশ করতে পারি না।" ফরাস উঠায়ে ফেলা হলে সওরী সাহেব আয়াত পাঠ করলেন, 'এ মাটি হতেই আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং এতেই আমি তোমাদের মিশাইব এবং এটা হতেই আমি তোমাদের আবার বের করব।' আয়াত পাঠ শেষে সওরী সাহেব জমীনেই বসে পড়লেন। সুদীর্ঘকাল অবধি খলীফা প্রবরকে সওরী সাহেব কঠোর ভাষায় উপদেশ দান করলেন। তাঁরা চলে আসলে, দরবারের একজন উচ্চ কর্মচারী বললেন, "আমীরুল মুমিনীনের সাথে এরূপ কঠোর ব্যবহারকারীর প্রাণদণ্ড হওয়া বাঞ্ছনীয়।" মনসূর বললেন, "থামুন। সুফিয়ান সওরী এবং ইমাম মালেকের চেয়ে অধিক শ্রদ্ধার পাত্র আর কে হতে পারে?"

পাঠকবর্গ বোধ হয় অবগত রয়েছেন যে, হযরত আলী কররমল্লাহু ওয়াজহাহুর পরে যখন হাশেমীদের মোকাবিলায় বনী উম্মাইয়াগণ প্রকাশ্য জয় লাভ করল, তখন বনু আব্বাস, বনু ফাতেমা এবং ওলোবীনদের (হযরত আলীর সন্তান, কিন্তু হযরত ফাতেমার গর্ভজাত নয়) সমন্বয় হাশেমী খেলাফত কায়েম করার জন্য গোপনে গোপনে ষড়যন্ত্র চলছিল। প্রথমতঃ এই আন্দোলনের নেতা ছিলেন ফাতেমী খান্দানের লোক এবং ওলোবীনগণ। ইমাম হুসাইনের (রাঃ) পর হযরত ফাতেমা (রাঃ) ব্যতীত হযরত আলীর (রাঃ) অপর স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান মুহাম্মদ বিন হানীফা ইমাম হন। এটার পর আবু হাশেম আবদুল্লাহ্ ওলোবী আবু হাশেমের শামদেশের ঘটনাস্রোতে প্রাণ হারায়। তখন মুহাম্মদ বিন আলী বিন আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাঃ) ব্যতীত অপর কোন হাশেমী বংশের লোক জীবত ছিলেন না। কাজেই আবু হাশেম মুহাম্মদ আব্বাসীকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করার জন্য অসিয়ত করলেন। এই সুযোগেই খেলাফতের দাবী ওলোবাদের কাছ হতে বিদ্যুৎ হয়ে আব্বাসীয়দের উপর ন্যাস্ত হয়।

মুহাম্মদ বিন আলী আব্বাসী ১২৪ হিজরীতে ইন্তেকাল কানে। তখন তাঁর পুত্র ইব্রাহীম বিন মুহাম্মদ আব্বাসীকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত বলে বরণ করে নেয়া হয়। ইব্রাহীম মরওয়ান উম্মাইয়ার হস্তে বন্দী হন। সেখানেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন বা তাঁকে মেরে ফেলা হয়। সেই শোক প্রকাশের নিমিত্ত আব্বাসীয় বংশের শিয়া সম্প্রদায় কাল কাপড় পরিধান করতে আরম্ভ করে এবং তখন হতে কাল বর্ণ শিয়াদের চিহ্নরূপে পরিগণিত হয়।

ইব্রাহীম পরে আবুল আব্বাস সফ্ফা বনু হাশেমদের নেতা হন। পরিশেষে

৩২ হিজরীতে তাঁর প্রচেষ্টা সফলকাম হয়। সফ্‌ফা জয়লাভের পর বনু হাশেমদের মধ্যে শুধু বনু আব্বাসকে খেলাফতের একমাত্র প্রকৃত দাবীদার বলে ঘোষণা করে দিলেন।

একদিক দিয়ে-তো নব গদিনশীল শাসনকর্তা উম্মায়াদেরকে সমূলে বিনষ্ট করার জন্য তাদের কবরের হাড় পর্যন্ত একত্র করে জ্বালায়ে দিয়েছিল, আর উমাইয়া ও মরওয়ানীদেরকে বেছে বেছে মেরে ফেলা হয়েছিল। অপরদিক দিয়ে খলীফা-নির্বাচনে ফাতেমী ও অ-ফাতেমীদের মধ্যে মহা অসন্তুষ্টি মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। পরিণামে রাজ্যময় ভীষণ অশান্তি উপদ্রব দেখা দিল। তথাপি সফ্‌ফাহের শাসনকাল পর্যন্ত প্রকাশ্য কার্যক্ষেত্রে তা তেমনভাবে প্রকাশ পায়নি। খলীফা মনসূর এ সম্বন্ধে আর অসতর্ক থাকা সমীচীন মনে করলেন না।

নফসে জকীয়া ইতিমধ্যে মদীনায় বিদ্রোহ আরম্ভ করলেন অধিকাংশ লোকই তাঁকে সমর্থন করল। কিন্তু পরিস্থিতি তাঁর অনুকূলে ছিল না। নফসে জকীয়া ময়দানে অপরিসীম বীরত্ব প্রদর্শনপূর্বক মারা পড়লেন। তখন তাঁর ভাই ইব্রাহীম মনসূরের বিরুদ্ধে লড়াই করলেন। তিনিও বেশীদিন টিকতে পারলেন না। তাঁকেও শত্রুহস্তে প্রাণদান করতে হলো। মনসূর তখন জাফরকে মদীনার রক্ষকরূপে নিযুক্ত করলেন।

ইমাম মালেক এই সব সংগ্রামে সত্যের পক্ষপাতী রইলেন। তিনি ফতোয়া জারী করলেন যে, নফসে জকীয়া খেলাফতের অধিকারী। লোকেরা বলল, "আমরা-তো মনসূরকে খলীফা করার জন্য শপথ করেছি।" ইমাম সাহেব বললেন, "মনসূর বলপূর্বক লোকদেরকে আনুগত্য স্বীকার করায়েছেন। বলপূর্বক যদি কারও কাছ হতে তালাক নেয়া হয়, তবে তা তালাক বলে গ্রাহ্য হবে না।"

জাফর নদীয়ায় যেয়ে নব উদ্যমে লোকদেরকে আনুগত্য স্বীকার করাতে লাগলেন। আর ইমাম সাহেবকে তিনি জানায়ে দিলেন যে, তালাক সম্বন্ধে এবং জোর জবরদস্তিতে আনুগত্য স্বীকার করান সম্বন্ধে তিনি যেন আর কোন ফতোয়া জারী না করেন। কিন্তু ইমাম সাহেব দমিবার পাত্র ছিলেন না। জোরজবরদস্তিতে তালাক আনুগত্য স্বীকার করান সম্বন্ধে তিনি বেপরোয়া ফতোয়া জারী করে যেতে লাগলেন।

জাফর ক্রোধান্ধ হয়ে ইমাম সাহেবকে সত্তর কোড়া মারবার জন্য আদেশ জারী করল। নির্দয় নিষ্ঠুরভাবে ইমাম সাহেবকে সত্তর কোড়া মারা হলো। তাঁর পৃষ্ঠ রক্তাভ হয়ে গেল।

এতেও সরকারী ক্রোধ প্রশমিত হলো না। আদেশ হলো যে ইমাম সাহেবের মুখে চুনকালী মাখায়ে উষ্ট্র-পৃষ্টে তাঁকে শহরময় পরিভ্রমণ করাতে হবে। এরূপে তাঁকে প্রতি শহর ও গলিতে ঘুরান হলো। ইমাম সাহেব এতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত না হয়ে ঘোষণা করে যেতে লাগলেন, "আপনাদের মধ্যে যারা আমাকে চিনেন, তাঁরা তো আমাকে চিনেনই; আমি মালেক বিন আনাস; আমি ফতোয়া দিচ্ছি যে, জোর জবরদস্তিতে তালাক ও আনুগত্য স্বীকার করান কোনটাই জায়েয নয়।"

অতঃপর ইমাম সাহেব রক্তাক্ত মসজিদে নববীতে পদর্পণ করলেন। তিনি তাঁর পৃষ্ঠ হতে রক্ত পরিষ্কার করলেন। তারপর তিনি দুই রাকাত নামায আদায় করে বললেন, "সাঈদ বিন মুসাইবকে যখন কোড়া মারা হয়েছিল, তখন মসজিদে এসে নামায পড়েছিলেন।"

অপমান করার জন্য ইমাম সাহেবকে এরূপে শাস্তি দেয়া হয়েছিল। কিন্তু এতে তার ইজ্জত শতগুণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হলো। এটা হিজরী ১৪৭ সালের ঘটনা।

মনসূরের বেখবরী ও অনুতাপ

মদীনার ওয়ালীর (শাসনকর্তার) এইরূপ হীন আচরণ মনসূরের কাছ অত্যন্ত অপ্রিয় ঠেকল এবং সেজন্য তিনি মহা অনুতপ্ত হলেন। খলীফা অবিলম্বে তাঁকে পদচ্যুত করলেন। আর অনতিবিলম্বে তাঁকে গাধায় চড়ে বাগদাদে উপস্থিত হয়ে এটার জন্য জবাবদিহি করতে আদেশ দিলেন। এরপর তিনি ইমাম মালেকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে চিঠি লিখেছেন।

৫৮ হিজরীতে সমগ্র হেজাজ ও ইরাকে শান্তি ফিরে আসল, তখন হজ্ব করবার বাসনায় মনসূর হেজাজে আসলেন। খলীফা তখন ইমাম সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং এই বলে বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন, "আমার কাছে কোন প্রকার বলা কওয়া না করেই জাফর আপনার সাথে বর্বর আচরণ করেছে। আমি তা শ্রবণ মাত্রই তাকে পদচ্যুত করেছি। আর তাকে গাধায় চড়ে বাগদাদ এসে জবাবদিহির আদেশ দিয়েছি।"

ইমাম সাহেব বললেন, " শুনে সুখী হলাম যে, আপনি তা অবগত ছিলেন না।" উক্ত জবাব শুনে খলীফা বলে যেতে লাগলেন, "হে আবু আবদুল্লাহ্ আপনি যতদিন পর্যন্ত জীবিত থাকবেন, ততদিন পর্যন্ত আপনি মক্কা ও মদীনার আশ্রয় স্বরূপ থাকবেন। আপনি ব্যতীত এটাকে সুরক্ষিত রাখবার ক্ষমতা অপর কারও

নেই। আমি যতটুকু অবগত রয়েছি, উভয় শহরের লোকই ঝগড়াপ্রিয় হয়ে উঠছে। কিন্তু আপনি যদি এই পরিস্থিতি না সামলান, তবে অন্য কোন উপায় আমি খুঁজে পেয়েছি। আমি দুশমনে-খোদাকে (জাফরকে) পদচ্যুতির পরোয়ানা প্রেরণ করেছি এবং বাগদাদে গাধায় চড়ে উপস্থিত হতে বলেছি।

ইমাম সাহেব বললেন, "প্রতিশোধ গ্রহণের কোন প্রয়োজন নেই। আমীরুল মুমিনীন এবং খোদার দিকে চেয়ে আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি।"

মনসূর ইমাম সাহেবের খেদমতে রাজকীয় পোশাক পেশ করলেন। সাধারণ নিয়ম এই ছিল যে, রাজকীয় পোশাক যাঁকে পুরস্কার দেয়া হতো, দরবারী লোকেরা, তা তাঁর স্কন্ধে রেখে দিত। ইমাম সাহেবের বেলায়ও সেই নিয়ম পালিত হবে বুঝতে পেরে ইমাম সাহেব পিছনে হেটে গেলেন। মনসূর তখন রাজ কর্মচারীকে শাসায়ে বললেন, "এই পোশাক ইমাম সাহেবের বাড়ীতে পৌঁছায়ে দাও।"

প্রশ্ন ও উত্তর এবং সম্মানসূচক শব্দগুলো বাদ দিয়ে যদি আমরা সবকিছু তলায়ে দেখি, তবে মনে হয় যেন, মনসূরের মনে আরও কিছু দুরভিসন্ধি রয়েছে। তিনি বলছেন, "মক্কা ও মদীনাবাসীরা ঝগড়াপ্রিয়। অথচ ইমাম সাহেবকে তিনি মক্কা মদীনার নেতাও বলছেন। আর ইমাম সাহেবের ইশারা ব্যতীত তারা কখনও বিদ্রোহ করতে পারে না, এটাও যেন তিনি বলতে চেয়েছিলেন।

একদিন মনসূরের মনে দৃঢ় ধারণা জন্মিল যে, ওলমায়ে কেরাম খলীফা বিরোধী। সুতরাং তিনি রাত্রিকালেই ইবনে আবি জেয়ব, হেজাজের ফকীহ ইবনে সমআন এবং ইমাম মালেককে তলব করলেন। ব্যাপার বুঝতে ইমাম সাহেবের কিছুই বাকী রইল না। তিনি অজু গোসল করে কাফনের কাপড় পরিধান করত, হলুদ (মৃতদেরকে লাগান হয়) মলিয়া জীবনের আশা পরিত্যাগ করে খলীফার দরবারে হাজির হলেন। তখন খলীফা বললেন, "হে ইমাম সাহেব, আমি একটি সংবাদ শুনে বিশেষ দুঃখিত হলাম। আমি আশা করেছিলাম যে, আপনি সকলের পূর্বে আমার আনুগত্য প্রকাশ করবেন। আপনি আমাকে মন্দ বলবেন, এটা আমার ধারণার বাইরে ছিল। আর আমার যদি কোন দোষ থেকে থাকে, তবে আমাকে নসীহত করা আপনার উচিত ছিল।" ইমাম সাহেব বললেন, "হে আমীরুল মুমিনীন, আল্লাহপাক বলছেন–

"হে মুসলমানগণ কোন ফাসেক যদি তোমাদেরকে কোন সংবাদ দেয়, তবে এ সম্বন্ধে বিশেষ খবর নেও; তা যদি না কর তবে হতে পারে যে, না জেনে

তোমরা নিরপরাধ ব্যক্তিকে শাস্তি দিয়ে ফেলবে; তখন তোমাদের কার্যকলাপের জন্য তোমাদেরকে অনুতাপ করতে হবে।"

মনসূর বললেন, "আচ্ছা, বলুন-তো, আপনি আমাকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখে থাকেন?" ইমাম সাহেব বললেন, "আশা করি, আল্লাহর ওয়াস্তে আপনি আমাকে এটার জবাব দেয়া হতে রেহাই দিবেন।"

মনসূর তখন ইবনে সমআনকে লক্ষ্য করে বললেন, "আপনি বলুন-তো আমি কেমন লোক?" ইবনে সমআন বললেন, "আমীরুল মুমিনীন, আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ লোক। আপনি হজ্ব করে থাকেন। জেহাদে যোগদান করেন। অত্যাচারীতদের সাহায্য করে থাকেন। আপনি ইসলাম-দরদী এবং ন্যায়বিচারকও।"

অতঃপর মনসূর ইবনে আবি জেয়বকে বললেন, "আচ্ছা, আপনি আমাকে কিরূপ বিবেচনা করে থাকেন?" তিনি মুক্তকণ্ঠে বললেন, "সৃষ্টির মধ্যে আপনার চেয়ে নিকৃষ্ট অপর কেউই নেই। আপনি মুসলমানদের সবকিছু ধনসম্পত্তি আপনার শান-শওকত বৃদ্ধি মানসে ব্যয় করে থাকেন। দরিদ্র ধ্বংস ও আমীরদেরকে যন্ত্রণা প্রদানে আপনি অদ্বিতীয়। জানিনা, কিয়ামতের দিবস খোদার কাছে আপনি এটার কি জবাব দিবেন?"

মনসূর বললেন, "আপনার সম্মুখে কি রয়েছে, এ খবর আপনার জানা আছে কি?" ইবনে আবি জেয়ব বললেন, "হ্যাঁ, আমি আমার সম্মুখে একটি তলোয়ার স্পষ্টভাবে দেখতে পেয়েছি কিন্তু আজকার মৃত্যু আগামীকল্যের মৃত্যু হতে শ্রেষ্ঠ।"

এটার কিছুক্ষণ পরে ইবনে সমআন ও ইবনে আবি জেয়ব সেখান হতে চলে আসলেন। কিন্তু ইমাম সাহেব সেখানে বসেই রইলেন। মনসূর বললেন, "আমি যে আপনার কাপড় হতে হলুদের গন্ধ পাচ্ছি।" ইমাম সাহেব বললেন, "অসময়ে আপনার তলব শুনে জীবনের আশা পরিত্যাগ করেই আপনার দরবারে উপস্থিত হয়েছি।" মনসূর বললেন, "সুবহানাল্লাহ্! হে ইমাম সাহেব, আমি কি নিজ হাতে ইসলামের স্তম্ভসমূহ নষ্ট করে দিব!"

মুহাম্মদুল মাহদী

সেই হজ্বের সফরে ১৫৮ হিজরীতে মনসূর ইন্তেকাল করেন। মুহাম্মদুল মাহদী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। এটার দুই বছর পরে মাহদী তাঁর দুই পুত্র মুসা ও হারুণসহ হজ্ব করতে ইচ্ছা করলেন। হজ্ব সম্পাদনের পর তিনি পবিত্র মদীনায়

গমন করলেন। তাঁরা মদীনার নিকটবর্তী হলে আমীর ওমরা ও আলেম ওলামা তাঁদেরকে অভ্যর্থনা করার জন্য আগায়ে আসলেন। ইমাম সাহেবও তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। মাহদী তাঁকে দেখতে পেয়ে তাঁর দিকে আগায়ে এসে সালাম পূর্বক তাঁর বুকের সাথে নিজের বুক মিলায়ে নিলেন।

সেই বছর হেজাজে অত্যন্ত দুর্ভিক্ষ ছিল। ইমাম সাহেব বললেন, "হে আমীরুল মুমিনীন, আপনি এখন যে মদীনার দিকে অগ্রসর হয়েছেন, তাতে মুহাজেরীর ও আনসারীদের বহু সন্তান বসবাস করছেন। আর এটারই বুকে হযরতের রওজা মোবারক আজও বিরাজ করছে।"

খলীফা প্রবর ইমাম সাহেবের বক্তব্য বুঝতে পেরে সাহেবের খেদমতে পাঠায়ে দিলেন। ইমাম সাহেব সে অর্থ তাঁর কোন একজন বিশ্বস্ত ও উপযুক্ত ছাত্রের হাতে দিয়ে দিলেন এবং লোকের অভাব অনুযায়ী তা বণ্টন করার নির্দেশও দান করলেন।

অতঃপর খলীফা তাঁর জনৈক উচ্চ কর্মচারীর মারফতে ইমাম সাহেবের নিজ ব্যবহারের নিমিত্ত তিন হাজার দেরহাম পাঠায়ে দিলেন। আর তৎসঙ্গে আরজ করে পাঠালেন যে, ইমাম সাহেব যদি বাগদাদে যান, তবে খলীফা পরম সুখী হবেন। আপনি ইচ্ছা করলে তা নিয়েও যেতে পারেন। কিন্তু মালেক কখনও মদীনা পরিত্যাগ করতে পারে না। হযরত (সাঃ) বলছেন 'মদীনাতে তাদের জন্য বহু মঙ্গল রয়েছে; তারা যদি জানতে পারত।"

খলীফার মজলিসে উপস্থিত হওয়ার নিমিত্ত মাহদী ইমাম সাহেবের জন্য যানবাহন প্রেরণ করেন। ইমাম সাহেব তা ফিরায়ে দিয়ে বললেন, "যে মদীনার অলীতে গলিতে হযরত (সাঃ) পদব্রজে চলাফেরা করছেন, আমি সেই মদীনায় যানবাহনে আরোহণ করি না।"

খলীফা হজ্বের ভ্রমণে 'মুয়াত্তা' শুনবারও সৌভাগ্য লাভ করেন। অতঃপর তিনি তাঁর দুই পুত্রকে ইমাম সাহেবের খেদমতে থেকে 'মুয়াত্তা' শুনবার জন্য প্রেরণ করলেন। পুত্রদ্বয় ইমাম সাহেবের খেদমতে হাজির হলেন। পুত্রদ্বয়ের সহচর ইমাম সাহেবকে 'মুয়াত্তা' শুনবার জন্য অনুরোধ করলে, ইমাম সাহেব বললেন, "আমাদের আলেমদের রীতি এই যে, ছাত্রেরা পড়ে, আর শেখ তা শুনে যান।" তখন খলীফার পুত্রদ্বয় 'মুয়াত্তা' পড়ে যেতে লাগলেন। ইমাম সাহেব তা শুনে গেলেন।

মাহদী ১৬৯ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তারপর তাঁর পুত্র মুসা খলীফার আসনে উপবিষ্ট হন। তিনি এক বছর কাল খলীফার আসনে সমাসীন থাকেন।

হারুণুর রশীদ

মাহদীর পরে হারুণুর রশীদ খলীফা হন। তখন ইমাম মালেকের গ্রন্থরাজি রাজ্যময় ছড়ায়ে পড়ছে। খেলাফত লাভের প্রথম বছরেই তিনি হজ্ব করেন। তিনি তখন মদীনায়ও গমন করেন। তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্য লোকেরা দলে দলে বাইর হতে লাগল। তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্য লোকেরা দলে দলে বের হতে লাগল। ইমাম সাহেবও তাদের সঙ্গে ছিলেন। খলীফা তাঁকে দেখে মহা খুশী হয়ে বললেন, "আপনার গ্রন্থরাজি আমার হস্তগত হয়েছে। আমার পরিবারস্থ যুবকদেরকে তা পাঠ করতে আদেশ করেছি। কিন্তু এটার কোন কারণ বুঝতে পারলাম না যে, এতে ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং আলী বিন আবু তালেবের (রাঃ) কোন রেওয়ায়েত দেখতে পাইনি। ইমাম সাহেব বললেন, "হে আমীরুল মুমিনীন, উক্ত বুজুর্গদ্বয় আমাদের মদীনা শহরে অবস্থান করতেন না।"

হারুণুর রশীদের শিক্ষা মজলিসে যোগদান

হারুণুর রশীদ ইমাম সাহেবকে 'মুয়াত্তা' সহ দরবারে উপস্থিত হতে আহ্বান করলেন। ইমাম সাহেব তা সোজাসুজি অস্বীকার করলেন। 'মুয়াত্তা' না নিয়েই তিনি খলীফার দরবারে উপস্থিত হলেন। হারুণ রশীদ অনুযোগ দিলেন। ইমাম সাহেব বললেন, "হে হারুণুর রশীদ, এলম আপনার ঘর হতে বের হয়ে গিয়েছে। এখন আপনি একে ইজ্জতও করতে পারেন, আর বেইজ্জতও করতে পারেন।"

ইমাম সাহেবের নসীহত খলীফার হৃদয় স্পর্শ করল। তিনি তাঁর দুই পুত্রসহ ইমাম সাহেবের শিক্ষা-মজলিসে উপস্থিত হলেন। সেখানে ছাত্রদের মহা ভিড় ছিল। খলীফা ছাত্রদের ভিড় কমায়ে দিবার জন্য ইমাম সাহেবকে অনুরোধ করলেন। তিনি বললেন, "ব্যক্তিগত ফায়েদার খাতিরে বৃহত্তর স্বার্থকে উপেক্ষা করা সমুচিত নয়।"

হারুণুর রশীদ তখন মসনদে সমাসীন ছিলেন। ইমাম সাহেব বললেন, "হে আমীরুল মুমিনীন, বিনয় অমূল্য সম্পদ।" খলীফা তখন নিয়ে নেমে আসলেন।

কিতাব পড়া ও শ্রবণ করার পালা আসল। হারুণ বললেন, "হে ইমাম সাহেব, আপনি আমাদেরকে তা পড়ে শুনিয়ে যান।" জবাবে ইমাম সাহেব বললেন, "এটা আমার অভ্যাসের খেলাফ।" তারপর তিনি মঈন বিন ঈসা নামক তাঁর এক ছাত্রকে ইশারা করলেন। পরবর্তী জীবনে ঈসাও নামজাদা মুহাদ্দেসদের উস্তাদ হন। তিনি কেরায়াত আরম্ভ করলেন। হারুণুর রশীদ তখন সাহেবজাদাদ্বয় সহ তাহা শ্রবণ করতে লাগলেন।

হাদীস-মজলিস

খলীফা হারুণুর রশীদের সেই ভ্রমণে শাম, ইরাক ও হেজাজের সকল আলেম তাঁর সঙ্গে ছিলেন। কাজী আবু ইউসূফও তাঁদের সংগে ছিলেন। খলীফা হারুণুর রশীদ তাঁদের সকলকে নিয়ে একটি সমিতি স্থাপন করলেন।

ইমাম সাহেব সেই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করে সকলের মুখ উজ্জ্বল করলেন। 'মুয়াত্তা' চর্চা শুরু হয়ে গেল। প্রত্যেক মাসআলা সম্বন্ধেই আলেমবৃন্দ চুপ থেকে তৎপ্রতি তাঁদের সমর্থন জ্ঞাপন করতে লাগলেন। ইমাম সাহেব ফিকাহ সম্বন্ধে সাগর স্বরূপ ছিলেন।

সভাশেষে ইমাম সাহেবের প্রস্থানের পর হারুণুর রশীদ উপস্থিত সকলকে লক্ষ্য করে বললেন, "হে ইরাক ও হেজাজের ফকীহ্‌বৃন্দ, ইমাম সাহেবের বর্ণিত কোন মাসআলা সম্বন্ধে আপনাদের কোন বক্তব্য রয়েছে কি?" ফকিহগণ সম্মিলিত ভাবে জবাব দিলেন, "একটি মাসআলা ব্যতীত অপর কোন মাসআলা সম্বন্ধে আমাদের কোন ওজর-আপত্তি নেই।"

হারুণুর রশীদ বললেন, "আশ্চর্য নয় যে, ইমাম মালেক সেই মাসআলাটি কোরআন হতে গ্রহণ করেছেন। সে যা হোক, হারুণুর রশীদ ইমাম সাহেবকে আহ্বান করে বললেন, "হে আবু আবদুল্লাহ্, 'মুয়াত্তা' কিতাবের একটি মাসআলা সম্বন্ধে এখতেলাফ রয়েছে। আপনি সেই মাসআলাটি দলীল সহ বর্ণনা করুন।"

ইমাম সাহেবের সাথে হারুণুর রশীদের কিরূপ সৌহার্দ ও আন্তরিকতা ছিল, তা এটা হতেই বুঝা যায় যে, তিনি সকল ফকীহদের সম্মুখেই বলছেন, "আর আমিও এই মাসআলা সম্বন্ধে আপনার সাথে এক মত।" ইমাম সাহেব তখন কোরআন ও হাদীস হতে দলীল পেশ করলেন। তাতে অপর কারও কোন ওজর-আপত্তি রইল না।

অতঃপর ইমাম সাহেব হারুণুর রশীদকে লক্ষ্য করে বললেন, "হে আমিরুল মুমিনীন, আজ আপনি যেমন আমাকে স্মরণ করেছেন, আপনার আব্বাজানও মাঝে মাঝে আমাকে তদ্রূপভাবে এয়াদ করতেন। আমিও তাঁকে হাদীস শুনায়ে দিতাম।"

খলীফা হারুণুর রশীদ মদীনার ফকীহ্‌দেরকে পর্যাপ্ত পরিমাণে সাহায্য করতেন।

মসজিদে নববীতে একটি মিম্বর ছিল। জনাব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটার উপর বসে খুৎবা পাঠ করতেন। এতে মাত্র তিনটি সিঁড়ি ছিল।

আমীর মোয়াবীয়া এতে আরও কয়েকটি সিঁড়ি সংযোজিত করেন। হারুণুর রশীদ ইচ্ছে করলেন যে, অতিরিক্ত সিঁড়ি কয়েকটি কেটে ছেটে এটার প্রকৃত গঠন বা হাল রেখে দিবেন। এ সম্বন্ধে তিনি ইমাম সাহেবের সাথে পরামর্শ করলেন।

ইমাম সাহেব তাতে সম্মত হয়ে বললেন, "এই মিম্বরের তক্তা খুব মজবুত নয়। এটাকে কাটছাঁট করার সময় হয়ত মূল তক্তা বিনষ্টও হয়ে যেতে পারে। হযরত (সাঃ) ইন্তেকালের সময় মদীনায় নবুওতের বহু কিছু চিহ্ন যথা তাঁর বিছানা, লাঠি, পেয়ালা এবং জুতা মোবারক ইত্যাদি ছিল। কিন্তু মদীনাবাসীরা একটি একটি করে এদের সবকিছু হাতছাড়া করে দিয়েছে। সেই সকল জিনিসের মধ্যে এখন মাত্র এই মিম্বর অবশিষ্ট রয়েছে। এটা অত্যন্ত ভারী হওয়ার কারণে এটাকে কেউই অপসারিত করেননি। এখন এটাকে যদি কেউ আবার তিন সিঁড়ি বিশিষ্ট মিম্বরে পরিণত করে, তবে আমার ভয় হয়েছে যে, এটাকে কেউ হয়ত মদীনার মসজিদ হতে অপসারিত করে অন্যত্র স্থানান্তরিত করে ফেলবে।"

হারুণুর রশীদ এসব কিছুর গুরুত্ব উপলব্ধি করে স্বীয় বাসনা পরিত্যাগ করলেন।

আবু নয়ীম 'হীলা' নামক কিতাবে ইমাম মালেকের কাছ হতে রেওয়ায়েত করেছেন যে, হারুণুর রশীদের ইচ্ছে ছিল যে, 'মুয়াত্তা' কিতাবকে কাবাশরীফে টাঙিয়ে দেয়া হবে এবং মুসলিম জাহানকে তিনি ফিকাহ সংক্রান্ত ব্যাপারে এটাকে আদর্শরূপে মেনে চলতে বাধ্য করবেন।

সম্মান ও গৌরব-লোভী লোকের পক্ষে নিজের গুরুত্ব বৃদ্ধি করার মানসে এটার চেয়ে সুবর্ণ সুযোগ আর কি থাকতে পারে? কিন্তু ইমাম সাহেব জবাব দিলেন, "আপনি কস্মিনকালেও তা করবেন না। স্বয়ং সাহাবাগণও শাখা উপশাখা সম্বন্ধে একমত ছিলেন না। অথচ তখন তাঁরা সমগ্র দেশে বিরাজ করতেন। কাজেই তাঁদের কল্যাণে এখনও বহুকিছু জ্ঞান-গরিমা বিভিন্ন দেশে বিরাজ থাকবে। আমি সেই উৎসকে বিনষ্ট করার পক্ষপাতী নই।"

হারুণুর রশীদের কাছে ইমাম সাহেবের পত্র

ইমাম সাহেব হারুণুর রশীদের খেলাফতের সময় ইন্তেকাল করেন। আমীন ও মামুন নামে খলীফা সাহেবের দুটি পুত্র ইমাম সাহেবের খেদমতে থেকে বহু কিছু উপকৃত হন। হারুণুর রশীদের নামে ইমাম সাহেব একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থ লিখেন। এতে তিনি খলীফা সাহেবকে বহু উপদেশ দান করেন। তাতে শিক্ষামূলকও বহু

কিছুর উল্লেখ রয়েছে। এটা মিসরে ১৩২২ হিজরীতে মুদ্রিত হয়েছিল। আর লাহোরে এটার উর্দু অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

মৃত্যু শয্যায়

ইমাম সাহেবের বয়স তখন ৮৬ বছর। তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ ও দুর্বল হয়ে পড়লেন। মসজিদে নববীতে আসা-যাওয়া, নামাযের জমাতে যোগদান করা, সুখ-দুঃখে ও শাহী-বিবাহে এখানে সেখানে যাতায়াত তো তিনি পূর্বেই পরিত্যাগ করেন। লোকেরা তথাপি নাছোড় বান্দা হয়ে ধরলে তিনি নিজের অসমর্থতা জ্ঞাপন করতেন।

মায়ান্ বিন ঈসা ইমাম সাহেবের অত্যন্ত প্রিয় ছাত্র ছিলেন। 'সেহা ছিত্তা' কিতাবে তাঁর বহু রেওয়ায়েত রয়েছে। সেই সময় তিনি ইমাম সাহেবের খাদেম ছিলেন। ইমাম সাহেব তাঁকে অবলম্বন করেই চলাফেরা করতেন। কিন্তু তাঁর বার্ধক্য ও দুর্বলতা সত্ত্বেও তিনি শিক্ষাদান ও ফতোয়া দানে বিরত থাকেননি।

এয়াহয়া বিন এয়াহয়া উন্দোলুসী মাহমুদী ইমামে উন্দোলুস দ্বিতীয়বার যখন মিসর হতে প্রত্যাবর্তন করে মদীনায় সনদ নিতে আসেন, তখন ইমাম সাহেব মৃত্যু শয্যায় শায়িত।

রবিবার দিবস তিনি প্রথম পীড়িত হন। প্রায় তিন সপ্তাহ-কাল তিনি রোগ শয্যায় শায়িত ছিলেন। রোগ উত্তরোত্তর বেড়ে চলল। লোকেরা তাঁর জীবনের আশা পরিত্যাগ করল। মদীনার আলেম-ওলমা, আমীর ওমরা তাঁর সাথে শেষ সাক্ষাতের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন। দিন দিনই তাঁদের ভিড় বেড়ে চলল।

এয়াহয়া উন্দোলুসী বলেন, "একে-তো আমারই চোখের পানি বাধা মানিছিল না, যারা তাঁর বাড়ীতে পরিশ্রম করে খাইত, তারাও রোদন করতে লাগল।" ছাত্রগণ ব্যতীত শত শত মুহাদ্দেস ও ফকীহ অশ্রু নয়নে ইমাম সাহেবের পাশে বসে রইলেন।

তাপ ক্রমান্বয়ে কমে আসতেছে। ইমাম সাহেবের দুই নয়ন বেয়ে অশ্রু গড়ায়ে পড়তেছে।

কায়নবী ইমাম সাহেবের বিশিষ্ট ছাত্র ছিলেন। ইমাম সাহেবের মৃত্যু শয্যায় তিনি উপস্থিত ছিলেন। তিনি ইমাম সাহেবকে তখনও রোদন করতে দেখে বললেন, "হযরত, এখনও কি আপনি রোদন করতেছেন?" ইমাম সাহেব বললেন, "কায়নবী, আমি যদি রোদন না করি, তবে কে রোদন করবে? আক্ষেপ!

আমার প্রত্যেকটি কেয়াসী ফতোয়ার পরিবর্তে যদি কেউ আমাকে এক একটি কোড়া মারত এবং এইরূপে আমাকে ফতোয়া দেয়া হতে বিরত রাখত!"

তখনও অশ্রু গড়ায়ে পড়তেছে। ওষ্ঠ মোবারক নড়ছে। তাঁর প্রাণ-পাখি দেহ পিঞ্জর হতে উড়ে গেল। শয্যার চারপার্শ্বে ছাত্র, মুহাদ্দেস ও ফকীহগণ বেহুশ মাতোয়ারা। ইমাম সাহেব চির নিদ্রায় নিদ্রিত হলেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।

ইমাম সাহেব ৯৩ হিজরীতে এ ধরার অতিথি হন। আর ৮৬ বছর বয়সে এই নশ্বর পৃথিবী পরিত্যাগ করেন। চব্বিশ বছর বয়সের সময় তিনি শিক্ষাদান কার্য আরম্ভ করেন। তিনি বাষট্টি বছর পর্যন্ত এলমে দীনের খেদমত করেন।

জানাযায় অসংখ্য লোকের ভিড় হলো। মদীনায় ওয়ালী আবদুর রহমান বিন মুহাম্মদ হাশেমী স্বয়ং পদব্রজে তাঁর জানাযায় শরীক হন। লাশ বহনকারীদের মধ্যে তিনিও অংশগ্রহণ করেন। মদীনার এক সর্বশ্রেষ্ঠ কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ), হযরত ওসমান (রাঃ), ইমাম হুসাইন (রাঃ), হযরত ফাতেমা (রাঃ), হযরত হাফসা (রাঃ) এবং ইসলাম-জগতের অপরাপর বহু বিশিষ্ট লোককে সেই কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে।

ওমর বিন ছায়াদুল আনসারী স্বপ্নে এক ব্যক্তিকে নিম্নলিখিত কবিতা পাঠ করতে শুনলেন!

ইমাম যেদিন কবরে শায়িত হলেন, তখনই ইসলামের স্তম্ভ হেলিয়া পড়ল। তিনি হিদায়াতের নেতা ছিলেন; তিনি এলমের চিররক্ষক ছিলেন। তাঁর উপর কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্ শান্তি বর্ষিত করুক!

দূরবর্তী শহর-বন্দর ও অন্যান্য রাজ্যসমূহের আলেমবৃন্দ যখন তাঁর মৃত্যু সংবাদ অবগত হলেন, তখন প্রত্যেক স্থানে শোকের তুফান বইতে লাগল।

কুফায় সুফিয়ান বিন আনীয়ার কাছে যখন এই নিদারুণ সংবাদ পৌঁছল, তখন তাঁর মুখের শব্দ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল। আর যখন তাঁর মুখে জবান ফিরে আসল, তখন তিনি বলে উঠলেন, 'এই বিশ্ব-চরাচরে তিনি তাঁর সমকক্ষ আর কাউকেও রেখে যাননি।"

আহমদ বিন জায়েদ বললেন, 'খোদা তাঁর উপর রহমত করুক! ধর্ম-জগতে তাঁর বিশেষ গুরুত্ব ছিল।

জগত যতদিন পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে, ততদিন পর্যন্ত লোকেরা তাঁর শোক পালন করতে থাকবে। আবু মুহাম্মদ জাফর কাদেরী বাগদাদী লিখেছেন, বজ্র-

বিশিষ্ট মেঘের উচিত যে, সেই কবরকে ভিজায়ে শীতল করে দেয়া, যে কবর ইমাম মালেককে এটার বুকে স্থান দিয়েছে। তিনি সেই ইমাম যিনি 'মুয়াত্তা' লিখেছেন। এই কিতাব সম্বন্ধে বিশ্ববাসী এক মত। তিনি সেই ব্যক্তি যিনি স্বীয় 'মুয়াত্তা' মারফত পয়গাম্বরের শরীয়তকে দুরস্ত করেছেন এবং তাঁর অন্তরে এই ভয়ও ছিল যে, শরীয়তের প্রতি যেন বিন্দু পরিমাণও অবিচার করা না হয়। তাঁর সনদ সহী ও অকাট্য এবং লোকেরা তাঁকে দেখলে ভয় পেত। তিনি যখন রেওয়ায়েত করতেন, তখন সকলেই তা বিশেষ মনোযোগের সাথে শ্রবণ করত। তাঁর বহু উপযুক্ত শাগরেদ রয়েছেন এবং তাঁরা প্রত্যেকেই বিখ্যাত লোক। ইমাম শাফেয়ী ব্যতীত প্রত্যেকেরই তাঁর ছাত্র হিসেবে গৌরব করবার বহু কিছু রয়েছে।

ইমাম সাহেবের জন্ম মৃত্যু সম্বন্ধে জনৈক কবি নিম্নলিখিত কবিতা লিখেছেনঃ তিনি ছিলেন ইমামদের ফখর এবং পীর-সমাজে মহা মুরব্বি।

তাঁর জন্ম-দিবস হেদায়তের তারাকারাজিস্বরূপ
মৃত্যুর পূর্বেই তিনি হয়েছিলেন বিজয় মাল্যে ভূষিত।

স্বভাব-আমল ও জিন্দেগানী

মহা বুজুর্গদের স্বভাব-চরিত্র ও জীবন-পদ্ধতি সম্বন্ধে এমনভাবে অতিরঞ্জিত করা হয় যে, তাঁদের প্রকৃত জীবন লোক-চক্ষুর অগোচরেই থেকে যায়। তখন মানব-সমাজ এক মহা উপকার হতে বঞ্চিত থেকে যায়। তাঁদের জীবন প্রকৃতপক্ষেই মানব-সমাজের জন্য একটি মহা কল্যাণ ভাণ্ডার। সুখের বিষয় এই যে, ইমাম সাহেবের জীবন-সম্বন্ধে আমাদেরকে সেই বিভ্রাটে পতিত হতে হয়নি।

এলাহী-আনুগত্য

তিনি মস্তবড় একজন আবেদ ছিলেন। শিক্ষা দান ও ফতোয়া দানের পর তিনি যা কিছু সময় পেতেন, এদের অধিকাংশই তিনি এবাদত-বন্দেগী ও তেলাওতে কাটায়ে দিতেন। কোন এক ব্যক্তি ইমাম সাহেবের কোন একজন পরিবারস্থ লোককে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, ইমাম সাহেব ঘরে কি কি কাজ করতেন। জবাবে তিনি বলেছিলেন যে, তিনি প্রায় সময় এবাদত-বন্দেগী ও তেলাওয়াত করতেন। তাঁর কন্যা বলছেন, "ইমাম সাহেব, জুমার রাত্রে এবাদত বন্দেগীতে মশগুল থাকতেন।"

রাসূল-প্রেম

তিনি রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা রাখতেন। তাঁর নাম শুনলেই ইমাম সাহেবের চেহারার রং পরিবর্তিত হয়ে যেত। লোকেরা এটার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেন, "হযরতের রূহ-মোবারক এমনই পবিত্র মধুর যে, তাঁর নাম শুনামাত্র আমার মনে জাগে, আমার ও তাঁর মধ্যে কতখানি আকাশ পাতাল পার্থক্য রয়েছে!"

ইমাম সাহেব ওজু গোসল না করে কখনও কালামে-নবুওত মুখে আনতেন না। ইমাম সাহেবের আস্তাবলে বহু ঘোড়া ও খচ্চর থাকত কিন্তু মদীনার রাস্তার ঘোড়া বা খচ্চরের উপর আরোহণ করে বের হননি। লোকেরা এটার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেন, "যে জমিনের বুকে রাসূল (সাঃ) চলাফেরা করেছেন, তথায় ঘোড়া বা খচ্চরের উপর চড়ে চলাফেরা করতে আমার লজ্জাবোধ হয়।" হযরতের প্রতি অপরিসীম ভালবাসা এবং হাদীস নববীর আপ্রাণ খেদমতের কল্যাণে এমন একটি রাত্রিও পার হতো না যে, ইমাম সাহেব স্বপ্নে রাহমাতুল্লিল আলমীনকে না দেখতেন।

মদীনা-প্রেম

মদীনাকে তিনি প্রাণাধিক ভালবাসতেন। হজ্ব উপলক্ষ ব্যতীত তিনি কখনও মদীনার বাইরে যেতেন না। খলীফা মনসূর তাঁকে বাগদাদে যেয়ে বসবাস করার জন্য আহ্বান করলেন। জবাবে তিনি জানায়ে দিলেন, "অর্থ লোভীদেরকে আপনি অর্থলালসা দেখাবেন। আপনি ইচ্ছা করলে, আপনার প্রদত্ত পূর্ব অর্থও নিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু আমি কস্মিনকালেও মদীনা পরিত্যাগ করতে পারি না। রাসূল (সাঃ) বলছেন, 'মদীনায় মানুষের জন্য বহু মঙ্গল রয়েছে; তারা যদি অবগত থাকত!' মদীনার চেয়ে মক্কা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তথাপি ইমাম সাহেবের মদীনার প্রতি অধিক আসক্তি ছিল।

দানশীলতা

আজ আলেমদের দারিদ্র্যতা ও কৃপণতা দেখে কেউই হয়ত বিশ্বাস করবে না যে, এমনও একদিন ছিল, যখন ওলামা ও বুজুর্গানে দীন দানশীলতায়ও রাজা-মহারাজাদের চেয়ে পশ্চাদপদ ছিলেন না।

হযরত রবীয় এলম শিক্ষায় বত্রিশ হাজার দীনার ব্যয় করেন। ইমাম আবু

হানীফা ছাত্রদেরকে দুই হাতে দান করতেন। ইমাম লাইস মিসরী স্বীয় ধনের অধিকাংশ অর্থ শিক্ষা ব্যাপারে ব্যয় করতেন।

ইমাম মালেকও দানশীলতায় কারও চেয়ে পশ্চাদ ছিলেন না। ইমাম শাফেয়ী একদিন ইমাম সাহেবের আস্তাবল দেখে বহু প্রশংসা করেন। ইমাম সাহেব নজরস্বরূপ তা ইমাম শাফেয়ীকে প্রতি বছর এগার হাজার দীনার বখশীশ স্বরূপ প্রদান করতেন।

অতিথি পরায়ণতা

আতিথ্য আরববাসীর স্বভাবগত ধর্ম। এটা মুমিনের পক্ষে অপরিহার্য কর্তব্য। কিন্তু ইমাম সাহেবের আতিথ্য অন্য ধরনের ছিল। ইমাম শাফেয়ী যখন তাঁর খেদমতে এলম শিখতে যেতেন তখন তিনি নিজ হাতে সবকিছু এনে তাঁকে আহার করাতেন। ...ফজরের নামাযের জন্য তিনি নিজ হাতে তাঁর জন্য ওজুর পানি এনে রাখতেন। বিদায়ের সময় তিনি নিজে যেয়ে তাঁর ফিরবার সুখ-সুবিধার বন্দোবস্ত করে দিয়ে আসতেন।

কার্যে-মনোনিবেশ

স্থিরতা, ধীরতা ও বিশেষ মনোযোগের সাথে কোন কাজ করার ক্ষমতা আল্লাহ্ তায়ালার একটি মহা দান। একদিন কূফার জামে মসজিদে খারেজীরা সশস্ত্রে ঢুকে পড়ে। সকল লোক পালাবার নিমিত্ত খাড়া হয়ে গেল। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা একটু নড়াচড়াও করলেন না।

একদিন ইমাম মালেকের মোজার মধ্যে বিচ্ছু প্রবেশ করে। ইমাম সাহেব প্রথমে তা টের পাননি। তিনি শিক্ষা-মজলিসে এসে বসে পড়লেন। বিচ্ছু দংশন করতে আরম্ভ করল। কিন্তু ইমাম সাহেব পড়ায়ে যেতে লাগলেন। সত্তর বার বৃশ্চিক তাঁকে দংশন করল। কিন্তু মজলিসের আদব রক্ষার্থে তিনি একটু নড়াচড়াও করলেন না। তাঁর চেহারার রং পরিবর্তিত হয়ে গেল। শিক্ষাদান কার্য শেষ হলে আবদুল্লাহ্ বিন মুবারক, এটার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তখন তিনি বললেন, "মোজায় বৃশ্চিক ঢুকেছিল।"

ক্ষমা ও ধৈর্য

সাধারণত লোকদের মাঝে তেজ, বীর্য ও সাহসিকতার সাথে ধৈর্য ও ক্ষমার প্রায়ই সমন্বয় দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু ইমাম সাহেবের চরিত্রে এই উভয়

গুণের সমন্বয় ছিল। এক দিক দিয়ে তো মনসূর ও হারুণুর রশীদের মত খলীফাদেরকে তিনি শাসায়ে দিতেন। অপর দিক দিয়ে তিনি স্বীয় পৃষ্ঠে কোড়ার আঘাতও নীরবে বরদাস্ত করেছেন। আর মনসূর যখন সেই পাপীকে শাস্তি প্রদানের কথা তাঁকে পরিজ্ঞাত করলেন, তখন তিনি বললেন, "আমি তাঁকে ক্ষমা করে দিয়েছি।"

ইমাম সাহেবের বিশিষ্ট ছাত্র মঈন বিন ঈসা বর্ণনা করেন যে, ইবনে সরহুন নামে এক কবি ইমাম সাহেবের কাছে বলতে লাগলেন, "আমি দুই একটি কবিতায় আপনার নাম উল্লেখ করেছি। আপনার অনুমতি ব্যতীত এই কাজ করেছি, সেজন্য আপনার কাছে ক্ষমা চেয়েছি।" ইমাম সাহেব তাঁকে ক্ষমা করে দিলেন। তারপর কবি সাহেব তাঁকে কবিতাগুলো শুনাবার আগ্রহও প্রকাশ করলেন। তখন ইমাম সাহেবের চেহারা রক্তবর্ণ হয়ে উঠল। তথাপি তিনি পরম ধৈর্যের সাথে বললেন, "শুনাতে থাকুন।" কবির সেই কবিতা পড়তে লাগলেন। কবিতার সারমর্ম এই "মদীনার মুফতী মালেকের কাছে জিজ্ঞেস করুন, ভালবাসায় কোন পাপ আছে কি?" ইমাম সাহেব শান্ত মধুর কণ্ঠে বললেন, "আমি কখনও এমন ফতোয়া দেইনি।

সত্য-প্রিয়তা ও আজাদী

বেপরওয়াভাবে সত্য কথা বলা এবং সৎকার্যে আদেশ ও অসৎকার্যে নিষেধ ওলামা ও সুফিদের জীবনের এক বিরাট অংশ। পূর্ব অধ্যায়সমূহ যাঁরা পাঠ করেছেন, তাঁরা জানতে পেরেছেন যে, ইমাম মালেক সাহেব খলীফার দরবারে মাঝে মাঝে যাতায়াত করতেন। কেউ কেউ এটার প্রতিবাদ করলে, ইমাম সাহেব বলতেন, "খলীফার দরবারে না গেলে, আমি সত্য কথা বলবার সুযোগ পাইব কিরূপে?"

পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে, একদিন অন্যান্য ফকীহদের সাথে খলীফা মনসূর ইমাম সাহেবকেও আহ্বান করে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনারা আমাকে কিরূপ ভেবে থাকেন? ইবনে আবি জেয়ব সর্বাধিক সাহসিকতার সাথে এটার জবাব দিলেন। ইমাম সাহেব তখন বলছিলেন, "আমাকে ক্ষমা করবেন; আমি এটার জবাব দিতে চাইনা" এতেও তাঁর মনের জোর প্রকাশ পায়।

ইমাম সাহেবকে কোড়া মারা হলো। এটার কারণ এই ছিল যে, সত্য প্রকাশে তিনি সরকারী হুমকিকে কোন পরওয়া করেননি।

একদিন খলীফা মনসূর মসজিদে নববীতে খুব জোরে সোরে তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ করে দিলেন। ইমাম সাহেব তাঁকে শাসায়ে দিয়ে নিম্নলিখিত আয়াত পাঠ করলেন। "নবীর আওয়াজের চেয়ে তোমাদের আওয়াজ অধিক উচ্চ করিও না।" 'অর্থাৎ আলেমগণ নায়েবে রাসূল (সাঃ)। কাজেই অ-আলেমদের পক্ষে আলেমদের আওয়াজের উর্ধ্বে স্বর উচ্চ করা আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়।

আব্বাসীয়দের মোকাবিলায় মুহাম্মদ নফস জকীয়া যখন নিজেই খেলাফতের দাবী করলেন, তখন ইমাম সাহেব প্রকাশ্যভাবে বেপরওয়া ফতোয়া প্রচার করলেন যে, মুহাম্মদ নফস জকীয়ার দাবী ন্যায্য। আব্বাসীয় জোরজবরদস্তিতে খেলাফত কেড়ে নিয়েছে।

আত্ম-সম্মান

আলেমের যদি আত্ম-সম্মান জ্ঞান না থাকে, তবে এলমেরও ইজ্জত থাকে না। আলেমগণ মহা সম্মানিত ব্যক্তি হওয়া চাই। আর তাঁদের জীবন-ধারা এমন হওয়া চাই যে, তাঁদেরকে দেখে যেন জনসাধারণ এলমের দিকে ঝুঁকে পড়ে। ইমাম মালেক বরাবরই তৎপ্রতি বিশেষ নজর রাখতেন।

পূর্বেও বর্ণনা করা হয়েছে, ইমাম সাহেব কিরূপ ধীর-স্থির ও গুরু গম্ভীর ভাবে এবং সুগভীর মনোযোগের সাথে শিক্ষাদানে ব্রতী হতেন।

বড় বড় আমীর ওমরা ও বিচারকগণ ইমাম সাহেবের খেদমতে হাজির হলে, অনেকে তাঁর ভয়ে কম্পিত থাকতেন। ইমাম সাহেব তখন বৃদ্ধ হয়েছেন। হারুণুর রশীদ ইমাম সাহেবকে তাঁর তাঁবুতে হাদীস-চর্চা করার জন্য আহ্বান করলেন। প্রত্যুত্তরে তিনি জানায়ে দিলেন, "লোকেরা এলমের কাছে আসবে। এলম লোকের কাছে আসবে না। খলীফা ইমাম সাহেবের খেদমতে হাজির হলেন বটে, কিন্তু তিনি চাইলেন যে, মজলিসের সর্বোচ্চ আসনে তিনি উপবেশন করবেন। তখন ইবনে সাহেব অতি অনায়াসে জানায়ে দিলেন যে, শিক্ষা-মজলিসের আদব রক্ষা করা সমুচিত। অতঃপর খলীফা নিম্নে আসন গ্রহণ পূর্বক বললেন, "আপনি মুয়াত্তা পাঠ করুন।" ইমাম বললেন, "এটা আমার অভ্যাসের বাইরে।" তখন জনৈক বিশিষ্ট ছাত্র তা পাঠ করে যেতে লাগলেন।

খলীফা মনসূরের দরবারের নিয়ম ছিল যে, যে কেউই তাঁর দরবারে আসতেন তিনি খলীফার হস্ত চুম্বন করতেন। কিন্তু ইমাম সাহেব এই অপমান কখনও বরদাস্ত করেন নি।

ন্যায়-প্রিয়তা

আত্ম-সম্মান, তেজবীর্য ও সত্য-প্রিয়তার চেয়ে কঠিন কাজ হলো, ন্যায়-প্রিয়তার। ন্যায়ের বেলায় অনেক লোকই টিকে না। কারও চরিত্রে বিন্দু পরিমাণ দুর্বলতা থাকলেও ন্যায়পরায়ণতা প্রদর্শন তার পক্ষে সম্ভবপর নয়। ইমাম সাহেবের চরিত্রে এসব দোষ বিন্দু পরিমাণও পরিলক্ষিত হতো না। তাঁর কাছে লোকেরা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে আসলে, তিনি সেই সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ওয়াকিফহাল না থাকলে অতি অনায়াসে বলে দিতেন, 'আমি তা জানি না।' সাধারণ লোকের পক্ষে এইরূপ বলা মামুলী ব্যাপার। কিন্তু ইমাম সাহেবের ন্যায় লোকের পক্ষে, যাঁর কাছে মাসআলা মসায়েল জানবার জন্য দূরদরাজ হতে বহু লোকের সমাগম হতো তাঁর এটা বলায় কম মনের জোর প্রকাশ পায় না। সমগ্র মসলিমরাজ্য হতে লোকজন ইমাম সাহেবের কাছ হতে মাসআলা ও ফতোয়া জিজ্ঞেস করতে আসতেন। এমতাবস্থায় ইমাম সাহেব ব্যতীত অপর কয়জনের পক্ষে 'আমি জানি না' বলা সম্ভবপর হতো!

তাঁর এক শাগরেদ বলছেন, "আমি যদি ইমাম সাহেবের 'আমি জানি না' লিখে রাখতাম, তবে তা লিপিবদ্ধ করলে, একটি গ্রন্থাকারে পরিণত হতো।

আলেমের প্রতি শ্রদ্ধা

পূর্ব-অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে যে, হারুণুর রশীদ যখন ইমাম সাহেবের মজলিসের শিক্ষা মজলিসে পদার্পণ করলেন, তখন তাঁকে শিক্ষা-মজলিসের সর্বোচ্চ আসন পরিত্যাগ করে নিম্ন আসন গ্রহণ করতে হয়েছিল।

কিন্তু একবার ইমাম আবু হানীফা যখন তাঁর খেদমতে উপস্থিত হলেন, তখন ইমাম মালেক তাঁকে এরূপ সম্মান প্রদর্শন করলেন যে, তাঁর নিজের চাদর ফরাশের উপর বিছায়ে দিলেন। ইমাম আজম চলে যাওয়ার পর ইমাম মালেক ছাত্রদের সঙ্গে বললেন যে, তিনি ইরাকের আবু হানীফা। তিনি যদি একটি স্তম্ভকে স্বর্ণে পরিণত করতে চান, তবে তাও সম্ভবপর। এটার পর কূফার মুহাদ্দেস সুফিয়ান আসলেন। তাঁর প্রতিও ইমাম মালেক সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন।

আবদুর রহমান বিন কাসেম ইমাম মালেক সাহেবের পুত্র ছিলেন। কিন্তু ইমাম সাহেব যখন তাঁকে কোন চিঠিপত্র লিখতেন, তখন তাঁকে 'মিসরের ফকীহ' বলে সম্বোধন করতেন।

একদিন কায়নবী নামক একজন মুহাদ্দেস তাঁর খেদমতে উপস্থিত হলেন। ইমাম সাহেব তাঁকে অভ্যর্থনা করার মানসে ছাত্রসহ নিজেই আগায়ে গেলেন।

শারীরিক অকৃতি

রং ছিল সাদা ও লালের সংমিশ্রণ। শরীর ভারী। ললাট প্রশস্ত। ডাগর চক্ষু। উচ্চ নাসিকা। দাঁড়ি বড় ও ঘন। মোচ খুব খাট করা তিনি পছন্দ করতেন না। তিনি খেজাব ব্যবহার করেননি।

পোশাক

তিনি বড় সৌখিন ছিলেন। তিনি সর্বদা মূল্যবান ও মনোরম পোশাক পরিধান করতেন। লোকেরা এ সম্বন্ধে কিছু আপত্তি করলে, তিনি বলতেন, "আমি মদীনায় যে সকল আলেমের সাথে মিশিয়াছি তাঁরা প্রত্যেকেই মনোরম পোশাকধারী ছিলেন।"

ইমাম সাহেবের পোশাকের বিশেষ বন্দোবস্ত থাকত। আদনের কাপড় তখন বিখ্যাত ও মূল্যবান ছিল। তিনি প্রায়ই সেই দেশের কাপড় ব্যবহার করতেন।

সুগন্ধি-ব্যবহার

তিনি সর্বদাই সুগন্ধি ব্যবহার করতেন। উদের অঙ্গার সর্বদাই তাঁর সম্মুখে জ্বলিত। পরিধেয় বস্ত্র সুগন্ধে ভরপুর থাকত। তিনি যে গলি দিয়ে চলাফেরা করতেন, সেই গলিতে অনেকক্ষণ পর্যন্ত খোশবু থাকত। আর প্রায়ই তিনি বলতেন, "খোদা যাকে নিয়ামত দিয়েছেন, তার উপর এটার কোন চিহ্ন না থাকা আমি পছন্দ করি না।" মাঝে মাঝে তিনি কাঁধে রুমালও ব্যবহার করতেন। সেই জমানায় এটা আলেমদের একটি চিহ্ন ছিল। তিনি পাগড়ীও ব্যবহার করতেন। হাতে চাঁদির একটি আংটি ব্যবহার করতেন। এতে কাল পাথরের উপর খোদিত ছিল–

ইমাম মালেক মদীনার বুকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এটা কি কম সৌভাগ্যের বিষয়! তিনি আরও একটি সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছিলেন যে, তিনি যে বাড়ীতে বাস করতেন, তা ছিল হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বাড়ী। আর যেখানে তাঁর শিক্ষা-মজলিস বসিত, তা ছিল হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর দৌলতখানা। সেখানে প্রায়ই হাদীস আলোচনার মজলিস বসত। এই সকল কারণে তিনি শুধু এলম ও মা'রেফাত সম্বন্ধেই ফারুকে আজমের উত্তরাধিকারী হননি, বরং তিনি তাঁর বাহ্যিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারীও হয়েছিলেন।

মুয়াত্তা ইমাম মালেক

এটা ইমাম সাহেবের মূল রচনা। কোরআন-পাকের পরেই এটার স্থান। কোরআন হলো আল্লাহর কালাম। আর হাদীস হলো রাসূলের কালাম।

হিজরতের প্রথম শতাব্দী পর্যন্ত আহাদীসে নববী পবিত্র লোকদের বুকেই শুধু স্থান লাভ করেছিল। এটা বিভিন্ন প্রকারে ভিন্ন ভিন্ন শেখদের কাছে মজুদ ছিল। সাহাবাদের পরে তাবেয়ীনদের জমানা আরম্ভ হয়। তখন ওমর বিন আবদুল আজীজ (রাঃ) খেলাফত লাভ করেন। তিনি খলীফা হিসেবে যেমন অতি উচ্চ শ্রেণীর খলীফা ছিলেন, মুহাদ্দেস হিসেবেও তাঁর স্থান কম উচ্চে ছিল না। আল্লামা জাহবী তাঁকে হোফফাজদের অন্তর্গত বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁরা ইশারায় হাদীসকে কিতাব আকারে লিপিবদ্ধ করা হয়। একশত হিজরীতে আবু বকর বিন হাজম (রাঃ) সর্বপ্রথমে হাদীসের সঙ্কলন করেন! তারপর মুহাম্মদ বিন শেহাবুজ্জহুরী, যিনি সকল মুহাদ্দেসদের ইমাম ছিলেন, তিনি হাদীসের দ্বিতীয় সঙ্কলন প্রণয়ন করেন। রবীয় বিন সবীহ ও সাঈদ বিন আরওয়া হাদীসে তৃতীয় সঙ্কলন প্রণয়ন করেন।

প্রথম সঙ্কলন যা আবু বকর (রাঃ) দ্বারা সঙ্কলিত হয়েছিল, তাতে সম্ভবতঃ সাহাবাদের ফতোয়া স্থানলাভ করেছিল। ইমাম জহুরীর সঙ্কলনে হাদীসের অধ্যায় সমূহ ও অন্যান্য বিষয় পৃথক ছিল না। রবীয় ও সঈদের সঙ্কলনে প্রত্যেক বিষয় ভিন্ন ভিন্ন ছিল।

১৩৩ হিজরীতে এক যুগের সূচনা হয়। তখন উম্মায়াদের খেলাফত ধ্বংস হয়ে খেলাফতে আব্বাসীয়া কায়েম হয়। তখন হাদীসের অসংখ্য সঙ্কলন সঙ্কলিত হয়। আর সেই জামানাতেই 'মুয়াত্তা' কিতাব লিপিবদ্ধ হয়।

এটাও বিশেষভাবে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর অধিকাংশ সাহাবা জেহাদের নিয়তে বিজিত দেশ সমূহে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। মক্কায় হযরত জাবের (রাঃ), শামে হযরত আবু জর (রাঃ), মিসরে ওকবা বিন আমের (রাঃ) খুরাসানে হযরত আলী (কঃ) এবং কূফায় ছিলেন ওবাইদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাঃ), কিন্তু সাহাবাদের মধ্যে বিশিষ্ট দল যাদের মধ্যে অধিকাংশ ফকীহ ছিলেন, তাঁরা মদীনাতেই রয়ে গেলেন।

সাহাবাগণ যে যেখানেই ছিলেন, সেইখানেই রেওয়ায়েত করতে থাকেন। তাঁদের পরে তাবেয়ীগণ তাঁদের উত্তরাধিকারী হন। দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত রেওয়ায়েত সমূহ লিখিত ও অ-লিখিতভাবে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থেকে যায়। এদের

প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল মদীনা। দ্বিতীয় কেন্দ্র ছিল মক্কা। এতদ্ব্যতীত কূফা, বসরা এবং দামেস্কও এটার কেন্দ্র ছিল।

ইমাম শাফেয়ী ও আবদুল্লাহ্ বিন মোবারক (রাঃ) সর্বপ্রথম সত্য-মিথ্যা যাচাই করার পর হাদীসকে সঙ্কলিত করেন। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ও ইমাম বোখারী হাদীসের যাচাই করে লিখিতভাবে এ সকলকে একত্র করেন।

ইমাম মালেকের জমানায় ও সবকিছু রেওয়ায়েত সমগ্র মুসলিম রাজ্যে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পড়ে রয়েছিল। কাজেই ইমাম সাহেবের জমানায় সম্মিলিত হাদীসের যা কিছু যাচাই হয়েছিল, তা প্রত্যেকটি মুসলিম রাজ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

মক্কায় ইবনে জরীহ (রাঃ), আওজায়ী (রাঃ), শামে, সুফিয়ান সওরী (রাঃ), কূফায়, আবু সলমা হাম্মাদ (রাঃ), বসরায়, মোআম্মার (রাঃ), ইয়মনে, ইবনে মোবারক (রাঃ), খুরাসানে হাদীস সংগ্রহ করেন। নবুওতের প্রাণ কেন্দ্র ও হাদীসের সঙ্কলন, শ্রেণী বিভাগ যা নবুওতের মূলভিত্তি ছিল, এটার খেদমত ইমাম মালেকের ভাগ্যে ঘটে।

মুয়াত্তা

এতে মদীনার সবকিছু জ্ঞানের সমন্বয় ছিল। সকল নেতৃস্থানীয় সাহাবা ও সর্বশ্রেষ্ঠ তাবেয়ীন পূর্বে যাঁদের সম্বন্ধে বিস্তৃত বর্ণনা করা হয়েছে, তাঁরা সকলেই মদীনার অধিবাসী ছিলেন। পবিত্র 'মুয়াত্তা' কিতাব মদীনার সকল বুজুর্গের রেওয়ায়েত ও ফতোয়ার উপর নির্ভরশীল ছিল। এই জন্যই এই কিতাব প্রকৃত পক্ষে সর্বাপেক্ষা সহী, সর্বাপেক্ষা বিশ্বাসযোগ্য ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ আহকামে ইসলামিয়ার সমষ্টিরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

মুয়াত্তা-সঙ্কলন

এটা অতি স্পষ্ট যে, ইমাম মালেক সর্বদাই মদীনায় অবস্থান করতেন। কাজেই 'মুয়াত্তা' যে মদীনাতেই সঙ্কলিত হয়েছিল, এতে সন্দেহের কোন অবকাশ দেখি না। কিন্তু কোন্ সনে এবং কোন্ তারিখে তা সঙ্কলিত হয়েছিল, তা বলা কঠিন। তবে এতটুকু বলা চলে যে, হিজরী ১৩০ হতে ১৪০ সনের মধ্যে এটা সঙ্কলিত হয়েছিল।

১৩০ হিজরী হতে বনি উমায়াদের পতনের যুগ আরম্ভ হয়ে যায়। তৎপূর্বে গ্রন্থ-রচনা ও সঙ্কলনে খুব বেশী লোকে হাত দেননি। ১৪৪ হিজরীতে মনসূর

সর্বশেষ হজ্ব করেন। সেই সময়েই মুয়াত্তা সর্বপ্রথমে প্রচারিত হয়ে এবং প্রসিদ্ধি লাভ করে।

ইমাম সাহেব যখন 'মুয়াত্তা' সঙ্কলনে মনোনিবেশ করলেন এবং মদীনাময় এই সংবাদ রটিয়া গেল, তখন অন্যান্য আলেমগণও নিজ নিজ হাদীস সমূহকে একত্র করতে আরম্ভ করলেন। লোকেরা এ সংবাদ ইমাম সাহেবের কর্ণে পৌছায়ে দিলেন।

ইমাম সাহেব বললেন, " শুধু নেক নিয়তই কায়েম থাকবে।"

এই ভবিষ্যদ্বাণী কিরূপ অকাট্য ছিল, জগতে এটার প্রমাণ আজও আমরা দেখতে পেয়ে ও যে, 'মুয়াত্তা' আজও দুনিয়ার বুকে টিকে রয়েছে। আর অপরাপরগুলোর নাম পর্যন্তও কেউ অবগত নয়। অনেকে শুধু সেই পর্যন্ত করেই ক্ষান্ত হননি। ইমাম সাহেবের বিরুদ্ধে আন্দোলনেও অনেকে উঠে পড়ে লেগে যান।

মুহাম্মদ বিন ইসহাক সাহেব 'সীয়র ও মগাজী' কিতাবে লিখেছেন, "মালেকের কিতাব আমার কাছে এনে উপস্থিত কর। আমি এটার ত্রুটিসমূহ বের করে দেব। আমি-ই-তো মালেকের কিতাবের পরীক্ষক।"

ইমাম মালেক লেখার কাজ শেষ করে হাদীসের শেখদের খেদমতে তা পেশ করলেন। সকলেই এটাকে অত্যন্ত পছন্দ করলেন। এটা পেয়ে মদীনার জন-সাধারণ মহা খুশী হলো। সেই মজলিসে 'মুয়াত্তা' সম্বন্ধে যখন আলেম ও ফাজেলগণ অধিক উচ্চ প্রশংসা করছিলেন, তখন সাঈদ নামে একজন কবি নিম্নলিখিত কবিতা পাঠ করলেন।

আমি তাঁদেরকে আহ্বান করেছি, যাঁরা হাদীস রেওয়ায়েত করেন এবং এটাকে লিপিবদ্ধ করেন এবং ফিকাহর রাস্তায় চলাচল করেন এবং এ সকলকে জানবার জন্য আগ্রহান্বিত; আপনি কি সেই ঘর পরিত্যাগ করতে চান, যে ঘরে আল্লাহর প্রিয় জিব্রাইল আসা-যাওয়া করতেন এবং যে ঘরে আল্লাহর রাসূল ইন্তেকাল করেছেন!

হযরতের ইন্তেকালের পর তাঁর আসহাবগণ এটাকে সযতনে রক্ষা করেছেন। আপনারা সাবধান থাকবেন যে, ইমাম মালেকের 'মুয়াত্তা' যেন বিনষ্ট না হয়। এটা যদি বিনষ্ট হওয়া যায়, তবে সত্য নিরাশ্রয় হয়ে পড়বে। কিন্তু জানবেন 'মুয়াত্তা' সূর্য স্বরূপ এবং অপরাপরগুলো তারকাস্বরূপ।

কিতাবের নাম 'মুয়াত্তা' রাখা হলো কেন?

কিতাব শব্দের অর্থ হলো মুয়াত্তা। এটার অর্থ কোনকিছুর উপর চলা। যে পথে ইমাম, আলেম ও বুজর্গগণ চলে গিয়েছেন, সেই পথকেও কেউ কেউ 'মুয়াত্তা' শব্দ দ্বারা বুঝে থাকেন। এটার আভ্যন্তরীণ অর্থ এই যে 'মুয়াত্তা' কিতাব সম্বন্ধে সকলেই একজন হয়েছেন। এই জন্যই এটার নাম 'মুয়াত্তা' রাখা হয়েছে। এই কিতাব লিপিবদ্ধ হবার পর হাদীসের সকল শেখগণ উক্ত কিতাব সম্বন্ধে একমত হয়েছেন এবং একে সমর্থনও করেছেন। এইজন্যই এটা মুয়াত্তা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

কেউ কেউ 'মুয়াত্তা' শব্দের এই অর্থও গ্রহণ করেছেন যে, যে পথে অধিকাংশ লোক যাতায়াত করে, এটাকেই 'মুয়াত্তা' বলা চলে। এই অর্থেই কিতাবের নাম 'মুয়াত্তা' রাখা হয়েছে। সুন্নত শব্দের অর্থও রাস্তা। এটা সেই রাস্তা, যে রাস্তায় হযরত (সাঃ) চলে গিয়েছেন। আর এই পথেই সাহাবাগণও চলে গিয়েছেন।

রেওয়ায়েত সংখ্যা

প্রথমতঃ 'মুয়াত্তা' কিতাবে দশ হাজার হাদীস স্থান পায়। কিন্তু ইমাম সাহেব বহুকিছু পরীক্ষা করে আট হাজার হাদীস বাদ দিয়ে দেন। অবশিষ্ট ১৭২০ হাদীসের মধ্যে মসনদ ও মরফু ৬০০, মুরসল ২৩৫, মওকুফ ৬১৩, তাবেয়ীনদের ও ফতোয়া ৬৮৫ ছিল।

'মুয়াত্তা' কিতাবের বিষয়বস্তু

'মুয়াত্তা' কিতাবে অন্য কোন বিষয় স্থান পায়নি। বোখারী, মুসলেম ও তিরমিযী কিতাবের ন্যায় এটা অসংখ্য অধ্যায়ে বিভক্ত হয়নি।

মুয়াত্তা ও অন্যান্য ফুকাহায়ে মুজতহেদীনের সঙ্কলিত হাদীস

চারজন ফুকাহায়ে মুজতাহেদীনের মধ্যে প্রত্যেকের সঙ্কলন হতে এতে হাদীসের সঙ্কলন রয়েছে। মসনদে আবু হানীফা, মসনদে শাফেয়ী, মসনদে ইবনে হাম্বল কিতাব মজুদ রয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো, উক্ত তিনটি কিতাবের তুলনায় ইমাম মালেকের কিতাবের কি পার্থক্য রয়েছে। জবাবে এতটুকু বলা চলে যে, ইমাম মালেক ব্যতীত অপর কেউই নিজ হাতে কিতাব লিখে যান নাই। কোরআন পাকে বলা হয়েছে,

'মসনদে আবু হানীফা' নামে কয়েকটি কিতাব মজুদ রয়েছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এ সকল কিতাব ইমাম আবু হানীফার মৃত্যুর বহু বছর পরে লিখা হয়েছিল। তন্মধ্যে কয়েকটি ইমাম আজমের ছাত্র লিপিবদ্ধ করেন। আর মুহাম্মদ বিন ইয়াকুব এবং হাসন বিন মুহাম্মদ খসরু প্রমুখ অপরাপর কিতাব লিপিবদ্ধ করেন। এই সকল কিতাবই মসনদে আবু হানীফা ও মসনদে ইমাম আজম বলে পরিচিত হয়ে থাকে।

'মসনদে ইমাম শাফেয়ী' বলতে এই বুঝায় যে, ইমাম শাফেয়ী স্বীয় সঙ্কলনে যা কিছু হাদীস সঙ্কলন করেছেন, আবু জাফর বিন মুহাম্মদ বিন মতর নিশাপুরী বা আবুল আব্বাস নামে এক ব্যক্তি এই সবগুলো একত্রে সাজাইয়ে গুছায়ে দিয়েছেন।

'মসনদে বিন হাম্বল' কিতাবের রচনা স্বয়ং ইমাম আহমদ সাহেবই আরম্ভ করেন। তখনও এটা পাণ্ডুলিপি আকারে ছিল। ইমাম আহমদ হাম্বল সাহেব চির নিদ্রায় নিদ্রিত হলেন। পরবর্তী সময়ে ইমাম সাহেবের পুত্র আবদুল্লাহ্ এটাকে নিয়মিতভাবে সাজায়ে ঠিক করে নেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, তিনি সেই ময়দানের লোক ছিলেন না। কাজেই মূল কার্যের সাথে এটার বহু স্থানে গরমিল ছিল। কাজেই এটাকে 'মসনদে আহমদ' না বলে 'মসনদে আবদুল্লাহ্' বললেও অত্যুক্তি হবে না।

মুয়াত্তা ও সমসাময়িক কিতাব

'মুয়াত্তা' কিতাবের পূর্বে এবং সেই সময়ে অন্যান্য যে সব সনদওয়ালা কিতাব লিখা হয়েছিল এবং তন্মধ্যে কতক এখনও বিদ্যমান রয়েছে। এদের সাথে মুয়াত্তার তুলনা করলে, বুঝা যাবে যে, সহীহ বোখারী কিতাবের সঙ্কলনকারী এবং বায়হাকী কিতাবের সঙ্কলনকারীর মধ্যে যতটুকু পার্থক্য রয়েছে, ইমাম মালেক এবং তাঁর পূর্বেকার ও তাঁর সমসাময়িক সঙ্কলনকারীদের মধ্যেও ততখানি পার্থক্য রয়েছে।

'মুয়াত্তা' কিতাবের পূর্বে যাকিছু হাদীসের কিতাব লেখা হয়েছে, এদের বেলায় সাহাবা ও তাবেয়ীনদের ও ফতোয়ার উপর বেশীরভাগ নির্ভর করা হয়েছে। ইমাম মালেক 'মুয়াত্তা' কিতাবে সেহার হাদীসাবলী, অকাট্য সনদ মুরসালের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছেন। এবং তারপর দৃষ্টি রেখেছেন, আছার ও ফতোয়ার প্রতি।

অন্যান্য কিতাবের সাথে এটার সর্বাপেক্ষা প্রধান পার্থক্য এই যে, হাদীসের সম্বন্ধে অন্যান্য কিতাবে অভিযোগ করা হয়নি। কিন্তু 'মুয়াত্তা' কিতাবে শুধু সেই হাদীস নেয়া হয়েছে, যারা সম্বন্ধে কোনই অভিযোগ নেই।

তৃতীয় কথা এই যে, 'মুয়াত্তা' মদীনায় সঙ্কলিত হয়েছে। এতে হেজাজী রেওয়ায়েত রয়েছে। অপরাপর মসনদ ও কিতাব কূফা, বসরা, ওয়াসেত, শাম, য়মন এবং খুরাসান ইত্যাদি স্থানে সঙ্কলিত হয়েছে। আর এ সম্বন্ধে সকল ওলামায়ে-হাদীস একমত যে হেজাজের হাদীস ও সনদ ব্যাপারে অন্যান্য হাদীস হতে অধিক শক্তিশালী।

হাদীসের কিতাবসমূহে 'মুয়াত্তা' এর শ্রেণীগত মর্যাদা

এটা স্পষ্ট যে, ওলমায়ে হাদীস হাদীসের কিতাবসমূহকে চারভাগে বিভক্ত করেছেন। প্রথম শ্রেণীতে শুধু সেই সকল হাদীস স্থান পেয়েছে, যার সঙ্কলনকারীগণ হাদীসের ইমাম এবং এর পরীক্ষক। আর এটার সঙ্কলনকারীগণ সেহাত, সনদ এবং মুহাদ্দেসীনদের স্বীকৃতি প্রাপ্তিতে সকলের উর্ধ্বে। আর এদের প্রমাণ, বিশ্বাসযোগ্যতা ও প্রসিদ্ধি হিসেবে সর্বজন পরিচিত। এদের চেয়ে কম শক্তিশালী কিতাবগুলো দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে। প্রথম শ্রেণীতে স্থান লাভ করেছে মুয়াত্তা, বোখারী ও মুসলেম।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে স্থান দেয়া হয়েছে, তিরমিযী, আবু দাউদ এবং নেছায়ী। উক্ত উভয় শ্রেণীকেই সেহা সিত্তাহ বলা হয়। ইবনে আসীর 'জামেউল উসূল' কিতাবে উক্ত ছয়টি কিতাব একত্রে জমা করেছেন।

প্রথম শ্রেণীতে 'মুয়াত্তা' এর মর্যাদা

প্রশ্ন জাগে, 'মুয়াত্তা' বোখারী ও মুসলেম কিতাবের মধ্যে পদ-মর্যাদা হিসেবে এটার স্থান কোথায়? ওলমায়ে হাদীস এ সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। সাধারণ আলেম তো এটাকে মুসলেম বরং পরবর্তীদের মধ্যে বিশেষভাবে শাহ ওলীউল্লাহ এবং শাহ আবদুল আজীজ সাহেব 'মুয়াত্তা' কে বোখারী হতেও উচ্চে স্থান দিয়ে থাকেন এবং তাঁরা নিজেও এটার উপর আমল করেছেন।

প্রকৃত ব্যাপার এই যে, অধিক রেওয়ায়েত, অধিক মরফুয়াত ও মুরসাল হাদীসাবলীর উপর যে বোখারী ও মুসলেম নির্ভরশীল এটা সত্য। কিন্তু ফজিলত তো শুধু অকাট্য সনদ এবং প্রসিদ্ধি লাভের উপর নির্ভরশীল।

এটা সত্য যে, মুয়াত্তার হাদীসাবলী মুরসাল, মওকূফ ও অকাট্যতার দিক দিয়ে প্রসিদ্ধ। অবশ্য অন্যান্য কিতাবের এরসাল ও অকাট্যতা মুয়াত্তার রেওয়ায়েত হিসেবে দুরস্ত। কিন্তু বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, সকল মুরাছিল, মওকূফাত, অকাট্যতা, মুত্তাসেল, মরফু এবং সনদ ব্যাপারে মুয়াত্তা যে শ্রেষ্ঠ, সনদ ও রফা সম্বন্ধে ইমাম বোখারী, মুসলেম ও তিরমিযী ইত্যাদি এটার সত্যতা স্বীকার করে নিজ নিজ মোহরও এতে প্রদান করেছেন। কাজেই বুঝা যায় যে, মুয়াত্তার স্থান কত উর্ধ্বে।

মুয়াত্তার সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠত্ব এই যে, এটা ইসলামের প্রথম কিতাব। কালামুল্লার পরে ইসলামের হাতে অপর একটি সহী কিতাব কালামূর রাসূল আসে। কালামূর রাসূল মুয়াত্তাতে আত্ম-প্রকাশ করে। মুয়াত্তা ইসলামের দৃষ্টিতে সর্বপ্রথম কিতাব। কাজী আবু বকর ইবনে আরবী মুয়াত্তার শরায় লিখেছেন, 'এটাই প্রতম কিতাব। যা শরীয়তে ইসলামিয়ায় লিখা হয়েছে। হযরত সুফিয়ান বলেন, 'সর্বাগ্রে মালেক সহীহ কিতাব লিপিবদ্ধ করেন।'

শুধু পূর্ববর্তী জমানাতেই মুয়াত্তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয়নি। পরবর্তী জমানায়ও মুয়াত্তার সমকক্ষ কোন কিতাব নেই। সেইগুলো নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের দাবীও করে না। এ সম্বন্ধে ইমামবৃন্দ, মুজতাহেদীন ও ওলমায়ে হাদীসের মজবুত সাক্ষ্য বর্তমান রয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী বলেন, "পৃথিবীর বুকে কিতাবুল্লার পরে ইমাম মালেকের মুয়াত্তার চেয়ে সহীহ কিতাব আর নেই।'

ইমাম নূদী মুসলেমের শরার উপক্রমণিকায় সনদের অবস্থা সম্বন্ধে বলেন, "আমি এমন একটি কিতাব পাইছি, যা বোখারী, মুসলেম, তিরমিযী, আবু দাউদও নেসায়ী থেকে শ্রেষ্ঠ। যদিও এ সকল কিতাবও উত্তম, কিন্তু মুয়াত্তা এমন এক কিতাব যে, এটার সঙ্কলনকারী সকল মুহাদ্দেসের।

শাহ ওলি-উল্লাহ্ বলেন, ইমামদের মধ্যে ইমাম শায়েফী এবং কিতাবুল আসার সম্বন্ধে ইমাম মুহাম্মদ যা কিছু ফিকাহ রয়েছে, তা মুয়াত্তার সদকা স্বরূপ।

ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলেম যাঁরা সহীহ বোখারী ও সহীহ মুসলেম রেওয়ায়েত করছেন, যদিও তাঁদের ধারাবাহিকতা চরম সীমায় পৌছছে, কিন্তু ইমাম মালেক মুয়াত্তায় যাঁদের কাছ হতে রেওয়ায়েত গ্রহণ করেছেন এবং ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলেম যাঁদের কাছ হতে রেওয়ায়েত গ্রহণ করেছেন, মর্যাদার হিসেবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এজন্য সাধারণ ও অসাধারণের নকল ও

রেওয়ায়েতে যে পার্থক্য রয়েছে, মুয়াত্তা ও অন্যান্য কিতাবের নকল ও রেওয়ায়েতে নিশ্চয়ই ততখানি পার্থক্য রয়েছে।

মুজতাহেদ ইমামদের মধ্যে ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মুহাম্মদ এবং মুহাদ্দেসীনদের মধ্যে অসংখ্য লোকে ইমাম মালেকের মুয়াত্তা হতে রেওয়ায়েত করেছেন। তন্মধ্যে ইমাম আবদুল্লাহ্ বিন মোবারক (রাঃ), হাসীম জমীল মুহাদ্দেস ওকীয়া, ইমাম মনসূর বিন সালমা (রাঃ), মুহাদ্দেসে বাগদাদ, আবদুল্লাহ্ বিন ওহ্হাব মুহাদ্দেসে মিসর ও এয়াহয়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ফকীহদের মধ্যে ফকীহে হেশাম বিন আবদুল্লাহ্ বিন কাসেম ইত্যাদি। সুফিদের মধ্যে হযরত জুন্নুন মিসরী, খলীফাদের মধ্যে হাদী, মাহদী, হারুণ, মামুন এবং আমীন। আর সাধারণ আলেমদের মধ্যে প্রায় হাজার লোকে মুয়াত্তা ইমাম মালেক হতে রেওয়ায়েত গ্রহণ করেছেন।

ছউতী 'তরবীরুল হাওয়ালেক' কিতাবে লিখেছেন, "ইমাম মালেকের কাছে যত সংখ্যক রেওয়ায়েত করেছেন, অপর কোন ইমামের বেলায় তা দেখা যায় নাই।"

এটা সুস্পষ্ট যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এবং হাদীস রেওয়ায়েতকারীর মধ্যে মধ্যস্থ ব্যক্তি যত কম হবে, রেওয়ায়েত হিসেবে এটার গুরুত্বও তত বেশি হবে। বোখারী ও মুসলেমের রেওয়ায়েতে প্রায়ই পাঁচ ছয়টি মধ্যস্থতা রয়েছে। মুয়াত্তার হাদীসে দুই তিনটির অধিক মধ্যস্থতা নেই। ইমাম বোখারীর কোন কোন রেওয়ায়েতে তিন জন মধ্যস্থ লোক রয়েছে। তজ্জন্য তিনি গৌরব করতে পারেন। আর ইমাম মালেক তিন জন মধ্যস্থ লোকের অধিক মধ্যস্থতার কোন রেওয়ায়েতই গ্রহণ করেননি। ইমাম মালেক এমন হাদীসও বর্ণনা করছেন যে, তাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে মাত্র দুই জন মধ্যস্থ লোক ছিলেন।

মুয়াত্তার সংস্করণ

অসংখ্য লোকে অসংখ্য ভাষায় ইমাম সাহেবের কাছ হতে মুয়াত্তা হাসিল করেছেন। তাঁদের সংখ্যা অধিক হওয়ার ফল এই দাঁড়িয়েছে যে, প্রত্যেকের রেওয়ায়েতেই কিতাবের অধ্যায়ের বিন্যাস, আগে বা পরে এবং কোন কোন শব্দে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। কাজেই ইমাম মালেকের মুয়াত্তার রেওয়ায়েত ত্রিশ রকমে করা হয়। তন্মধ্যে ষোল রকম রেওয়ায়েত সুপ্রসিদ্ধ। তন্মধ্যে আবার

এগারটি বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন ও বিশ্বাসযোগ্য। অর্থাৎ এয়াহয়া, ইবনে বাকীর, আবু মসহাব এবং ইবনে ওহ্হাবের রেওয়ায়েত সর্বাধিক মর্যাদা-সম্পন্ন ও বিশ্বাসযোগ্য। কিন্তু এয়াহয়ার রেওয়ায়েত সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য, সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ও সর্বাপেক্ষা গ্রহণোপযোগী এতে প্রথমে যথাক্রমে নামায, যাকাত ও রোযার বর্ণনা করা হয়েছে। এটার পরের অধ্যায়ে হজ্ব সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। অতঃপর এতে অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। বোখারী এবং মুসলেমেও এই জাতীয় মতবিরোধ রয়েছে।

ইয়াহয়া বিন এয়াহয়া মসমুদী উন্দুলুসী বরবর নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। সর্বপ্রথম তাঁর দাদা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। করতবায় ইমাম মালেক সাহেবের বিশিষ্ট ছাত্র আবু আবদুল্লাহ্ জিয়াদ বিন আবদুর রহমান বিন জিয়াদুল খামছী শিক্ষা দান করতেন।

এয়াহয়া প্রথমে তাঁরই কাছে পূর্ণ মুয়াত্তার কেরাআত পাঠ করেন। জ্ঞান পিপাসা আর তাঁকে নিজ পল্লীতে থাকতে দিল না। কিন্তু এয়াহয়ার এমনই দুর্ভাগ্য যে, এয়াহয়া মুয়াত্তা পূর্ণরূপে পাঠ করার পূর্বেই ইমাম সাহেব ইন্তেকাল করেন। এ জন্যই তাঁর প্রত্যেক হাদীসই বলে শুরু করা হতো।

ইমাম সাহেব এয়াহয়াকে অত্যন্ত সম্মান করতেন। উন্দুলুসের শাসনকর্তাও তাঁকেও পরম শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। চারটি মাসআলা ব্যতীত অপরাপর সব মাসআলা সম্বন্ধে তিনি ইমাম সাহেবের তকলীদ করতেন। তিনি ১৫২ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। বিরাশি বছর বয়সে তিনি ২৩৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

আবদুল্লাহ্ বিন ওয়হ্হাবও মুয়াত্তা লিপিবদ্ধ করেন। মিসরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বিখ্যাত মুহাদ্দেস লাইস বিন সাঈদ মিসরীর কাছ হতে তিনি হাদীস হাসিল করেন। ইমাম মালেকের নামধাম শুনে তিনি মদীনায় পদার্পণ করেন। কুদরতে এলাহী ইমাম সাহেবের সঙ্কলন ও গ্রন্থরাজি লিপিবদ্ধ করার নিমিত্ত তাঁকে নির্বাচিত করেন। 'মজমুআতে ইমাম মালেক' নামে তিনি তিন খণ্ড কিতাব বের করেন। তাঁর সকল কিতাবে এক লক্ষ বিশ হাজার হাদীস স্থান লাভ করে। সেই সবগুলো হাদীসই সহী। তিনি হিজরী ১২৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৯৭ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

আবদুল্লাহ্ বিন মসলনা কায়নবীকে মুহাদ্দেসীন ইমাম সাহেবের ছাত্রদের মধ্যে সকলের উপরে স্থান দেন। তিনি ইমাম সাহেবের খেদমতে আট বছর কাল ছিলেন। বার্ধক্যে তাঁকে অবলম্বন করেই ইমাম সাহেব চলাফেরা করতেন।

ইবনুল কাসেম মালেকী মাজহাবের একজন বিখ্যাত ফকীহ ছিলেন। তিনি মালেকী মাজহাবের বিরাট খেদমত করেন। 'কিতাবুল মাদুনতুল কুবরা' কিতাব তিনিই সঙ্কলন করেন। ইমাম সাহেবের সমুদয় ফতোয়াকে তিনি এক কিতাবের আকারে সঙ্কলিত করেন। জোহদ ও পরহেজগারীতে তিনি যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেন। ইবনে কাসেম শুধু এলম-জগতেই সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন না, বরং তিনি রোম, বরাবর ও অন্যান্য জেহাদে তাঁর জীবনের হারুণুর রশীদ ইমাম সাহেবের শিক্ষা-মজলিসে তাঁরই পাঠ-দান শ্রবণ করেন। ইমাম সাহেবের চল্লিশ হাজার ফতোয়া তাঁর এয়াদ ছিল। তিনি মদীনায় ১৯৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

আবদুল্লাহ্ বিন ইউসূফ দামেস্কে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি উন্দুলুসে বসবাস করেন। তিনি ইমাম বোখারী শেখ ছিলেন। ইমাম বোখারী তাঁর এলম ও ফজল সম্বন্ধে প্রশংসা করেন।

ইমাম বোখারী অন্য কোন মধ্যস্থতা ব্যতীত ও ইমাম মুসলেম মধ্যস্থতার মারফতে এয়াহয়া বিন বকীরের কাছ হতে রেওয়ায়েত করেন। ইমাম সাহেবের ফতোয়াকে তিনি পৃথকভাবে রেসালা আকারে লিপিবদ্ধ করেন। ইমাম সাহেবের মুয়াত্তা তিনি চৌদ্দবার পাঠ করেন।

সাঈদ বিন আফীর মিসরের একজন বুজুর্গ লোক ছিলেন। তিনি লাইস মিসরী ও ইমাম মালেক হতে রেওয়ায়েত করেন। ইমাম বোখারী তাঁর কাছ হতে রেওয়ায়েত করেন। এলমে হাদীস ব্যতীত ইতিহাস, সীয়র, সাহিত্য এবং কবিত্বে তিনি পরিপূর্ণতা লাভ করেন। তিনি ১৪৬ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২২৬ হিজরীতে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

আবু মাসআব জহুরী মদীনার একজন শেখ ছিলেন। তিনি জীবিত থাকা অবধি মদীনাবাসীগণ ইরাকবাসীকে বড় বেশী গণনা করত না। সেহা সিত্তায় তাঁর রেওয়ায়েত স্থান পাইছে। তিনিই ইমাম সাহেবকে সর্বশেষে মুয়াত্তা পড়ে শুনান। তিনি মদীনার কাজীপদে অধিষ্ঠিত থেকেই ২৪০ হিজরীতে মারা যান।

ইমাম শাফেয়ী (রাঃ)

[জন্ম হিজরী–১৫০ সন, মৃত্যু হিজরী–২০৪]

বৈশিষ্ট্য

* বংশের দিক দিয়ে তিনি হাশেমী ও মুত্তলেবী ছিলেন।
* হাদীস শাস্ত্রে তিনি পণ্ডিত ও ফিকাহ-শাস্ত্রে অতুলনীয় ছিলেন। 'কিতাবুল উম্ম' তাঁর স্বরচিত কিতাব। এদের দীপ্তিতে তিনি উজ্জ্বল থাকবেন।
* সত্যের খাতিরে তিনি বহু দুঃখ কষ্ট বরণ করেছেন। দুঃখ-কষ্টকে তিনি কোন দিন পরওয়া করেননি।
* তিনি বহু নামজাদা তার্কিক ছিলেন। সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি বহু দেশ-বিদেশ পর্যটন করেন। বহু বিখ্যাত লোকের সাথে তিনি তর্কবিতর্ক (বাহাস্) করেন।
* কিছুকালের নিমিত্ত তাঁর মাজহাব মিসরের সরকারী মাজহাব ছিল। এখনও মিসরে বহু শাফেয়ী দেখতে পাওয়া যায়।

জন্ম, শৈশব ও শিক্ষা

নাম মুহাম্মদ। ডাক নাম আবু আবদুল্লাহ্। উপাধি 'হাদীসের সাহায্যকারী।' শাফেয় নামে তাঁর একজন পূর্ব-পুরুষ ছিলেন। সেই হিসেবেই তিনি শাফেয়ী বলে অভিহিত।

বংশ ধারা–মুহাম্মদ বিন ইদ্রিস-বিন আব্বাস-বিন শাফেয় বিন সায়েব-বিন ওবাইদ-বিন আব্দ-বিন হাশেম-বিন আবদুল মুত্তালেব-বিন আব্দে মোনাফ আল-কোরাইশ আল-হাশেমী-আল-মুত্তলেবী। তাঁর সপ্তম পুরুষ হুজুর আলাই হিচ্ছাল্লামের সাথে মিলিত হয়েছেন। এটার চেয়ে কৌলিণ্য আর কি থাকতে পারে! আল্লামা তাজুদ্দীন সাবকী রাহমাতুল্লাহে আলাইহে ইমাম সাহেবের মাতাকে হাশেমী বংশোদ্ভবা বলে উল্লেখ করেছেন।

কিন্তু এটা সত্য যে, তাঁর মাতা উজ বংশের কন্যা ছিলেন। এটা সেই দেশের এক সম্ভ্রান্ত ও বিখ্যাত পরিবার ছিল। দাদার দিক দিয়ে ইমাম সাহেবের অংশ অধিক শ্রেষ্ঠ ছিল। তিনি কোরাইশ হাশেমী ও মুত্তলেবী ছিলেন।

তাঁর পিতা ইদ্রিস বিন আব্বাস পবিত্র মদীনার সন্নিকটবর্তী একটি ক্ষুদ্র শহরে বাস করতেন। পরে তিনি মদীনায় চলে আসেন। জীবিকা সংস্থানের নিমিত্ত তিনি শামদেশে প্রস্থান করেন। সেখানে আসকলান নামক স্থানে তিনি বসতি স্থাপন করেন। ইমাম সাহেবের দাদা আমজাদ শাফেয় এবং তাঁর পিতা উভয়েই সাহাবী ছিলেন।

সায়েব বিন ওবাইদ বিন আব্দ, হাশেম বিন মোত্তালেব বিন আব্দ মোনাফ মুত্তলেবী ইমাম শাফেয়ী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর দাদা ছিলেন।

খতীব কোন সনদ ব্যতীতই ইমাম শাফেয়ী সম্বন্ধে বর্ণনা করেছেন যে, বদর যুদ্ধের প্রস্তুতির সময় সায়েব ঈমান আনেন। তিনি অংশীবাদীদের পক্ষে বনি হাশেমদের পতাকাবাহী ছিলেন। তখন তিনি গ্রেপ্তার হন অর্থ-দানে তিনি মুক্তিলাভ করেন। অতঃপর তিনি দীন-ইসলাম গ্রহণ করেন।

বায়হাকী বলেছেন, "সায়েব বিন ওবাইদ (রাঃ) সাহাবা ছিলেন আর তাঁর পুত্র শাফেয় (রাঃ) ও সাহাবা ছিলেন। আর তাঁর ভাই আবদুল্লাহ্ বিন সায়েব (রাঃ) ও সাহাবা ছিলেন।

জন্ম

তিনি গুজ্বাতে রজবের চাঁদে ১৫০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জন্মগ্রহণ করার কিছুদিন পূর্বেই তাঁর পিতা মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, 'আমি গুজ্বাতে জন্মগ্রহণ করি। তারপর আমার মাতা আমাকে আসকলান নিয়ে যান।'

শৈশব

জন্মের পূর্বেই তাঁর পিতা ইন্তেকাল করেন। তাঁর মাতা তাঁকে দুই বছর দুগ্ধ দানের পর তাঁকে সহ এয়মনে স্বীয় বংশের লোকের কাছে ফিরে আসেন। ইমাম সাহেব তাঁর মামুর বাড়ীতে আট বছর পর্যন্ত লালিত পালিত হন। সাত বছর বয়সের সময় তিনি কোরআন শরীফ মুখস্ত করেন। আর দশ বছর বয়সের সময় তিনি ইমাম মালেকের মুয়াত্তা কিতাব কণ্ঠস্থ করেন।

স্বপ্ন ও এটার তাৎপর্য

ইমাম শাফেয়ী বললেন, 'হে বৎস, তুমি কোন বংশের সন্তান?' আমি বললাম, আমি হুজুরের (সাঃ) খান্দানের লোক। হুজুর (সাঃ) বললেন, 'তুমি আমার কাছে এস।' আমি যখন হুজুরের (সাঃ) কাছে গেলাম, তখন তিনি আমার

মুখ হতে থুথু দিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, "যাও, খোদা তোমার প্রতি বরকত নাজিল করুক,!"

ইমাম শাফেয়ী বললেন, "আমি সেই জামানাতেই আবার হুজুর আলাইহি ছালামকে স্বপ্নে কাবাশরীফে নামায পড়তে দেখলাম। নামায শেষে তিনি লোকদেরকে শিক্ষা দিতে লাগলেন। আমি তখন তাঁকে কাছে যেয়ে আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমাকেও কিছু শিক্ষা দিন। তিনি তাঁর আস্তিনের নীচ হতে একটি পাল্লা আমাকে দান করে বললেন, "আমি এটা তোমাকে অর্পণ করেছি।" ইমাম শাফেয়ী বলেন, "আমি এক বুজুর্গের কাছে এটার তাৎপর্য জিজ্ঞেস করলাম।" তিনি বললেন, আপনি দুনিয়ায় হুজুর আলাইহিছ্ছালামের সুন্নত তাজা করার উদ্দেশ্যে ফিকাহ-সঙ্কলন ও প্রচারের ইমাম হবেন।"

স্বপ্নে তিনি একদিন হযরত আলী (কঃ)-কে দেখেন। শেরে খোদা নিজ আংগুল হতে আংটি বের করে ইমাম শাফেয়ীর হাতে পরায়ে দিলেন। এই আংটির বরকতে হযরত আলীর (কঃ) এলম ইমাম সাহেবকে প্রভাবান্বিত করে।

শিক্ষা ও লালন পালন

ইমাম শাফেয়ীর মাতা তাঁকে সুচারুরূপে লালন-পালনে অসমর্থ হয়ে পবিত্র মক্কা শরীফে তাঁর চাচার কাছে প্রেরণ করলেন। তিনি শহরে থেকে লালিত পালিত হবেন এবং যতটুকু সম্ভব শিক্ষা-দীক্ষা পাবেন, এটাই ছিল তাঁর আম্মাজানের অন্তরতম কামনা। কিন্তু তাঁর চাচার আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না। কাজেই ইমাম শাফেয়ীর শিক্ষা-দীক্ষা কোন এক প্রকার চলছিল। ইমাম সাহেব তখন একজন মুরব্বী লোকের কাছে যেয়ে এ সম্বন্ধে পরামর্শ জিজ্ঞেস করলেন। তিনি তাঁকে সর্বপ্রথমে জীবিকা নির্বাহের উপায় করে তারপর এলম শিক্ষা করার পরামর্শ দিলেন।

ইমাম সাহেব বললেন, "আমার দেহমন এলমের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। আমি কোন আলেমের মুখে যদি কোন হাদীস বা মাসআলা শুনি, তখনই তা আমি এয়াদ করে রাখি এবং তা লিপিবদ্ধ করে থাকি।"

সে যা হোক, তিনি পরিশেষে মক্কা শরীফের মুফতী এবং ফিকাহ ও হাদীসের ইমাম মুসলেম বিন খালেদের অনুসন্ধান জানতে পারলেন। আর তিনি এটাও অবগত হলেন যে, ইমাম মুসলেম বিন খালেদ, মুহাম্মদ বিন শেহাব জহুরী, ওমর বিন দীনার এবং মক্কা শরীফের প্রাক্তণ মুফতী সাহেবের সাহচর্য লাভ

করবার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। তিনি ইমাম মুসলেম বিন খালেদের খেদমতে উপস্থিত হলেন। লোক চিনবার ক্ষমতা মুফতী সাহেবের ছিল অপরিসীম। ইমাম শাফেয়ীর মেধা, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও মুখস্ত ক্ষমতা দেখে তিনি মোহিত হলেন। তিন বছর সময়ের মধ্যে তিনি তাঁকে ফিকাহ ও হাদীস পরিপূর্ণরূপে শিক্ষা দিলেন।

ইমাম মুসলেম বিন খালেদের মজলিসে প্রায়ই ইমাম মালেক রাহমাতুল্লাহ আলাইহি সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা হতো। কাজেই তাঁর খেদমতে যাবার জন্য ইমাম শাফেয়ীর মনে প্রবল বাসনা জাগল। তখন তিনি তাঁর উস্তাদের কাছে পবিত্র মদীনা যাবার বাসনা জ্ঞাপন করলেন। উস্তাদ সাহেব তখনই ইমাম মালেক আলাইহির রাহমতের খেদমতে এই বলে এক সুপারিশ পত্র পাঠালেন যে, অমূল্য মাণিক্যকে আপনার খেদমতে প্রেরণ করা হলো, তিনি প্রকৃত পক্ষেই আপনার সাহচর্য হতে মহা উপকৃত হবার উপযুক্ত পাত্র। তাঁর মধ্যে অসাধারণ প্রতিভা নিহিত রয়েছে।

ইমাম শাফেয়ীর কাছে পথ-খরচটুকু পর্যন্ত ছিল না। ভ্রাতুষ্পুত্রকে সাহায্য করতে পারেন, তাঁর চাচাজীরও তেমন সংগতি ছিল না। কাজেই তিনি মাসআব ইবনে জুবাইরের কাছে স্বীয় অভাবের কথা জ্ঞাপন করলেন। তাঁর সুপারিশক্রমে সেই ব্যক্তি সাহায্যস্বরূপ ইমাম শাফেয়ীকে একশত দীনার প্রদান করলেন।

পথ-খরচ হওয়া মাত্র সবকিছু গুছায়ে নিয়ে তিনি কিছু দিনের মধ্যে মদীনায় যেয়ে ইমাম মালেক বাড়ীতে উপস্থিত হলেন। কড়া নাড়লে খাদেম এসে তাঁর নাম জিজ্ঞেস করে চলে গেল। অতঃপর ইমাম সাহেব এসে বড় খোশ-মেজাজের সাতে তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করলেন। তখন ইমাম শাফেয়ী হযরত মুসলেম বিন খালেদের চিঠি তাঁর খেদমতে পেশ করলেন। ইমাম সাহেব পত্রখানি পাঠ করে দূরে নিক্ষেপ করে বললেন, সুবহানাল্লাহ। হুজুর আলাইহিচ্ছালামের এলম কি এতই মূল্যহীন হয়ে গিয়েছে যে, এটা শুধু লোকের ওছিলা ও কিতাব পাঠ করেই লাভ করা যাবে?"

ইমাম মালেক সাহেবের রাগ দেখে ইমাম শাফেয়ী সাহেব ক্ষমা প্রার্থনার পর এলম হাসিল করার একান্ত ঐকান্তিক বাসনা জ্ঞাপন করলেন। ইমাম সাহেব তার আন্তরিকতা বুঝতে পেরে তাঁর প্রতি এক বার আপাদমস্তক দৃষ্টিপাত করে বললেন, "তোমার নাম কি?" জবাবে তিনি বললেন, "আমার নাম মোহাম্মদ ইবনে ইদ্রীস।" ইমাম সাহেব বললেন, "আল্লাহকে ভয় করতে থাক। শীঘ্রই আল্লাহ তোমাকে মহা সম্মান দান করবেন।"

উস্তাদ ও শায়খ

বিভিন্ন শায়খ বিভিন্ন পন্থায় শিক্ষা দান করেন। প্রায় শেখেরই নিয়ম এই ছিল যে, তিনি কোন উচ্চ আসনে বলে যেতেন বা দণ্ডায়মান হয়ে যেতেন, ছাত্রবৃন্দ সম্মুখে কাতার ধরে বসে যেত। উস্তাদ পড়ে যেতেন বা রেওয়ায়েত করতেন। ছাত্র তা লিখে নিত।

কিন্তু মদীনার অধিকাংশ শেখের নিয়ম ছিল যে, তিনি নিজেই হাদীসসমূহ, ফতোয়া এবং রচনা লিখে নিতেন, আর কোন একজন মেধাবী ও সমমর্যাদার ছাত্রের হাতে তিনি তা দিয়ে দিতেন। মজলিস আরম্ভ হয়ে গেলে, সেই ছাত্র তা পড়ে যেতেন এবং শেখ এটার বিস্তৃত ব্যাখ্যা বর্ণনা করতেন। সেই নিয়মানুযায়ী ইমাম মালেকের ছাত্রবৃন্দের মধ্যে ইবনে হাবীব, মআন বিন ঈসা না বলে বলতেন, "আমি ইমাম মালেক সাহেবের সম্মুখে পাঠ করেছি।"

ইমাম সাহেবের শিক্ষা-মজলিস অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ ছিল। ছাত্র ও শিক্ষক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করে মজলিসে যোগদান করতেন। সকল ছাত্র অত্যন্ত আদব সহকারে বসে যেতেন। উদ ও লুবানের গন্ধে মজলিস মাতোয়ারা হয়ে উঠত। সকল মজলিস নীরব নিঃস্তব্ধতা বিরাজ করত।

ইমাম মালেক অপরিসীম স্নেহবশতঃ ইমাম শাফেয়ীকে কেরাআত পাঠ করার অনুমতি দান করলেন। ইমাম শাফেয়ী বলেন, "আমরা কিতাবের পৃষ্ঠাও অতি সাবধানে এবং অতি ধীরে ধীরে উল্টাতাম, যেন তাতে শিক্ষা-মজলিসের নীরবতা ও নিঃস্তব্ধতার ব্যাঘাত না জন্মায়।"

ছাত্র-সমাগম, ফতোয়া-প্রার্থীদের শুভ আগমন, আমীর-ওমরাদের উপস্থিতি, নববী-ফয়েজ হাসিল করার নিমিত্ত আলেমদের পদার্পণ,—এই সবকিছু দেখে মানুষের তাক লেগে যেত।

মহামহিম মুহাদ্দেস হযরত ইমাম মালেক রাহমাতুল্লাহে আলাইহের খেদমতে তিনি প্রায়ই তিনটি বছর অতিবাহিত করেন। হাদীস, সাহাবা-মাধুর্য, তাবেয়ীনদের ফতোয়া, ইমাম মালেক রাহমাতুল্লাহে আলাইহির ফিকাহ অতি উত্তমরূপে তিনি পড়েছেন, বুঝেছেন এবং এয়াদ করেছেন।

আরও কতিপয় শেখ

ইমাম মালেক রাহমাতুল্লাহে আলাইহি ব্যতীত পবিত্র মদীনার হযরত ইব্রাহীম বিন সইয়দুল আনছারী, আবদুল আজীজ বিন মুহাম্মদ বিন ইসমাইল, আবদুল্লাহ্ বিন নাফেয় সাহেবের কাছ হতেও ইমাম শাফেয়ী বহু রেওয়ায়েত গ্রহণ

করেছেন এবং আছারে-সাহাবা ও ফতোয়া পাঠ করছেন। তিনি হাদীসের রেওয়ায়েতের যাচাই ও পৃথকিকরনের কায়দা-কানুন জেনে বুঝে সুরক্ষিত করে রেখেছেন।

এক ইমাম মালেক রাহমাতুল্লাহে আলাইহির কাছ হতে তিনি প্রায় দশ হাজার রেওয়ায়েত সুরক্ষিত রেখেছেন। তবে সেই রেওয়ায়েতে সাহাবাদের বাণী ও ফতোয়া, তাবেয়ীনদের বাণী এবং আরও মুরসাল, মওকূফ এবং সনদও সেই সকল রেওয়ায়েতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহে আলাইহি ইমাম মালেক রাহমাতুল্লাহে আলাইহির ফয়জের বরকতে এই সবকিছু হাসিল করেছিলেন। তদুপরি সাহাবা ও তাবেয়ীনদের বাণী ও ফতোয়া সম্বন্ধে বিভিন্ন মতাবলম্বীকে তিনি অতি সুস্পষ্টভাবে বুঝে নিয়েছিলেন এবং সেই সকল তিনি আজীবন স্মরণ রাখেন।

ইমাম শাফেয়ীর সূক্ষ্ম বুদ্ধি

ইমাম মুহাম্মদ বিন জরীর তবরী হতে রেওয়ায়েত আছে যে, ইমাম শাফেয়ী (রাঃ) পবিত্র মদীনায় শিক্ষা সমাপ্ত করার পূর্বে একদিন তিনি শিক্ষা মজলিসে উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি ইমাম মালেক রাহমাতুল্লাহে আলাইহির খেদমতে এসে আরজ করল, "আমি তোতা-পাখির ব্যবসায় করে থাকি। আমি এক ব্যক্তির কাছে এই বলে একটি তোতা-পাখি বিক্রয় কর যে, এটা খুব কথা বলে। ক্রেতা কিছুক্ষণ পরে এসে বলল যে, তোতা-পাখিটি তো কথা বলে না। এই সম্বন্ধে আমাদের দুই জনের মধ্যে বাক্-বিতণ্ডা আরম্ভ হয়ে গেল। তখন আমি হঠাৎ বলে ফেললাম যে, আমার তোতা পাখি কখনও চুপ থাকে না। এটা যদি চুপ থাকে, তবে আমার বিবি তালাক। এখন আপনি আমাকে বলে দিন, আমার স্ত্রী তালাক হয়ে গিয়েছে কিনা।" ইমাম মালেক রাহমাতুল্লাহে আলাইহি জবাব দিলেন, "তোমার বিবি তালাক হয়ে গিয়েছে।" সেই ব্যক্তি তখন অত্যন্ত বিষণ্নভাবে বাড়ী ফিরছিল। ইমাম শাফেয়ী (রাঃ) চুপচাপ তার পিছনে ধাওয়া করলেন। কিছুদূর যেয়েই সেই ব্যক্তিকে ডেকে ফিরায়ে বললেন, "তোমার পাখিটি অধিকাংশ সময় কথা বলে, নাকি প্রায়ই চুপ থাকে!" সেই ব্যক্তি বলল, "এটা প্রায়ই কথা বলে। তবে মাঝে মাঝে চুপও থাকে।" ইমাম শাফেয়ী সাহেব বললেন, "তুমি নিশ্চিন্ত থাক; তোমার বিবি তালাক হয়নি।" এই জবাব দিয়ে ইমাম শাফেয়ী আবার শিক্ষা-মজলিসে যোগদান করলেন। প্রশ্নকারী ফিরে এসে

ইমাম মালেক সাহেবকে বললেন, "হযরত, আমার বিষয়টি একটু গভীরভাবে তলায়ে দেখুন।" ইমাম মালেক রাহমাতুল্লাহে আলাইহি আবার সেই একই উত্তর প্রদান করলেন।

তখন প্রশ্নকারী বলল, "আপনার মাদ্রাসায় এই যে নব যুবকটি রয়েছেন, তিনি আমাকে নিশ্চিন্ত করে দিয়েছেন যে, আমার স্ত্রী তালাক হয়নি।" এতে ইমাম মালেকের মনে অধিক রাগ হলো। অতঃপর বললেন, "এখানে কম বেশীর কিরূপে পরিমাপ হতে পারে?"

ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহে আলাইহি জবাব দিলেন "হযরত. আপনি নিজেই আবদুল্লাহ্ বিন জিয়াদের (রাঃ) রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছিলেন যে, কায়েসের কন্যা ফাতেমা হুজুর আলাইহিচ্ছালামের কাছে এসে আরজ করলেন, হে আল্লাহ রাসূল, মাআবীয়া (রাঃ) ও আবু জাহাম (রাঃ) উভয়েই আমাকে বিবাহ করতে চায়।" তিনি বললেন, "আবু জাহাম তো কখনও স্কন্ধ হতে লাকড়ির বোঝা নামায় না।" অথচ হুজুর বিশেষরূপেই জানতেন যে, আবু জাহান শয়নও করতেন। আর অন্যান্য কাজেও লিপ্ত থাকতেন। এটা হতে আমি অনুমান করে নিয়েছি যে, হুজুর আলাইহিচ্ছালামের ধারণা এই ছিল যে, আবু জাহাম প্রায়ই স্কন্ধে লাকড়ি রাখতেন। এটার উপর ভিত্তি করে আমিও তাকে ফতোয়া দিয়েছি যে, যেহেতু তোতা পাখি প্রায় সময়ই কথা বলে। কাজেই তাঁর স্ত্রী তালাক হয়নি।"

ইমাম মালেক রাহমাতুল্লাহে আলাইহি প্রশ্নকারীকে বললেন, "হ্যাঁ ভাই, তুমি এখন যাও। প্রকৃতপক্ষেই তোমার স্ত্রী তালাক হয়নি। শাফেয়ীর দলীল গ্রহণযোগ্য।" ইমাম শাফেয়ীর সূক্ষ্মবুদ্ধি দেখে ইমাম মালেক বললেন, "এখন তোমারও ফতোয়া দেওয়ার মত যোগ্যতা হাসিল হয়েছে।' ইমাম মালেক ও অন্যান্য ইমামও শাফেয়ীকে অনুমতি দান করলেন।

কথিত আছে যে, ইমাম শাফেয়ী যখন ইমাম মালেকের কাছে পড়াশুনা করতে যেতেন, তখন কেউ ফতোয়া চাইলে ইমাম মালেক যখন ফতোয়া দান করতেন, তখন ইমাম শাফেয়ী দরজায় বসে থাকতেন। ফতোয়া কোন ত্রুটি ধরা পড়লে, ইমাম শাফেয়ী তা পুনরায় দেখে দিতে ইমাম মালেককে অনুরোধ করতেন। ইমাম মালেকও তখন গভীরভাবে তলায়ে দেখে স্বীয় ত্রুটি বুঝতে পেরে সেই অনুযায়ীই ফতোয়া দিতেন। তখন হতে তিনি ইমাম শাফেয়ীকে না দেখে কোন ফতোয়া দিতেন না।

মক্কা শরীফ ও অন্যান্য স্থানে ভ্রমণ

অতঃপর তিনি পবিত্র মক্কাশরীফে ফিরে আসলেন। তিনি তথায় কিছুকাল অবস্থান করেন। সেখান হতে তিনি এয়মনে যান। সেখানকার হাজীল সম্প্রদায় সমগ্র আরবদেশে স্পষ্ট ভাষার জন্য বিখ্যাত ছিল। সেখানে অবস্থান করে তিনি বিভিন্ন জ্ঞান ও বিভিন্ন শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তীরান্দাজী, অভিধান ও ইতিহাস শাস্ত্র, নুহূ-শাস্ত্র ইত্যাদিতে তিনি এইরূপ পরিপূর্ণতা লাভ করলেন যে, সমগ্র আরববাসী তাঁকে বিভিন্ন শাস্ত্রের ইমাম বলে আখ্যা প্রদান করেন।

সাহিত্য ও অভিধানে প্রসিদ্ধি লাভ

আরব সৈনিক জীবনে তীরান্দাজী একটি হৃদয় আকৃষ্টকর কাজ ছিল। সেই দৃষ্টিকোণ হতে বিচার করতে গেলে একজন ধর্মীয় আলেমের পক্ষে গাজী (ধর্ম-যুদ্ধা) হওয়া অনিবার্য প্রয়োজন। ইমাম শাফেয়ী সাহেবের তীরান্দাজী সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। তিনি তাতে পরম গৌরব অনুভব করতেন।

অভিধানের প্রয়োজনীয়তা আধুনিক জগতে কেউই অস্বীকার করে না। ইমাম সাহেব এ সম্বন্ধে সুদীর্ঘ বিশটি বছর সাধনা করেন। তিনি হাজীলে দশ হাজার কবিতা ও এটার আনুষংগিক মাল-মসলা মুখস্ত করেন।

মবরদ সাহিত্য ও অভিধানের ইমাম ছিলেন। তিনি বলতেন, অভিধান সম্বন্ধে ইমাম শাফেয়ীর দান অপরিসীম এবং তা প্রমাণ ও দলীল স্বরূপ। সাহিত্য-বিশারদ হাফেজ বলেন, "ইমাম শাফেয়ীর লেখার চেয়ে সারগর্ভ লেখা আমি আর কোথাও দেখিনি। তাঁর লেখার ধারা চমৎকার ছিল। এটাকে অমৃত-বাণী বললেও অত্যুক্তি হবে না।"

আবুল আব্বাস তলআব বলেন, "ইমাম শাফেয়ীকে অভিধান-ভাণ্ডার বলা চলে। তাঁর লেখার ধারা এমন চমৎকার যে, তা পাঠ করলে অভিধানের অর্থ ও উদ্দেশ্য বুঝতে কোন বেগ পেতে হয় না। ইমাম আবু মনসূরকে 'অভিধান-রত্ন, উপাধি দান করা হয়েছে। তাঁর পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে সকলেই একমত। তিনি বলেন, "এ সম্বন্ধে ইমাম শাফেয়ীর জ্ঞানের গভীরতা প্রগাঢ়। তিনি ইমাম শাফেয়ীর প্রচলিত শব্দ সম্বন্ধে একটি বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। এটা কিতাবরূপে পরিচিতি লাভ করেছে। ইমাম শাফেয়ী সাহিত্য ও অভিধানে অদ্বিতীয় লোক ছিলেন। মুর্খ-যুগের কবিতা তাঁর চেয়ে অধিক কেউই অবগত ছিলেন না।"

ইমাম আবু সুলাইমান হানতী অভিধান সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান রাখতেন। তিনি ইমাম শাফেয়ীর একজন প্রিয় ছাত্র ছিলেন। তিনি বলেন, "ইমাম সাহেবের ভাষা অত্যন্ত মধুর এবং লেখা হৃদয়গ্রাহী। তাঁর প্রকাশ-ভঙ্গিমাও ছিল অতুলনীয়।"

আল্লামা জমখ্শরী কশফওয়ালা লোক ছিলেন। আরবী ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিল। তিনি বলেন, "ইমাম শাফেয়ী আলেমকুল শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি শরীয়তের আলেম ও মুজতাহেদের নেতা ছিলেন। তাঁর লেখা পড়াই বুঝা যেত যে, এটা ইমাম শাফেয়ী সাহেবের লেখা। তিনি কোথা হতে কথা বলেন' তা চিন্তা করেও বুঝা যেত না। তাঁর লেখা বা বলায় কখনও কোন ভুল হতো না। আরবী ভাষায় তাঁর খুব বেশী দখল ছিল। তাঁর জানাশুনা ছিল খুব বেশী। তিনি ছিলেন জ্ঞানসমুদ্র। অভিধানের কোনকিছু তাঁর অজানা ছিল না।"

ইমাম রাজী রাহমাতুল্লাহে আলাইহি বলেন, "অভিধান-অভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ এ সম্বন্ধে একমত যে, ইমাম শাফেয়ী এ শাস্ত্রের নেতা এবং ইমাম। হাতেমের দানশীলতা ও হযরত আলীর বীরত্বের ন্যায়, ইমাম শাফেয়ীর এলম ও আদব, অভিধান ও নূহু-এলম সর্বজনগ্রাহ্য।"

ইতিহাস

আরব সাহিত্যকে রীতিমত আরবের বিস্তৃত ইতিহাস বলা চলে। যিনি আরবে অজ্ঞযুগের কবিতাবলী পাঠ করবেন, তাঁর পক্ষে আরবের ইতিহাস জানবার কোনকিছুই বাকী থাকবে না। তাঁকে নিরাপদে একজন ঐতিহাসিক বলা চলে। জনৈক বিজ্ঞলোক বলছেন, "ইমাম শাফেয়ী আরবের ইতিহাস সম্বন্ধে সবচেয়ে অধিক ওয়াকিফহাল।"

ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মুহাম্মদ বিনেল হাসানের মধ্যে যে তর্ক যুদ্ধ হয়েছিল, সেই মনোরম সংবাদ খলীফা হারুণুর রশীদ পর্যন্ত পৌছল। খলীফা ইমাম শাফেয়ীকে আহ্বান করে কোরআন, হাদীস, অভিধান, কবিতা ও সাহিত্য ইত্যাদি সম্বন্ধে বহু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন। ইমাম সাহেব এদের অত্যন্ত সন্তোষজনক উত্তর দিলেন। অতঃপর খলীফা যখন আরবী সাহিত্য ও অভিধান সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন, তখন তিনি জবাবে বললেন, "আমরা আরবের মাটি হতে পয়দা হয়েছি। এটার ভাষা আমাদের রক্তমাংসের সাথে বিজড়িত হয়ে গিয়েছে।"

জ্যোতিষ-বিদ্যা

চন্দ্র ও সূর্যের পরিভ্রমণ-স্থল, এদের গতিপথ, স্থিতিশীলতা, তারকারাজির প্রভাব ইত্যাদি তিনি সুচারুরূপে শিক্ষা করেছিলেন। হাফেজ ইবনে হাজার আসকলানী রাহমাতুল্লাহে আলাইহি বর্ণনা করেছেন যে, একদিন ইমাম শাফেয়ী

তাঁর এক বন্ধুকে বললেন, 'অমুক দিন আপনার একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করবে। তার বাম উরুতে একটি কাল তিন হবে। সে চল্লিশ দিন জীবিত থেকে হঠাৎ মারা যাবে।' বাস্তবক্ষেত্রে তাই হলো। ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তারপর সেই সম্বন্ধীয় সব কিতাব জ্বালায়ে দিলেন। আর তখন হতে সেই সম্বন্ধীয় কোন প্রশ্নের জবাব তিনি আর দেননি।

চিকিৎসা-বিদ্যা

তিনি অত্যন্ত নামকরা একজন চিকিৎসক ছিলেন। জালিনূস, আরসতু ও অন্যান্য হেকীমী কিতাব এবং রোম দেশের বহু কিতাব তিনি গভীর মনোযোগের সাথে পাঠ করেন। তিনি বলতেন, "মানুষের দেহ ও আত্মা রয়েছে। কাজেই জ্ঞানও দুই প্রকার–চিকিৎসা বিদ্যা ও এলমে দীন। তিনি প্রায়ই আক্ষেপের সুরে বলতেন, মুসলমানগণ চিকিৎসা শাস্ত্র বিনষ্ট করে দিয়েছে। তারা এলমে-দীন হাতে রেখে ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে অবশিষ্ট অর্ধেক এলমের অধিকারী করে দিয়েছে। তিনি বলতেন, " যে শহরে কোন আলেম ও চিকিৎসক নেই, তথায় বাস করা পাপ।" তিনি অত্যন্ত আক্ষেপের সাথে বলতেন, "মুসলমানগণ চিকিৎসা শাস্ত্র সম্বন্ধে গবেষণা, অনুসন্ধান ইত্যাদির বিমুখ হয়ে পড়েছে।" তাঁর জমানার চিকিৎসকগণ তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক বলে মান্য করতেন।

ইমাম শাফেয়ী সাহেবের জীবনের দুইটি দিক মুসলিম জাহান এবং বিশেষভাবে আলেম-ওলমা ও পরহেজগার দীনদার বলে আজ জগতে যাঁরা পরিচিত তাঁদের পক্ষে আগ্রহ সহকারে চিন্তা করে দেখা আবশ্যক। তন্মধ্যে চিকিৎসা-শাস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করব।

ইমাম সাহেব মানব জীবনকে দেহ ও আত্মা এই দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। এলমকেও তিনি দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন, চিকিৎসা-বিদ্যা এবং এলমে-দীন। মুসলমানগণ চিকিৎসা-বিদ্যাকে যে প্রায় বর্জন করে আসছে, তজ্জন্য তিনি মহা দুঃখিত হয়েছেন। ইহুদী ও খৃষ্টানগণ তা পরিত্যাগ করেননি। বরং এ সম্বন্ধে তারা বেশকিছু উন্নতিও করেছে।

জমির যে অংশটুকু নিম্ন তাতেই পানি গড়ায়ে যাবে। এই স্বাভাবিক নিয়মের কোনদিন কোন ব্যক্তিক্রম হতে পারে না। মানুষ যে স্থান হতে অধিক উপকৃত হবে, তৎপ্রতি তার মন অধিক আকৃষ্ট হবে। লোকটি কোন্ জাতির বা কোন্ ধর্মের তৎপ্রতি নজর রাখা প্রায় ক্ষেত্রেই মানুষের পক্ষে সম্ভবপর থাকে না।

মুসলমানগণ যদি এ সম্বন্ধে পশ্চাদপদে থাকে, তবে মুসলিম জাতি পরোক্ষভাবে অমুসলমান জাতির প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে পারে না। তখন এটার প্রতিকার না করে যদি কেউ অবান্তর শাসনপীড়নও চালায়, তবে তাতে তেমন সুফল ফলবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। এইরূপে মুসলমান জাতির একটি বিরাট সমর্থন অমুসলমানদের ভাগে পড়বে। এতে অমুসলিম জাতি লাভবান হবে এবং মুসলমানগণ এক বিরাট ক্ষতির ভাগী হয়ে পড়বে। মুসলিম জাহান তখন পরোক্ষভাবে অমুসলিম জাহানের মুখাপেক্ষী না হয়ে পারবে না। এ সম্বন্ধে মুসলিম জাহান অমুসলিম জাহানের কতক লোককে উস্তাদ না মেনে পারবে না। আধুনিক মুসলিম জাহান অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় এ সম্বন্ধেও যে খৃষ্ট জগতকে আদর্শ দেশ ভেবে থাকে, এ সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ দেখিনি। ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহের অতি সূক্ষ্ম ও দূরদৃষ্টিতে তা যথাযথভাবে ধরা পড়েছিল। মুসলিম জাহানের চিন্তাশীল ও বুদ্ধিসম্পন্ন জ্ঞানী-মানীদের পক্ষে এ বিষয়ে বিশেষভাবে তলিয়ে দেখা অনিবার্য হয়ে পড়েছে। এটার প্রতিকারার্থ আমরা যদি কোন এক দলকে আগ্রহভরে আগায়ে আসতে না দেখি, তবে মুসলিম জাহানে যে বুদ্ধিমান লোকের একান্ত অভাব, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ দেখি না। রোগ হলে ঔষধ ব্যবহার করবার নিমিত্ত রাসূল (সাঃ) রীতিমত উৎসাহ দান করেছেন। কিন্তু কোন্ রোগের কোন্ ঔষধ রয়েছে, আমরা যদি তা না জানি, তবে তা প্রশংসনীয় হতে পারে না। কাজেই ঔষধের ব্যবস্থা ও প্রস্তুতিতে ইসলাম পরোক্ষভাবে উৎসাহও প্রদান করেছে। এ সম্বন্ধে কোন আলাপ-আলোচনা হলেই প্রায় সব আলেমের মুখেই শুনা যায় যে, ইসলামের বিধানমতে চললে মানুষের কোন অসুখ হতে পারে না। হযরতের জমানায় মুসলমানগণ ইসলামের হুবহু অনুকরণ অনুসরণ করতেন। কাজেই তখন সমগ্র আরবদেশে না কোন ঔষধ, না কোন চিকৎসকের প্রয়োজন ছিল। এই সকল বলেই অনেকে স্বীয় কর্তব্য ফতে করেন।

ইসলামকে হুবহু অনুকরণ করলে, অসুখ-বিসুখ বহু কম হয়, এটাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তখন কোন প্রকার অসুখ-বিসুখ হবে না, এইরূপ ভাবা ও চিন্তা করা আদৌ প্রশংসনীয় নয়। অকস্মাৎ মানুষের বহু কিছু অসুখ হয়ে পড়ে। কোন কার্যকারণ সূত্র ব্যতীতও বহু অসুখ-বিসুখ হয়। কাজেই প্রকৃত মুসলমান বনিতে পারলেই কোন অসুখ-বিসুখ হবে না, এবং প্রকৃত মুসলমান বনিতে পারলেই চিকিৎসা শাস্ত্রেরও মুসলমানদের কোন প্রয়োজন নেই বলে যাঁরা চিন্তা করে

থাকেন, তাঁরা কতখানি প্রশংসনীয়, এবং তাঁদের এ সকল চিন্তাধারা ইসলাম-বিরোধী কিনা, তা তলায়ে দেখবার বিষয় বটে। চিকিৎসা-শাস্ত্রের যদি কোন গুরুত্ব না থাকত, তবে ইমাম শাফেয়ী সাহেবের মত লোক বোধ হয় শিক্ষাকে দুই ভাগে বিভক্ত করতেন না। এলমে দীনের ন্যায় এলমে তিব অর্থাৎ চিকিৎসা-শাস্ত্রকেও ওলামা এ সম্বন্ধে ভীষণ পশ্চাদপদ থাকায় ইহুদী ও খৃষ্টানদের প্রস্তুতকৃত ঔষধ বিশ্ব মুসলিম জনসাধারণ ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছে। আর তাদের প্রস্তুতকৃত বহু ঔষধেই মদ মিশান থাকে। শত বাধা-নিষেধ সত্ত্বেও মুসলমানগণ সেই সকল ঔষধ ব্যবহার করেছে। এইরূপ মদ মুসলমানদের দেল-দেমাগের সাথে মিশে যাচ্ছে। অমুসলমান মদখোরদের ন্যায় তারাও পরোক্ষভাবে মদখোরে পরিণত হয়েছে।

মুসলমানগণ যদি বরাবরই চিকিৎসা-শাস্ত্রকে যথাযথভাবে শিক্ষা করত ও সেই শিক্ষাকে স্বীয় প্রয়োজন-সাধনে ব্যবহার করে আসত, তখন মদ ছাড়াও যে ঔষধ তৈরী সম্ভবপর হতে পারে, তা আর নতুন করে কাউকেও কোন রকমে বুঝাবার প্রয়োজন থাকত না। তখন এই বিভাগটি মুসলমানদের হাতেই থাকত এবং অপর জাতির হাতে এটার কর্তৃত্ব তুলে দেওয়ার কোন প্রয়োজন পড়ত না। আর অমুসলমানদের ন্যায় মুসলমানগণও যে, আদর্শ ও সর্বোচ্চ চিকিৎসক বনিতে পারে, তা নূতনভাবে প্রচার করার কোন প্রয়োজন পড়ত না। পবিত্র কোরআন-হাদীস ও ফিকাহ-শাস্ত্রে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী হয়েই যদি ইমাম শাফেয়ী সাহেব তাঁর জমানার একজন অদ্বিতীয় চিকিৎসক বনিবার সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকেন, এবং প্রয়োজনীয় বলেই তিনি তা শিক্ষাও করে থাকেন, তবে পরহেজগার-দীনদার লোক বিশেষভাবে আলেমগণও আবার তৎপ্রতি মনোযোগী হবেন কিনা এবং তা একান্ত প্রয়োজনীয় কিনা, তা যদি তাঁদের মস্তিষ্কে স্থান না পায়, তবে তাঁদের মস্তিষ্কে যে তৎপূর্বে বহু অবান্তর বিষয় স্থান পাওয়াতেই চিকিৎসা শাস্ত্রের ন্যায় এইরূপ একটি অনিবার্য প্রয়োজনীয় মস্তিষ্ক হতে সেই সকল অবান্তর, অবাস্তবও অকেজো বিষয়গুলো অনতিবিলম্বে বিদূরীত করে দেয়া অনিবার্য কর্তব্য।

পাকিস্তান কায়েম হবার পূর্বে মুসলমানদেরকে বিপুলভাবে হিন্দু চিকিৎসক-দের মুখাপেক্ষীই থাকতে হতো। এইরূপে মুসলমানদেরকে অজস্র টাকা হিন্দুদের হাতে যেত। মুসলমান সমাজে যে ভাল ডাক্তার থাকতে পারে না, বহু পূর্বে এটাও প্রায় অনেকেরই বদ্ধমূল ধারণায় পরিণত হয়েছিল। দেশ বিভাগের পরেও

আমাদের দেশে বহু হিন্দু চিকিৎসক দেখতে পাওয়া যায়। এটাতে যে পয়সা ও পদমর্যাদা রয়েছে, আজও হিন্দুদের ন্যায় মুসলিম জনসাধারণের মনে তা তেমনভাবে স্থান পায়নি।

এখন যুদ্ধ-বিদ্যা সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করা যাক। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইমাম শাফেয়ী সাহেব একজন পরিপক্ক তিরন্দাজ ছিলেন। আর তজ্জন্য তিনি পরম গৌরব বোধ করতেন।

তদুপরি এ সম্বন্ধে আমরা যদি কোরআন-হাদীসের আদেশ তলায়ে দেখি তবে যুদ্ধ-বিদ্যা শিক্ষা করা এবং সৈনিক-জীবন যাপন করা ইসলামের চোখে কিরূপ মর্যাদা সম্পন্ন কাজ তা অতি সহজেই বুঝা যাবে।

হাদীস শরীফে আছে, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "তোমরা তীর ছোঁড়া অভ্যাস কর।" তিনি আরও বলছেন, "যে তীর-ছোঁড়া অভ্যাস করেছেন এবং ভুলে গিয়েছে সে আমার উম্মত নয়। সীমান্ত রক্ষার নিমিত্ত যে চক্ষু নিয়োজিত হবে, তাতে দোজখের অগ্নি স্পর্শ করবে না। সীমান্ত রক্ষার্থে যে সকল লোক নিয়োজিত হবে, তাদের নিমিত্ত যে রেশন খরচ হবে, এটার হিসেব নিকাশ হবে না।"

পবিত্র কোরআন শরীফে বলা হয়েছে, "মুসলমানগণ এমন শক্তি সঞ্চয়ে চেষ্টা করবে, যাতে তারা আল্লাহর শত্রু এবং মুসলমানদের শত্রুকে ভীত-বিহ্বল রাখতে পারে।" এই আয়াত অনুযায়ী মুসলিম জাহানের এমন শক্তি সঞ্চয়ে আপ্রাণ চেষ্ট করা উচিত ছিল যে, যাতে প্রয়োজন অনুসারে তারা রাশিয়া ব্লাক ও আমেরিকা ব্লাককে ভীত-বিহ্বল রাখতে পারে। কিন্তু আজ তাদের সেই শক্তি কোথায়? এমনকি তেমন শক্তি-সঞ্চয়ের প্রবল-পরাক্রান্ত বাসনাও আজ তাদের মধ্যে সজীব নয়।

এ সম্বন্ধে কোন আলাপ আলোচনা হলে প্রায় আলেমই এটার প্রকৃত সমাধান না দিয়ে। কোনমতে ধাপা-চাপা দিবার অপচেষ্টা করতেও লজ্জাবোধ করেন না। সাহাবাগণ এবং নবীকূল এ সম্বন্ধে কি কি অপূর্ব আল্লাহর সাহায্য প্রাপ্ত হয়ে প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুকুলের মুখে চুনকালি মাখায়ে দিয়েছেন, সেই সকল অমূল্য আদর্শ পেশ করেই নিজেদের কর্তব্য সমাধা করেন। কিন্তু পাক-কোরআনেও যে মুসলমানদেরকে যথাসাধ্য প্রস্তুতি ও প্রচেষ্টার কথা বলা হয়েছে এবং সাহাবাকুল ও নবীগণও তজ্জন্য আপন আপন কর্তব্য পালনে বিন্দু পরিমাণ ত্রুটি করেননি বলেই যে, মদদে এলাহী তাঁদের নিত্য সহচর রূপে বিরাজ করত, সেই সম্বন্ধে কোন আভাস পর্যন্ত না দেওয়াও যেন নিতান্ত বুদ্ধিমানের মত কাজ করা হলো বলে বর্তমান যুগের অধিকাংশ শিক্ষিত মুসলমান কর্তৃক বিবেচনা করা হয়।

ওহোদে, বদরে এবং ইসলামের ইতিহাসের সংখ্যায় মুষ্টিমেয় হয়েও এবং যথোপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত না হয়েও মুসলমানগণ শত্রুকুলের বিরুদ্ধে জয় লাভ করেছেন। পাক কোরআনে বজ্রগম্ভীর স্বরে বলা হয়েছে, কতবার কত অল্প সংখ্যক সৈন্য আল্লাহর আদেশে বহুসংখ্যক সৈন্যকে পরাস্ত করে দিয়েছে।' তৎসঙ্গে এটাও বলা হয়েছে, এবং আল্লাহ্ ধৈর্যশলীদের সঙ্গে রয়েছে।' এখানে দুইটি জিনিস বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার রয়েছে। সেই সকল ক্ষেত্রে মুসলমানগণ আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন এবং তাঁদের শক্তি সামর্থে যতটুকু কুলায়েছিল, তদনুযায়ী তাঁরা কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপায়েও পড়েছিলেন। কিন্তু আজকাল তথাকথিত পরহেজগার দীনদার লোকদের মধ্যে তদ্রূপ প্রেরণাও সজীব নয়। আজ তাঁদের হস্তে রণ-বল বলে কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই। এটার চেয়ে অধিক মারাত্মক ব্যাপার এই যে, তেমন কল্পনাও তাঁদের মস্তিষ্কে স্থান পাচ্ছে না।

আজ পাকিস্তানে তথা মুসলিম জাহানে যদি বেতন ভোগী সৈন্য না থাকত, তবে পাকিস্তান তথা সমগ্র মুসলিম জাহানের অস্তিত্ব থাকত কি? পাকিস্তান রক্ষা তথা মুসলিম জাহান রক্ষার্থে এমন গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য পালনে কয়জন পরহেজগার দীনদার লোক এবং কয়জন আলেম ওলামা অগ্রসর হয়েছে?

আজ মুসলিম জাহানের সর্বাপেক্ষা মারাত্মক বিষয় এই যে, আজ যাঁরা মসজিদ ও অন্যান্য ইবাদত বন্দেগীর ইমাম তাঁদের অতি নগণ্যসংখ্যক লোক ব্যতীত জেহাদের ময়দান সম্বন্ধে প্রায়ই বেখবর। আর যাঁরা লড়াইয়ের ময়দানের সেনাপতি তাঁদেরও প্রায় সকলেই মসজিদ ও অন্যান্য ইবাদত বন্দেগীতে পাইকারী দরে অনুপস্থিত। তাঁরা উভয়েই পথভ্রান্ত। কিন্তু আধুনিক মুসলিম জগতের সৈন্য বিভাগ এবং সেনাপতিকে কেউ ইসলামের আদর্শরূপে ভেবে থাকে না । সুতরাং তাঁদের অধপতনে মুসলিম জাহানের বিরাট ক্ষতি সাধিত হয়েছে। তবু এ কথা সত্য যে, তাতে প্রকৃতপক্ষে ইসলামের নামের উপর কোন কলঙ্ক লেপন করা হয়নি। কিন্তু মসজিদ ও অন্যান্য ইবাদত-বন্দেগীর পদস্খলনে ইসলাম জগতের বিপুল ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

আজ যে মুসলিম জাহান যুদ্ধ-বিদ্যা এবং অন্যান্য বিদ্যা সম্পর্কীয় কাজ হতে মুখ ফিরায়ে লণ্ডন, আমেরিকা এবং রাশিয়া-মুখী হয়ে উঠছে, তজ্জন্য প্রধানতঃ দায়ী হলেন, মুসলিম জাহানের পরহেজগার ও দীনদার মুসলমান এবং বিশেষ ভাবে আলেমবৃন্দ। শেরে খোদা হযরত আলী (রাঃ) শহীদকুল-শিরোমণি হযরত আমীর হামজা (রাঃ), হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এবং খালেদ বিন ওলীদ

(রাঃ)-এর ন্যায় বর্তমান পৃথিবীর বুকের উপর পরহেজগার দীনদার এবং আলেম-ওলমাও যদি জেহাদের ময়দানের সাথে সুপরিচিত থাকতেন এবং মরলে শহীদ বাঁচলে গাজী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠতেন এবং নামায, রোজা, হজ্ব, যাকাতের ন্যায় দেশ-রক্ষা এবং দেশ শাসনও যে ফরজ কর্তব্য, তা পালনে যদি তাঁরা কর্তব্য-সচেতন থাকতেন, তবে পাকিস্তান তথা মুসলিম জাহান, তথা সমগ্র দুনিয়ায় একটি নবযুগের সূচনা হতো। হযরত (সাঃ) নিজেও ওহোদে, বদরে ও হুনায়েনে সেনাপতি হিসেবে অপূর্ব বীরত্ব প্রদর্শন করেছেন। হুনায়েনের ময়দানে মুসলমানগণ যখন ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েন এবং হযরতের পাশে যখন একজন মুসলমানও ছিলেন না, তখন তিনি বজ্রগম্ভীর স্বরে ঘোষণা করেছিলেন, "এটা নিঃসন্দেহে যে, আমি নবী। আমি আবদুল মুত্তালেবের বংশধর।"

বুদ্ধিমত্তা

এটা সকল মানুষের থাকে না। বহু অভিজ্ঞতা, সৎকর্ম-সম্পাদন ও পূর্ণত্ব লাভের পর মানুষের বুদ্ধি পরিপক্কতা লাভ করে। এতে সমাজের শ্রেষ্ঠ লোকদেরকে জানবার ক্ষমতা জন্মে। হাদীস শরীফে আছে, "মুমিনের বুদ্ধি মত্তাকে ভয় করবে, কেননা, সে আল্লাহর আলো দ্বারা দৃষ্টিপাত করে থাকে।"

ইমাম শাফেয়ীর বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে হাফেজ ইবনে হাজর আছকালানী রাহমাতুল্লাহে আলাইহি তাঁর গ্রন্থে এবং ইমাম রাজী রাহমাতুল্লাহে আলাইহি 'মুনাকেবে ইমাম শাফেয়ী' কিতাবে বহু ঘটনার উল্লেখ করেছেন।

ইমাম বোখারী রাহমাতুল্লাহে উস্তাদ ইমাম হামীদী (রাঃ) বলেন, 'আমি ও ইমাম শাফেয়ী একদিন মক্কার বাইরে চললাম। পথিমধ্যে আমরা এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ পেলাম। আমি তাঁকে বললাম, "আপনার বুদ্ধিমত্তা (ফরাসত) দ্বারা বলুনতো এই লোকটির জীবিকা নির্বাহের উপায় কি?' তিনি বললেন, ' স মসলা পিষিবার কাজ বা দর্জির কাজ করে থাকে।' আমি সেই ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কি কাজ করে থাক?' সে বলল, 'প্রথমে আমি মসলা পিষিবার কাজ করতাম্াজকাল দর্জির কাজ করে থাকি।'

ইমাম শাফেয়ী নিজে বলছেন, "আমি এয়মন দেশ হতে 'এলমে ফরাসত' সম্বন্ধে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করে ফিরবার পথে একটি ক্ষুদ্র শহরে উপনীত হওয়ার পরে রাত্রি হয়ে যায়। আমি কোথায় রাত্রিযাপন করব, এ সম্বন্ধে চিন্তান্বিত হয়ে পড়তাম। সুপ্রশস্ত কপাল বিশিষ্ট ও নীল চক্ষুওয়ালা এক ব্যক্তিকে তার বাড়ী

সম্মুখে পায়চারী করতে দেখলাম। আমার অভিজ্ঞতা দ্বারা তাঁকে একজন কৃপন লোক ভেবেছিলাম, কিন্তু কার্যকলাপে তাঁকে অন্যরূপ পেলাম। আমি তাঁর কাছে রাত্রিযাপন করার সুযোগ পাব, এমন ভরসা আমার ছিল না। তথাপি প্রয়োজনের তাগিদে আমি আমার বক্তব্য পেশ করলাম। লোকটি আমার সাথে বড় ভদ্রভাবে মিলিত হলেন এবং আমাকে অতি উত্তম এক ঘরে অবস্থান করতে দিলেন। আমার আহারেরও তিনি বন্দোবস্ত করলেন। লেপ, শীত-বস্ত্র এবং উত্তম বিছানার বন্দোবস্ত ইত্যাদিতে কোন কসুর দেখা গেল না। আমার ঘোড়ার ঘাস-পানির বন্দোবস্তেরও কোন ত্রুটি রইল না। তাঁর সদ্ব্যবহার এবং আতিথেয়তা দেখে মহা সন্তুষ্ট হলাম।

আমার এলমে ফরাসত দ্বারা যা বুঝেছিলাম, তাতে বাস্তবক্ষেত্রে এটার বিপরীত দেখে আমার এলমে মনে হলো যে, আমার এলমে ফরাসত হয় মিথ্যা হবে, আর না হয় এই লোকটির স্বভাব নিশ্চয়ই অন্যরকম হবে।

প্রভাতে আমি বিদায় চাইলাম এবং আমার খাদেমকে রওয়ানা হবার জন্য সবকিছু তৈরী করতে বললাম। অতঃপর বাড়ীওলার প্রতি বহু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার পর বললাম,"আপনি যদি কোন সময় মক্কাশরীফে যান, তবে 'জি-তাওয়া' নামক স্থানে যেয়ে মুহাম্মদ বিন ইদরীসের বাড়ী অনুসন্ধান করবেন। আমি আপনাকে আমার গরীবালয়ে দেখতে পেলে মহা সন্তুষ্ট হবে।"

তখন লোকটি বলল, "হ্যাঁ, আপনার ভদ্র ব্যবহারে আমি মহা খুশী হলাম। আচ্ছা, আমি যতটুকু জানি, তাতে মনে হয়েছে যে, আপনি পূর্বে আমার কাছে কোন আমানত রাখেননি। অথবা আপনি কোনদিন আমার কোন প্রকার উপকারও করেননি। কাজেই আমার পরিশ্রমের জন্য আমি পারিতোষিক দাবী করছি।"

ইমাম শাফেয়ী বলেন, "আমি আপনার কাছে কোন আমানত রাখিনি বা আমার দ্বারা আপনার কোন উপকারও সাধিত হয়নি। কিন্তু আপনাকে আমি এখন কিভাবে পারিতোষিক প্রদান করতে পারি তা বুঝায়ে বলুন।"

সেই ব্যক্তি তখন প্রত্যেক কাজের পরিবর্তে বিভিন্ন পারিতোষিক দাবী করল। আমি তখন খাদেমের মারফত তা পারিশ্রমিক দিয়ে দিলাম। পরিশেষে বললাম, "আপনার কোন পারিতোষিক অবশিষ্ট নেই-তো?" সেই ব্যক্তি বলল, "এখন শুধু ঘরের ভাড়া বাকী রয়েছে।"

আমি তাও আদায় করে দিলাম। তখন আমি নিশ্চিতভাবে বুঝলাম "এলমে ফরাসত প্রকৃতপক্ষেই একটি এলম।" ইমাম হাকীম মুহাম্মদ বিন সঈদের কাছ

হতে রেওয়ায়েত করছেন, "আমি রবীয়ের কাছ হতে শুনেছি যে, ইমাম শাফেয়ী একদিন তাঁর কাছে বললেন, 'এক ব্যক্তি আমার কাছে আসল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি বোধ হয় সনআর দেশের অধিবাসী।' সেই ব্যক্তি তা স্বীকার করল। আমি আবার তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমি বোধ হয় লোহা-লঙ্করের কাজ করেন?" সেই ব্যক্তি তাও স্বীকার করল।

রবীয় বললেন, "জামে মসজিদের সম্মুখে ইমাম শাফেয়ী সাহেবের সম্মুখ দিয়ে আমার ভাই অতিক্রম করল। ইমাম সাহেব বললেন, রবীয়, এই লোকটি কি আপনার ভাই? রবীয় সাহেব তা স্বীকার করলেন। রবীয় বলেন, ইমাম শাফেয়ী সাহেব পূর্বে কখনও আমার ভাইকে দেখেননি।"

ইমাম বায়হাকী বলেন, "আমি একদিন জামে মসজিদে ইমাম শাফেয়ী সাহেবের সঙ্গে ছিলাম। তখন একব্যক্তি শায়িত ব্যক্তিদের মধ্য হতে একব্যক্তিকে অনুসন্ধান করল। ইমাম শাফেয়ী রবীয়কে বললেন, "আপনি যেয়ে তাকে জিজ্ঞেস করুন যে, লোকটি তার নীল চক্ষু বিশিষ্ট হাবশী গোলাম হারায়েছে কিনা?"

রবীয় যেয়ে লোকটিকে সব কথা ভেঙ্গে বললেন। লোকটি তখন তাঁর সঙ্গে ইমাম সাহেবের খেদমতে হাজির হয়ে বললেন, "আচ্ছা আমার গোলাম কোথায় গিয়েছে?"

ইমাম শাফেয়ী বললেন, "আপনি তাকে এখন জেলখানায় পাবেন।" লোকটি জেলখানায় যেয়ে গোলামটি দেখতে পেল।

রবীয় সাহেব এটার তাৎপর্য জানতে চাইলে, ইমাম শাফেয়ী বললেন, "অনুসন্ধানকারী ব্যক্তি যখন মসজিদে উপস্থিত হলো, তখন আমি তার হাবভাবে বুঝতে পারলাম যে, সে কোন পলাতক লোককে তালাশ করছে। অতঃপর লোকটিকে দেখলাম যে, তখন বিশেষভাবে দৃষ্টি করে বুঝতে পারলাম যে, লোকটি গোলামদের চক্ষুর প্রতি সূক্ষ্ম দৃষ্টিপাত করে দেখছে। তাতেই আমি বুঝলাম যে, চক্ষুতে ত্রুটিপূর্ণ তার কোন হাবশী গোলাম হারায়ে থাকবে।"

আমি এ সকল কথা শুনে ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি কিভাবে জানতে পারলেন যে, গোলামটি জেলখানায় রয়েছে?" ইমাম সাহেব বললেন, অভিজ্ঞতা হতে আমি এটা বুঝতে পেরেছি যে, গোলাম যদি ক্ষুধার্ত হয়, তখন চুরি করে। আর যদি পেটভরা থাকে, তখন ব্যভিচার করে। আমি ধারণা করলাম যে, এই দুইটির মধ্যে কোন একটির অপরাধ-তো সে অবশ্যই করে থাকবে।"

মোটকথা এই যে, ইমাম শাফেয়ী সর্বগুণে গুণান্বিত ছিলেন। তিনি ছিলেন, মুজতাহেদ, মুহাদ্দেস ও মুফাচ্ছের। সাহিত্যে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। অভিধানের জ্ঞান ছিল তাঁর অতুলনীয়। তিনি নূহ্ ও বালাগতের ইমাম ছিলেন! এত সব গুণের সমন্বয় অন্য কোন ইমামের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় না।

ইমাম শাফেয়ীর গ্রেপ্তারী ও হারুণুর রশীদের ভ্রম

হযরত আলী কররমল্লাহু ওয়াজহাহু এবং ইমাম হুসাইন আলাইহিচ্ছালামের পর হাশেমীদেরকে দাবায়ে উম্মাইয়া বংশ যখন জয়লাভ করল, তখন বনু হাশিম, বনু আব্বাস, বনু ফাতেমা এবং ওলুভীগণ ইত্যাদি বনুহাশেম বংশীয়গণ আবার নিজদেরকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার নিমিত্ত গোপনে চেষ্টা সাধ্য করতে লাগলেন।

ইমাম হুসাইন আলাইহিচ্ছালামের পর হযরত আলী কররমল্লাহু ওয়াজহাহুর স্ত্রী হযরত ফাতেমা ব্যতীত অন্য বিবির গর্ভজাত সন্তান মুহাম্মদ বিন আলী বিন আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাসকে যথাক্রমে খলীফা বলে প্রকাশ করা হয়। এরূপ খেলাফতের দাবী ওলুভী খান্দান হতে হস্তান্তরিত হয়ে আব্বাসীয় খান্দানের প্রতি অর্পিত হয়।

মুহাম্মদ বিন আব্বাসী ১২৪ হিজরীতে ইন্তেকল করেন। তারপর তাঁর পুত্র ইব্রাহীম বিন মুহাম্মদকে ইমাম বলে তসলিম করা হয়। তিনি উম্মাইয়াদের হাতে নিহত হন। শিয়াগণ এই শোকে শোকান্বিত হয়ে কাল কাপড় পরিধান করতে থাকে। ইব্রাহীমের পর আবুল আব্বাস সফ্ফাহ বনু হাশেমদের নেতা হন। তিনি ১৩২ হিজরীতে সফলকাম হন। এরূপে খেলাফত বনু হাশেমদের হস্ত হতে বনু আব্বাসীয়দের হাতে আসে।

সৈয়দ-বংশের প্রতি আব্বাসীয়দের অত্যাচার

একদিক দিয়ে তো নব শাসনকর্তাগণ উম্মাইয়াদেরকে সমূলে বিনষ্ট করার মানসে তাদের কবর হতে হাড়গুলো তুলে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে লাগলেন। অপর দিক দিয়ে খলীফা নির্বাচন ব্যাপারে বনু ফাতেমা ও ওলুভী ও তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন।

সফ্ফাহ তাঁর পরবর্তী কোন লোককে নির্বাচন করে যাননি। কিন্তু মনসূর সতর্কতামূলক বা মন্দ ধারণার বশবর্তী হয়ে ফাতেমা ওলুভী সৈয়দদের প্রতি অত্যাচার অবিচার করতে শুরু করলেন; সৈয়দ বংশের লোকেরা পরিশেষে অতিষ্ঠ

হয়ে উঠলেন। ১৩৫ হিজরীতে মুহাম্মদ নফস জকীয়া মদীনায় বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। অধিকাংশ লোক তাঁর পক্ষাবলম্বন করল। কিন্তু তাঁর ভাগ্য ছিল অন্যরূপ। অত্যন্ত বীরত্ব সহকারে তিনি লড়াই করে শহীদ হলেন। অতঃপর তাঁর ভাই ইব্রাহীমও শহীদ হলেন। ১৫৮ হিজরীতে মনসূর ইন্তেকাল করেন। তখন মাহদী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন। মাহদী ১৬৯ হিজরীতে মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। হারুণুর রশীদ ১৭০ হিজরীতে খলীফা হলেন। সেই সময় আবদুল্লাহ্ বিনেল হুসাইন বিন আলী হারুণের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তাঁর সাথে মুকাবেলা করার নিমিত্ত প্রস্তুত হলেন। মোটকথা এই যে, আব্বাসীয়দের শাসনকালও সৈয়দ বংশীয়দের নিমিত্ত দুঃখকষ্ট ও অত্যাচারের জমানাই রয়ে গেল।

বখরানের গভর্ণররূপে

লোকেরা মক্কার শাসনকর্তার কাছে ইমাম শাফেয়ী সম্বন্ধে সুপারিশ করল যে, তিনি অত্যন্ত উপযুক্ত আলেম, চিন্তাশীল এবং রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি। কাজেই তাঁকে কোন উপযুক্ত সরকারী কাজে নিযুক্ত করা হোক।

প্রথমে তাঁকে এক সাধারণ পদে নিযুক্ত করা হয়। অতঃপর খোদা প্রদত্ত শক্তিবলে এবং মহামঙ্গল প্রচেষ্টার ফলে তিনি যখন জনসাধারণের কাছে প্রসিদ্ধ হয়ে উঠলেন, তখন তাঁকে বখরানের গভর্ণররূপে নিযুক্ত করা হলো। বনু হারেস বিন আবদুল্লাহ্ এবং মওয়ালী সকীফ সেখানকার বিশিষ্ট লোক ছিলেন। তাঁরা গভর্ণরকে ঘুষ প্রদান করতেন। এজন্য গভর্ণর বরাবর তাঁদেরকে খাতির তোয়াজ করতেন। তাঁরা পূর্বের ন্যায় ইমাম শাফেয়ীর খেদমতেও নজরানা পেশ করলেন। তিনি তা ফিরায়ে দিলেন। তিনি কাউকেও কোন পরোয়া বা খাতির তোয়াজ না করেই কাজ চালাইয়ে যেতে লাগলেন। তিনি সাতজন বিশিষ্ট লোককে নিয়ে একটি পঞ্চায়েত কমিটি কায়েম করলেন। সেই কমিটির মারফতেই স্বাধীনভাবে সবকিছুর বিচার-মীমাংসা করা হতো। কিন্তু এটা অনেকের মনঃপুত হলো না। তারা গোপনে ইমাম শাফেয়ী সাহেবের বিরুদ্ধে খলীফার কাছে অভিযোগ পেশ করল।

গ্রেফ্তারী ও মুক্তি

এয়মনে ইমাম শাফেয়ী সাহেবের অত্যন্ত প্রবল পরাক্রান্ত প্রভাব ছিল। এয়মনের আশে পাশের লোকের ইমাম সাহেবের স্পষ্টবাদিতা, প্রকাশ-ভঙ্গিমা, তর্ক ক্ষমতা, সৎস্বভাব এবং অগাধ জ্ঞান-গরিমা ও বুদ্ধিমত্তার কল্যাণে মোহিত ও

মুগ্ধ হয়ে উঠল। অন্যান্য কর্মচারীরাও যাতে ঘুষ গ্রহণ, অবিচার এবং পক্ষপাতিত্ব করতে না পারে, তজ্জন্য ইমাম সাহেব কঠোর নীতি অবলম্বন করলেন।

দুর্নীতি-পরায়ণ কর্মচারী ও জনগণ ইমাম সাহেবের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে জ্বলিয়ে বিদ্রোহী হয়ে উঠল। তারা ইমাম সাহেবের বিরুদ্ধে খলীফার কাছে বহুকিছু অভিযোগ পেশ করল। তারা এতটুকু অগ্রসর হলো যে, "আপনি যদি রাজ্যের মঙ্গল চান, তবে অনতিবিলম্বে ইমাম শাফেয়ীকে পদচ্যুত করেন। এখানে তাঁর প্রভাব খুব বেশী। দেশব্যাপী সৈয়দ-কুল আবার খেলাফত লাভ করার স্বপ্ন দেখেছে। ইমাম শাফেয়ী নিজেও হাশেমী বংশের লোক। কাজেই তাদের সাথে ইমাম সাহেবের গভীর যোগাযোগ না থেকে পারে না।"

এই সকল দরখাস্ত হারুণুর রশীদের কাছে পৌঁছলে, তিনি ইমাম শাফেয়ী ও অন্যান্য সকল সৈয়দদেরকে গ্রেফতার করে আনবার জন্য এক পরওয়ানা পত্র পাঠায়ে দিলেন। হাম্মাদ সেইপত্র পাঠ মাত্র ইমাম শাফেয়ীসহ সকল সৈয়দদেরকে গ্রেফ্তার করে হারুণুর রশীদের কাছে প্রেরণ করলেন। রশীদ আদেশ করলেন যে, প্রতিরোজ দশজন করে সৈয়দকে হত্যা করতে হবে। প্রতিদিন রশীদের সম্মুখে দশজন করে সৈয়দ শহীদ হতে লাগলেন। এইরূপে একদিন ইমাম শাফেয়ীর পালা পড়ল। তিনি তখন এমনই এক মর্মস্পর্শী বক্তৃতা দান করলেন যে, খলীফার হৃদয কেঁপে উঠল। অতঃপর খলীফা সেই আদেশ রহিত করে দিলেন। একদিন এক বুজুর্গ ব্যক্তি খলীফার সম্মুখে ইমাম শাফেয়ী সাহেবের একটি উপদেশ পরিপূর্ণ রচনা পাঠ করে শুনালেন। এটা তাঁর মর্মস্পর্শ করল। তখন এটা তাঁকে আবার পাঠ করে শুনাবার নিমিত্ত অনুরোধ করলেন। আবার তা শ্রবণ করে "বললেন, বাস্তবিকই ইমাম শাফেয়ী একজন অতুলনীয় জবরদস্ত আলেম।" খাজাঞ্চীকে তখনই ইমাম সাহেবকে পাঁচশত দীনার নজর স্বরূপ দান করার জন্য আদেশ করলেন।

আল্লাহর উপর ভরসা ও ধৈর্য

সৎকাজ করার ক্ষমতা প্রাপ্তি ও মন্দ কাজ হতে বেঁচে থাকবার নিমিত্ত আল্লাহতালার সাহায্য চাওয়া সমুচিত। আর প্রতিটি ভাল ও মন্দ কাজ বুঝবার নিমিত্ত আপ্রাণ চেষ্টা করা চাই, এটাই পরহেজগারীর মূল মন্ত্র। প্রত্যেক কাজে আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টি ব্যতীত অপর কোন প্রকার লাভের আশা না করাকে এখলাস বলা চলে। আর তা পালন করার নিমিত্ত একমাত্র আল্লাহতায়ালার

সাহায্য-সহানুভূতির ভরসা করাকে তাওয়াক্কুল বলা হয়। তাতে যদি বাধাবিঘ্ন আসে বা আশাতিরিক্ত বিলম্ব ঘটে, তখন অধীর অস্থির না হয়ে খোদার প্রতি অচল-অটল থাকা সমুচিত। তখন যারা বিরোধিতা করবে বা বাধাবিঘ্ন প্রদান করবে, তাদের নিমিত্ত কোন অনিষ্ট চিন্তা করা চাই না। এটাকে সবর বলা হয়। আর যদি সফলতা লাভ হয়, তবে এতে গর্ভানুভব করা চাই না। একে একান্তই আল্লাহুতায়ালার অনুগ্রহ অনুকম্পা মনে করা চাই। কায়মনোবাক্যে তা স্বীকার করা চাই। এটাকে শোকর বলা হয়। ইমাম শাফেয়ী সাহেবের জীবনে এই সবকিছুর সমন্বয় ছিল। নিম্নে পৃথকভাবে এদের আলোচনা করা হবে।

সন্তুষ্টি

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, "আমি বিশ বছর পর্যন্ত কোনদিন পেট ভরে খাইনি। আমি লোভ-লালসাকে কস্মিন্‌কালেও প্রশ্রয় দেইনি। এতে আমি সর্বদা আরাম অনুভব করতাম। এটার কল্যাণেই আমাকে কখনও কার কাছে মাথা নত করতে হয়নি।"

তিনি লোভ-লালসাকে বরাবরই অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখতেন। লোভ-লালসায় বশবর্তী হয়ে মানুষ বহু গর্হিত কাজ করে থাকে। এটার অনিষ্ট সম্বন্ধে কোরআন শরীফে বহু জায়গায় বর্ণনা রয়েছে।

হারুণুর রশীদ একদিন অত্যন্ত অনুনয় বিনয়ের সাথে বললেন, "আপনি যে কোন শহর পছন্দ করেন, আপনাকে আমি সেই শহরের কাজী নিযুক্ত করব।" তিনি অম্লানবদনে তা অস্বীকার করলেন।

দানশীলতা ও বদান্যতা

তিনি বলেন, "বদান্যতার অর্থ এই যে, নিজের কোন দাবী বা বস্তু বিনা উদ্দেশ্যে ও স্বার্থহীনভাবে কাউকেও দিয়ে দেওয়া। তা কয়েক প্রকারের হতে পারে। নিজের পাওনা কাউকেও ক্ষমা করা দেওয়া; নিজের প্রয়োজন না মিটায়ে অপরের প্রয়োজন মিটান; অপরের জন্য নিজের দেমাগ খন্ডন করা; অপরের সাহায্যের জন্য নিজকে বিপদে পতিত করা, এমনকি নিজের প্রাণকে পর্যন্ত বিপন্ন করা; অপরের প্রাণ বাঁচাবার নিমিত্ত নিজের জীবন দান করা। এ সকল প্রকৃত বদান্যতা। তিনি বলেন, কাউকেও কোন কিছু প্রদান করে তার কাছ হতে প্রতিদান আশা করতে নাই বা তাকে কোন প্রকারে হেয় প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা

করতে নেই। এটাতে লাভের চেয়ে ক্ষতি অধিক। খোদা বলেন, 'হে ঈমানদারগণ, তোমরা যা উপার্জন করেছ এবং জমীন হতে তোমরা যা উৎপন্ন করেছ, তা হতে উত্তম বস্তু খরচ কর; তন্মধ্যে হতে মন্দ বস্তু প্রদানের বাসনাও পোষণ করবে না।"

ইমাম সাহেবের প্রথম জীবন অভাব অনটনে কাটে। কিন্তু শিক্ষাসমাপ্তির পর খোদাতায়ালার মেহেরবানীতে তাঁকে কোনপ্রকার অভাব অভিযোগ সইতে হয়নি। ধনীলোক, আমীর, ওমরা ও খলীফা এবং মন্ত্রী প্রায়ই তাঁর খেদমতে নজর পেশ করতেন। প্রায় প্রত্যেক লোকই তাঁকে নজর প্রদান করত। তিনি তা গ্রহণ করতে না চাইলে তারা পীড়াপীড়ি করত।

একদিন খলীফা হারুণুর রশীদ তাঁর খেদমতে পঞ্চাশ হাজার দেরহাম নজর স্বরূপ পেশ করলেন। তন্মধ্যে চল্লিশ হাজার দেরহাম ইমাম সাহেব গরীব, এতিম, বিধবা এবং অভাবগ্রস্ত আলেমদের মধ্যে বিতরণ করে দিলেন।

অন্য এক সময় আবু হাসন জেয়াদী ছয় হাজার দীনার, জাফর বিন এয়াহয়া বরকানী এক হাজার দীনার এবং হারুণুর রশীদ কয়েক হাজার দীনার তাঁর খেদমতে নজর স্বরূপ প্রেরণ করলেন। প্রায় সময়ই তিনি এ সকলের চার ভাগের এক ভাগ নিজের জন্য রেখে অবশিষ্ট তিন ভাগ রাত্রির অন্ধকারে গরীব দুঃখী, এতিম বিধবা, অভাবগ্রস্ত আলেম, ফকীহ এবং ছাত্রদেরকে দিয়ে আসতেন। তৎপরও তিনি সর্বদা খোদার কাছে দো'আ করতেন,"এলাহী, আমকে দুনিয়ার লোভ লালসা হতে মুক্ত রাখিও।"

ইমাম মাজনী রাহমাতুল্লাহে আলাইহি বলেন, 'আমি ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহে আলাইহির চেয়ে অধিক দানশীল ও বদান্য লোক দেখিনি। একদিন ঈদের রাত্রিতে আমি তাঁর সাথে মসজিদ হতে বের হয়ে বাড়ী ফিরেছিলাম। পথিমধ্যে এক মাসআলা সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা আরম্ভ হলো। তাঁর বাড়ীর দরজায় একটি গোলামকে দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখতে পাওয়া গেল। সে সালাম জানায়ে আরজ করল, 'আমার মনিব নজরস্বরূপ এই অর্থপূর্ণ থলে আপনার খেদমতে পেশ করেছেন।' ইমাম সাহেব সালামের জবাব প্রদানের পর শোকরিয়া আদায় করে তা গ্রহণ করলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বলল, 'হযরত আজ আমার একটি সন্তান জন্মিছে। কিন্তু আমার হাতে একটি কপর্দকও নেই। ইমাম সাহেব তৎক্ষণাৎ সেই থলিয়াটি তাকে দিয়ে খালি হাতে বাড়ীর ভিতরে ঢুকলেন।"

অন্য একদিনের ঘটনা। ঈদের রাত্রি। ঘরে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রাদির অভাব। ইমাম সাহেবের বিবি বলেন, "আপনি তো আপনার জাতির মঙ্গল কামনায় দিবারাত্রি কাটায়ে থাকেন। আজ ঈদের রাত্রি। ঘরে প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রাদিরও অভাব। কাজেই আপনি যদি কারও কাছ হতে কিছু অর্থ কর্জ করে না আনেন, তবে অন্য কোন উপায় দেখছি না।" ইমাম সাহেব এক ব্যক্তির কাছ হতে সত্তর দীনার কর্জ করে বাড়ী ফিরেছিলেন। পথিমধ্যে ফকীর মিসকীন তাঁকে ঘিরে নিল। তিনি পঞ্চাশটি দীনার তাদের বিলায়ে দিলেন। অবশিষ্ট বিশ দীনার নিয়ে তিনি বাড়ী ফিরলেন। তিনি তা বিবির হাতে দিবার পূর্বেই এক কোরাইশী বিপদগ্রস্ত হয়ে স্বীয় অভাব পেশ করল। ইমাম সাহেব সেই বিশ দীনার তার সম্মুখে রেখে দিয়ে বললেন, "ভাই, এটার মধ্য হতে তোমার যা কিছু প্রয়োজন তা নিয়ে যাও।" সেই ব্যক্তি সব কয়টি মুদ্রা উঠায়ে নিয়ে বলল, "এটাতেও আমার প্রয়োজন মিটবার নয়।"

তিনি তখন বিবি সাহেবার কাছে পৌছে সমুদয় ঘটনা বর্ণনা করলেন। বিবি সাহেবা বললেন, "এটা তো আপনার পক্ষে মামুলি ব্যাপার।" রাত্রি হলো। মিয়া বিবি খামুশীর সাথে শুয়ে পড়লেন।

প্রভাতে হারুণুর রশীদের মন্ত্রী জাফর বিন এয়াহয়া বরমকীর এক কাসেদ এসে ইমাম সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে গেল। জাফর তাঁর প্রতি মহা 'সম্মান প্রদর্শন পূর্বক বললেন, "আজ রাত্রে স্বপ্নযোগে আল্লাহ তায়ালার তরফ হতে আমাকে আপনার দানের ঘটনা শুনায়ে দেয়া হয়েছে।" অতঃপর তিনি তাঁকে এক হাজার দীনার নজরস্বরূপ পেশ করে তা কবুল করার জন্য বহু অনুনয় বিনয় করলে, তিনি তা গ্রহণ করলেন।

বিনয়

ইমাম সাহেব বলেন, "বিনয় প্রদর্শন করার জন্য উদ্দেশ্য করা হয়েছে যে, যেন কোন ব্যক্তি নিজ শক্তি ও অর্থের অপব্যহার না করে। আর আমাদের ব্যবহার ও কাজে যেন কোন গরীব-দুঃখীর মনে কোন ব্যথা বা আঘাত হানতে না পারে। হুজুর (সাঃ) বলেছেন, খোদা আমার প্রতি ওহী নাযিল করেছেন যেন তোমরা বিনয় অবলম্বন কর। আর কেউ কারও প্রতি অবিচার না কর। আর একের প্রতি অপরের গর্ব প্রদর্শনের যেন কোন প্রবৃত্তি না জন্মে।'

বন্ধুবান্ধব ও শাগরেদদের খাতির তোয়াজোর নিমিত্ত তিনি এক দাসী নিযুক্ত

করেছিলেন। যে হালওয়া প্রস্তুতিতে পাকা উস্তাদ ছিল। তিনি তার দ্বারা হালওয়া প্রস্তুত করায়ে প্রায়ই তাঁর বন্ধুবান্ধবদেরকে আহার করাতেন। আর বন্ধু-বান্ধবের সাথে তিনি অত্যন্ত সদয় স্বস্নেহ এবং মধুর ব্যবহার করতেন। বন্ধু-বান্ধবকে আহার করাতে পারলে, তিনি পরম সন্তুষ্টি লাভ করতেন। কোন ব্যক্তি যদি বিন্দু পরিমাণও তাঁর উপকার করতেন, তবে তিনি তাঁর প্রতি চির কৃতজ্ঞ থাকতেন। তিনি তার শত গুণ অধিক উপকার করতেন।

উপযুক্ত লোককে তিনি পরম শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। কারও কোন কৃতিত্ব দেখলে, তিনি তাকে মহা পুরস্কারে ভূষিত করতেন। একদিন তিনি কোন এক স্থানে যাচ্ছিলেন। তথায় তিনি এক ব্যক্তিকে তিরন্দাজী শিক্ষা করতে দেখলেন। তাঁর সম্মুখেই লোকটির তীর নির্দিষ্ট স্থানে পৌছল। তিনি তাঁর পকেট হতে তিনটা দীনার পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করে আক্ষেপের সুরে বললেন, "আমার সঙ্গে অধিক দীনার থাকলে আমি এত দীনার আপনাকে পুরস্কারস্বরূপ দিতাম না।"

সুন্নতের পাবন্দী

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহমাতুল্লাহে আলাইহি তাঁর বিশিষ্ট ছাত্র ছিলেন। তিনি বলেন, "ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহে আলাইহি নিয়ম এই ছিল যে, তাঁর ফতোয়ার খেলাফ যদি কোন হাদীস মিলে যেত, তখনই তিনি প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করে দিতেন যে, আমি আমার পূর্ব ফতোয়া হতে প্রত্যাবর্তন করেছি।"

ইমাম মাজনী, রবীয় বিন সুলাইমান এবং অপরাপর ছাত্রদের সাথে সর্বদাই ইমাম সাহেব বলতেন, "আমি যে কয়টি কিতাব লিখেছি, তা যথাসাধ্য সতর্কতা ও দলীলসহ লিখতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। তথাপি আমি মানুষ। আমার বহু ভুলত্রুটিও হতে পারে। খোদা ব্যতীত অপর কেউই ভুলত্রুটি হতে পবিত্র নয়। কাজেই আমার কিতাবে যদি কোন মাসআলা কোরআন ও সুন্নতের খেলাফ হয়ে থাকে এবং আপনারা যদি তা বের করতে পারেন, তবে ধরে নিতে হবে যে, আমি তা হতে প্রত্যাবর্তন করেছি। আর এটাও স্মরণ রাখবেন যে, আমি যদি কোন সহীহ হাদীস জানতে পারি এবং তদনুযায়ী আমল না করি তবে বুঝতে হবে, আমার বুদ্ধির ত্রুটি ঘটেছে।"

তিনি স্বীয় অভিমত ও কথার ব্যাপারে কখনও জেদের বশবর্তী হতেন না। কোন মাসআলায় যদি ভুল বের হয়ে যেত, তবে অবিলম্বে তা সংশোধন করে নিতেন। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহমাতুল্লাহে আলাইহিকে প্রায়ই তিনি

বলতেন, "হাদীস সম্বন্ধে আপনার দৃষ্টি আমার দৃষ্টি হতে অধিক তীক্ষ্ণ। কাজেই আমার ফতোয়ার খেলাফ যদি আপনাদের দৃষ্টিতে কোন হাদীস পরিদৃষ্ট হয়, তবে অবিলম্বে আপনি তা অবগত করাবেন। তখন আমার পক্ষে নিজেকে সংশোধন করা সম্ভবপর হবে।"

তিনি অত্যন্ত সত্যপ্রিয় ছিলেন। তাঁকে প্রায়ই বহু তর্ক-বিতর্ক সভায়ও যোগদান করতে হতো। তিনি অপর পক্ষকে অত্যন্ত বিনীত ও ভদ্রভাবে জবাব দিতেন। তিনি বলে থাকতেন, "আমি আমার বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার জন্য কারও সাথে কোনদিন তর্ক-বিতর্ক করিনি। সত্য প্রচার এবং সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল।"

মিথ্যাকে তিনি প্রকট ঘৃনার চোখে দেখতেন। তিনি বলতেন, "আমার সারা জীবনের ভিতরেও আমি কোনদিন মিথ্যাকথা বলিনি। শপথ দূরের কথা, সত্য শপথও আমি কোনদিন করিনি।" তাঁর গ্রন্থরাজি সম্বন্ধে তিনি বলতেন, "আমি খোদার কাছে ফরিয়াদ করেছি যে, আমার জাতি আমার লেখা বুঝুক এবং তদনুযায়ী আমল করুক।"

বুজুর্গদের প্রতি আদর শ্রদ্ধা

কোন এক ব্যক্তি হযরত ইমাম আবু হানীফা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে, ইমাম শাফেয়ী সাহেব বললেন, "আপনারা জেনে রাখবেন যে, ফিকাহ-শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইমাম আবু হানীফা সাহেবের আওলাদ।"

অপর এক ব্যক্তি ইমাম সুফিয়ান বিন আনীয়া এবং ইমাম মালেক সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, "এই দুই ব্যক্তি না থাকলে হেজাজে এলমে হাদীসের অস্তিত্ব থাকত না।"

তিনি যখনই ইমাম মালেকের কথা নকল করতেন, তখনই বলতেন, "এটা আমাদের উস্তাদ ইমাম মালেকের অভিমত।" তিনি প্রায়ই বলতেন, "ইমাম মালেকের সাথে আমাদের কোন তুলনা হতে পারে না।"

সাহাবাদের প্রসঙ্গে বলতেন, "এলমে এজতেহাদ, পরহেজগারী এবং জ্ঞানে তাঁরা আমাদের চেয়ে শত সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন।"

এক ব্যক্তি একদিন মাসআলা জিজ্ঞেস করলেন যে, কোন এক ব্যক্তি পদব্রজে কাবায় পৌঁছবার জন্য শপথ করল। কিন্তু কার্যে পরিণত করতে পারল না। এটার বিধান কি? তিনি বললেন, "তাকে কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। আর আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হযরত আত্তার বিন রব্বাহও এইরূপ অভিমত পোষণ করেন।"

শিক্ষা-মজলিস

সুবেহ সাদেকের সময় নামাযান্তে সূর্যোদয় পর্যন্ত ফিকাহ ক্লাস চলত। তারপর হাদীসের ক্লাস আরম্ভ হতো। এটার পর ওয়াজের মজলিস বসত। তারপর এলমী তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ হতো। জোহরের পর সাহিত্য, কবিতা, নূহু ও লুগাতের ক্লাস শুরু হতো। এটার পর আসর পর্যন্ত তিনি ঘরে বিশ্রাম করতেন। আসর হতে মাগরিব পর্যন্ত তিনি আল্লাহতালার জিকির-আজকারে নিমগ্ন থাকতেন।

রাত্রিকে তিনি তিন ভাগে করতেন। প্রথম ভাগে শয়ন করতেন। দ্বিতীয় অংশে হাদীস ও ফিকাহ সম্বন্ধে কিতাব লিখেতেন। তৃতীয় অংশে কোরআন পাঠ ও নফল নামায পড়তেন। এইরূপে সুবেহ সাদেক পর্যন্ত কাটাতেন। কোরআন পাঠে তাঁর খুব সখ ছিল।

মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ্ বিন আবদুল হাকীম বলেন, আপোসে সংসার-বিরাগী এবং মুত্তাকীদের সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করছিলাম। তখন হযরত জুন্নুর মিসরী রাহমাতুল্লাহে আলাইহি সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা হচ্ছিল। এমন সময় ওমর বিন তাবাহও এসে পড়লেন। তিনি বললেন, হে ভ্রাতৃবর্গ, আমার বিবেচনায় ইমাম শাফেয়ী সবচেয়ে জাহেদ, আবেদ এবং মুত্তাকী। তিনি আপনহারা অবস্থায় কোরআন তেলাওয়াত করে থাকেন। সাংসারিক হট্টগোল হতে তিনি সম্পূর্ণ দূরে অবস্থান করেন। আমীর ওমরাহ ও রাজসরকারের তিনি কোন পরোয়া করেননি। একদিন আমি এবং মাজনীর গোলাম শাফেয়ী সাহেবের সঙ্গে সাফা পাহাড়ে যাচ্ছিলাম। ঘটনাক্রমে গোলাম ব্যক্তি আয়াত পাঠ করলেন। ইমাম শাফেয়ী উক্ত আয়াত শ্রবণ করে কেঁপে উঠলেন এবং অধীর রোদন করতে লাগলেন। খোদার ভয় তাঁর মধ্যে অত্যন্ত প্রবল পরাক্রান্ত ছিল।

রবীয় বিন সুলায়মান বলেন, ইমাম শাফেয়ীর সঙ্গে আমি হজ্বে গেলাম। হজ্ব-সম্পাদনের প্রতিটি স্তরের কর্তব্য পালনে তিনি অধীর রোদন করতে লাগলেন। আর অত্যন্ত তন্ময় তদ্গতভাবে নিম্নলিখিত কবিতা পাঠ করছিলেন।

আল্লাহর রাসূলের বংশধরগণ আমার অবলম্বন এবং খোদার দরবারে এটাকে আমি একটি নাজাতের কারণ মনে করি। উক্ত কারণে আমি আশা করেছি যে, আমার ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে।

ইমাম শাফেয়ী সাহেব এমনই মর্মস্পর্শী সুরে কোরআন পাঠ করতেন যে, তখন মুসল্লিদের মধ্যে রোদনের সুর পড়ে যেত। আর কোন মজলিসে তিনি যখন কোরান মজিদ পাঠ করতেন, তখন লোকেরা রোদনে রোদনে বেহুশ মতোয়ারা হয়ে যেত।

বুদ্ধির প্রখরতা

ইমাম সাহেবের আম্মা অত্যন্ত নেককার ও আমানতদার ছিলেন। লোকে তাঁর কাছে বহু টাকা-পয়সা ও মাল-সম্পত্তি আমানত রাখতো। তখন ইমাম সাহেবের বয়স মাত্র ছয় বছর। একদিন দুই ব্যক্তি সমবেতভাবে তাঁর আম্মাজানের কাছে একটি কাপড়ের বাক্স আমানত দিয়ে দিলেন। কিছুদিন পর একব্যক্তি এসে বাক্সটি দাবী করল। ইমাম-জননী বললেন, তোমার সাথী তো বাক্সটি নিয়ে গিয়েছে। সেই ব্যক্তি বলল, আমি তো বলেছিলাম যে, আমরা দুইজন না আসলে, আপনি বাক্স দিবেন না।

ইমাম জননী এটার কোন সদুত্তর দিতে পারলেন না। তিনি মহা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ইতিমধ্যে বালক শাফেয়ী মক্তব হতে ফিরে মাতার বিষণ্ন চেহারা দেখে এটার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। ইমাম জননী ঘটনা বর্ণনা করলেন। বালক সকল কথা শুনে বললেন, "আপনি এজন্য আদৌ চিন্তিত হবেন না। লোকটি আবার এসে বাক্স চাইলে বলবেন, তুমি তোমার সাথীকে নিয়ে আইস।"

হারুণুর রশীদ তখন বাগদাদের খলীফা। একদিন রাত্রিকালে তাঁদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন এক বিষয় প্রসঙ্গে বাক বিতণ্ডা হয়। জুবায়দা ক্রোধভরে খলীফাকে দোজখী বলে সম্বোধন করলেন। খলীফা জবাবে বললেন, আমি যদি দোজখী হই, তবে তুমি তালাক হয়ে যাও।

এটার পরই তাঁদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। প্রকৃতপক্ষে তাঁদের মধ্যে গভীর ভালবাসা ছিল। হারুণুর রশীদ মহা দুঃখিত অন্তরে সকল আলেমকে সমবেত করে উক্ত মাসআলার সমাধান জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু কেউই এটার সদুত্তর দিতে পারছিলেন না। খলীফা বেহেশতী না দোজখী এটার উপরই উক্ত মাসআলার জবাব নির্ভর করেছিল। এটা বলা তাঁদের পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়াল।

এমন সময় তের বছরের বালক ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহি দণ্ডায়মান হয়ে বললেন, আমি এ মাসআলার জবাব দিতে পারবো।

লোকেরা ভাবল, বালকটি সম্ভবতঃ পাগল, নতুবা সকল আলেম ও বুজুর্গলোক মিলেও যে জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করতে অক্ষম, সেখানে এই বালকটির কথা বলবার কি অধিকার রয়েছে?" খলীফা তাঁকে অনুমতি দান করলে তিনি বললেন, উক্ত মাসআলার জবাব দিবার পূর্বে আমি আপনার কাছে জানতে চাই, এখন কি আমার কাছে আপনার প্রয়োজন, নাকি আপনার কাছে আমার প্রয়োজন? হারুণুর রশীদ বললেন, এখন আপনার কাছেই বরং আমার প্রয়োজন।

তখন ইমাম সাহেব বললেন, তবে এ কেমন কথা যে, আপনি উচ্চ আসনে বসে থাকবেন, আর আমি নিম্ন আসনে বসে থাকবো? আলেমের স্থান অতি উচ্চে। আমি আমার অপমান সইতে পারি কিন্তু আলেমের অপমান বরদাস্ত করতে রাজী নই।

খলীফা তখন নিম্নে এসে ইমাম সাহেবকে খলীফার আসনে বসালেন। তারপর ইমাম সাহেব খলীফাকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, বলুন তো আপনার জীবনে কি এমন কোন ঘটনা ঘটেছে যে, আপনার পাপ করতে ইচ্ছা হয়েছে এবং আপনার সেই পাপ করার ক্ষমতাও ছিল, কিন্তু শুধু আল্লাহর ভয়ে আপনি তা পরিত্যাগ করেছেন?

খলীফা বললেন, এরূপ ঘটনা আমার জীবনে বহুবার ঘটেছে। তখন ইমাম সাহেব সুস্পষ্টভাবে বললেন, আমি ফতোয়া দিচ্ছি যে, আপনি বেহেশতী। কাজেই আপনার বিবিও তালাক হয়নি।

ওলমায়ে কেরাম এটার দলীল চাইলে, ইমাম সাহেব বললেন, খোদা বলেছেন এবং যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়ার ভয়ে নিজকে পাপ হতে রক্ষা করেছেন, নিশ্চয় বেহেশত তার থাকবার স্থান।"

উক্ত জবাব শুনে সকলেই মহা সন্তুষ্ট হলেন। আর পরস্পর বলাবলি করতে লাগলেন। বাল্যকালেই যিনি এতদূর অগ্রসর, পরিণত বয়সে যে তিনি অদ্বিতীয় হবেন, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

স্মৃতি শক্তি

ইমাম সাহেবের স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রবল ছিল। লোকেরা খলীফা হারুণুর রশীদের কাছে অভিযোগ পেশ করল যে, ইমাম সাহেব কোরআন শরীফ হেফ্‌জ করেননি। আর বাস্তবিক পক্ষে কোরআন শরীফ তখন তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল না। খলীফা তাঁকে পরীক্ষা করতে চাইলেন। তিনি ইমাম শাফেয়ীকে রমযান মাসে তারাবীর নামাযের ইমাম নিযুক্ত করলেন। ইমাম সাহেব প্রতিরোজ এক পারা করে মুখস্ত করতেন এবং তারাবীর নামাযে তা শুনায়ে যেতেন। এইরূপে তিনি ত্রিশ দিনে ত্রিশ পারা শুনায়ে দিলেন।

ইমাম সাহেবের কেরামতি

প্রতি বছর রোম-সম্রাট বাগদাদের খলীফা হারুণুর রশীদের কাছে কর পাঠাতেন। একবছর রোমের শাসনকর্তা খলীফার দরবারে এই বলে কয়েকজন

পাদ্রী প্রেরণ করলেন, আমার রাজ্যের কতিপয় তত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণের সাথে যদি আপনার রাজ্যের মুসলিম পণ্ডিতবর্গ তর্ক করে জয়ী হতে পারেন, তবে আমি রীতিমত কর প্রেরণ করব। অন্যথায় আপনি আমাদের কাছ হতে কর চাইবেন না।

এই দরে চার শত পাদ্রী এসেছিলেন। হারুণুর রশীদ দিজলা নদীর তীরে কতিপয় জ্ঞানী আলেমকে সমবেত করলেন। অতঃপর ইমাম শাফেয়ীকে বললেন, এ ক্ষেত্রে আপনাকেই সর্বপ্রথম হতে হবে।

উভয়পক্ষে দিজলার তীরে উপস্থিত হলে, ইমাম শাফেয়ী একখানা নামাযের রুমাল কাঁধে করে পায়ে হেঁটে নদীর উপর চলে গেলেন। অতঃপর পানির উপর নামাযের রুমাল পেতে বললেন, যিনি আমার সাথে বচসা করতে ইচ্ছুক, তিনি এখানে আসুক।

খৃষ্টানগণ এটা দেখে অবাক হয়ে রইলেন। এমনকি শেষে অনেকেই দীন-ইসলাম গ্রহণ করলেন। বহু পাদ্রীও তখন মুসলমান হয়ে যান। রোম-সম্রাটের দরবারে উক্ত সংবাদ পৌছলে, তিনি বললেন, খোদার শোকর যে, সেই লোক এই দেশে আসেননি। তিনি যদি এ দেশে আসতেন, সারা রোম-সাম্রাজ্যে একজন খৃষ্টানও থাকত না।

নবী-বংশধরদের প্রতি শ্রদ্ধা

ছাত্র-জীবনে ইমাম সাহেব অধ্যয়ন কালে দশ বার উঠলেন এবং দশ বার বসলেন। লোকে এটার কারণ জিজ্ঞেস করলে, তিনি বললেন, সৈয়দ বংশের একটি শিশু দরজায় খেলা করছেন। শিশুটি আমার সম্মুখে আসলে, আমি তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে দণ্ডায়মান হই। আমার সম্মুখে আমার প্রেমের নবী রহমতের ছবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধর আসবেন, আর আমি না দাঁড়ায়ে বসে থাকব, তা কখনও হতে পারে না!

ইমাম সাহেবের বাণী

তিনি বলেন, যিনি আমাকে আদব বা নীতি শিক্ষার একটি অক্ষর শিক্ষা দিয়েছেন, আমি তাঁর খাদেম। যিনি অযোগ্য ব্যক্তিকে এলম শিক্ষা দেন, তিনি এলমের ফজিলত বিনষ্ট করেন। পক্ষান্তরে তিনি যোগ্য ব্যক্তিকে এলম হতে বঞ্চিত করেন, তিনি বড় জালেম।

কেউ যদি এই দুনিয়া আমার কাছে এক টুকরো রুটির বদলে বিক্রয় করে তবে আমি গ্রহণ করব না।

এক ব্যক্তি ইমাম সাহেবের কাছে কিছু উপদেশ চাইলে, তিনি বললেন, আপনি কখনও এমন আক্ষেপ করবেন না যে, আমি অমুক ব্যক্তির মত ধন সঞ্চয় করতে পারলাম না; কেননা, যে ধন সঞ্চয় করছে, সে এটা রেখেই দুনিয়া পরিত্যাগ করবে। এটা দ্বারা তার কোন লাভ হয়নি। বরং আপনি এরূপ আক্ষেপ করবেন যে, অমুক ব্যক্তি যেরূপ ধর্ম-কর্ম করেছে, আমিও যদি তদ্রূপ ধর্ম-কর্ম করতে পারতাম! দুনিয়ায় কেউ মৃতব্যক্তির উপর হিংসা করে না। জীবিত ব্যক্তি প্রতিহিংসা করেও কোন লাভ নাই। কেননা জীবিতও একদিন মৃত হবে।

একদিন এক ব্যক্তি মক্কাশরীফের দরবেশগণের খেদমতের জন্য কিছু টাকা পয়সা প্রেরণ করেন। ঘটনাক্রমে ইমাম শাফেয়ীও তখন মক্কাশরীফে ছিলেন। সেই ধনের কিছু অংশ তাঁর খেদমতে পেশ করা হলো।

ইমাম সাহেব বললেন, এই ধনের মালিক ধন বিতরণ সম্বন্ধে কি নির্দেশ দান করেছেন? বাহক বলল, তিনি মক্কার খোদা-ভীরু লোকদের এটা দান করতে নির্দেশ দান করেছেন। এটা শুনে ইমাম সাহেব বললেন, আমি এই মাল গ্রহণ করতে পারি না; কেননা, আমি খোদা-ভীরু নই।

যৌবনের প্রারম্ভে তিনি মক্কাশরীফে অবস্থান করেন। একদিন রাত্রিকালে তিনি চাঁদের আলোতে বসে কিতাব পাঠ করছিলেন। এদিকে নিকটেই কাবাগৃহে বাতি জ্বলছিল। এক ব্যক্তি তাঁকে বাতির আলোতে না পড়ে চাঁদের আলোতে পড়বার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, এই বাতি শুধু কাবার জন্যই জ্বালান হয়েছে। আমি সেই আলোতে কিতাব পড়লে অন্যায় হবে।

ইমাম শাফেয়ী সারা জীবনে কখনও হারাম খান নেই। একবার তিনি একজন সিপাহীর মেহমান হন। এটার কাফ্ফারা স্বরূপ তিনি চল্লিশ রাত্রি ভোর পর্যন্ত নফল নামায পড়েছিলেন।

বুদ্ধি

কাজী এয়াহয়া বিন আকসাম বলেন, আমি ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহে আলাইহির চেয়ে অধিক বুদ্ধিমান লোক অপর কাউকেও দেখিনি। ইমাম মাজনী বলেন, অর্দ্ধ পৃথিবীর লোকের বুদ্ধি এক পাল্লায় রেখে অপর পাল্লায় ইমাম শাফেয়ীর বুদ্ধি রাখলে, ইমাম সাহেবের বুদ্ধি অধিক ভারী হবে।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের সাথে অপর এক বুজুর্গ ব্যক্তি হজ্বে যান। তাঁরা উভয়ে একই স্থানে অবস্থান করছিলেন। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল প্রভাতে চুপচাপ উঠে পবিত্র হেরেম শরীফে চলে যান।

বুজুর্গ ব্যক্তি ধারণা করলেন যে, তিনি সম্ভবতঃ হযরত সুফিয়ান বিন আনীয়া রাহমাতুল্লাহের শিক্ষা মজলিসে যোগদান করে থাকবেন। সেই বুজুর্গ ব্যক্তি হেরেম শরীফে যেয়ে হযরত সুফিয়ান বিন আনীয়া হযরত ইমাম জহুরী এবং অপরাপর শ্রেষ্ঠ ইমাম ও তাবেয়ীনদের অতি প্রিয় শাগরেদ।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল বললেন, আমি যদি এমন বুদ্ধিমান লোকের মজলিসে না বসি, তবে কেয়ামত পর্যন্ত এমন সুযোগ আর মিলিবার নয়। এই কোরাইশী নব্যযুবকের চেয়ে কিতাবুল্লাহ্ বুঝবার ক্ষমতা সম্পন্ন আমি অপর কাউকেও পাইনি।

বুজুর্গব্যক্তি তাঁর নাম জিজ্ঞেস করলে, তিনি বললেন, তিনিই বিশ্ববিখ্যাত ইমাম শাফেয়ী।

ইমাম বোখারীর উস্তাদ ইমাম হামীদী বলেন, আমি মক্কাশরীফের সকল শেখকে ইমাম শাফেয়ীর বুদ্ধি, মেধা, স্পষ্টবাদিতা এবং জ্ঞানের প্রশংসা করতে শুনেছি।

ইমাম মালেক বলছেন, আমার কাছে যত ছাত্র শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েছে, তন্মধ্যে ইমাম শাফেয়ীর চেয়ে অধিক মেধাবী ও সমর্যাদার আমি অপর কাউকেও পাইনি।

আবু ওবাইদ কাসেম বিন সালাম বলেন, ইমাম মালেক রাহমাতুল্লাহে আলাইহি ইমাম শাফেয়ীর তেজস্বীতা ও স্পষ্টবাদিতায় মোহিত ও মুগ্ধ ছিলেন।

স্বয়ং ইমাম শাফেয়ী বলেন, ইমাম মালেক বড় স্বস্নেহে ও আগ্রহভরে আমাকে তাঁর সম্মুখে কিতাব পাঠ করতে দিতেন। তিনি আমাকে কিতাব পড়ে যেতে আদেশ করতেন। আমি খানিকটা পড়ে চুপ করলে, তিনি বলতেন, না, তোমাকে আরও পড়তে হবে। আমার পঠন-পদ্ধতি এবং বুঝবার ও বুঝাবার পন্থাকে তিনি অত্যন্ত পছন্দ করতেন।

আত্ম-বিশ্বাস

একদিন ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ইমাম ইসহাক বিন রাহুবিয়া ও ইমাম আবদুর রাজ্জাক মুহাদ্দেসের শিক্ষা-মজলিসে যোগদান করতে ইচ্ছা করলেন। তাঁরা সেখানে পৌছে দেখতে পেলেন যে, বড় জাঁকজমকের সাথে এক নব্যযুবক মসনদে উপবিষ্ট রয়েছে। আর তাঁর চারধারে অন্তহীন লোকের ভিড়।

সেই নব্যযুবকটি স্বগৌরবে দান করে বলতেছেন, হে শামদেশবাসী ও ইরান দেশবাসী, আপনারা আমাকে হুজুর আলাইহিচ্ছালামের হাদীসাবলী সম্বন্ধে যে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারেন এটার সদুত্তর দিতে প্রস্তুত রয়েছে।

ইমাম ইসহাক বললেন, আমি বললাম, এই উদ্ধত গর্বিত যুবকটি কে? লোকেরা বলল, তিনি মুহাম্মদ বিন ইদরীস শাফেয়ী মওলবী।

ইমাম ইসহাক ইমাম হাম্বলকে বললেন, চলুন ইমাম শাফেয়ীকে পাখি উড়া সম্বন্ধে হাদীসটির তাহকীক জিজ্ঞেস করে আসি। ইমাম আহমদ বললেন, এটার গুরুত্ব-তো পরিষ্কার। অর্থাৎ রাত্রিকালে পাখিগুলোকে বাসায় ঘুমাতে দাও। কিন্তু আপনি যখন সেখানে যেতে চাইলেন, তখন আমিও আপনার সাথী হচ্ছি।

ইমাম আহমদ ইমাম শাফেয়ীকে সেই হাদীসের মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন।

ইমাম শাফেয়ী অবিলম্বে এটার উত্তর প্রদান করলেন যে, মূর্খযুগে রীতি ছিল যে, রাত্রিকালে যদি কাউকেও ভ্রমণে বের হতে হতো, তবে পাথর নিক্ষেপ করে পাখিগুলো বাসার বের করা হতো। এটার যদি ডান দিকে উড়ত, তবে এটাকে মঙ্গলজনক মনে করা হতো এবং বাম দিকে উড়লে অশুভ মনে করা হতো। এই ঘটনা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে পেশ করা হলো, তখন হুজুর বললেন, শুন। পাখিগুলো এদের বাসায় বিশ্রাম করতে দাও। আর তোমরা খোদার উপর ভরসা রাখ।

ইমাম ইসহাক তখন ইমাম আহমদকে বললেন, আমরা ইরাক হতে হেজাজ পর্যন্ত শুধু এই হাদীসের মর্ম উদ্ধার করার জন্য ভ্রমণ করতাম, তবে তাও সার্থক হতো না। তখন ইমামত্রয় ইমাম শাফেয়ীর তেজস্বীতা ও হাদীস জ্ঞানকে মনেপ্রাণে সমর্থন করলেন।

মুফ্‌তি পদ প্রাপ্তি

মদীনার আলেমবৃন্দ এবং ইমাম মালেক রাহমাতুল্লাহে আলাইহি ইমাম শাফেয়ীকে চৌদ্দ পনর বছর বয়সের সময়ই ফতোয়া দেওয়ার অনুমতি দান করেন। ইমাম শাফেয়ী মক্কাশরীফ হতে ফিরিবার পথে তাঁর মক্কাশরীফের উস্তাদ মুসলেম বিন খালেদ জাঞ্জী ও তাঁকে ফতোয়া দেওয়ার অনুমতি দান করেন।

হযরত ইমাম সুফিয়ান বিন আনিয়া এবং ইমাম মালেক রাহমাতুল্লাহে আলাইহে ইমামকুল শ্রেষ্ঠ মুহাম্মদ ইবনে শাহাবুদ্দীন জহুরীর অতি প্রিয় শাগরেদ ছিলেন। ইমাম শাফেয়ী তাঁদের কাছ হতেও বহু ফায়দা লাভ করেন।

ইমাম সুফিয়ান বিন আনীয়া কতিপয় বছর পর্যন্ত ইমাম শাফেয়ীকে হাদীস ফিকাহ ও তফসীর শিক্ষা দেন। একদিন তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হে শাফেয়ী, ইমাম জহুরীর রেওয়ায়েতে হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে যে, হুজুর

আলাইহিচ্ছালাম উম্মুল মুমিনীন হযরত সফীয়া সহ মসজিদে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে তিনি দুইজন লোকের সাক্ষাৎ পেলেন। তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, আমার সঙ্গে আমার বিবি সফীয়া উম্মুল মুমিনীন রয়েছে। আর এটাও বললেন যে, শয়তান রক্তের ন্যায় মানুষের রগ-রেশায় যাতায়াত করে থাকে।

হুজুরের ঐ সকল বলবার উদ্দেশ্য কি ছিল? ইমাম শাফেয়ী বললেন, হুজুর আলাইহিচ্ছালামের এইরূপ বলবার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, তাদের অন্তরে যেন এইরূপ ভবের উদয় না হতে পারে যে, একজন স্ত্রীলোক কিরূপে একজন মহানবীর সাথী হতে পারে? বা এতে শয়তানের কুমন্ত্রণায় পড়ে তাদের হৃদয়ে মন্দ ধারণার উদ্রেক হতে পারে। সেই সব চিন্তা করে তিনি সর্বাগ্রেই পরিষ্কার করে দিলেন যেন তাদের মস্তিষ্কে কোন মন্দ ধারণাই ঢুকতে না পারে। আর অপরাপরদের জন্যও এটাতে বহু উপদেশ রয়েছে।

হযরত (সাঃ) এই সকল বলবার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, তিনি নবী হওয়া সত্বেও তাঁর প্রতি মন্দ ধারণার উদ্রেক হতে পারত। কাজেই প্রত্যেক মানুষের সর্বদা এইরূপ সাবধান থাকা উচিত যেন, তার প্রতি কোন প্রকার অপবাদ দিবার কোন সযোগ না ঘটে। কেননা, শয়তান রক্তের ন্যায় মানুষের রগ-রেশায় যাতায়াত করে থাকে।

হযরত সুফিয়ান বিন আনীয়া রাহমাতুল্লাহে আলাইহে বললেন, "আল্লাহ্ আপনাকে পুরস্কৃত করুক! আপনার জবাবে আমি মহা সন্তুষ্ট হয়েছি। এখন হতে আপনি ফতোয়া দিতে থাকবেন।"

ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের অভিমত

ইমাম শাফেয়ী একাকীই বহু কঠিন সমস্যার সুসমাধান করে দিতেন।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহমাতুল্লাহে আলাইহি বলেন, "আমি ইমাম শাফেয়ীর চেয়ে উর্বর মস্তিষ্ক, উপস্থিত-বুদ্ধি এবং মাসআলার সহীহ ও দলিলযুক্ত জবাবদাতা আর কাউকেও দেখিনি।" ইমাম সাহেব ১৯৫ হিজরী পর্যন্ত মক্কাশরীফের মুফতীরূপে নিযুক্ত ছিলেন। অতঃপর তিনি বাগদাদ চলে আসেন। হারুণুর রশীদ একদিন ইমাম সাহেবকে তাঁর শাহী দরবারে ওয়াজ করতে অনুরোধ করলেন। তাঁর ওয়াজ সভাশুদ্ধ লোকের মর্ম স্পর্শ করল। সভাময় রোদনের সুর পড়ে গেল স্বয়ং হারুণুর রশীদও অধীরভাবে রোদন করলেন। সভাশেষে খলীফা তাঁকে পঞ্চাশ হাজার দেরহাম পুরস্কার প্রদান করেন।

রবীয় ও মাজনী বলেন, "ইমাম সাহেব পঞ্চাশ হাজার দেরহামের মধ্যে চল্লিশ হাজার দেরহাম আলেম-ওলমা, ফকীহ-দরবেশ, দীন-দুঃখী এবং এতিম-বিধবাদের মধ্যে বিলায়ে দেন।"

লোকেরা বলল, আপনি-তো প্রায় সব অর্থই অপরকে বিলায়ে দিয়েছেন। তিনি বললেন, "খোদা বলেছেন এবং তাদের মালের উপর দরিদ্রের দাবী রয়েছে।' তাদেরকে কিসমতেই এইসব আমদানী হয়ে থাকে। কাজেই তাদের মাল আমি তাদেরকে বিলায়ে দিয়ে থাকি; খোদা আমাকে তাদের মধ্যস্থ লোক নিযুক্ত করেছেন। আমার মধ্যস্থতায় তাদের মাল তাদের কাছে পৌঁছে দিবো। আমি ভয় করি, আমি যদি আজ তাদের ধন তাদের কাছে যথাযথভাবে পৌঁছে না দেই, তবে হাশরের দিন আমাকে খোদার কাছে জবাবদিহি করতে হবে।"

ইমাম শাফেয়ী আবার মক্কাশরীফে চলে আসলেন। ১৯৮ হিজরীতে হজ্ব-সম্পাদনের পর তিনি বাগদাদে পদার্পন করেন। সেখানে কয়েক মাস অবস্থানের পর তিনি আবার মিসরে চলে যান। শেষ বয়স পর্যন্ত তিনি সেখানেই কালাতিপাত করেন। সেখানেই তিনি ইন্তেকাল করেন।

তর্ক-শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি

ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহি হেজাজ ও ইরাকের ফিকাহ, হাদীস ও কৃষ্টির সাথে পরিচিত ছিলেন। তিনি মক্কা-মদীনা, এয়মন, ইরাক, শাম ও মিসর ইত্যাদি বহু দেশ ভ্রমণ করেন। অন্য কোন ইমাম এত দেশ পর্যটন করেননি। তিনি বিভিন্ন দেশের আলেম-ওলমা এবং জ্ঞানী-মানীদের কাছ হতে বহু শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করেন। এজতেহাদী মাসআলা সম্বন্ধে সমগ্রদেশের লোক তাঁকে মুহাদ্দেস এবং মহামহিম ইমাম রূপে বরণ করে নিয়েছিল। এখানেও এটার কিছুটা আলোচনা করা হবে।

এতিমের মাল ও যাকাত

ইমাম শাফেয়ী ফতোয়া দিয়েছিলেন যে, এতিমের মালেরও যাকাত দিতে হবে। কতক লোক এটার প্রতিবাদ করলেন। তাঁদের যুক্তি এই ছিল যে, খোদা কোরআনে বলছেন– 'এবং নামায কায়েম কর এবং জাকাত আদায় কর।' এই আদেশ থাকা সত্ত্বেও এতিম ও নাবালেগের উপর নামায ফজর নয়। কাজেই এতিমের উপর জাকাত কিরূপে ফরজ হতে পারে? নাবালেগের প্রতি কোন শাস্তিবিধানও হতে পারে না। নাবালেগ, পাগল এবং নিদ্রিত ব্যক্তির কাজকর্মের জন্য কোন ধর-পাকড় বলা চলে না।

ইমাম শাফেয়ী এ সকল শুনে বললেন, "আপনাদের যুক্তি প্রমাণগুলো আগাগোড়া ভ্রম পরিপূর্ণ। তদুপরি আপনাদের যুক্তি অনুসারে আপনারাই কাজ করেননি, আপনারা এখন আমার বক্তব্য শ্রবণ করুন–শরীয়তের মূল মর্ম এই যে, মালের উপর যাকাত ফরজ হয়। বয়সের উপর এটা ধার্য হয়নি। শরীয়তানুসারে যিনি মালদার, তার এক বছর কাল যদি অতীত হয়ে যায়, তবে সেই বছরের মালের যাকাত ফরজ। আর নামায বালেগের উপর ফরজ। বালেগ না হলে পাক-পবিত্রতা সম্বন্ধে সে ওয়াকেফহাল হতে পারে না।

আর আপনারা যে আপনাদের কথানুযায়ী কাজ করেন না, এটার কাহিনী শ্রবণ করুন। অপরিণত বয়সে যদি কোন বালিকার স্বামী মারা যায়, তবে আপনারা পরিণত বয়সের স্ত্রীলোকের ন্যায় তাদের জন্যও ইদ্দত কায়েম করে থাকেন। আপনারা নাবালকের কাছ হতেও ওশর আদায় করে থাকেন। আর এটাও বলে থাকেন যে, এ ব্যাপারে তারা বালেগের সমতুল্য। এ সকল আপনাদের ভুল বুঝ।

আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করছি যে, আপনারা যখন বলেন যে, নামায ও জাকাত সঙ্গে সঙ্গে ফরজ হয়ে থাকে, তখন আপনারা এই মাসআলা সম্বন্ধে কি বলে থাকেন যে, যার কাছে মাল নেই, তাকে কোন জাকাত দিতে হয় না। তখন কি নামাযও তার জন্য রহিত হয়ে যায়। কিন্তু যে যদি মালদার হয়ে থাকে, তবে কি তার রহিত হয়ে যায়? কোন মালদার যদি ভ্রমণে থাকে এবং সেই ভ্রমণে থাকবার কালেই যদি তার জাকাত আদায় করার সময় শুরু হয়ে যায়, তবে সেই ভ্রমণে তাকে নামাযের কসর পড়তে হয়। আর সেই ভ্রমণের সময় সে কি জাকাতেরও কসর আদায় করতে পারে?

হায়েজ প্রাপ্তা স্ত্রীলোকের নামায রহিত হয়ে যায়। তখন কি তার জাকাতও রহিত হয়ে যায়?

এ সকল যুক্তি-তর্ক শুনে প্রশ্নকারীগণ মোহিত ও মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তারপর আরজ করলেন, "আমাদের কূফার ফুকহা ও অন্যান্য বুজুর্গগণ তো এতিম ও নাবালেগের মালের জাকাত আদায় করা ফরজ জ্ঞান করেন না।"

ইমাম শাফেয়ী বললেন, সহীহ্ হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, নাবালেগের মালের জাকাত আদায় করতে হবে।

জবাবে কূফার ফকীহগণ বললেন, আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদের (রাঃ) ফতোয়াও আপনার খেলাফ। ইমাম শাফেয়ী বললেন, আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদের

(রাঃ) মুকাবিলায় হুজুর আলাইহিচ্ছালামের অভিমত অগ্রগণ্য। তদুপরি আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাঃ) যা বলেছেন, তাও আপনারা বুঝতে ভুল করেছেন। তিনি বলেছেন, অলি যেন এতিমের মাল হতে জাকাত আদায় না করে; বরং এতিম যখন বালেগ হবে, তখন সে নিজেই হিসেব করে জাকাত আদায় করে দিবে। তদুপরি আপনারা আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদের (রাঃ) যে রেওয়ায়েত করে থাকেন, এটার রেওয়ায়েতকারী বিশ্বাসযোগ্য নয়। আর আমি যা বলেছি, এটার দলীল সহীহ হাদীস আর চারজন জবরদস্ত সাহাবা এটার মীমাংসা করেছেন। হযরত ওমর (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ্ বিন ওমর (রাঃ), হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) এটার মীমাংসা করেছেন।

ফিকাহ্ নাকি তামাশা

একদিন ফকীহ্, রবীয় ইমাম শাফেয়ীকে বললেন, কোন ব্যক্তি যদি রমযানের এক রোযা কযা করে, তবে আমার মতে তাকে বার রোযা কযা করতে হবে; কেননা এই মাসের এক দিন অন্য মাসের বার দিনের বরাবর।

ইমাম শাফেয়ী বললেন, এটা কি ফিকাহ্, নাকি তামাশা? আপনি যদি এরূপ মন্তব্য করতে চান, তবে আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করেছি, কোন ব্যক্তি যদি লাইলাতুল কদরের নামায কযা করে, তবে আপনাদের রায় মতে সে হাজার মাস পর্যন্ত কিরূপে কাযা করবে কেননা কোনআনে বলা হয়েছে, লাইলাতুল কদর হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই জবাব শুনে রবীয় খামোশ হয়ে চলে গেলেন।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের বিরোধিতা

ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহে আলাইহি একদিন আহমদ বিন হাম্বলকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি শুনেছি, আপনি বলে থাকেন যে, কোন ব্যক্তি যদি এক ওয়াক্তের নামায পরিত্যাগ করে, তবে সে কাফের হয়ে যাবে। ইমাম আহমদ তা স্বীকার করলে তিনি বললেন, সেই ব্যক্তি যদি মুসলমান হতে চায়, তবে কি করতে হবে। ইমাম সাহেব বললেন, তাকে আবার নামায পড়া আরম্ভ করতে হবে।

ইমাম শাফেয়ী বললেন, আপনার রায় মতে দেখা যায় যে, কাফের ব্যক্তির পক্ষেও নামায পড়া সহীহ হবে। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, নামায পড়বার নিমিত্ত প্রথম শর্ত এই যে; তার ঈমান থাকা চাই। কিন্তু কাফের ব্যক্তির কোন ঈমান থাকে না।

তিনি-তো কোন তার্কিক নন

ফযল বি.রবীয় একদিন ইমাম শাফেয়ীর কাছে আরজ করলেন, হাসন বিন জিয়াদ লুলুভীর সাথে আপনার একদিন তর্ক শুনতে চাই। ইমাম শাফেয়ী বললেন, তিনি-তো কোন সময়ই তর্ক করার মত উপযুক্ত লোক নন। আপনি যদি একান্তই তাঁর তর্ক-ক্ষমতা পরীক্ষা করতে চান তবে আমার যে কোন একজন ছাত্রকে তাঁর সাথে তর্কে লাগাইয়ে দিবেন, তবে আপনি আমার কথার সার্থকতা বুঝতে পারবেন।

হাসন বিন জিয়াদকে আহবান করা হলো। তখন ইমাম সাহেবের জনৈক ছাত্র তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, মদীনাবাসীগণ আমাদের সাথে কয়েকটি বিষয়ে বিরোধিতা করে থাকেন। আশা করি, আপনার মুখে আমরা সেই সকলের মীমাংসা শুনতে পাবো। হাসন তা শুনতে চাইলেন।

ছাত্রটি বললেন, মাসআলা এই যে, নামাযে থেকে কোন ব্যক্তি যদি কোন সতী-সাধ্বী স্ত্রীলোককে অপবাদ প্রদান করে তবে তার প্রতি আদেশ কি? হাসন বললেন, তাহার নামায বাতেল হয়ে যাবে। ওজু উভয়ই বাতিল হয়ে যাবে।

তখন ছাত্রটি বললেন, সতী সাধ্বী স্ত্রীলোকের প্রতি অপবাদ প্রদান অট্টহাসির চেয়ে কম নিন্দনীয় হতে পারে কিরূপে?

ফজল বিন রবীয় তা শুনে আপনা-আপনি হেসে উঠলেন। ইমাম শাফেয়ীকে সব কথা খুলে বললেন, তিনি বললেন, আমি সর্বপ্রথমেই তো বলেছিলাম যে, হাসন বিন জিয়াদ তর্ক করার মত উপযুক্ত লোক নন। এই ঘটনার পর হতে হাসন বিন জিয়াদকে মুহাদ্দেসীনগণ গ্রহণযোগ্য লোক নন বলে সাব্যস্ত করেন। আর তাঁর কাছ হতে কোন হাদীস রেওয়ায়েত করা হয়নি। ইমাম শাফেয়ী তাঁর সাথে তর্ক করতেও রাজী হননি, এটাই একাজের নিমিত্ত প্রধানতম কারণ ছিল।

রাসূলের বাণী দ্বারা প্রমাণ

ইমাম ইসহাক বিন বাহুবীয়া বলেন, এয়াহয়া বিন মঈন, ইমাম আহমদের এটা অভ্যাসগত ব্যাপার ছিল যে, তিনি অধিকাংশ সময়ই ইমাম শাফেয়ীর খেদমতে থাকতেন। আমি কিন্তু ইমাম আহমদের খেদমতে উপস্থিত থাকতে অধিক আগ্রহান্বিত থাকতাম।

একদিন ইমাম আহমদ আমাকে বললেন, "হে আবু এয়াকুব, তুমি কেন আমার সঙ্গে ইমাম শাফেয়ীর খেদমতে যাও না?"

আমি বললাম, "ইমাম শাফেয়ীর উস্তাদ সুফিয়ান বিন আনীয়ার সোহ্বত পরিত্যাগ করে আপনি কেন অ-প্রবীণ ইমাম শাফেয়ীর সভায় যোগদান করে থাকেন, আমি এটার কারণ বুঝতে পারছি না।"

ইমাম আহমদ বললেন, "আল্লাহ্ তোমাকে মঙ্গল হাসিল করার তৌফীক দান করুক! ইমাম শাফেয়ীর জ্ঞানের সাথে অন্য কারও জ্ঞানে কোন তুলনা হতে পারে না।"

তাঁর কথা শুনে আমিও একদিন ইমাম শাফেয়ীর শিক্ষা-মজলিসে যোগদান করলাম। অপরাপর লোকেরা আমাকে জিজ্ঞেস করল যে, মক্কা-শরীফে ঘরের ভাড়া লওয়া দুরস্ত কিনা। আমি তাদেরকে জানাইয়ে দিলাম যে, তা জায়েয নয়। এটা ইমাম শাফেয়ীর কান পর্যন্ত পৌছল। আমি তাঁর সাথেও কিছু বাদানুবাদ করলাম।

তখন ইমাম শাফেয়ী আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি আমার সাথে তর্ক করতে চান?" আমি তদ্রূপ মনোভাব প্রকাশ করলে তিনি বললেন, "আপনি শুনুন যে, খোদা বলছেন, অর্থাৎ 'সেই নিঃস্বদের জন্য যাদেরকে তাদের ঘর হতে বের করে দেয়া হলো।' এই আয়াত দ্বারা খোদা মক্কাশরীফের মুহাজেরদেরকে তাদের ঘরের মালিক বলে বর্ণনা করছেন। কাজেই এটা দ্বারা প্রমাণিত হয়ে গেল যে, মক্কাবাসীগণ তাদের ঘরে মালিক। ঘরের ভাড়া না দিয়ে সেইগুলো ব্যবহার করার কারও অধিকার নেই। ঘরের মালিক ইচ্ছা করলে তা বিক্রয়ও করে ফেলতে পারে।

হুজুর আলাইহিচ্ছালাম মক্কা বিজয়ের দিন বলেছিলেন, "ব্যক্তি স্বীয় ঘরের দরজা বন্ধ রাখবে, সে নিরাপদ। আর যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের ঘরে আশ্রয় লইবে, সেই ব্যক্তিও নিরাপদ।"

এখন বুঝা গেল যে, হুজুর আলাইহিচ্ছালাম মক্কাবাসীদেরকে তাদের ঘরের মালিক বলে প্রকাশ করেছেন। আর জেনে রাখবেন যে, হুজুর আলাইহিচ্ছালাম যখন পবিত্র মদীনায় পদার্পণ করলেন, তখন কোন এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল, আপনি মক্কাশরীফে কোথায় অবস্থান করবেন?" তখন হুজুর বললেন, 'আকীল আমার ঘর কার কাছে রেখে আসছিল? (সব ঘর কি বিক্রয় করে এসেছিল?)

ইমাম শাফেয়ী তখন ইসহাকের মতামত জানতে চাইলে, তিনি বললেন, "আতা, হাসন, ইব্রাহীম এবং মুজাহেদ ইত্যাদি আমরা তাবেয়ীন তো মক্কা শরীফের ঘরগুলো কোনকিছুর পরিবর্তে ব্যবহার করা মুবাহ বলেই সাব্যস্ত করেছি।"

ইমাম শাফেয়ী উপস্থিত লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তিনি কে?" লোকেরা বলিল, "তিনি ইমাম ইসহাক বিন রাহুবীয়া।"

ইমাম শাফেয়ী বললেন, "আপনি কি সেই ইসহাক যাঁকে খুরাসানবাসীরা ফকীহ বলে থাকে?" তিনি তা স্বীকার করলে, ইমাম সাহেব বললেন, "আপনি ব্যতীত অপর কেউ যদি এ সকল কথা বলত, তবে আমি তার কান মলিয়া এখান হতে বের করে দিতাম। আমি বলছি যে, হুজুর আলাইহিচ্ছালাম তা বলেছেন। আর আপনি বলতেছেন যে, আতা, ইব্রাহমি এবং আপনি এই সিদ্ধান্তে পৌছছেন। হুজুর আলাইহিচ্ছালামের অভিমতের সম্মুখে অপর কারও অভিমতের কোন গুরুত্ব থাকতে পারে কি?"

ইমাম শাফেয়ী বললেন, "ভাই এই আদেশটি কাবাশরীফ সম্বন্ধে সীমাবদ্ধ।" ইমাম ইসহাক তা শ্রবণ করে নীরব হয়ে গেলেন। তখন হতে তিনি ইমাম শাফেয়ীর জ্ঞান-গরিমাকে মনে প্রাণে স্বীকার করতে থাকেন এবং তখন হতে তিনি তাঁর সাহায্য লাভের জন্য লালায়িত থাকতেন।

অদ্ভূদ তর্ক

ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহে আলাইহি ফতোয়া দিয়েছিলেন যে, কোন মুসলমান গোলাম যদি কোন কাফেরকে আশ্রয় দেয়, তবে তা গ্রহণযোগ্য। তাঁর স্বপক্ষে তিনি দুইটি দলীল পেশ করেছেন। (১) হুজুর আলাইহিচ্ছালাম বলেছেন, "মুসলমানদের জিম্মা এক বরাবর। তাদের মধ্যে সাধারণ লোকও যদি কাউকেও আশ্রয় দেয়, তবে সমগ্র মুসলমানের পক্ষে তা আমল করা চাই।"

ইমাম শাফেয়ী বলেন, "গোলাম মুসলমানকে যদি সাধারণ কাফেরদেরকে আশ্রয় দিয়ে দেয়। ফারুকে আজম সেই গোলামের শর্তানুযায়ী সেই আশ্রয় বহাল রাখেন।

এ সম্বন্ধে জনৈক হানফী ফকীহ ইমাম শাফেয়ী সাহেবের বিরোধিতা করে বলেন যে, গোলামের রক্ত আজাদ মুসলমানের রক্তের বরাবর হতে পারে না। ইমাম শাফেয়ী বললেন, "আপনাদের মুখে এটা বলা এইজন্য শোভা পায় না যে, আপনারা গোলামের পরিবর্তে আজাদ মুসলমানকে প্রতিশোধ স্বরূপ খুন করা বাঞ্ছনীয় মনে করে থাকেন।"

এ সকল তর্ক-বিতর্ক হতে অনুমান করা যায় যে, হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে ফিকাহ সংক্রান্ত মাসআলার ব্যাপারে কিরূপ এলোমেলো ভাব দেখা দিয়েছিল।

একদিন ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মুহাম্মদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ হয়ে গেল। ইমাম মুহাম্মদ বললেন, "ধরে নেয়া হোক যে, কোন এক ব্যক্তি একটি বড় লৌহখণ্ড অপহরণ করে দালান প্রস্তুতিতে ব্যবহার করল এবং তাতে কয়েক হাজার টাকা ব্যয়ে এক বিরাট অট্টালিকা প্রস্তুত করল। অতঃপর সেই লৌহখণ্ডের মালিক যদি সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত করতে পারে যে, এটা তার লৌহখণ্ড এবং সেই লৌহখণ্ড সেই ব্যক্তি ফিরায়ে পেতে চায়, তবে এটার প্রতিবিধান কি?" তিনি বললেন, "লৌহখণ্ডের বালিকাকে আপ্রাণ বলে কহে লৌহখণ্ডের দাম তাকে দিতে হবে। তাতেও সেই ব্যক্তি যদি রাজী না হয়, তবে অতি সাবধানে সেই লৌহখণ্ড তাকে ফেরৎ দিতে হবে।"

ইমাম মুহাম্মদ তাঁকে আবার জিজ্ঞেস করলেন, "কোন ব্যক্তি যদি একটি তক্তা চুরি করে নিজের নৌকায় ব্যবহার করে এবং দরিয়ার মাঝে নৌকা পৌছবার পর তক্তার মালিক এসে এটা দাবী করে, তবে কি সেই তক্তা খুলে মালিককে দিয়ে দিতে হবে?" ইমাম শাফেয়ী বললেন, "না, তার তক্তা ফেরৎ দিতে হবে না।"

এই জবাব শুনে ইমাম মুহাম্মদ এবং তাঁর ছাত্রবৃন্দ অত্যন্ত খুশী হলেন। তারপর হাসতে হাসতে ইমাম মুহাম্মদ বললেন, "আপনার প্রথম জবাব ও দ্বিতীয় জবাবে বহু পার্থক্য রয়েছে।"

ইমাম শাফেয়ী বললেন, "কিস্তির মালিক যে তক্তাটি নৌকাতে লাগায়েছিল, তা যদি তার তক্তা হতো, তবে দরিয়ার মাঝে সেই তক্তা খুলে ফেলা জায়েয হতো কি?" ইমাম মুহাম্মদ বললেন, "তা হারাম হতো।"

তারপর ইমাম শাফেয়ী বললেন, "সেই দালানের মালিক যদি প্রয়োজনানুসারে তা মেরামত করতে চায়, তবে তা জায়েয হবে কিনা?" ইমাম মুহাম্মদ বললেন, "তা জায়েয হবে।"

ইমাম মুহাম্মদ বললেন, "নৌকার ব্যাপারে আর কি উপায় হতে পারে?" ইমাম শাফেয়ী বললেন, "নৌকা কিনারায় ভিড়লে তক্তাওয়ালাকে বলে কয়ে এটার দাম দিতে হবে। এটাতে যদি সে রাজী না হয়, তবে তাকে তক্তা খুলে দিয়ে দিতে হবে।"

ইমাম মুহাম্মদ বললেন, "হুজুর আলাইহিচ্ছালাম বলেছেন, 'কারও কোন ক্ষতি করতে নাই।'" ইমাম শাফেয়ী বললেন, "সেই ব্যক্তি তো নিজের ক্ষতি নিজেই করেছে।"

ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ইমাম মুহাম্মদ আলাইহির রাহমাতকে জিজ্ঞেস করলেন, "নিম্নলিখিত মাসআলা সম্বন্ধে আপনি কি বলেন?"

'এক ভদ্রবংশের লোক এক হাবশীর দাসীকে অপহরণ করে তার সাথে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে কালাতিপাত করে। সেই দাসীর গর্ভে কয়েকটি সন্তান জন্ম নেয়, তার মধ্যে উপযুক্ত পুত্র জন্মগ্রহণ করে। দীর্ঘকাল পর সেই হাবশী সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ করে যে, এই দাসী তার।'

ইমাম মুহাম্মদ বললেন, "সেই পুত্র হাবশীর ভাগে পড়বে।" ইমাম শাফেয়ী তখন তাঁকে খোদার কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন' নৌকার তক্তা উঠায়ে ফেলা এবং সেই বালকটিকে গোলামে পরিণত করার মধ্যে কোন্‌টি অধিক প্রয়োজনীয়?" ইমাম মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তখন চুপ করে রইলেন। ইমাম শাফেয়ী তখন বললেন, "যা সাধারণতঃ ঘটে না সেই সকল ব্যাপারে এবং কেয়াসী ব্যাপারে যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। এখন আর সাহাবাদের রীতি-নীতি নেই। কোন কঠিন সমস্যা দেখা দিলে, খুব বুঝে শুনে এটার জবাব দিতে হবে।"

ইমাম শাফেয়ীর ফতোয়া অনুযায়ী মোহরের কোন নির্দিষ্ট সীমা নেই। এটাকে সীমাবদ্ধও করতে নেই। হুজুর আলাইহিচ্ছালাম লোহার আংটি দ্বারাও বিবাহ জায়েয রাখতেন। হযরত তালহা (রাঃ) দীন-ইসলাম কবুল করেছেন, শুধু এই কারণেই হযরত উম্মে সলীম তাঁকে স্বামীরূপে বরণ করে নেন। উভয় পক্ষ যত টাকায় রাজী হয়, তাই মোহররূপে নির্ধারিত হওয়া উচিত।

ফকীগণ তাঁর সাথে তর্ক করা গৌরবের বিষয় মনে করতেন। পরিশেষে তিনি নিয়ম দিলেন যে, তাঁর সাথে তর্ক করতে হলে, শুধু হুজুর আলাই-হিচ্ছালামের বাণী দ্বারা তাঁকে খণ্ডন করতে হবে। তখন হতে তার্কিকের ভিড় আপনাআপনি কমে গেল।

ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আবু ইউসূফ

ইমাম শাফেয়ী বলেন, "মদীনাবাসীগণ আবু ইউসূফ রাহমাতুল্লাহে আলাইহির সাথে এই মাসআলা সম্বন্ধে ঝগড়া করতেন যে, দাবিদারের কসম এবং একটি সাক্ষী থাকলেই চলবে।" কাজী আবু ইউসূফ বলতেন, "আমি এটা সমর্থন করতে পারি না। কেননা, খোদা বলেন, অর্থাৎ তোমাদের মধ্য হতে দুইজন সাক্ষী নেও।"

এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, "সেই দুইজন সাক্ষী কেমন লোক হওয়া চাই?" কাজী সাহেব জবাব দিলেন যে, দুই জন ন্যায়পরায়ণ মুসলমান হওয়া আবশ্যক। মদীনাবাসীরা তখন চুপ হয়ে গেলেন।

আমি তখন আস্তে আস্তে তাঁকে বললাম, "লোকে যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করে যে, হক সাব্যস্ত করার ব্যাপারে আপনারা জিম্মিদের সাক্ষ্য কেন জায়েয বলে থাকেন? আর এখানে আপনি দুইজন ন্যায়পরায়ণ মুসলমানের সাক্ষ্য কেন জায়েয বলে থাকেন? আর এখানে আপনি দুইজন ন্যায়পরায়ণ মুসলমানের সাক্ষ্য শর্ত করতেছেন। আপনি তখন তাদেরকে কি জবাব দিবেন?" এই সকল শুনে কাজী ইউসূফ সাহেব বহুক্ষণ পর্যন্ত মাথা অবনত করে রাখলেন, এবং চিন্তা করে পরিহাস করে বললেন, "তাদের চিন্তা এতদূর পর্যন্ত গড়াতে পারে না।"

ইমাম মুহাম্মদ আবু ইউসূফ ইত্যাদি ইরাকের ফকীহবৃন্দ তর্ক-বিতর্কের ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ীর বিরোধী ছিলেন। কিন্তু তাঁরা সকলই ইমাম শাফেয়ীর গৌরব ও তেজস্বীতা সম্বন্ধে পরম শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম শাফেয়ী

ইমাম মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহে একদিন হারুণুর রশীদের দরবারে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে ইমাম শাফেয়ী সাহেবের সাথে তাঁর দেখা হলো। ইমাম মুহাম্মদ তৎক্ষণাৎ ঘোড়া হতে নেমে গেলেন। আর খাদেমকে বললেন, "তুমি খলীফাকে জানায়ে দিবে যে, ইমাম শাফেয়ী পদার্পণ করেছেন, কাজেই আজ খলীফার দরবারে হাজির হতে পারব না।"

ইমাম শাফেয়ী বললেন, "আচ্ছা, আপনি না হয় খলীফার দরবারেই চলে যান। আমি অন্য সময় আপনার খেদমতে হাজির হবো।" ইমাম মোহাম্মদ বললেন, "আপনার শুভ আগমনে যতখানি উপকৃত হব, সেখানে আমি তা আশা করতে পারি না।"

ইমাম শাফেয়ীর শারীরিক অবয়ব

হাফেজ ইবনে হাজর আসকলানী রাহ্মাতুল্লাহে আলাইহি বলেন, "ইমাম শাফেয়ী আকার আয়তনে মধ্যম ধরনের ছিলেন। তাঁর হাত খুব লম্বা ছিল। কপাল সুপ্রশস্ত চেহারা অধিক মাংস-বহুল ছিল না। দন্ত চিক্কন ও লম্বা ছিল। দাড়ী মধ্যম। শেষ বয়সে তিনি মেহেদির খেজাব ব্যবহার করতেন। নাসিকা দীর্ঘ ছিল। আর তাঁর চেহারা ছিল শান্ত ও গম্ভীর।

পরিবার

তাঁর বিবি ছিলেন একজন। তাঁর একজন দাসীও ছিল। তাঁর বিবি হযরত ওসমান (রাঃ)-এর বংশধর ছিলেন। তাঁর বংশধারা–হামীদা বিনতে নাফেয় বিন আনীয়া বিন ওমর বিন ওসমান বিন আফ্‌ফান (রাঃ)। তাঁর তিন ছেলে ও দুই মেয়ে ছিল। ছেলেদের মধ্যে দুইজন শৈশবেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। শুধু আবু ওসমান মুহাম্মদ জীবিত ছিলেন। মেয়ের নাম যথাক্রমে ফাতেমা ও জয়নব। তিনি পরিবারস্থ লোকজনের সাথে ভদ্রভাবে বসবাস করতেন।

ইমাম শাফেয়ীর পুত্র আবু ওসমান

নাম মুহাম্মদ, ডাক নাম আবু ওসমান। বংশধারা–মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ ইদ্‌রীস বিন আব্বাস বিন ওসমান বিন শাফেয়। হযরত ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহে আলাইহির ইন্তেকালের সময় আবু ওসমান মক্কাশরীফে অবস্থান করছিলেন। তিনি ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহমাতুল্লাহে আলাইহের বিশিষ্ট ছাত্র ছিলেন। ইমাম আহমদ বলতেন, "আমি তোমাকে তিনটি কারণে ভালবেসে থাকি। (১) তুমি আমার উস্তাদ ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহে আলাইহির পুত্র। (২) তুমি কোরাইশ। (৩) তুমি সুন্নতের পাবন্দ।"

ইমাম আহমদ বলেন, "আমি সেজদায় ছয়জন লোকের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করে থাকি। তন্মধ্যে একজন হলেন, ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহে আলাইহে।"

খেতাব বিন বশীর বলেন, "আমি যখন মাসআলা সম্বন্ধে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল সাহেবের কাছে জিজ্ঞেস করতাম, তখন তিনি বলতেন, এই প্রশ্নের তাই উত্তর যা একদিন রাত্রিকালে ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ ইমাম বোখারীর উস্তাদ ইমাম হামীদীকে বলেছিলেন। ইমাম শাফেয়ী সাহেব বলেছিলেন, হামীদী শ্রবণ কর। যাঁরা আমলকে ঈমানের অন্তর্গত মনে করেন না, তাঁদের বিরুদ্ধে দলীল স্বরূপ নিম্নলিখিত আয়াত পেশ করা হয়। অর্থাৎ "আর তাদেরকে তো এই আদেশ করা হয়েছিল যে, খাঁটি আমলের দ্বারা খোদার এবাদত কর এবং একাগ্র মনে নামায এবং জাকাত আদায় কর এবং তাই স্থায়ী ধর্ম।"

ইমাম সাহেবের ছাত্র ও শাগরেদ

হাফেজ ইবনে হাজর আসকালীন রাহমাতুল্লাহ আলাইহির শাগরেদের সংখ্যা প্রায় একশত ষাট বলে উল্লেখ করেছেন। রবীয় বিন সুলাইমান বলেন, "আমি

তাঁর দরজায় সাত শত গাড়ী দেখেছি। লোকেরা গাড়ীতে চড়ে বহু দূর-দরাজ হতে হাদীস ও ফিকাহ শুনবার জন্য আসত।" তাঁর শাগরেদদের সংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন ব্যাপার। তন্মধ্যে বিশিষ্ট কয়েকজনের নাম এখানে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হবে। এটাতে প্রতিপন্ন হবে যে, ইমাম শাফেয়ী সাহেবের শাগরেদ হওয়া তাঁদের পক্ষে কিরূপ গৌরবের বিষয় ছিল।

ইমাম বোখারীর উস্তাদ ইমাম হামীদী, হারমেলা বিন এয়াহয়া, সুলাইমান বিন দাউদ, আবু মুহাম্মদ হাসন বিন মুহাম্মদ জাফরানী আবু আলী আল বাগদাদী, ইব্রাহীম, ইসমাইল বিন এয়াহয়া মাজনী, আবু ছত্তার ইব্রাহীম বিন খালেদ, ইউনূস বিন আবদুল আয়লা, রবীয় বিন সুলাইমান, আবু ইয়াকুব ইউসূফ বিন এয়াহয়া, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম।

ইমাম হামীদী

নাম আবদুল্লাহ্ বিন জুবাইর; ডাক-নাম আবু বকর। ইমামুল এলম আবু বকর আবদুল্লাহ্ বিন জুবাইর কোরাইশ-আসদী-হামীদী-মক্কী। তিনি সুফিয়ান বিন আনীয়া, মুসলিম বিন খালিদ জাঞ্জি, ফুজাইল বিন আইয়াজ ইত্যাদির কাছ হতে হাদীস ও ফিকাহ রেওয়ায়েত করেন। তিনি ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহে আলাইহির ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন।

ইমাম আহমদ বলেন, "ইমাম হামীদী আমাদের মধ্যে ইমামরূপে পরিগণিত।" আবু হাতেম বলেন, সুফিয়ান বিন আনীয়ার শাগরেদদের মধ্যে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ। ইমাম বোখারী, আবুজর, আবু হাতেম এবং বশীর বিন মূসা তাঁর কাছ হতে রেওয়ায়েত করেন।

ইবনে আদী বলেন, ইমাম হামীদী ইমাম শাফেয়ীর সঙ্গে মিসরে গমন করেন। তিনি অত্যন্ত বিখ্যাত লোক ছিলেন। ইমাম বোখারী তাঁর কাছে হতে অধিকাংশ রেওয়ায়েত করেন।

সিরাজ বলেন, আমি ইমাম বোখারীকে বলতে শুনেছি যে, ইমাম হামীদী হাদীসের ইমাম। ইবনে সৈয়দ ও ইমাম বোখারী বলেন, ২১৯ হিজরীতে ইমাম হামীদী। মক্কাশরীফে ইন্তেকাল করেন।

আবু ইব্রাহীম

তিনি ইমাম শাফেয়ী, নয়ীম বিন হাম্মাদ ইত্যাদির কাছ হতে রেওয়ায়েত করেন। তিনি জ্ঞানের সাগর ছিলেন। ইমাম শাফেয়ী বলেন, তিনি যদি শয়তানের

সাথেও তর্ক করেন, তথাপি জয়ী হবেন। তাহাবী, জকরিয়া, সাকী, ইবনে আবী হাতেম তাঁর কাছ হতে রেওয়ায়েত করেন। তিনি অতি উচ্চ শ্রেণীর জাহেদ ও আবেদ ছিলেন। তিনি দুনিয়া হতে সম্পূর্ণ বিমুখ ছিলেন। জামাআতের সাথে তাঁর দুই রাকাআত নামায ছুটে গেলে, তিনি এটার পরিবর্তে পঞ্চাশ রাকাআত নামায পড়তেন। তাঁর অন্তর যাতে শক্ত হয়ে না যায়, তজ্জন্য তিনি সর্বদা ভীত-কম্পিত থাকতেন।

আবু ইসহাক বলেন, তিনি জাহেদ, আলেম এবং মুজতাহেদ ছিলেন। তিনি অতি উচ্চ শ্রেণীর তার্কিক ছিলেন।

ইসমাইল বিন এয়াহয়া মাজনী

ইমাম শাফেয়ী বলেন, মাজনীকে আমার মাজহাবের একজন সাহায্যকারী বলা যায়। ইমাম মাজনী কিতাব লিখবার সময় দুই অধ্যায় লিখে দুই রাকাআত নামায পড়ে নিতেন। তিনি অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি জামেয়ে সগীর, জামেয়ে কবীর, আল-মুখতসর, আল-মনসূর, আওরগীব ফীল এল্‌মে, কিতাবুল ওসায়েক, কিতাবুল আকাবের ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি দো'আ করা মাত্র কবুল হতো। তিনি ২৬৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

ইমাম সাহেবের রূহানী-গৌরব

সাহাবায়ে কেরামের সম্মুখে একমাত্র হুজুর আলাইহিচ্ছলামই জ্বলন্ত আদর্শরূপে বিরাজ করতেন। তিনিই তাঁদের চরিত্র গঠনের প্রধান উৎস ছিলেন। সাহাবাগণ সেই মহান আলোক দ্বারা প্রভাবান্বিত ছিলেন। কাজেই তাঁদের রূহানীয়ত, চরিত্র, আমল, ইবাদত, বৈরাগ্য, আল্লাহর উপর ভরসা ও ধৈর্য ইত্যাদি তাসাওফের কোন অংশেই মানবীয় দর্শনের কোন স্পর্শ পায়নি। সাহাবাদের হুবহু অনুকরণ অনুসরণ তাবেয়ীনদের জীবনেরও একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। তাবে-তাবেয়ীন এবং দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত সালেহীন একই আদর্শ অনুপ্রাণীত হয়েছিলেন। তাঁরা বিন্দু পরিমাণ বেদআতকেও প্রশ্রয় দিতেন না। কাজেই প্রত্যেক সালেহ, আবেদ এবং জাহেদের আমলের মধ্যে পরিপূর্ণরূপে বরকত থাকত। তারা শরীয়ত ও সুন্নতের অনুকরণ অনুসরণে বিন্দুপরিমাণও রদ-বদল করতেন না। আমরা সেই আলোতেই ইমাম শাফেয়ী আলাইহির রাহমাতের রূহানী জীবনের আলোচনা করব।

তাঁর প্রথম জীবন দারুণ অভাব অনটনের ভিতর দিয়ে কাটে। তখন লোকেরা তাঁর প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হয়ে দুঃখ প্রকাশ করলে তিনি বলতেন,

"আপনারা কি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবুজর (রাঃ) কে যে উপদেশ দান করেছিলেন, তা শ্রবণ করেনি? হযরত বলেছিলেন–অর্থাৎ তোমরা দুনিয়াতে অপরিচিত লোক বা মুসাফিরের ন্যায় কালাতিপাত কর এবং নিজের সম্বন্ধে ধারণা রাখবে যে, একদিন তোমাকে কবরে যেতে হবে।' আপনারা যদি এই হাদীস অনুযায়ী চিন্তা করে দেখেন, তবে দুনিয়ার সুখ শান্তি ও মোহ-মায়ার লালসা আপনা-আপনি প্রশমিত হয়ে যাবে। তাঁর দুঃখ-দুর্গতির দিনে তিনি এই উত্তর প্রদান করেছিলেন।

কিন্তু খোদা যখন স্বীয় অনুগ্রহ-অনুকম্পাবশতঃ ধন-ভাণ্ডার দীন-দরিদ্র, এতিম-বিধবা এবং গরীব ছাত্র ও আলেমদের মধ্যে অকাতরে বিলিয়ে দিতেন। তিনি সেই ধন ও প্রাচুর্যের চারভাগের একভাগের চেয়েও কম নিজের জন্য খরচ করতেন। তাঁকে এইরূপ অজস্র টাকা বিলায়ে দিতে দেখে আলেম-ওলামা ও মুহাদ্দেসীন আপত্তি জানালে তিনি বলতেন, "আমরা সুন্নতের অনুকরণ অনুসরণের দাবী করে থাকি। আজ আমাদের স্মরণ করা আবশ্যক যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁর স্ত্রী-পুত্র পরিবারের জন্য কি রেখে দিয়েছিলেন? হুজুর (সাঃ) যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার স্ত্রী-পুত্র পরিবার-পরিজনের নিমিত্ত আপনি ঘরে কি রেখে আসছেন। জবাবে তিনি বলেছিলেন, তাদের নিমিত্ত খোদা ও তাঁর রাসূলই যথেষ্ট।"

আপনারা এখন বিবেচনা করে দেখতে পারেন, আমি কেন আমার আমদানীর চার ভাগের এক ভাগ নিজের জন্য রেখে থাকি। আমি লজ্জিত আছি এবং ভয় করেছি, না জানি এই অর্থ খরচ ব্যাপারে কি খোদাতায়ালা আমার প্রতি নারায হন। আমাদের জানা উচিত যে, সৃষ্টিজগতের উপকার সাধনের নিমিত্তই খোদা মানবকে ধন দান করে থাকেন। আমি যদি তা শুধু আমার নিজের উপকারের জন্যই ব্যয় করি, তবে হাশরের দিন যখন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শফাআতকারী হবেন, সেদিন আমার কি উপায় হবে?" ইমাম সাহেব প্রায়ই এই সকল কথা বলে অধীর ভাবে রোদন করতেন।

বৈরাগ্য ও ইবাদত-বন্দেগী

তিনি নিজেই বলেছেন, "মিথ্যা শপথ দূরের কথা আমার জীবনে আমি কখনও সত্য শপথও করিনি। আমি রাত্রের তিন ভাগের এক ভাগ নফল এবাদত, জেকরে ইলাহী এবং তওবাতে কাটাই। তিন ভাগের এক ভাগ কোরান হাদীস ও ফিকাহ অধ্যয়ন এবং গ্রন্থ রচনায় কাটাই।"

তিনি কখনও কারও গীবত করেননি। তাঁর এবাদত বন্দেগীর নিমিত্তও তিনি সকলের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। তাঁর এক প্রধান শিষ্য বলেছেন, "ইমাম শাফেয়ীর চেয়ে অধিক পরহেজগার, দীনদার এবং খোদাভীরু আমি অপর কাউকেও দেখিনি।"

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহমাতুল্লাহ আলাইহির পুত্র আবদুল্লাহ হতে আল্লামা ইবনে জুজী রেওয়ায়েত করছেন যে, আবদুল্লাহ বলেছেন, "আমি আমার পিতা ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকে জিজ্ঞেস করলাম, ইমাম শাফেয়ী কে, যাঁর জন্য আপনি প্রায়ই দো'আ করে থাকেন।"

তিনি বললেন, 'প্রিয় বৎস, তিনি মানবজাতির স্বাস্থ্য ও সুস্থতাস্বরূপ এবং তিনি বিশ্ববাসীর জন্য সূর্যস্বরূপ। মানবতার পক্ষে বেঁচে থাকবার নিমিত্ত স্বাস্থ্য ও সূর্য যেরূপ আবশ্যকীয়, ইমাম শাফেয়ী ও তদ্রূপ আবশ্যকীয়।

শত্রুর মুখে চুনকালী

ইমাম শাফেয়ী মালেকী সম্প্রদায়ের কয়েকটি মাসআলা খণ্ডন করে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তাতে কতিপয় লোক মিসরের গভর্ণরকে বলে ইমাম শাফেয়ীকে মিসর হতে বিতাড়িত করার বন্দোবস্ত করে। গভর্ণর ইমাম সাহেবকে ডাকায়ে এনে তাঁকে মিসর পরিত্যাগ করতে আদেশ দিলেন। ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি গভর্ণরের দিকে তাকায়ে বললেন, "আপনার যদি কোন অসুবিধা না হয়, তবে আমাকে তিন দিনের সময় দিন।" গভর্ণর চিন্তা-ভাবনা করে তাঁকে তিন দিনের সময় দিলেন।"

তৃতীয় দিবস গভর্ণর অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। লোকেরা মহা আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলল' "খোদা যাকে ইচ্ছা কায়েম রাখেন এবং যাকে ইচ্ছা ধ্বংস করে দেন।"

ইমাম শাফেয়ীর প্রতি হযরতের শাফাআত

আল্লামা ইবনে জুজী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন, "আমি হুজুর আলাইহিচ্ছালামকে স্বপ্নে দেখে আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল, আপনার চাচার বংশধরদের মধ্যে মুহাম্মদ বিন ইদরীস শাফেয়ী মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। হুজুর কি তাঁর জন্য শফাআত করেছেন?"

হুজুর (সাঃ) বললেন, "আমি আল্লাহর কাছে আরজ করেছি, হে বিশ্ব-প্রতিপালক, মুহাম্মদ বিন ইদ্রীস শাফেয়ীকে বিনা হিসেবে ক্ষমা করে দাও।"

আমি আরজ করলাম, "হে আল্লাহর রাসূল, আপনি তাঁর কোন্ আমলের জন্য এরূপ শফাআত ফরামায়াছেন?"

হুজুর (সাঃ) বললেন, "শাফেয়ী আমার উপর এমন দরূদ পাঠ করত, যা আজ পর্যন্ত অপর কেউ পাঠ করেনি।" আমি আরজ করলাম, "হে আল্লাহর রাসূল, এটা কোন্ দরূদ?"

হুজুর (সাঃ) বললেন, "তা এই–

"আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদীন কুল্লু মা-যাকারাহুজ যাকিরুনা ওয়া সাল্লে আলা মুহাম্মাদীন কুল্লু মা-গাফালা আনহুল গাফেলুন।"

এই ঘটনার পর আমাদের পক্ষে নিম্নলিখিত হাদীসের প্রতি চিন্তা করে দেখা আবশ্যক, যা হযরত আবু আমামা হাশেমী (রাঃ) রেওয়ায়েত করেছেন এবং তা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ইমাম তিরমিযী এবং ইমাম আবু দাউদ ও রেওয়ায়েত করেছেন। হযরত আবু আমামা (রাঃ) বলেন, আমি হুজুর আলাইহিচ্ছালামকে বলতে শুনেছি যে, তাঁর উম্মতের মধ্যে সত্তর হাজার এবং প্রত্যেক হাজারের সাথে সত্তর হাজার লোক বিনা হিসেবে বেহেশতে চলে যাবে।"

এই হাদীস অনুযায়ী মনে হয় ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ আলাইহিও সেই বেহেশতীদের মধ্যে একজন হবেন।

ইমাম সাহেবের গ্রন্থাবলী

ইমাম রবীয় বিন সুলাইমান বলেন, "ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ আলাইহে যে ভাব-ভাষা ও জ্ঞান গরিমা পরিপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন এবং পাণ্ডিত্য পরিপূর্ণ যে আরবী ভাষায় কথাবার্তা ও আলাপ-আলোচনা করে থাকেন, তা হৃদয়ঙ্গম করার জন্য যথেষ্ট জ্ঞান থাকা আবশ্যক। আরবের আলেম-ওলামা সুধী মণ্ডলী তাঁর বক্তৃতা শ্রবণ করে আশ্চর্যান্বিত হয়ে যেতেন। তাঁর গ্রন্থরাজিতেও তিনি যদি উক্ত ধারা অনুসরণ করতেন, তবে সম্ভবতঃ অতি কম মানুষের পক্ষেই তা বুঝা সম্ভবপর হতো। কিন্তু তিনি তাঁর গ্রন্থরাজিতে অতি সহজ সরল ভাব ও ভাষা প্রয়োগ করতেন।

কাদেরী রাহমাতুল্লাহে আলাইহে বলেন, "ইমাম শাফেয়ী সাহেব এক শত তের খানা গ্রন্থ লিখিয়াছেন।" ইমাম বায়হাকী ও হাফেজ ইবনে হাজর আসকালানী বলেন যে, ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহে আলাইহে মিসরে চার বছর

কঠোর পরিশ্রম সহকারে নিম্নলিখিত কিতাব লিখেন। রেসালায়ে কদীম, রেসালায়ে জদীদ, এখতেলাফুল হাদীস জামায়ুল এলম, আবতালুল এসতেহসান, আহকামুল কোরআন, এখতেলাফে মালেক ও শাফেয়ী, এখতেলাফে আরাকীন, এখতেলাফে মুহাম্মদ বিনের হাসন, কিতাবু আলী ও আবদুল্লাহ্ ফজায়েয, জীবন ও মৃত্যু এবং বিবাহ সমস্যা।

ইমাম বায়হাকী বলেন, "হযরত ইমাম শাফেয়ী সহীহ হাদীসসমূহ সঙ্কলন এবং আসরের পর স্বীয় কিতাব 'কওলে কদীম' হতে প্রত্যাবর্তন করে 'ফিকাহ জদীদ' নামক কিতাব লিখেন।"

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ইমাম বোখারীর উস্তাদ হযরত ইমাম হামীদী, রবীয় বিন সুলায়মান এবং ইমাম মাজনীকে হযরত ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহে আলাইছে ওসিয়ত করিয়াছিলেন, "আমার গ্রন্থরাজির বিরুদ্ধে যদি কোন হাদীস মিলে যায়, তবে তাই হলো আমার মাজহাব।" ইমাম শাফেয়ী সাহেব উপরোক্ত ইমাম সাহেবদের মারফত তাঁদের শাগরেদদের কাছেও তাঁর এই মিনতি পৌছায়ে দিতে অনুরোধ করেন।

হযরত শাহ ওলিউল্লাহ রাহমাতুল্লাহে আলাইহে আল্লামা আবু তাহের মদনী রাহমাতুল্লাহে আলাইহের কাছে ইমাম শাফেয়ী সাহেবের রেসালায়ে হাদীস ও ফিকাহ এবং কিতাবুল উম্মু প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত পাঠ করেছেন। এবং মাসআলা নিরূপণে তিনি প্রায়ই ইমাম শাফেয়ী সাহেবের উসুলের উপর নির্ভর করতেন।

তের শত একুশ হিজরীতে 'কিতাবুল উম্মু' সাত খণ্ডে মিসরে বের হয়। হাফেজ ইবনে হাজর রাহমাতুল্লাহ এতে যে সকল অধ্যায়ের কথা বর্ণনা করেছেন, মিসরের প্রকাশক অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে নিম্নলিখিত কিতাবগুলোও সংযোজিত করে দিয়েছেন, যথা কিতাবুল এখতেলাফু ফীহে আবু হানীফা ওয়া ইবনে আবু লাইলা, কিতাবু এখতেলাফে আলী ওয়া আবদুল্লাহ বিন মসউদ, কিতাবু এখতেলাফে মালেক ওয়াশ শাফেয়ী, সীয়রল আওজায়ী, কিতাবুল হাদীস এবং ইমাম মাজনী রাহমাতুল্লাহে আলাইহের কিতাবুল মুখতসর।

হযরত ইমাম শাফেয়ী সাহেবের প্রত্যেকটি কিতাব সম্বন্ধেই পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তৃত বর্ণনা থাকবে। আর এটাই বলা আবশ্যক যে, তাঁর প্রত্যেকটি কিতাব অমূল্য। কিন্তু তন্মধ্যে 'রেসালাহ উসুলে আহকামুল কোরআন' এবং 'এখতেলাফুল হাদীস' কিতাবদ্বয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

'রেসালাহ উসূলে' তিনি উসূলে ফিকাহ ও হাদীসে মতীন বর্ণনা করেছেন।

আর প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত ফিকাহ সম্বন্ধে যাহা কিছু রদবদল ও হাদীস সম্বন্ধে যা কিছু ভুল বর্ণনা করা হয়েছে, সেই সকল ভুল সংশোধনের নিমিত্ত এবং সেই সকল সংশোধনের উদ্দেশ্যে তিনি ইসলামী রাজ্যসমূহ পরিভ্রমণ করে সকলকে তা বুঝায়ে দেন। এ সম্বন্ধে বহু গবেষণা করে এইরূপ সূক্ষ্ম উসূলের উপর এদের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে যে, আজও তা উক্ত বিষয়ের ভিত্তিরূপে বিবেচিত হয়ে থাকে।

কেয়াসকে তিনি এই দৃষ্টিকোণ হতে দেখে থাকেন যে, কেয়াস অবশ্যই কোরআন বা সুন্নতে সহীহার উপর নির্ভরশীল হওয়া চাই। কাজেই যখন কোন সমস্যা দেখা দেয়, তখন সর্বপ্রথমে এটাকে কোরআন-হাদীসের মাপকাঠিতে পরীক্ষা করে দেখা আবশ্যক এবং সাহাবায়ে-কেরাম এ সম্বন্ধে কোন্ পথ অবলম্বন করেছেন, তাও বিশেষ ভাবে প্রণিধান যোগ্য।

ইমাম সাহেবের শেখ উস্তাদবৃন্দ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ

প্রথমে তাঁর শেখদের বর্ণনা দেয়া বাঞ্ছনীয় মনে করি। হাফেজ ইবনে হাজর আসকলানী বলেন, "হযরত ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ আলাইহের শেখবৃন্দ বা তিনি যাঁদের কাছ হতে উপকার লাভ করেছেন, তাঁদের সংখ্যা আশি ছিল। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ইমামগণ অতি প্রসিদ্ধ ছিলেন, যথা মুসলেম বিন খালেদ জালুতী, হযরত কুফাইল বিন আইয়াজ জাহেদ, ইমাম সুফিয়ান বিন আনীয়া, ইমাম মালেক বিন আনাস, (রাঃ) ওয়াকীহ বিন জেয়াহ, এয়াহয়া বিন সাঈদ কত্তান, মুহাম্মদ বিন ইসমাইল, ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসন, আবদুল্লাহ বিন মুবারক এবং ইব্রাহীম বিন সাইয়েদুল আনসারী।

মুসলেম বিন খালেদ জঞ্জী, ফকীহে মক্কা

তাহজীবুত্তাজীব ও তযকেরাতুল হোফ্ফাজ কিতাবে বর্ণিত আছে যে, তিনি তাঁর জমানায় হেরম শরীফের শেখ ছিলেন। তিনি মুহাম্মদ বিন শেহাব জহুরী, ওমর বিন দীনার এবং হেসাম বিন আরওয়া হতে হাদীস রেওয়ায়েত করেন। আর হেরম শরীফের ফকীহ ইমাম আবদুল মালেক বিন আবদুল আজীজ বিন জরীহের কাছ হতে ফিকাহ শিক্ষা করেন। ইমাম আবদুল মালেক ১৫০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তাঁর ইন্তেকালের পর মুসলেম বিন খালেদ জঞ্জী হেরম শরীফের শেখ ছিলেন। ইমাম শাফেয়ী প্রথম জীবনে তাঁর কাছ হতে ফিকাহ শিক্ষা করেন। মুহাদ্দেসীন তাঁকে ফকীহ হিসেবে পরম শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন।

হযরত ফুজাইল বিন আইয়াজ বিন মাসউদ (রাঃ)

তিনি আওলিয়া কেরাম এবং মুহাদ্দেসীনদের অগ্রগণ্য ছিলেন। তিনি খুরাসানের অধিবাসী ছিলেন। কিন্তু মক্কা শরীফে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। তাহজীবুত্তাহজীব কিতাবে বর্ণিত আছে যে, তিনি আয়মাশ এয়াহয়া বিন সাঈদ আনসারী, ইমাম জাফর সাদেক এবং হাদীদুত্তাবীল হতে রেওয়ায়েত করেন। আর আবদুল্লাহ্ বিন মুবারক এবং ইমাম শাফেয়ী তাঁর কাছ হতে রেওয়ায়েত করেন। তিনি পবিত্র মক্কাশরীফে ১৮৭ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। মুহাদ্দেসীন তাঁর তেজস্বীতাকে পরম শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। তিনি আবেদ, ফাযেল, হাফেজ কাসীরুল হাদীস ছিলেন। তিনি দুনিয়া ও দুনিয়াদারী হতে বহুদূরে থাকতেন। তিনি ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহ্কে অত্যন্ত ভালবাসতেন। ইমাম শাফেয়ী তাঁর কাছ হতেই বৈরাগ্য ও অরা শিক্ষা করেন। ইমাম শাফেয়ী তাঁর কাছ হতেই যে মহাশিক্ষা লাভ করেন, জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত তা বিশেষরূপে স্মরণ রাখেন।

ফজল বিন রবীয় বলেন, "খলীফা হারুনুর রশীদ যখন হজ্বে আসলেন, তখন তিনি আমার বাড়ীতে পৌছলেন। আমি আরয করলাম "হে খলীফাতুল মুসলেমীন, আপনি কেন এত কষ্ট করে আমার বাড়ী পর্যন্ত আসলেন? আপনি আমাকে ডাকালেন তো আমি আপনার খেদমতে হাজির হতাম।" খলীফা বললেন, "আচ্ছা যাক সে কথা। আমি মক্কা শরীফের বুজুর্গ লোকের সাথে মিলিত হতে চাই।"

আমি আরয করলাম, "অনতি দূরেই ইমাম সুফিয়ান বিন আনীয়া অবস্থান করেন। খলীফা সেখানে যেয়ে তাঁর সংবাদ দিলেন। আমরা কে তিনি তা জানতে চাইলে, আমি বললাম, আমীরুল মুমিনীন আপনার খেদমতে সমুপস্থিত।" তিনি তৎক্ষণাৎ বাইরে এসে খলীফাকে বললেন, "আপনি আমাকে খবর দিলেই তো আমি আপনার সমীপে উপস্থিত হইতাম।" খলীফা বললেন, "আমি আপনার খেদমতে কিছু নজর পেশ করছি।" আপনি তা গ্রহণ করুন।" অতঃপর খলীফা বললেন. "আপনার কিছু ঋণ আছে কি?" হযরত সুফিয়ান তা স্বীকার করেন, খলীফা তহবিলদারকে তা পরিশোধ করে দিতে আদেশ করলেন।

খলীফা আমাকে অপর কোন বুজুর্গ লোকের কাছে নিয়ে যেতে অনুরোধ করলেন। আমি অতঃপর তাঁকে ইমাম আবদুর রাজ্জাকের খেদমতে নিয়ে গেলাম। তিনি আমাদের পরিচয় পেয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লে, খলীফা তাঁকে শান্ত

করে তাঁর খেদমতেও কিছু নজরানা পেশ করলেন এবং তাঁর সমূহ ঋণ আদায় করে দিলেন।

খলীফা বললেন, "তাঁদের কারও দ্বারা আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে না। আমাকে অপর কোন বুজুর্গ লোকের কাছে নিয়ে চলুন।"

আমরা অতঃপর হযরত ফুজাইল বিন আইয়াজের বাড়ীতে উপস্থিত হলাম। তখন তিনি পবিত্র কোরআন শরীফের নিম্নলিখিত আয়াত পাঠ করেছিলেন। অর্থাৎ দুষ্ক্রিয়াশীল লোকেরা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে ঈমানদার ও নেককারদের শ্রেণীভুক্ত করব?

খলীফা বলিলেন, "আমি যখন উপদেশ প্রার্থী হয়ে আসছি, এমতাবস্থায় এই আয়াতই আমার জন্য যথেষ্ট।" তৎপর দ্বারে করাঘাত করলে, হযরত ফুজাইল বললেন, "বাহিরে কে"? জবাবে বলা হইল, "আমীরুল মুমিনীন আপনার দ্বারে সমুপস্থিত।" তিনি বললেন, আমার কাছে তাঁর কি প্রয়োজন বা তাঁর কাছেই বা আমার কি প্রয়োজন থাকতে পারে?" তখন খলীফার সহচর বললেন, "আপনার কি হুজুর আলাইহিস সালামের এরশাদ স্মরণ নাই যে, মুসলমানের পক্ষে উচিত যে, নিজেকে অপমানিত না করা? অর্থাৎ আপনি যদি আমীরুল মুমিনীনকে স্বেচ্ছায় আপনার ঘরে প্রবেশের অনুমতি না দেন, তবে আইনের বলে আপনার ঘরে তাঁর প্রবেশ করার ক্ষমতা রয়েছে।" তখন হযরত ফুজাইল বললেন, "আপনারা আইনের বলে তা করতে পারেন, কিন্তু আমি তদ্রূপ কোন ইচ্ছা করি না।" খলীফাকে ভিতরে প্রবেশ করতে দেখে পাছে তাঁর মুখ দর্শন করতে না হয়, এই উদ্দেশ্যে তিনি তাড়াতাড়ি বাতি নিবায়ে দিলেন। ইতিমধ্যে হারুণুর রশীদ তাঁর হাতের সাথে হাত মিলালেন। তিনি বললেন, "হায়, কি কোমল হাত! এটা দোজখের অগ্নি হতে রক্ষা পেলে হয়।" খলীফা আরও উপদেশ পেতে চাইলে, তিনি বললেন, "ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (রঃ) খলীফার আসনে উপবিষ্ট হয়েই সালাম বিন আবদুল্লাহ্ বিন ওমর (রাঃ) এবং মুহাম্মদ বিন কায়াবকে আহ্বান করলেন। তখন ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (রাঃ) সর্বসমক্ষে বললেন, আমি এখন খলীফা পদে নির্বাচিত হয়েছি। এখন আপনারা আমার কর্তব্যাবলী স্থির করে দিন। তখন সালাম বিন ওমর বললেন, আপনি যদি কেয়ামতের দিবস খোদার শাস্তি হতে মুক্তি পেতে চান, তবে বৃদ্ধলোকদের পিতৃতুল্য, যুবকদেরকে ভ্রাতৃতুল্য, স্ত্রীলোকদেরকে মা-ভগ্নিতুল্য এবং বালক-বালিকাদেরকে সন্তান তুল্য মনে করবেন।" এ সকল কথা শুনে খলীফা অস্থির হয়ে পড়লেন। হযরত

ফুজাইল বললেন, "এ মুসলিম রাজ্যকে আপনার গৃহ এবং প্রজাবর্গকে আপনার পরিজন মনে করবেন।" খোদা সম্বন্ধে কখনও নির্ভয় থাকবেন না। খোদা কেয়ামতের দিবস আপনাকে আপনার প্রত্যেকটি প্রজা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। কোন রাত্রে একটি বৃদ্ধাও যদি অন্নাভাবে রাত কাটায় এবং তাতে তার নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মে, তবে সে পরকালে খোদার কাছে আপনার বিরুদ্ধে নালিশ পেশ করবে।" এ সকল কথা শুনে হারুণুর রশীদ অস্থির হয়ে রোদন করলেন। খলীফার সহচর বললেন, হযরত থামুন। আপনি-তো আমীরুল মুমিনীনকে মেরে ফেলবেন।" হযরত ফুজাইল বললেন, "হে হামান চুপ করুন। আপনি আপনার দলবলই তাঁকে বধ করার বন্দোবস্ত করেছেন।" তাতে হারুনের রোদনের মাত্রা অধিক বেড়ে গেল। তিনি স্বীয় সহচরকে বললেন, থামুন, মন্ত্রীপ্রবর। তিনি আমাকে ফেরাউন মনে করে থাকেন। এজন্য তিনি আপনাকে হামান বলে সম্বোধন করেছেন। কারণ ফেরাউনের মন্ত্রীর নাম ছিল হামান।"

খলিফা আরও উপদেশ পাইতে চাইলে, তিনি বললেন, "হযরত আব্বাস (রাঃ) এর কাছে এসে কোন উচ্চপদের প্রার্থী হলেন। হুজুর (সাঃ) বললেন, উচ্চপদ কেয়ামতের দিবস পরিতাপের কারণ হবে।" এ সকল কথা শুনে খলীফা অধীর দিবস পরিতাপের কারণ হবে।" এ সকল কথা শুনে খলীফা ব্যাপক রোদন করতে লাগলেন। তারপর খলীফা আরও উপদেশ পেতে চাইলে, তিনি বললেন, "সৃষ্ট-জগৎ সম্বন্ধে কেয়ামতের দিন আপনাকে প্রশ্ন করা হবে। কাজেই আপনি এজন্য সর্বদা ভীত-শঙ্কিত থাকবেন। আপনার এ সুন্দর চেহারাকে যদি দোজখের ভীত-শঙ্কিত থাকবেন। আপনার এই সুন্দর চেহারাকে যদি দোজখের অগ্নি হতে রক্ষা করতে চান, তবে এখন হতেই আপনাকে সতর্ক ও সাবধান থাকতে হবে। আপনি দিবারাত্রিতে কোন মুহূর্তেই কোন প্রজার প্রতি বিন্দু পরিমাণ আক্রোশও রাখবেন না। কেননা হুজুর আলাইহিচ্ছালাম বলেছেন 'যে ব্যক্তি প্রজার প্রতি বিন্দু পরিমাণও শত্রুতাভাব পোষণ করবে, তার গায়ে বেহেশতের বাতাসও লাগবে না।"

এটা শুনে হারুনুর রশীদ বহু রোদন করলেন। তারপর তিনি বললেন, "হযরত, আপনার কোন ঋণী। তাঁর ইবাদত ও আদেশ পালনই আমার ঋণ। তিনি যদি আমাকে রেহাই না দেন তবে আমাকে নিরুপায় আছে কিনা তাই জিজ্ঞেস করেছি।" তিনি বললেন, "খোদার শোকর, "এ মাল হালাল, এটা আমার মাতৃ সম্পত্তি হতে লাভ করেছি। আপনি এটা গ্রহণ করুন।"

হযরত ফুজাইল আক্ষেপ করে বললেন, "আহা! আমার সকল উপদেশই বুঝি বৃথা গেল। তদ্বারা আপনার কোন ফলই দর্শে নেই। আপনি এখনই অবিচার আরম্ভ করে দিলেন। আমি আপনাকে লঘুভার করতে চাইছি, আর আপনি আমাকে গুরুভারাক্রান্ত করে মৃত্যুর গহ্বরে নিপাতিত করতে চাইছেন। আনি বলছিলাম, আপনি তা কোন উপযুক্ত পাত্রে প্রদান করুন। আপনি তা না করে যাকে দেওয়া উচিত নয়, তাকেই তা দিতে চাইছেন। পরিতাপের বিষয় এ যে, আমার উপদেশে আপনার কোন উপকার হলো না। এই পর্যন্ত বলে তিনি হারুনের কাছ হতে উঠে দরজা বন্ধ করে দিলেন। হারুন বাইরে এসে বললেন, "তিনি বাস্তবিকই সংসার বিরাগী বটে।"

হযরত সুফিয়ান বিন আনীয়া (রাঃ)

তিনি ১০৭ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ওমর বিন দীনার, ইমাম জহুরী বিন আসলাম, আবদুল্লাহ্ বিন দীনার, মনসূর বিন মুয়তামার, এবং অপরাপর ইমামদের কাছ হতে হাদীস হাসিল করেন। আয়মাস, আবদুল্লাহ্ বিন মুবারক, আবদুর রহমান বিন মেহেদী, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, এয়াহিয়া বিন মঈন, ইমাম ইসহাক বিন রাহুরীয়া এবং ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহিম তাঁর কাছ হতে রেওয়ায়েত করেন।

মুহাদ্দেসীন এ সম্বন্ধে একমত যে, তিনি ইমাম ছিলেন এবং ইসলামের একটি বিশিষ্ট স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। তিনি হাদীসের হাফেজ সংসার বিরাগী এবং তাঁর সময়ে তিনি পবিত্র মক্কা শরীফের অন্যতম ইমাম ছিলেন।

ইমাম শাফেয়ী (রাঃ) বলেন, ইমাম মালেক, এবং ইমাম সুফিয়ান বিন আনীয়া না থাকলে, হেজাজে হাদীসের চর্চা হতো না। আবদুর রহমান বিন মেহদী বলেন, ইমাম সুফিয়ান বিন এনে হেজাজীদের মধ্যে হাদীস সম্বন্ধে সবচেয়ে অধিক ওয়াকিফহাল ছিলেন। ইমাম বোখারী রাহমাতুল্লাহ্ বলেন, ইমাম সুফিয়ান বিন এনে হাম্মাদ বিন জাইদ হতে অধিক হাফেজে হাদীস ছিলেন। তিনি ১৯৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তিনি ৯১ বছরকাল জীবিত ছিলেন। তিনি সত্তর বার হজ্ব করেন। ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহে তাঁর খেদমতে সুদীর্ঘকাল অবধি অবস্থান করেন। তাতে তিনি অনেক উপকৃত হন।

লোকেরা হযরত ইমাম সুফিয়ান বিন আনিয়া রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহের কাছে কোন মাসআলা, তফসীরের বয়ান বা হাদীসের মতবিরোধ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন

জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলতেন, আমার মজলিসে এই কুরাইশী নব্য যুবক মুহাম্মদ বিন ইদরীস শাফেয়ী বিরাজ করছেন, আপনারা যে কোন প্রশ্ন তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করুন। ইমাম শাফেয়ী সেই সকল প্রশ্নের এরূপ যুক্তিসংগত উত্তর দিতেন যে, ইমাম সুফিয়ান বিন আনীয়া একদিন পরম সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, "আপনার পক্ষে আর আমার এই শিক্ষা-মজলিসে অবস্থান করার প্রয়োজন হবে না। আপনি এখন নিজে স্বাধীনভাবে ফতোয়া দিতে থাকুন।"

ইমাম মালেক বিন আনাস

মালেক বিন আবী আমরের তিনটি ছেলে ছিল। তাঁদের নাম আনাস, রবীয় এবং আবু সুহাইল নাফেয়। ইমাম মালেকের চাচা আবু সুহাইল নাফেয় বিশেষ গণ্যমান্য তাবেয়ী এবং বিখ্যাত মুহাদ্দেস ছিলেন। ইমাম মালেক তাঁর কাছ হতে রেওয়ায়েত করেন।

জায়েদ বিন আসলাম, নাফেয়ে মাওলা, আবদুল্লাহ বিন ওমর, হাদীদুত্তাবলি, সাইদুল মাকবরী, আবু হাজেম, সালমা বিন দীনার, ইমাম জহুরী, হেশাম বিন আরওয়া এবং ইমাম জাফর সাদেক আলাইহিমুর রেদওয়ান এবং অপরাপর মুহাদ্দেসীনে কেরাম এবং মহান তাবেয়ীনদের কাছ হতে ইমাম মালেক রেওয়ায়েত করেন। আর তাঁর কাছ হতেই অসংখ্য লোকে রেওয়ায়েত করেন। তন্মধ্যে ইমাম শাফেয়ী, আবদুল্লাহ্ বিন মুবারক, আবদুর রহমান বিন মাহদী এবং মক্কী বিন ইব্রাহীম অন্যতম ছিলেন।

ইমাম মালেক নিজেই বলেছেন, "আমার ফতোয়া দেয়া সম্বন্ধে সত্তর ব্যক্তি একমত না হওয়া পর্যন্ত আমি ফতোয়া দেয়া আরম্ভ করিনি। তিনি বলেনঃ এলম একটি আলোক সদৃশ। এটা খোদার তরফ হতে মানুষের অন্তরকে আলোকিত করে থাকে।"

এলমে হাদীসকে দীন বলা চলে। সুতরাং এটা কার কাছ হতে লাভ করা হলো, তা বিশেষভাবে পরীক্ষা করে দেখা আবশ্যক। আমি মসজিদে নববীতে সত্তরজন লোককে বলতে শুনেছি। কিন্তু আমি তাঁদের কারও কাছ হতে একটি হাদীসও রেওয়ায়েত করি নেই। অথচ তাঁরা পাক্কা ঈমানদার। লোকেরা এটার কারণ জিজ্ঞেস করলে, তিনি বললেন, তাঁরা যা বলে থাকেন, এটার অর্থ তাঁরা বুঝেন না। এই কারণেই আমি তাঁদের কাছ হতে কোন রেওয়ায়েত গ্রহণ করিনি।

তাঁর শেখদের মধ্যে কেহই ইরাকবাসী ছিলেন না। লোকেরা এটার কারণ জিজ্ঞেস করলে, তিনি বললেন, "আমি কিরূপে তাঁদের কাছ হতে রেওয়ায়েত গ্রহণ করতে পারি? তাঁরা এখানে এসে এমন লোকের কাছ হতে রেওয়ায়েত শিক্ষা করেন এবং হাসিল করেন যে, যাঁর উপর কোন আস্থা স্থাপন করা যায় না।"

আল্লামা জাহবী ইসমাঈল বিন দাউদ হতে রেওয়ায়েত করেছেন, "আমি ইমাম মালেককে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন যে, আমি ইমাম রবীয়ের কাছ হতে শুনেছি, তিনি বললেন, আমি এই পবিত্র ভূমির প্রতিপালকের কসম করে বলছি যে, আমি কোন ইরাকবাসীকেই পরিপূর্ণ বুদ্ধিমান দেখিনি।"

হযরত ইমাম মালেক অতি উচ্চ শ্রেণীর মুহাদ্দেস ও ফকীহ ছিলেন। হেজাজবাসী তাঁকে ইমাম সুফিয়ান বিন আনীয়া রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহের চেয়ে অধিক শ্রদ্ধার চোখে দেখিত। তিনি ৯৫ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। আর ১৭৯ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন। তিনি ৮৬ বছর কাল জীবিত ছিলেন। চব্বিশ বছর বয়সের সময় শিক্ষাদানে রত হন। ৬২ বছর পর্যন্ত তিনি হাদীস-শিক্ষাদানে মশগুল ছিলেন।

তাঁর মৃত্যু-সংবাদ সুফিয়ান বিন আনীয়ার কর্ণে পৌছলে, তিনি বেহুশ হয়ে পড়েন। চেতনা-প্রাপ্তির পর তিনি বললেন অর্থাৎ এই বিশ্বচরাচরে তিনি তাঁর সমকক্ষ কাউকে রেখে যাননি।

ইমাম মালেক মসজিদে নববীতে যে কোন প্রকার গণ্ডগোলকে প্রকট ঘৃণার চোখে দেখতেন। হুজুর আলাইহিস সালামের পবিত্র নাম যখন উল্লেখ করা হতো, তখনই তিনি কম্পিত হয়ে উঠতেন। আর তাঁর চেহারা সাদা হয়ে যেত।

ইমাম মালেক সম্বন্ধে ইমাম শাফেয়ীর মতামত

হযরত ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহের কাছে কেউ যদি হযরত ইমাম মালেক রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহে সম্বন্ধে কোন প্রসঙ্গ তুলতেন, তখনই তিনি বলতেন, "ইমাম মালেক ও ইমাম সুফিয়ান বিন আনীয় থাকলে হেজাজে এলমে হাদীসের চর্চা থাকত না। ইমাম শাফেয়ী তাঁকে অত্যন্ত ভক্তি করতেন। ইমাম শাফেয়ী একদিন ইমাম মালেকের খুরাসানী ঘোড়া এবং মিসরের খচ্চরের প্রশংসা করেন। ইমাম মালেক তখন আস্তাবলের সব ঘোড়া ও খচ্চর ইমাম শাফেয়ীকে নজর স্বরূপ পেশ করলেন। ইমাম শাফেয়ী তাঁকে নিজ ব্যবহারের

জন্য একটি ঘোড়া রেখে দিতে অনুরোধ করলেন। ইমাম মালেক তা প্রত্যাখ্যান করে বললেন, "যে জমীনের নীচে হুজুর আলাইহিচ্ছালামকে দফন করা হয়েছে, এটার উপর ঘোড়ায় চড়ে চলাচল করতে আমি অপরিসীম লজ্জাবোধ করেছি।" তিনি পরম পরিতোষের সাথে ইমাম শাফেয়ীকে সব ঘোড়া ও খচ্চর নজরস্বরূপ প্রদান করলেন।

ইমাম শাফেয়ী সাহেবের যে কতিপয় উস্তাদ ও শেখের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তাতেই তাঁদের গুণ-গরিমার সাথে সুপরিচিত হতে কাউকে বেগ পেতে হবে না। তাঁদের সম্বন্ধে অধিক বিস্তৃত আলোচনা এই পুস্তকে সম্ভবপর নয় বিবেচনায় মক্কা, মদীনা, এয়মন, ইরাক ও মিসরের শুধু বিশিষ্ট শেখদের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো যথা ইব্রাহীম বিন সাঈদ বিন ইব্রাহীমু-জ্জহুরী, ইব্রাহীম বিন আবদুল আজীজ বিন আবী মাহজুরা, ইব্রাহীম বিন মুহাম্মদ বিন আবী এয়াহয়া, ইব্রাহীম বিন হেরেম, আসামা বিন জাইদ বিন ইসমাঈল বিন জাফর, ইসমাঈল বিন আবদুল্লাহ্ বিন কুসতনতীন, আনাস বিন আইয়াজ, আবু জুময়াতুল লাইসী, আইয়ুব বিন সাবীরুর রমলী, জাফর বিন ইব্রাহীমুত্তায়ী, হামেত বিন ইসমাঈলুল মদনী, আল-হারেস বিন আমীরুল বছরী, হাম্মাদ বিন আসমাহ, হাম্মাদ বিন জাইদ বছরী, হাম্মাদ বিন জরীফ, দাউদ বিন আবদুর রহমান আত্তার, সাঈদ বছরী, হাম্মাদ বিন জরীফ, দাউদ বিন আবদুর রহমান আত্তার, সাঈদ বিন সালেমুল কদাহ, সাঈদ বিন সালমা, সাঈদ বিন মুসলেমাহ্, সুলাইমান বিন ওমর, সেমাক বিন ফজল, ইসহাক বিন ওসমান, উব্বাদ বিন আওয়াম, আবদুল্লাহ্ বিন ইদ্‌রীস, আবদুল বিন হারেস মক্কী, আবদুল্লাহ্ বিন সাইদ, আবু সকওয়ান, আবদুল্লাহ্ বিন মুবারক, অবদুল্লাহ্ বিন মুছা, আবদুল্লাহ্ বিন মুয়ামেল, আবদুল্লাহ্ বিন নাফেয়েল সায়েগ, আবদুল্লাহ্ বিন ওলীদ, আবদুর রহমান বিন আবী বকর, আবদুর রহমান বিন হাসান, আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ্, আবদুল আজীজ বিন আবদুল্লাহ্, আবদুল আজীজ বিন মুহাম্মদ, আবদুল মজীদ বিন আবদুল আজীজ, আবদুল করীম বিন মুহাম্মদ খুরাসানী, আবদুল মালেক বিন ওলীদ, আবদুল ওহহাব বিন আবদুল মজীদ, আত্তাফ বিন খালেদ, ওমর বিন আবদুর রহমান, ওমর বিন হাবীব, ওমর বিন আবী মুসলেম, ওমর বিন এয়াহয়া, ফুজাইল বিন এয়াহয়া, কাসেম বিন আবদুল্লাহ্, মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল, মুহাম্মদ বিন হাসান, মুহাম্মদ বিন খালেদ, মুহাম্মদ বিন আব্বাস শাফেয়ী, মুহাম্মদ বিন ইয়াজীদ, মায়াজ বিন মুছা জাফরী, হেশাম বিন ইউসূফ, ওকীয় বিন জরাহ, এয়াহয়া বিন

হাসন, এয়াহয়া বিন জাইদ কত্তান, এয়াহয়া বিন সলীম বিন মক্কী, ইয়াজীদ বিন আবদুল মালেক, ইয়াকুব বিন ফেছা, ইউসুফ বিন আসওয়াদ, ইউসুফ বিন খালেদ, ইউসুফ বিন ওমর ও ইউসুফ বিন ইয়াকুব রাহমাতুল্লাহে আলাইহিম।

ফিকাহ্‌র প্রাথমিক পর্যায়

হুজুর আলাইহিস সালামের জমানায় ফিকাহ নামে কোন একটি পৃথক শাস্ত্র ছিল না। যে কোন প্রশ্ন উদয় হলে, সাহাবাগণ নির্বিবাদে হযরতের (সাঃ) কাছে তা জিজ্ঞাসাবাদ করতেন! হুজুর এদের উত্তর প্রদান করতেন। বা হুজুর ওজু নামায, রোযা এবং যাকাত ইত্যাদি কিরূপে আদায় করেন, সাহাবাগণ তা সবিশেষ মনোযোগের সাথে লক্ষ্য করতেন এবং তদনুযায়ী আমল করতেন। কখনো হযরতের (সাঃ) হাব-ভাব বা হুজুরের আদেশ উপদেশানুযায়ী তাঁরা কোনটি ফরজ, ওয়াজেব বা মুবাহ ইত্যাদি সাব্যস্ত করে নিতেন। কিন্তু স্ত্রীলোকেরা এরূপে উপকৃত হবার তত সুযোগ পেতেন না। তবে আনসারী স্ত্রীলোকেরা বেশ কিছু সাহসের সাথে অগ্রসর হয়ে উপকার লাভ করতেন। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) বলতেন, "আনসার স্ত্রীলোকেরা অতি উত্তম; তাঁরা ধর্ম সম্বন্ধে অবগত হতে কোন লজ্জাবোধ করেন না।

মদীনার বাইরে যে সকল সাহাবা অবস্থান করতেন, তাঁরা তদ্রূপ পূর্ণ সুযোগ পেতেন না। কাজেই তাঁরা কতিপয় দিবস হুজুর (সাঃ)-এর খেদমতে অবস্থান করতেন এবং ধর্ম-সংক্রান্ত জ্ঞান লাভ করে নিজেদের আবাসভূমিতে যেয়ে স্বীয় কওমকে শিক্ষা দান করতেন। এই শিক্ষার প্রতি ইশারা করেই পাক-কোরআনে বলা হয়েছে, 'অনন্তর তোমাদের মধ্যে প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে কেন একদল বের হয় না, যেন তারা ধর্ম্ম-জ্ঞান লাভ করতে পারে এবং তারা যখন স্বীয় 'সম্প্রদায়ের কাছে প্রত্যাবর্ত্তন করে, তখন তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করবে, সম্ভবতঃ তারা ভয় পাবে।'

নবীজীর জমানায় ফিকাহ্ শিক্ষা

আবদুল কাইসের প্রতিনিধি-ধল হুজুর আলাইহিস সালামের খেদমতে হাজির হয়ে বললেন, "আমরা বহু দেশ পর্যটন করে এসেছি। আমরা হজ্বের মাস ব্যতীত অন্য সময় হুজুরের খেদমতে উপস্থিত থাকতে পারি না। হুজুর আমাদেরকে এমন শিক্ষা প্রদান করুন, যাতে আমরা আমাদের স্বীয় কওমকে শিক্ষা দিতে পারি।" হুজুর (সাঃ) তখন তাঁদেরকে ঈমান, নামায, জাকাত, রোজা এবং অপরাপর বহু

মূল্যবান উপদেশ দান করতেন। আর শরাব-পান হতে বিরত থাকবার জন্য বহু উপদেশ প্রদান পূর্বক হুজুর বলতেন, "তোমরা রোযা এবং অপরাপর বহু মূল্যবান উপদেশ দান করতেন। আর শরাব-পান হতে বিরত থাকবার জন্য বহু উপদেশ প্রদান পূর্বক হুজুর বলতেন, "তোমরা এই সকল উপদেশ স্মরণ রাখবে এবং সম্প্রদায়কেও তা বুঝাতে থাকবে। বনি সাআদ গোত্রের পক্ষ হতে হযরত জামান হযরতের (সাঃ) খেদমতে হাজির হয়ে নামায, রোযা ইত্যাদি সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে বললেন, "হুজুর আমি আমার গোত্রের প্রতিনিধি হিসেবে আপনার খেদমতে উপস্থিত হয়েছি।" এরূপ বহু ঘটনা রয়েছে।

সাহাবা ফকীহবৃন্দ তিন ভাগে বিভক্ত

(১) তাঁরা অসংখ্য মাসায়েল বর্ণনা করেছেন।

(২) তাঁরা অতি কম হাদীস বর্ণনা করেছেন।

(৩) তাঁরা মাঝামাঝি সংখ্যায় হাদিস বর্ণনা করেছেন।

প্রথম শ্রেণীতে সাতজনকে স্থান দেয়া হয়েছে, যথা হযরত ওমর (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত আয়েশা (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ), হযরত আবদুল্লা বিন মাসউদ (রাঃ), হযরত জাইদ বিন সাবেত (রাঃ)। সাধারণ সাহাবাগণ দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। নিম্নলিখিত তেরজন তৃতীয় শ্রেণীর সাহাবাদের মধ্যে অন্যতম। হযরত আবু বকর, হযরত আনাস, হযরত আবু হুরাইরা, হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর বিন আছ, হযরত আবদুল্লাহ বিন জুবাইর, হযরত আবু মূসা আশআরী, হযরত সুলাইমান ফারসী, হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ, হযরত মায়াজ বিন জবল, হযরত সাআদ বিন আবি ওক্কাস, হযরত আবু সাঈদ খুদরী এবং হযরত উম্মে সালমা রদিয়ল্লাহু আনহুম আজমঈন।

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাঃ)

তিনি সুদীর্ঘকাল কূফায় অবস্থান করেন। হযরত আলকামা মাসউদ তাঁর ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। ইমাম ইব্রাহীম নাখয়ী ও তাঁর ছাত্র ছিলেন। ইব্রাহীম নাখয়ী ফিকাহ-শাস্ত্রের ভিত্তি পত্তন করেন। ফিকাহ সম্বন্ধে তিনি একটি ক্ষুদ্র কিতাব রচনা করেন। হযরত হাম্মাদ তাঁর পরমভক্ত শাগরেদ ছিলেন। ইমাম আবু হানীফা সাহেব তাঁর কাছ হতে শিক্ষা প্রাপ্ত হন।

হযরত জাইদ বিন সাবেত (রাঃ)

হযরত জাইদ বিন সাবেত, হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর, হযরত আয়েশা সিদ্দিকা এবং হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহুম স্থায়ীভাবে মদীনায় অবস্থান করতেন।

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহুর ছাত্রবৃন্দ পবিত্র মক্কা শরীফকে শিক্ষা-কেন্দ্রে পরিণত করেন। অধিকাংশ সাহাবাই হজ্বের নিমিত্ত মক্কা শরীফে পদার্পণ করতেন। কাজেই তাঁদের কাছ হতে হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদের (রাঃ) ছাত্রবৃন্দ উপকৃত হবার সুযোগ লাভ করতেন। ইবনে জরীহ, সুফিয়ান বিন আলীয়া, ইমাম মুজাহেদ, আকরমা এবং তাউস তাঁদের কাছ হতে শিক্ষালাভ করেন।

মাসআলা নির্বাচন

হাদীসের ভিত্তি-ভূমির উপর যে সকল মাসআলা প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং যে সম্বন্ধে কোন মত-বিরোধ ছিল না, সেই সম্বন্ধে ফতোয়া দেয়া সহজ ব্যাপার। প্রায় সাহাবাই এ সকল ক্ষেত্রে অগ্রসর হতেন। কিন্তু যে মাসআলার পিছনে কোন হাদীস নাই, এটা নির্বাচনে এজতেহাদ ও যাচাই প্রধান অবলম্বন। হযরত ওমর হযরত আলী, হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস এবং হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ রদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম এসব ক্ষেত্রে অন্যতম ছিলেন। হযরত শাহ ওলিউল্লাহ্ সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহে বলেন, "এটা চারজন ব্যতীত অপরাপর সাহাবাও যে, এ সকল বুঝতেন না তা নয়; কিন্তু যে সকল রেওয়ায়েতে মতবিরোধ হতো, সেই সকল ক্ষেত্রেই তাঁরা অগ্রসর হতে না। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ), হযরত আয়েশা (রাঃ) এবং হযরত জাইদ বিন সাবেত (রাঃ) উক্ত শ্রেণীভুক্ত ছিলেন।

মাসআলা-নির্বাচন ও যাচাই এর দ্বিতীয় পন্থা এই ছিল যে, কোন মাসআলা সম্বন্ধে ফায়ছালা করতে হলে, সেই সম্বন্ধে কয়েকদিন ব্যপিয়া চিন্তু ও গবেষণা করে এদের সমাধান করতেন। শাহ সাহেব বলেন, হযরত ওমর (সাঃ)-এর রীতি এটা ছিল যে, ফিকাহ-সংক্রান্ত মাসায়েল সম্বন্ধে তিনি সাহাবাদের সাথে পরামর্শ করতেন এবং তাঁদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করতেন। তাঁর মন প্রবোদ না মানা পর্যন্ত তিনি উক্ত পন্থা অবলম্বন করতেন। বিশ্ব-মুসলিম এ কারণেই তাঁর আদেশাবলী এবং ফতোয়ার অনুসরণ করে থাকে।

সাহাবাদের মতবিরোধ

ফারুকে আজমের (রাঃ) জমানায় অধিকাংশ সাহাবা যখন দেশ-বিজয়ে বাইর হয়ে পড়লেন এবং তাঁদের সম্মুখে নব নব সমস্যা দেখা দিল, তখন এদের সমাধানে তাঁদের যে সকল হাদীস স্মরণ হতো সেই অনুযায়ী কোরআনের আলোকে তাঁরা ফতোয়া দিতেন। কিন্তু যে সকল মাসআলা সম্বন্ধে তাঁদের তাহকীক ছিল না সেই সকল মাসআলা সম্বন্ধে সাহাবাদের মতবিরোধ হতো। জনৈক সাহাবা কোন মাসআলা সম্বন্ধে হুজুর আলাইহিস সালামের মীমাংসা শ্রবণ করেছিলেন। কিন্তু অপর সাহাবারা তা শ্রবণ করবার সুযোগ ঘটেনি। কাজেই তিনি এজতেহাদ ও স্বীয় রায়মতে এটার মীমাংসা করতেন। সুতরাং একটি মাসআলা সম্বন্ধে একাধিক পন্থা অবলম্বন করা হতো।

অপর একজন স্ত্রী লোকের স্বামী মোহর নির্ধারিত না করেই মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ রদিয়ল্লাহু তায়ালা আন্হুর কাছে এ সম্বন্ধে মাসআলা জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, "এ সম্বন্ধে হুজুর আলাইহিস সালামের কোন মীমাংসা আমার জানা নেই। কিন্তু লোকেরা এটার মীমাংসার জন্য পীড়াপীড়ি করলে, তিনি সেই স্ত্রী লোকের নিমিত্ত মোহরে মেছাল দেওয়ার ফতোয়া দিলেন। আর সেই স্ত্রী লোককে ইদ্দত পালন করার জন্য আদেশ দিলেন। হযরত মায়কাল বিন ইয়াসার (রাঃ) এই ফতোয়া দেওয়ার পর বললেন, "হুজুর আলাইহিচ্ছালামও এক স্ত্রী লোকের এমনই এক ব্যাপারে এই ফতোয়াই দিয়েছিলেন।" এটা শুনে হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাঃ) খুব বেশী খুশী হলেন।

দুই সাহাবার মধ্যে কোন বিষয়ে মতবিরোধ হতো। একে অপরের সম্মুখে আবু হুরাইরা (রাঃ)-এর খেয়াল এই ছিল যে, কোন ব্যক্তি যদি রমজানে সুবেহ পর্যন্ত নাপাক অবস্থায় থাকে, তবে তার রোজা বিনষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু অপর একজন সাহাবার মারফতে তাঁর খেয়ালের বিপরীত রেওয়ায়েত যখন তাঁর কর্ণগোচর হলো, তখন তিনি স্বীয় রায় পরিবর্তন করলেন।

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন ওমর (রাঃ) স্ত্রী লোকদের গোসলের সময় কেশ খুলে রাখবার নিমিত্ত আদেশ দিলেন। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) তা জানতে পেরে বললেন, "ইবনে ওমর (রাঃ) স্ত্রী লোকদের মাথা মুণ্ডন করতে কেন আদেশ প্রদান করেননি? আমি নিজে হুজুর আলাইহিস সালামের সংগে একাকিনী ছিলাম। আর আমি মাথায় শুধু তিনবার পানি ঢেলে নিতাম।"

বুঝা-পড়ার মতবিরোধ

হুজুর আলাইহিচ্ছালাম হজ্বের সময় কোন এক স্থানে থামেন। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) ও হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমরের (রাঃ) ধারণা এছিল যে, সেই নির্দিষ্ট স্থানে থামা সুন্নত এবং তা হজের সুন্নত সমূহের অন্তর্গত। কিন্তু হযরত আয়েশা (রাঃ) ও হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের (রাঃ) রায় এই ছিল যে, তা শুধু ঘটনাক্রমে ঘটেছে। হজ্বের সুন্নতসমূহের সাথে এটার কোন সম্পর্ক নেঈ। এরূপে হযরত যখন কোন কাজ করতেন, তখন সাহাবাদের মধ্যে কোন কোন কাজে মতবিরোধ দেখা দিত। কেউ এটাকে ইবাদতস্বরূপ মনে করতেন। আর কেউ এটাকে জায়েয বলে বিবেচনা করতেন।

সাহাবাগণ যখন হুজুর আলাইহিচ্ছালামকে কোন কাজ করতে দেখতেন, তখন তাঁরা নিজ নিজ রায় অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন উপায় অবলম্বন করতেন। হযরত (সাঃ)-এর বিদায় হজ্ব সম্বন্ধে সাহাবাদের বিভিন্ন রায় রয়েছে। অর্ধেকের মতে হুজুর (সাঃ) শুধু হজ্বের এহরাম বেঁধেছিলেন। অনেক এটাকে অন্য হিসাবে গ্রহণ করেন।

কি কি কারণে এরূপ বিভিন্ন মতবাদের উদ্রেক হয়, এ সম্বন্ধে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। ভুল-চুক হওয়া মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক ব্যাপার। এই ভিত্তিতেও বিভিন্ন মতবাদের উদ্রেক হয়ে থাকে। হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ)-এর খেয়াল ছিল যে, হুজুর আলাইহিচ্ছালাম রজব মাসে ওমরা করেছিলেন। কিন্তু হযরত আয়েশা (রাঃ) এটাকে ভুল চুকের ফল বলে উল্লেখ করেছেন।

রেওয়ায়েতের পরিপূর্ণ অংশ অটুট না রাখবার কাণে মতবিরোধ দেখা দেয়। আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন যে, মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন রোদন করলে মৃতব্যক্তির উপর আজাব হয়। হযরত আয়েশা (রাঃ) এই রেওয়ায়েত শুনে বললেন, "তিনি হাদীস সঠিকভাবেই ইয়াদ রাখেননি। ব্যাপার এই যে একজন ইহুদী স্ত্রীলোক মারা যায়। তার স্বামী তজ্জন্য অধীরভাবে রোদন তরে। হুজুর আলাইহিচ্ছালাম সেই পথ অতিক্রম করার সময় বললেন, "লোকটি-তো মৃতব্যক্তির জন্য রোদন করছে এবং কবরে তার উপর আজাব হয়েছে।"

কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ্ বিন ওমর (রাঃ) মৃত ব্যক্তির অন্য রোদনকে মৃত ব্যক্তির উপর আজাব হওয়ার কারণ বলে সাব্যস্ত করেছেন। অথচ এটা পৃথক ঘটনা। এটা ঘটনার সাথে অন্য ঘটনার কোন সংস্রব নাই।

এরূপে হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু রেওয়ায়েত করেন যে, বাড়ী, স্ত্রীলোক এবং ঘোড়া এই তিনটিতে মঙ্গল অমঙ্গল রয়েছে।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) এই ঘটনা জানতে পেরে বললেন, "আবু হুরাইরা বোধ হয় রেওয়ায়েতের প্রথম অংশ ভুলে গিয়েছেন। হুজুর আলাইহিচ্ছালাম-তো এটাও বলেছেন, "খোদা ইহুদীকে বরবাদ করুক! ইহুদী এরূপ বলছিল যে, এই বস্তুকে অমঙ্গল নিহিত রয়েছে।"

মতবিরোধের অপর একটি কারণ

মতবিরোধের অপর একটি কারণ এই যে, সাহাবাদের মধ্যে আদেশের মূল মর্ম বুঝতে মতবিরোধ দেখা যেত। কাজেই এদের ফলাফল সম্বন্ধেও মতবিরোধ দেখা দিত।

জানাযা দেখে দণ্ডায়মান হওয়ার নিমিত্ত হাদীসে রেওয়ায়েত রয়েছে। এটার কয়েকটি কারণ রয়েছে। আর এই কারণগুলোও সাহাবাদের বুঝবার ফলাফল স্বরূপ। কোন কোন সাহাবা বলেছেন, "জানাযার প্রতি সম্মান প্রদর্শন এটার উদ্দেশ্য।" এটা স্বীকার করে নিলে, মুসলমান ও কাফের এটা উভয় জানাযার নিমিত্তই দণ্ডায়মান হতে হবে; কেননা ফেরেশতা উভয় জানাযার সঙ্গেই থাকেন।

অপর সাহাবা এটাকে আখেরাতের ভয়ের কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। সেই হিসেবেও কাফের ও মুসলমান উভয় জানাযা দেখেই দণ্ডায়মান হওয়া উচিত। কিন্তু এরূপও রেওয়ায়েত রয়েছে যে, হুজুর আলাইহিস সালামের সম্মুখ দিয়ে জনৈক ইহুদীর জানাযা যাচ্ছিল। হুজুর সেই স্থানে উপবিষ্ট ছিলেন। হুজুর এমন স্থানে বসা ছিলেন যে জানাযা অতিক্রম করলে হুজুরের খুব বেশী কাছে দিয়ে অতিক্রম করত। হুজুর তা পছন্দ করলেন না। কাজেই হুজুর দণ্ডায়মান হয়ে সেখান হতে দূরে সরে পড়লেন।

বিপরীত আদেশ সম্বন্ধে মতবিরোধ

একই ঘটনা সম্বন্ধে হুজুর আলাইহিস সালামের দুইটি বিপরীত আদেশ থাকা। এটার বিশেষ কারণ এটা যে, ইতিহাসের মূল গোড়া সম্বন্ধে যদি চিন্তা করে দেখা যায়, তবে এরূপ বহু আদেশই সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। তখন এ সকল যে বিপরীতমুখী নয় তা প্রতিপন্ন হবে।

প্রাচীন আরবে মুতা তথা অস্থায়ী বিবাহ প্রচলন ছিল। কিন্তু হুজুর আলাইহিস সালামের জামানায় তা স্পষ্টভাবে নিষেধ করে দেয়া হয়েছে।

মক্কায় অবস্থান করবার জামানায় 'ভয়ের নামায' আদায় করার যে রীতি ছিল, মদীনায় এসে তা পরিবর্তিত হয়ে গেল।

অগ্নিতে রন্ধন করা বস্তু সম্পর্কে ওজু করবার মাসআলা বা উষ্ট্রের গোস্ত খাওয়ার পর দ্বিতীয়বার ওজু করা এ জাতীয় কয়েকটি আদেশ সম্বন্ধে পর্যালোচনা করলে সবকিছু সমস্যার সমাধান হতো। এটা সুস্পষ্ট যে, সেই জমানায় অজু করার কোন কিতাব ছিল না। আর এটাও সুস্পষ্ট যে নব্য মুসলমানগণ পবিত্রতা সম্বন্ধে তত সাবধান ছিলেন না এবং তাঁদেরকে এটা সম্বন্ধে সতর্ক ও সাবধান করতে হয়েছিল।

হযরত ওমর (রাঃ)-এর কর্মধারা

এটা বাস্তব সত্য অস্বীকার করার কোন উপায় নাই যে, হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ইমামকুল শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁর জমানায় কোন প্রকাশ মতবিরোধ মাথা গজাতে পারিনি। তিনি নিজে ৫৩৯টি হাদীসের রেওয়ায়েতকারী। কিন্তু হাদীস বর্ণনা সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। তিনি কোন প্রকার মতবিরোধ মাথাচাড়া দিয়া উঠতে দেননি। মতবিরোধের কোন গন্ধ পাওয়া গেলেই, তিনি সাহাবাদের সাথে পরামর্শ করে তা মীমাংসা করে দিতেন।

অকস্মাৎ পিটুনিতে একটি স্ত্রীলোকের গর্ভ নষ্ট হয়ে যায়। হযরত ওমর (রাঃ) এটার দীয়ত সম্বন্ধে সাহাবা কেরামদের পরামর্শ চাইলেন। মুগাইরা বিন শুহবাহ আরয করলেন যে, হুজুর আলাইসি সালাম এরূপ ব্যাপারে একটি গোলাম বা একটি দাসী দীয়ত স্বরূপ আদায় করেন।

হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, "আপনার কোন সাক্ষী থাকলে আনয়ন করুন।" অতঃপর হযরত মুহাম্মদ বিন মুসলেম (রাঃ) সাক্ষ্য দিলেন।

একদিন হযরত ওমর বিন উমাইয়া (রাঃ) বাজারে চাদর ক্রয় করছিলেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, "আপনি এই চাদর দ্বারা কি করবেন?" তিনি বললেন, "আমি তা সদকাস্বরূপ প্রদান করব।" হযরত ওমর (রাঃ)ও তা শুনলেন। পরে তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি চাদরখানা কাউকে সদকাস্বরূপ প্রদান করেছেন।" তিনি বললেন, 'আমি আমার বিবিকে তা প্রদান করেছি, কেননা, হুজুর আলাইহিস সালাম বলেছেন, বিবিকে যাকিছু দিবে তা সদকায় পরিণত হবে।" হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, "হে ওমর আল্লাহর রাসূলের নামে মিথ্যা কথা রটনা করবেন না।" তখন হযরত ওমর ইবনে উমাইয়া (রাঃ) ফারুকে আজমের সাথে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)-এর কাছে যেয়ে তাঁর কথার সত্যতা প্রমাণ করলেন।

একদিন হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হলেন। তিন বার অনুমতি চেয়েও কোন জবাব না পেয়ে তিনি ফিরে গেলেন। হযরত ওমর (রাঃ) তাঁকে ডাকায়ে এনে বললেন, "আপনি ফিরে গেলেন কেন?" তিনি বললেন, "তাই হুজুর আলাইহিস সালামের আদেশ।" তিনি বললেন, "হুজুর যে এ আদেশ প্রদান করেছিলেন, এ সম্বন্ধে আপনার কোন সাক্ষ্য আছে কি?" হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) এ সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করেন।

অতঃপর ফারুকে আজম (রাঃ) বললেন, "আপনাদেরকে বিন্দু পরিমাণও অপমান করা আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু আমার পক্ষে সর্বদা সতর্ক থাকা উচিত যে লোকেরা যেন ভুল হাদীস বর্ণনা করার সাহস না পায়।"

হযরত আলী কররমল্লাহু ওয়াজহাহু, হযরত ওসমান রদিয়ল্লাহু আনহু, হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ (রাঃ), হযরত মাআজ বিন জবল (রাঃ), হযরত আবী বিন কায়াব (রাঃ) এবং হযরত জাইদ বিন সাবেত রাদিয়ল্লাহু তায়ালা আনহুকে নিয়ে ফারুকে আজম (রাঃ) একটি বিচার কমিটি স্থাপন করলেন। তাঁরা ব্যতীত মদীনায় অপর কারও ফতোয়া দেয়া অনুমতিও ছিল না এবং সাহসও ছিল না।

অধিক রেওয়ায়েতকারীকে শাস্তি প্রদান

আল্লামা জাহবী দুইটি রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। নিম্নে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

মঈন বিন ঈসা বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম মালেক রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহে আবদুল্লাহ্ বিন ইদ্রীসের কাছ হতে, তিনি শুয়াবা হতে তিনি সাঈদ বিন ইব্রাহীমের কাছ হতে এবং তিনি তাঁর আব্বাজানের কাছ হতে বর্ণনা করেছেন যে ফারুকে আজম (রাঃ), ইবনে মাসউদ (রাঃ), আবু মাসউদ আনসারী (রাঃ) এবং আবুদ্দারদা (রাঃ) কে বন্দী করে বললেন, "আপনারা হুজুর আলাইহিস সালামের কাছ হতে বহু রেওয়ায়েত বর্ণনা করে থাকেন।"

রেওয়ায়েত কোড়ার আঘাতের ভয়

আবদুল আজীজ বিন দারাওয়ারদি মুহাম্মদ বিন ওমর (রাঃ) হতে তিনি আবু সালমাহ (রাঃ) হতে রেওয়ায়েত করেছেন–আমি হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি কি ফারুকে আজমের (রাঃ) জমানায় এরূপে রেওয়ায়েত বর্ণনা করতেন?" তিনি বললেন, "আমি যদি তা করতাম, তবে আমাকে কোড়ার আঘাত খেতে হতো।"

এ সকল রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, ফারুকে আজমের (রাঃ) জমানায় হাদীস বর্ণনা সম্বন্ধে কিরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা হতো। আর ইসলামের খাতিরে কত বড় জবরদস্ত ব্যক্তির উপরও ফারুকে আজম (রাঃ) কিরূপ কড়া নজর রাখতেন!

ইরাক-বিজয়ের পর ফারুকী এজতেহাদ

ইরাক বিজয়ের পরে বিজিত দেশে কাহাদের দাবী অগ্রগণ্য এ সম্বন্ধে সাহাবাদের মধ্যে ঘোর মতবিরোধ দেখা দিল। হযরত বিলাল (রাঃ), হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ (রাঃ) এবং অধিকাংশ সাহাবাদের মত এ ছিল যে, যাদের তলোয়ারের জোরে দেশ জয় করা হয়েছে, সেই সকল সৈন্যের মধ্যেই বিজিত দেশগুলো বণ্টন হওয়া সমুচিত। হযরত ওমর রাদিয়ল্লাহু তায়ালা আনহু এবং হযরত আলী কররমল্লাহু ওয়াজহাহুর অভিমত এই ছিল যে, বিজিত দেশগুলি সরকারের প্রাপ্য। এটাতে পরবর্তী বংশধরদেরও দাবী রয়েছে।

সমস্যাটি যখন সঙ্কটপূর্ণ হয়ে উঠল, তখন ফারুকে আজম (রাঃ) মসজিদের মধ্য হতে পাঁচজন সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা ও বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি এবং আনসারদের মধ্য হতেও তদ্রূপ পাঁচ সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা ও বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি এবং আনসারদের মধ্য হতেও তদ্রূপ পাঁচ ব্যক্তিকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করলেন। অতঃপর তাঁদের সম্মুখে সমস্যাটি পেশ করা হইল। কয়েকদিন ব্যাপী এটার অধিবেশন চলল। পরিশেষে ফারুকে আজম তাঁর সমর্থনে পবিত্র কোরান শরীফের নিম্নলিখিত আয়াত পাঠ করলেনঃ অর্থাৎ 'যে সকল লোককে তাদের ঘর ও সম্পত্তি হতে বের করে দেয়া হয়েছে, তা সেই সকল নিঃস্ব লোকদের জন্য; আর যারা তাদের পরে আসবে এটাতে তাদেরও অংশ রয়েছে।'

এ আয়াতের শেষ অংশকে ফারুকে আজম (রাঃ) দলীলস্বরূপ পেশ করলেন। এটা শুনে সকল সাহাবা একমত হয়ে গেলেন। তখন সকলে মিলে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, যে সকল দেশ জয় করা হবে, তা সৈন্যদের প্রাপ্য নয়; বরং এটা সরকারী সম্পত্তি।

ফারুকে আজমের (রাঃ) জমানার পর এবং খোলফায়ে রাশেদীনের জমানার পর মহান তাবেয়ীন নিজ নিজ উস্তাদ ও সাহাবা কেরামদের রেওয়ায়েত ও ফতোয়া নিজ নিজ শহরে পরম বিশ্বস্ততার সাথে পৌছায়ে দিতে থাকেন।

মদীনার শ্রেষ্ঠ ফকীহবৃন্দ

হযরত সাঈদ বিন মুসায়েব (রাঃ), হযরত আরওয়া বিন জুবাইর (রাঃ), হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ (রাঃ),

ছালেম বিন আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ), হযরত সুলাইমান বিন ইয়াসার (রাঃ), হযরত কাসেম বিন মুহাম্মদ, হযরত ইমাম বাকের, হযরত মুহাম্মদ ইবনে শেহাব জহুরী, হযরত নাফেয় মাওলা, আবদুল্লাহ্ বিন ওমর, হযরত এয়াহয়া বিন সাঈদ আনছারী এবং হযরত রাবীয়া বিন বোরুখী রেদওয়ানুল্লাহে আলাইহিম আজমঈন পবিত্র মদীনায় শিক্ষাদান ও ফতোয়ার কাজ সুসম্পন্ন করতেন।

কুফার ফকীহবৃন্দ

হযরত আলকমা বিন কায়েস হযরত আসওয়াদ বিন ইয়াজীদ নখয়ী, কাজী শরীহ, হযরত ইব্রাহীম বিন ইয়াজীদ নখয়ী, হযরত ইমাম শাবয়ী এবং সাঈদ বিন জুবাইর রাদিয়ল্লাহু আনহুম কূফায় শিক্ষাদান এবং ফতোয়ার কার্যে মশগুল ছিলেন।

বসরায় একার্যে নিযুক্ত ছিলেন হযরত ইমাম হাসন বছরী, রফীয় বিন মাহরান জাবের বিন জায়েদ এবং মুহম্মদ বিন ইয়াসের বিন কাতাদাহ রাদিয়ল্লাহু আনহুম।

শাম ও দামেস্কের ফকীহবৃন্দ

শাম ও দামেস্কে তখন বিরাজ করছিলেন হযরত ওমর বিন আবদুল আজীজ (রাঃ) এবং হযরত মকহুল (রাঃ) প্রমুখ মহামহিম ব্যক্তিবর্গ। আর মিসরে ইয়াজীদ বিন আবিল জবীব (রাঃ) তাবেয়ী-শ্রেষ্ঠ ও মুফতী ছিলেন। আর এয়মনে হযরত তাউস কীসান (রাঃ) এবং হযরত ওহ্হাব বিন মুতনব্বা (রাঃ) সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন।

এ সকল তাবেয়ীন নিজ নিজ শহরে সাহাবাদের কাছ হতে শিক্ষা লাভ করেন। সাহাবাদের কাজ ও আমলকে তাঁরা শিরোধার্য করে চলতেন। মদীনা দীর্ঘকালের নিমিত্ত শিক্ষা ও খেলাফতের কেন্দ্র ছিল।

কাবাশরীফের খাতীরে শহর ও পল্লীবাসী আলেমবৃন্দ ও বিশিষ্ট ব্যক্তি মক্কাশরীফে পদাপর্ণ করতেন। কাবীশরীফে যাতায়াত এবং তওয়াফ করাকে তাঁরা পরম গৌরবের বিষয় মনে করতেন। মক্কাশরীফে এলমী শিক্ষা ও বরকত লাভের-ধারা সর্বদা প্রবাহিত ছিল।

তাবেয়ীনদের জমানায় ঝগড়া-বিবাদ ভীষণ আকার ধারণ করে। হযরত ওমরের (রাঃ) ইন্তেকালের পরই ঝগড়া-বিবাদ শুরু হয়। অতঃপর হযরত ওসমান, হযরত আবদুল্লাহ বিন জুবাইর রদিয়ল্লাহু তায়ালা আনহুমার হত্যাকাণ্ড এবং মদীনাতেও তদ্রূপ ঘটনার অপঘাতে মারামারি ও রক্তারক্তি আরম্ভ হয়।

এটাতে জনসাধারণের চরিত্রবলও নষ্ট হয়। মিথ্যা কথা বলা, প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা এবং খুন-খারাবী অনেকের কাছে অতি সাধারণ ব্যাপার বলে প্রতীয়মান হলো। এটা সকল পরিস্থিতিতে মুহাদ্দেসীন ও মহামান্য তাবেয়ীদের পক্ষে কোরআন-হাদীসকে রক্ষিত করা কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

তাবেয়ীন ও তবে তাবেয়ীনদের জমানা

তাবেয়ীন ও তবে-তাবেয়ীনদের জমানায় বনী উমাইয়াদের অত্যাচার চরম সীমায় পৌছেছিল। তাঁদের পূর্ববর্তী জমানায় তো খলীফা নিজের ইমামতিতেই নামায আদায় করতে অভ্যস্থ ছিলেন। আর এটাকে তখন বরং গৌরবজনকও মনে করা হতো। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই খলীফাবৃন্দ ইমামতি পরিত্যাগ পূর্বক নিজেদের পরিবর্তে অপর লোক স্থির করে দিতে লাগলেন। হযরত শাহ ওলিউল্লাহ সাহেব এ সম্বন্ধে তাঁর কিতাবে লিখেছেন ঃ 'খোলাফায়ে রাশেদীনের পর কোন খলীফাই নিজের নেতৃত্বে হজ্ব আদায় করেননি। তাঁদের ও অগ্নিপূজকদের শাসনে কোন পার্থক্য রইল না। শুধু এতটুকু পার্থক্য রইল যে, তাঁরা কলমা পড়তেন ও নামায আদায় করতেন।' আমরাও সেই একই জমানায় পয়দা হয়েছি। ভবিষ্যতের গর্ভে আরও কি নিহিত রয়েছে, তা একমাত্র খোদাতায়ালাই অবগত রয়েছেন।

তাঁরা যে শুধু ইমামতিই বর্জন করলেন তা নয়, বরং নামাযের প্রতি গুরুত্বও তাঁরা বহু কমাইয়ে দিলেন। তাঁদের দরবারে আলেম ওলামাদের মর্যাদারও হানী ঘটল। পরিশেষে খোদা হযরত ওমর বিন আবদুল আজীজ (রাঃ) কে খলীফা বানালেন। তিনি ধর্ম, রাষ্ট্র, সভার-চরিত্র ও রীতি-নীতি সবকিছুতে হযরত ওমর ফারুকের (রঃ) অনুকরণ করতেন। তাঁর শাসনকালের পর আবার সেই ঘোর দুর্দিন নেমে আসল। অত্যাচার অবিচারে বনী আব্বাস বনী উমায়েদের চেয়ে কয়েকপদ অধিক অগ্রসর হলেন।

সরকারের সাথে আলেমদের সম্পর্ক ছেদন

ইসলামের ইতিহাসে তখন দুর্দিন ননেমে আসছেন। ফুকাহা ও মুহাদ্দেসীন নিজ নিজ শহরে অবস্থান করে ফেৎনা-ফসাদ সমূহ হতে বেঁচে থাকতে তাঁরা বদ্ধ পরিকর হলেন। হযরত ইমাম আবু হানীফা, (রাঃ) ইমাম মালেক (রাঃ) এবং শাফেয়ী (রাঃ) মহা সুখ-সম্পদের পরিবর্তেও নিজদেরকে খলীফার হাতে পুতুল সাজাতে রাজী হলেন না। কিন্তু সহকারের সাথে সম্বন্ধ ছেদন তখনকার দিনে

আজকালকার সহজ সরল ব্যাপার ছিল। সম্পর্ক ছেদন ব্যাপারেও সমূহ বিপদে জড়িত হলে হতো। এ 'অপরাধে' বিষ প্রয়োগে ইমাম আবু হানীফার মৃত্যু ঘটে। কাজেই ইমামগণের পক্ষে ঈমান বাঁচাবার নিমিত্ত পবিত্র কোরআন -হাদীস ও বুজর্গানের জীবন পদ্ধতিকে পরিপূর্ণরূপে আঁকাড়ে ধরে থাকা ব্যতীত অন্য কোন সান্ত্বনা রইল না। ইমাম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহে আলাইহে কূফায় তাঁর উস্তাদ ইমাম ইব্রাহীম সাহেবের মসায়েল, ফতোয়া ও রেওয়ায়েতকে অবলম্বন করলেন।

ইমাম মালেক ও ইমাম আবু হানীফা

ইমাম মালেক রাহমাতুল্লাহে আলাইহে ও ইমাম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহে আলাইহের ফিকাহর মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য এই ছিল যে, ইমাম আবু হানীফা শুধু কূফার আসহাবদের রেওয়ায়েত, তাঁদের ফতোয়া এবং কেয়াসী মাসআলাকে গ্রহণ করতেন।

হযরত ইমাম মালেক রাহমাতুল্লাহে আলাইহেও ভদ্রূপভাবে শুধু মদীনাবাসীদের রেওয়ায়েত, তাঁদের মীমাংসা ও আহকামকে গ্রহণ করতেন।

উভয় ইমামই খলীফা মনসূরের জমানায় জীবিত ছিলেন। মনসূরের অত্যাচার অবিচারে মুসলিম জাহান তখন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে। ফুকাহা ও ওলামা কোণঠাসা অবস্থায় নিজ নিজ অঞ্চলে নিজ নিজ ভাবধারা প্রচার করতে থাকেন।

মনসূর হজ্ব করতে যেয়ে পবিত্র মদীনায় পৌছলেন। তিনি মদীনার সকল আলেম, মুহাদ্দেস ও নেতৃস্থানীয় লোকের সাথে মিলিত হলেন। সর্বাগ্রেই তিনি ইমাম মালেককে আহ্বান করে বললেন, "ইমাম সাহেব, আমি ফকীহদের মতবিরোধ দেখে হতভম্ব হয়ে গিয়েছি। ইরাকে উল্লেখযোগ্য কোন কিছুই নেই। শাম দেশের অধিবাসীরা জেহাদের জন্য উম্মাদ। এ সম্বন্ধে হেজাজই একমাত্র উল্লেখযোগ্য। মদীনায় আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দেস। কাজেই আপনি এমন এক কিতাব রচনা করুন, যাতে ইবনে আব্বাস (রাঃ), ইবনে ওমর (রাঃ), এবং ইবনে মাসউদের (রাঃ) ফিকাহর সমন্বয় থাকে এবং কিতাবখানা যেন মধ্যপন্থী হয়। আমি এটার প্রচারের ও এটাকে কার্যে পরিণত করার ভার গ্রহণ করেছি।"

ইমাম সাহেব বললেন, "সাহাবাগণ সমগ্র দেশে ছড়ায়ে পড়েছিলেন। তাঁদের ফতোয়া ও আদেশাবলী বিভিন্ন স্থানের আলেমদের কাছে পৌছছে। আর তা সেই সকল স্থানে গৃহীতও হয়েছে। এমতাবস্থায় আমি যদি কোন কিতাব লিখি, তথাপি তা গ্রহণ করার জন্য দেশবাসীকে জোর করা চলে না। এটার কারণ এই যে, আমার অভিমত ভ্রম ও ত্রুটিপূর্ণও হতে পারে।"

খলীফা তাঁর কাছ হতে বিফল মনোরথ হয়ে চলে আসেন। অতঃপর তিনি সুফিয়ান সওরী রাহমাতুল্লাহ আলাইহ্‌কে স্বীয় তাঁবুতে আহ্বান করলেন। তিনি বললেন, "আপনার শাহী দরবারের এই শাহী বিছানা উঠায়ে না ফেলা পর্যন্ত আমি আপনার দরবারে হাজির হতে পারি না।"

অবিলম্বে শাহী বিছানা তুলে দেয়া হলো। তখন তিনি নিম্নলিখিত আয়াত পাঠ করলেনঃ 'এ মাটি হতে আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং এই মাটিতেই আমি তোমাদেরকে মিশাইব এবং আবার এ মাটি আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং এটা মাটিতেই আমি তোমাদেরকে মিশাব এবং আবার এটা মাটি হতেই আমি তোমাদেরকে বের করব।" এ সকল কথা শুনে মনসুরের চোখের পানি গণ্ড বেয়ে পড়তে লাগল। হযরত সুফিয়ান সওরী বেশ কিছু কাল তাঁকে কঠোর ভাষায় উপদেশ দান করলেন। অতঃপর খলীফা সেই স্থান হতে প্রস্থান করলেন।

আবু উবাইদা নামক একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী খলীফার সঙ্গে ছিলেন। তিনি বললেন, "হে আমীরুল মুমিনীন, এরূপ কঠোরভাষী লোককে দ্বিখণ্ডিত করা উচিত।" মনসূর বললেন, "থামুন! ইমাম মালেক ও ইমাম সুফিয়ান সওরী সবিশেষ শ্রদ্ধার উপযুক্ত পাত্র।"

এই মনসূরের শাসনকালেই এক তালাকের মাসআলা প্রসঙ্গে ইমাম মালেককে মনসূরের অধীনস্থ এক গবর্ণরের হস্তে অমানুষিক অত্যাচার সাথে হয়েছিল। অবশ্য মনসূর তা অবগত ছিল না। মনসূর তা অবগত হয়ে সেই গভর্ণরকে যথাযথ শাস্তি প্রদান করেন এবং ইমাম সাহেবের কাছে তাঁর এটা অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

পরিস্থিতি ও ফিকাহ

এ সকল ঘটনা হতে এটা অনুমান করা চলে যে, প্রতিটি শহরেই ফকীহগণ নিজের জন্য একটি পরিবেষ্টন প্রস্তুত করে রাখছিলেন। আর তঁরা প্রত্যেকেই সেই সীমাবদ্ধ সীমানায় অবস্থান করার ফলে এবং তদুপরি শতবিধ বাধা-বিপত্তির কারণে স্বীয় প্রতিভা ও জ্ঞান অনুযায়ী কাজ করতে পারেননি। কাজেই মক্কা, ইরাক, এয়ামন, বিশর ও শাম ইত্যাদি এক দেশের ফকীহের সাথে অন্য দেশের ফকীহের কোন না কোন বিষয়ে মতবিরোধ থেকে যেত। ফলে এক ফকীহ অন্য ফকীহের সাথে সব বিষয়ে একমত হতে পারতেন না। সে পরিস্থিতিতে ফিকাহ

সম্বন্ধে সকলে একমত হয়ে কাজ করা তাঁদের পক্ষে সম্ভবপর হতো না। তাঁদের পক্ষে হাদীস সহী, নাকি দুর্বল সেই তুলাদণ্ড কায়েম করা সম্ভবপর হয়নি। প্রতি শহরের ফিকাহ ও ফকীহ পৃথক ছিলেন। নামজাদা মুহাদ্দেসগণ রায় বিশিষ্ট ফকীহদের সাথে সম্পর্ক ছেদন করতেন। অপর দিক দিয়ে ধর্ম সম্বন্ধে হুকুমতের সম্পর্কশূন্যতা, রাজনৈতিক দলন-পীড়ন এবং অত্যাচার অবিচারের দরুণ আরবের বুক সত্যকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করার মত লোকের মহা দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়।

হযরত ইমাম শাফেয়ীর উসূল ও ব্যক্তিত্ব

মুসলিম জাহানের আকাশ যখন ঘোর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন তখন সরকার বেপরওয়া, এমনকি জায়েয চাকুরী প্রাপ্তি সম্বন্ধেও বেপরওয়া, ফকীহ-জগতের তথাকথিত অভিমত বেপরওয়া, ধর্মের নামে যারা অযথা ভীতি প্রদর্শন করে, তাঁদের সম্বন্ধেও নির্ভীক হযরত ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহে আলাইহে ময়দানে নামলেন। তখন তিনি শান্ত-মধুর ও উদার কণ্ঠে আরব ও আজমের সম্মুখে তাঁর বক্তব্য পেশ করলেন।

(১) কোরআন ও হাদীস দীনের মূলভিত্তি। কোরআন ও হাদীসে-রাসূল (সাঃ) দ্বারা যদি কোন একটি বিষয় মীমাংসা না হয়, তবে কোরআন হাদীসের মুতাবেক কেয়াস দ্বারা এটার মীমাংসা করতে হবে।

(২) কোন একটি বিষয় যদি সহীহ মুত্তাসেল হাদীসে-রাসূল (সাঃ) দ্বারা প্রমাণিত হয়, তবে তা আমলে পরিণত করা অপরিহার্য।

(৩) হাদীস সর্বদাই স্বীয় জাহেরী অর্থের প্রতি নির্ভরশীল হওয়া বাঞ্ছনীয়। এটার দ্বারা যদি কয়েকটি অর্থ প্রকাশের সম্ভাবনা দেখা দেয়, তবে যে অর্থ জাহেরী হাদীসের অধিক সন্নিকট তাই গ্রহণযোগ্য।

(৪) সাহাবা কেরামদের সম্মিলিতি মত খবরে ওয়াহেদের চেয়ে অগ্রগণ্য। সাহাবাদের সম্মিলিত মত যদি না মিলে, তবে খবরে ওয়াহেদের উপর গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। হাদীস যত শক্তিশালীই হউকনা কেন, কোরআনের আদেশকে খন্ডন করতে পারে না।

(৫) কয়েকটি হাদীস যখন পরস্পর-রিরোধী হয়ে দাঁড়ায়, তখন সবিশেষে অনুসন্ধান করে দেখা আবশ্যক যে, এদের রেওয়ায়েতকারী কে কে? তারপর আদেশাবলীর ধারার প্রতি দৃষ্টিপাত করতে হবে। সর্বশেষে রেওয়ায়েতকারী সাহাবাদের মধ্যে কে পূর্বে বা পরে ঈমান এনেছেন, তার প্রতিও গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

(৬) সাঈদ বিন মুসাইব ব্যতীত অপর কারও 'হাদীসে মুরসাল' গ্রহণযোগ্য নয়।

(৭) হাদীসে মুত্তাসেল সহীহের তুলনায় হাদীসের মুরসাল' গ্রহণ মূল্যহীন।

(৮) হযরতের জমানায় সাহাবাদের বাণী একত্র করা হয়েছিল। আর কোন কোন বাণী সহীহ হাদীসের খেলাফ ছিল। এজন্য ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ আলাইহে এটার মীমাংসা করেছেন যে, সহীহ হাদীসের মুকাবেলায় এর গুরুত্ব নেই। আর তিনি বলছেন, অর্থাৎ তাঁরাও মানুষ ছিলেন আর আমরা মানুষ।"

(৯) প্রত্যেক সাধারণ আদেশের মধ্য হতে পারে। কিন্তু তা কখনও অকাট্য হইতে পারে না।

ইমাম শাফেয়ীর চিন্তাধারার স্বীকৃতি

তিনি তাঁর উসূল সমূহকে দলীলসহ পেশ করেন। অতঃপর তিনি এসকলকে তরাইয়ে দেখা এবং প্রচারের উদ্দেশ্যে মুসলিম জাহান পরিভ্রমণ করেন বাগদাদ ও ইরাক তখন কেন্দ্রস্থল ছিল। কাজেই তিনি তথায় যেয়ে নামজাদা ফকীহও এর সাথেও যুক্তিতর্ক প্রদর্শনপূর্বক তাঁদেরকে আপন ভক্তদলে ভিড়ান। তিনি মক্কা-মদীনা, শাম-মিসর এবং দামেস্ক এ এয়ামন ইত্যাদি দেশে পৌছে স্বীয় উসূলের যুক্তি তর্ক এবং সারমর্ম বুঝায়ে সমগ্র দেশবাসীর কাছে তা সুপরিচিত ও সুবিদিত করেন। তাতে মুসলিম জাহানের শ্রেষ্ঠতম মুহাদ্দেসীন তাঁর প্রতিভা ও গুণ গরিমা সম্বন্ধে যে ভুরিভূরি প্রশংসা করেছেন, তন্মধ্যে কয়েকটি উদ্ধৃত করা হলো।

(১) ইমাম হুসাইন বলেন, "কোরআন ও হাদীসকে কিরূপে বুঝা যায়, তা আমরা ও আমাদের পূর্ববর্তীগণ জানতাম না। ইমাম শাফেয়ীর কাছ হতে আমরা তা শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছি।"

(২) আবু মুসা জরীরকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, ইমাম শাফেয়ীর কিতাব সমূহ মানবের মর্মস্থল স্পর্শ করার কিরূপ সম্ভাবনা রয়েছে? তিনি বললেন, "এটাই খোদাতায়ালার বাসনা ছিল যে ইমাম শাফেয়ীর এলম সুপ্রকাশিত হোক। এজন্য খোদা তাঁকে মহা উন্নতি প্রদান করেছেন।

(৩) কোন এক ব্যক্তি ইমাম ইসহাক বিন রাহুবীয়াকে জিজ্ঞেস করেছিল যে, এত অল্প বয়সে ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহে কিরূপে এরূপ অমূল্য গ্রন্থরাজি রচনা করলেন? তিনি বললেন, "তাঁর বয়স কম থাকবার কল্যাণেই খোদা তাঁকে এরূপ পরিপূর্ণ বুদ্ধি প্রদান করেন।"

(৪) হিলাল বিন আলায়ী বলেন, "খোদা চারজন ব্যক্তিকে পয়দা করে জগতের অশেষ উপকার সাধন করেছেন। তন্মধ্যে ইমাম শায়েফী অন্যতম।"

(৫) হাফেজ বলেন, "আমি ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ, আলাইহের গ্রন্থরাজি পাঠ করেছে! গ্রন্থগুলি মণি-মাণিক্য ও রত্ন স্বরূপ।"

(৬) ইমাম আহমদ বিন হাম্বল বলেন, "এটা খোদা তায়ালার একটি বিশিষ্ট রাহমাত যে, তিনি প্রত্যেক শতাব্দীতে এমন একজন লোককে পয়দা করেন যিনি হুজুর আলাইহিস সালামের সুন্নতকে অটুটাভাবে শিক্ষা দিয়া থাকেন এবং ভুল ত্রুটিকে সংশোধন করেন। গত শতাব্দীতে ওমর বিন আবদুল আজীজ (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেন এবং বর্তমান শতাব্দীতে ইমাম শাফেয়ীকে সেই উদ্দেশ্যে পয়দা করা হয়েছে। আমি প্রতি ওয়াক্তের নামাযের সময় ইমাম শাফেয়ীর জন্য দোয়া করে থাকি।"

(৭) ইমাম বোখারীর উস্তাদ ইমাম আলী বিন মদীনী রাহমাতুল্লাহ আলাইহে স্বীয় পুত্রকে হেদায়াত করেছিলেন "বৎস, ইমাম শাফেয়ী সাহেবের গ্রন্থরাজির একটি শব্দ সম্বন্ধেও অনুমান করে কোনকিছু বলিওনা আমি তাঁর সমুদয় গ্রন্থ সংগ্রহ রেখে দিয়েছি। তাঁর গ্রন্থরাজি গুঢ়তত্ত্বে ভরপুর।"

(৮) ইমাম নেসায়ী বলেন, "ইমাম শাফেয়ী আমাদের মাথার তাজ স্বরূপ ছিলেন।

(৯) ইমাম মুসলেম তাঁর গ্রন্থরাজিতে ইমাম শাফেয়ীর বহু প্রশংসা করেন।

কোরআন-জ্ঞান, তফসীরে কোরআন ও ইমাম শাফেয়ী

ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ আলাইহের কিতাব 'আহকামুল কোরআন' এর প্রাণবস্ত এটা যে কোরআন-মজীদের যে সকল আদেশের পাবন্দি করা মুসলমানদের পক্ষে অপরিহার্য তা চার প্রকার।

(১) আকায়েদ (ধর্ম-বিশ্বাস)–আল্লাহর একত্ব, নুবুওত, পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব, আম্বিয়া আলাইহিস সালাম হাশর এবং কোরানের উপর ঈমান আনা এ সকল আকায়েদের অন্তর্গত এবং ফরজ।

(২) এবাদত–এটা আদায় করা ফরজ। খোদা ও বান্দার সাথে যে ব্যাপারে যেমন নামায রোযা এবং মালের জাকাত আদায়, তমদ্দুন এবাদত,

হজ্বে বদনী ও হজ্বে তমদ্দুনী ইত্যাদি এটার অন্তর্গত। এদের পর বুনিয়াদে ইসলামের স্থান। এটাও ঈমানের অন্তর্গত।

এক বান্দার সাথে অপর বান্দার সম্বন্ধ। এটা দুই প্রকার। একটি রক্ষামূলক। ইসলামের দিকে আহ্বান এবং জেহাদ দ্বারা তা সম্পন্ন হতে পারে।

অপরটি জীবন-পদ্ধতি। বিবাহ, তালাক, বাট বন্টন-বিধি এটার অন্তর্গত।

(৩) ব্যবসা-বাণিজ্যের বিধি-বিধান যথা বেচাকেনা, ইজারা ইত্যাদি।

(৪) শরীয়তের সীমা এবং প্রতিশোধ গ্রহণ।

কোরআন-মজীদের আহকামকে কিভাবে বুঝা উচিত? ইমাম সাহেব প্রায়ই আপেক্ষের সুরে বলতেন, "যাঁরা আরবী ভাষায় অভিধান এবং অজ্ঞযুগের আরবের ইতিহাস না জানেন, তাঁরা যে কিরূপে কোরআন মজীদের তফসীর লিখতে সাহস পান, তা আমার বুঝে আসে না। কারও দেহ-মন যদি কোরআনী ওয়াদায় সান্ত্বনা লাভ না করতে পারে, তবে তার পক্ষে কোরআন মজীদ হতে উপদেশ লাভ করা সম্ভবপর হতে পারে না। সে যদি কোরআনী ভীতি প্রদর্শনে প্রকম্পিত হয়ে না উঠে এবং আল্লাহর একত্ব ও নুবুওতের প্রতি যথাযথভাবে পরম বিশ্বাসী হতে না পারে, তবে তার পক্ষে কোরআন বুঝবার ক্ষমতালাভ কিছুতেই সম্ভবপর হতে পারে না।

জুলুম শব্দের বিভিন্ন অর্থ

কোরআন শরীফের নিম্নিলিখিত আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করলেই জুলুম শব্দের কি কি বিভিন্ন অর্থ হতে পারে, তা স্পষ্ট হয়ে যাবে। কোরআনে বলা হয়েছে, 'যারা ঈমান এনেছে এবং ঈমানের সাথে জুলুম মিশ্রিত করেনি, তাদের নিমিত্ত শান্তি রয়েছে এবং তারা হেদায়তপ্রাপ্ত হয়েছে।'

এই আয়াতে যদি জুলুম শব্দের আভিধানিক অর্থ নিয়ে যায়, তবে কেউই বাঁচতে পারবে না। সাহাবায়ে কেরাম আলাইহিমুর রেদওয়ান হুজুর আলাইহিস সালামের কাছে আরজ করলেন, "হে রাসূল, আমাদের মধ্যে এমন কেউ আছেন যে, নিজের প্রতি অবিচার করেননি!"

হুজুর (সাঃ) বললেন, "এখানে শব্দের অর্থ শেরেক। অযথা স্থানে কোন বস্তুকে ব্যবহার করাও এক প্রকার জুলুম। ঈমান নিজেই একটি শক্তি-কেন্দ্র। এটাতে তওহীদ ব্যতীত অপর কোন কিছু মিশ্রিত করা চাই না।"

মুফাচ্ছির ইমাম শাফেয়ী

ইমাম ইউনুস বিন আবদুর আলা বলেন, "ইমাম শাফেয়ী এমন মনোরমভাবে কোরআন মজীদের তফসীর বর্ণনা করতেন, যেন তিনি কোরআন শরীফ নাযিলের সময় উপস্থিত ছিলেন।"

হযরত জুনাইদ রাহমাতুল্লাহ বলেন, "ইমাম শাফেয়ীর চেয়ে বেশী কোরআন জ্ঞানসম্পন্ন লোক অপর কেউই ছিলেন না।"

ইমাম শাফেয়ী স্বয়ং বলেছেন, "কোরাআনে করীমে এমন কোন শব্দ নেই, আরবী পরিভাষায় যার অর্থ আমি অবগত নই।"

সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ

শরীয়তে দুইটি আদেশ রয়েছে, 'কর' এবং 'করিওনা'। এটাকে সৎকার্যে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ বলা হয়। কোরআন ও হাদীস এই উভয়টিতেই এটা আদেশ দুইটি বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন এটা যে, উভয়টিতে অর্থাৎ 'কর বা করিও না' দ্বারা যে কাজটি করতে বা না করতে আদেশ দেয়া হয়েছে তন্মধ্যে যে কাজটি করতে আদেশ করা হয়েছে, তা করা কি অপরিহার্য এবং যা করতে নিষেধ করা হয়েছে, তা না করা অপরিহার্য কিনা।

আর কোরআন হাদীসের 'কর এবং করিওনা' যদি কার্যেই পরিণত করা উচিত হয়ে থাকে তবে এবাদত করা যদি অপর কিছুর উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে, তবে এটার হুকুম কি? নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হয়েছে। খোদা বলেছেন, "হে মুসলমানরা! গোলাম এবং যে সকল লোক তোমাদের মধ্যে বালেগ হয়নি, তারা তোমাদের কাছ হতে তিন বার অনুমতি চাইবে।" কিন্তু এটা অনুমতি চাওয়া অপর কোন কাজের সাথে জড়িত নয়।

খোদা বলেছেন, 'অর্থাৎ, হে মুমিনগণ, তোমার যখন নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হও তখন স্বীয় মুখ ধৌত করে নিবে।" কিন্তু অজু করার এই আদেশটি অপর একটি এবাদত অর্থাৎ নামাযের সাথে সম্পর্কশীল।

খোদা বলেছেন, 'হে মুমিনগণ, তোমরা যখন এক নির্দিষ্ট কালের জন্য কর্জ আদান প্রদান কর, তখন তা লিখে নিবে।" লিপিবদ্ধ করার এ আদেশটিও উদ্দেশ্যমূলক অর্থাৎ কর্জকে সুরক্ষিত করা এটার উদ্দেশ্য।

খোদা বলেছেন, "হে মুসলমান, তোমরা যখন স্ত্রীলোকদেরকে তালাক দাও, তখন তাদের ইদ্দতের মধ্যে তালাক দাও।" এ আদেশ দ্বারাও তালাকের সময় ইদ্দতের প্রতি দৃষ্টিপাত রাখতে আদেশ করা হয়েছে। তালাকের এটাও একটি অংগ। তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোক ক্ষতির ভাগী না হোক, এটাই এ আদেশের উদ্দেশ্য।

আচ্ছা, এমতাবস্থায় এটা কি বলা চলে যে, খোদা তালাকের যে আদেশ প্রদান করেছেন, তা দ্বারা তালাক দেওয়াকে উৎসাহিত করা হয়েছে? বরং এটা বলা চলে যে, এটা দ্বারা তালাক দেয়া অধিক সীমাবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে।

আর অপর কিছুর সাথে যখন সম্পর্কশীল করে দেয়া হয়, সেই অবস্থায়ও তালাক দিতেই হবে, এমন কিছু বুঝায় কি? অর্থাৎ এটার অর্থ এই যে, তালাক যদি একান্তই দিতে হয়, তবে ইদ্দতের সময় তালাক দেয়া সমুচিত।

এ সবকিছুর প্রতি লক্ষ্য রেখে ইমাম শাফেয়ী সাহেব বলেন যে, কোরআন হাদীস ও জনসাধারণের কতাবার্তায় একটি আদেশের কয়েকটি অর্থ হতে পারে। এটার একটি উদাহরণ এই যে খোদা প্রথমে একটি বস্তুকে হারাম করেন। পরে মুবাহ বলে উল্লেখ করেছেন। এজন্য কোন কোন ব্যাপারে আদেশের অর্থ হারাম বস্তুকে হালাল করে দেওয়া। খোদা বলেছেন, ' তোমরা যখন হজ্বের এহরাম খুলে ফেল' তখন শিকার করতে পার। 'অপর এক জায়গায় কোরআনে বলা হয়েছে, 'জুমার নামায আদায় করার পর তোমরা জমীনে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড় এবং আল্লাহর জীবিকা অনুসন্ধান কর।' আর যদি তারা খুশী হয়ে ক্ষমা করে দেয় তবে তা মজা করে খাও। আরও বলা হয়েছে, 'কোরবানীর পশু যখন জবেহ করা হয় তখন তা হতে খাও।' এইরূপ কতিপয় আদেশ রয়েছে।

কিন্তু এহরাম খুলিবার পর শিকার করা, জুমার নামাযের পর ব্যবসায়ের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া, আর কোন স্ত্রীলোক যদি খুশী হয়ে মোহরের কোন অংশ ক্ষমা করে দেয়, তবে তা দ্বারা উপকৃত হওয়া এবং জবেহ হওয়ার পর কোরবানীর পশুর গোস্ত খাওয়া ওয়াজেব বা ফরয নয়।

কোরআনী আদেশের বিভিন্ন ধারা

কখনও সুস্পষ্ট আদেশে শব্দ সমূহ ব্যবহার করা হয়। খোদা বলেছেন, 'আল্লাহ্ ন্যায় বিচার, পরোপকার এবং আত্মীয়-স্বজনের সাহায্য করতে আদেশ করেছেন।' খোদা আরও বলেছেন, 'খোদা তোমাদেরকে আদেশ করতেছেন যে, আমানতকারীকে তার আমানত দিয়ে দাও। আর লোকের মধ্যে তোমরা যখন বিচার কর, তখন ন্যায় বিচার করবে।"

কখনও কোরআন হুশিয়ার করে দেয় যে, একটি কাজটি অমুক অমুক ব্যক্তির উপর ফরজ করা হয়েছে। কোরআনে বলা হয়েছে, 'নিহত ব্যক্তির পরিবর্তে প্রতিশোধ লিপিবদ্ধ হয়েছে।' খোদা আরও বলেছেন, 'তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে।' তিনি আরও বলেছেন, 'নামায মুসলমানদের জন্য এক নির্দিষ্ট সময়ে সীমাবদ্ধ।'

কখনও এ খবর প্রদান করে যে, এ কাজটির জিম্মাদারী সকলের উপর বা কোন নির্দিষ্ট দলের উপর "যে সকল লোকের পথ খরচ সম্বল রয়েছে, তাদের নিমিত্ত খোদার উদ্দেশ্যে হজ্ব করা ফরজ করা হয়েছে। আর যার সন্তান জন্মে, তার উপর সেই স্ত্রীলোকটির খোরাকী দেয়া ফরজ। যাকে তালাক দেয়া হয়, তার সাথে দস্তুর অনুযায়ী ব্যবহার করা চাই; কেননা পরহেজগারদের উপর এটা এক প্রকার ফরজ।'

কখনও সেই বাঞ্ছিত বস্তুর জিম্মাদারী সেই সকল লোকের উপর অর্পণ করা হয়, যার সাথে সেই কাজের সম্পর্ক রাখা হয়। কোরআন পাকে বলা হয়েছে, "তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোককে তিন হায়েজ পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকতে হবে। আর তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সেই স্ত্রীকে চারমাস দশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।"

কখনও এমন শব্দ ব্যবহৃত হয়, যাতে বাঞ্ছিত কাজের প্রতি তাকীদ দেয়া হয় এবং তৎসঙ্গে এটাও প্রমাণিত হয় যে, কাজটি ফরজ নয়। কোরআনে বলা হয়েছে, "আর যারা স্বীয় সন্তানকে পূর্ণ দুই বছর দুগ্ধ পান করাতে চায়, তেমন ক্ষেত্রে সন্তানের মাতা সন্তানকে দুই বছর দুগ্ধ পান করাবে।" "আমি তাদের বিবি এবং দাসীদের সম্বন্ধে তাদের উপর যা ফরজ করেছি, সেই সম্বন্ধে অবগত রয়েছি।" "আর তোমাদের মধ্যে যারা পীড়িত হবে, তাদের মাথায় যদি কোন কষ্ট থেকে থাকে, তবে চুল মুণ্ডায়ে ফেলবার পরিবর্তে তাকে রোযা বা সদকা ও দান বা কোরবানী করতে হবে। আর সে যদি ধনী বা অভাবগ্রস্ত হয়ে থাকে, তবে তাকে সুস্থ বা স্বচ্ছল না হওয়া পর্যন্ত সময় দেয়া হবে।"

কখনও ঈপ্সিত উদ্দেশ্যের উল্লেখ মঙ্গলজনক কাজটির সাথে মিলায়ে দেয়া হয়। যেমন হক-তায়ালা বলেছেন, "আর যারা এতিমদের সম্বন্ধে তোমরা প্রশ্ন করতেছে, তাদেরকে বলে দাও যে, সন্ধি উত্তম।"

কখনও কোন ওয়াদার সঙ্গে কোন কাজের উল্লেখ করা হয়ে থাকে। পাক কোরআনে বলা হয়েছে, "এমন কে আছে যে খোদাকে কর্জে-হাসনা প্রদান করবে! তবে তাকে বহুগুণ অধিক পুরস্কৃত করা হবে।"

আর কখনও সেই বাঞ্ছিত কাজটি সম্বন্ধে বলা হয়ে থাকে যে, তা নিজেই সৎকাজ এবং তা নেকীর কাছে পৌছায়ে দেয়। কোরআন বলে, "তোমরা কখনও মঙ্গলের ভাগী হতে পারবে না, যে পর্যন্ত না তোমরা যা ভালবাস তা ব্যয় কর।" 'যে ব্যক্তি পরহেজগারী অবলম্বন করে সেই ব্যক্তিই মঙ্গলের অধিকারী হবে।'

উদাহরণস্বরূপ যেরূপভাবে আদেশের আয়াতসমূহ রয়েছে, তদ্রূপভাবে কোন কাজ বা কাজসমূহের নিষেধাজ্ঞাও কয়েক প্রকারে বর্ণনা করা হয়েছে। কতক কাজ প্রকাশ্যভাবে নিষেধ করা হয়েছে। কোরআনে বলা হয়েছে, "এবং খোদা নির্লজ্জ কাজ ও মন্দ কাজ হতে ফিরায়ে থাকেন।" ধর্ম সম্বন্ধে যারা তোমাদের সাথে সংগ্রাম করেছে এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘর হতে বের করে দিতে তোমাদের শত্রুদেরকে সাহায্য করেছে, তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে খোদা তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন।"

নিষিদ্ধ বস্তুকে হারাম করা

"প্রকাশ্য ও অপ্রাকাশ্য নির্লজ্জ কাজ আর পাপ ও অনর্থক বাড়াবাড়ি এবং এটাকেও যে, খোদা যে সম্বন্ধে কোন দলীল নাযিল করেননি এটাকে যে তোমরা খোদার সাথে শরীক করবে এবং তোমরা যে না জানিয়ে, না শুনিয়ে খোদার উপর অপবাদ প্রদান করবে, আমার প্রতিপালক এ সকল কাজকে হারাম করে দিয়েছে।" "এবং স্ত্রীলোকদের জন্য এটা হালাল নয় যে, খোদা তাদের গর্ভে যা পয়দা করেছেন, তা গোপন রাখবে।" খোদা বলেছেন, আর মঙ্গল করার উদ্দেশ্য ব্যতীত তোমরা এতিমের মালের কাছে যেও না।" 'এবং তোমরা প্রকাশ্য ও গোপন পাপ পরিহার কর।' 'এটা কোন মঙ্গল কাজ নয় যে, তোমরা তোমাদের মুখ পূর্ব পশ্চিম দিকে ফিরাবে।' 'অনন্তর এ সব মাসে যে ব্যক্তি হজ্ব করতে ইচ্ছে করবে, তবে হজ্বের মধ্যে সে স্ত্রী-সহবাস, পাপ এবং ঝগড়া বিবাদ করবে না।' 'মাতাকে তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে না, সন্তানওয়ালাকে তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে না। যে ব্যক্তি অছিয়ত শুনবার পর এটাকে পরিবর্তিত করে, তবে এটার পাপ তার উপর বর্তিবে, যে এটাকে পরিবর্তিত করে।' 'আর যারা স্বর্ণরৌপ্য জমা করে রাখে এবং খোদার রাস্তায় খরচ করে না, তবে এ সকল লোকের জন্য মহা শাস্তি রয়েছে।' 'এবং খোদা তাদেরকে যে মঙ্গল দান করেছেন, যারা তাতে কৃপণতা, করে, তারা যেন না ভাবে যে তা তাদের জন্য মঙ্গলজনক, বরং তাতে তাদের জন্য অনিষ্ট রয়েছে।'

কোরআন-মজীদের এমন কতক আদেশাবলী রয়েছে, যা করা না করা ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তাও বিভিন্ন উপায়ে প্রকাশ করা চলে কোরআনে বলা হয়েছে, 'আজ তোমাদের জন্য খাবার পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করা হয়েছে এবং যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের জবেহ তোমাদের জন্য হালাল এবং তোমাদের জবেহও তাদরে জন্য হালাল।' 'লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে,

তাদের জন্য কি কি হালাল করা হয়েছে। তুমি তাদেরকে বলে দাও যে, খাবার পাক বস্তুগুলি তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে।' ছফা ও মরওয়া আল্লাহর শায়ার। অনন্তর যে ব্যক্তি খানায়ে কাবার হজ্ব করবে বা ওমরা করবে, সে যদি উভয়ের চারদিকে তওয়াফ করে, তবে তার জন্য কোন পাপ নেই।'

ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহে 'সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের' আরও কয়েকটি পন্থা বর্ণনা করেছেন। এটার পর আবার একটি পন্থাও বের করেছেন যে, হুযুর আলাইহিস সালাম ব্যতীত আল্লাহ তায়ালার আদেশাবলী স্পষ্টভাবে বুঝা সম্ভবপর নয়। এখন প্রশ্ন হতে পারে, কোরআনের সাথে সহী হাদীসের কি সম্পর্ক রয়েছে। খোদা বলেছেন ঃ 'তিনিই মুর্খদের মধ্যে তাদের মধ্য হতে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদেরকে আল্লাহর আয়াত শুনায়ে থাকেন এবং তাদেরকে পবিত্র করে থাকেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দিয়ে থাকেন এবং তারা তার পূর্বে পথভ্রান্তদের অন্তর্গত ছিল।'

এ আয়তে তিনটি কথা উল্লেখ করা হয়েছে–

(১) হযরত (সাঃ) খোদার আদেশ বা আয়াতসমূহ পাঠ করে লোকদেরকে শুনায়ে থাকেন।

(২) হযরত (সাঃ) শ্রোতাদেরকে অংশীবাদীতা ও অপরাপর পাপ হতে পাক করে থাকেন।

(৩) তিনি তাদেরকে কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দিয়ে থাকেন।

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, খোদাতালার আয়াতসমূহ পাঠ করে অপরাপরকে শুনায়ে দেয়াই যদি হযরতের একমাত্র কর্তব্য হয়ে থাকে এবং তাতেই তাঁর প্রচার-কর্তব্য সম্পন্ন হয়ে যায়, তবে সর্বশেষ আদেশ অর্থাৎ কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দেয়ার কি অর্থ হতে পারে? এতে স্পষ্ট আদেশ রয়েছে যে, পয়গাম্বর আলাইহিস সালাম যে জ্ঞান হাসিল করেন তা দুই প্রকারের।

(১) ওহীয়ে হাকীকী, যা খোদা তাঁর প্রতি নাযিল করে থাকেন। যাদের সমষ্টিকে কেতাবে-এলাহী, ছহীফায়ে রব্বানী বা কোরআন-মজীদ বলা হয়ে থাকে।

(২) সেই এলম যা পয়গাম্বরদের নুবুওতের পূর্ণত্বলাভ বা নুবুওত-জ্ঞানের ফলাফলস্বরূপ হয়ে থাকে। দ্বিতীয় এলম প্রথম এলমের নিয়মাবলীর অধীন থেকে প্রকৃত উদ্দেশ্যকে স্পষ্ট করে দেয় এবং এটার অংশবিশেষকে ও বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করে থাকে।

হযরতের বাণী তিনভাগে বিভক্ত

(১) যে সকল আদেশ কোরআন মজীদে বিদ্যমান রয়েছে।

(২) যা কোরআনের সংক্ষিপ্ত আদেশকে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করে থাকে।

(৩) যে সকল হাদীসের বর্ণনা কোরআন মজীদে প্রকাশ্যভাবে, না বিস্তৃতভাবে, না সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী আরও বলেছেন যে, হুজুর আলাইহিস সালামের পূর্ণ পাবন্দী আমাদের জন্য ফরজ করা হয়েছে। হুজুর আলাইহিস সালাম এমন কোন আদেশ প্রদান করেননি, কোরানে যে সম্বন্ধে কোন না কোন আসল উৎস নেই। সে আসল উৎস হুজুর আলাইহিস সালামের মহান হৃদয়ে সমুদয় হাদীস ঢেলে দিয়েছে। হুজুরের সম্মুখে যখন কোন নব সমস্যা দেখা দিয়েছে এবং সেই সম্বন্ধে কোন ওহী নাযিল হয়নি, তখন হুজুর আলাইহিস সালাম নিজ এজতেহাদ দ্বারা এটার সমাধান করেছেন। তা উম্মতের জন্য গ্রহণযোগ্য হয়েছে। এটা ভুল-ত্রুটি হতে মুক্ত। এজন্য রেসালতের আদেশ এবং দীনের আদেশে হযরতের রায় কখনও ভুল-ত্রুটিপূর্ণ হতে পারে না।

ইমাম শাফেয়ী আরও বলেছেন, "আমার মাতা-পিতা হুজুর আলাইহিস সালামের নামে উৎসর্গ হোক। পয়গাম্বরী এজতেহাদ এবং রায় এলমের সেই আবে কওসর হযরতের হৃদয়-উৎস হতে প্রবাহিত হয়ে থাকে। এটাকেই এলহামের এলাহী, ফাহমে রেসালত ও হুকুমতে খোদাওন্দী বলা হয়ে থাকে।"

এ সম্বন্ধে আল্লাহ্ পাক বলেছেন, 'আমি তোমার প্রতি সত্যভাবে কিতাব নাযিল করেছে, যেন তুমি আল্লাহ্ তোমাকে যা বুঝাইয়ে দিয়েছেন, তদনুযায়ী লোকদের মধ্যে মীমাংসা কর।'

হুজুর আলাইহিস সালাম স্বয়ং বলেছিলেন, 'যে মাসআলা সম্বন্ধে আমার কাছে কোন ওহী আসেনি সেই সম্বন্ধে আমি তোমাদের মধ্যে নিজের রায় অনুযায়ী মীমাংসা করে থাকি।'

হুজুর আলাইহিস সালাম দুনিয়াতে যে শরীয়ত নিয়ে এসেছিলেন, তা সর্বশেষ এবং চিরস্থায়ী। এরূপ আখেরী ও স্থায়ী শরীয়তের জন্য এটা জরুরী ও অপরিহার্য যে, এটা অকাট্য প্রমাণের উপর নির্ভরশীল হওয়া বাঞ্ছনীয়। এজন্য এ আখেরী ওহীয়ে এলাহী স্বীয় পবিত্র কোরআনকে বিধি-বিধানের সীমাতে সীমাবদ্ধ করেছে। আর অংশ বিশেষের জন্য কোরআনের আয়াতসমূহে এরূপ ইশারা দেয়া হয়েছে যে, সেই নির্দেশানুযায়ী হযরতের অন্তর যা এলম ও মা'রেফতের

আলোতে ভরপুর এবং যা এলম ও হেকমতের ভাণ্ডার এবং খোদার তরফ হতে যার অন্তর সুপ্রশস্ত করা হয়েছে, তাঁর প্রতি নির্ভরশীল করে রাখা হয়েছে। তিনি জমানা অনুযায়ী সেই সকল অংশ বিশেষের উপর চিন্তা করে দেখলেন।

হযরত আমাদের নিমিত্ত চরম আদর্শ। তাঁর অভিমত, তাঁর নির্দেশ এবং তাঁর আমল-আখলাক সকল ত্রুটি হতে পবিত্র। অতঃপর হযরতের তোফায়েলে এই মহাগুণ খোলাফায়ে রাশেদীন, শ্রেষ্ঠ সাহাবাকুল, তাবেয়ীন, তাবে-তাবেয়ীন এবং আলেম ওলামাদের মধ্যে গিয়ে বর্তে। এ সকলের সমষ্টিগত নাম এজতেহাদ।

কিন্তু আমাদের নিমিত্ত সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বগুরুত্বপূর্ণ এবং পবিত্র ফরজ এই যে, হুজুর আলাইহিস সালামের সহী অমূল্যবাণীসমূহ এবং সহী পবিত্র আমল লাভ করার নিমিত্ত আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করা সমুচিত এবং এটার উপর যেন আমরা পূর্ণ বিশ্বাসী হই যে, যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য স্বীকার করে, অনন্তর সে যেন আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করল।'

হাদীসের শ্রেণী বিভাগ

যে হাদীসের রাবী হুজুর আলাইহিস সালামের বাণী বা কাজ তো বর্ণনা করে থাকেন, কিন্তু তাঁদের রেওয়ায়েত তাবেয়ী পর্যন্ত যেয়ে শেষ হয়ে যায়। তাঁরা কোন সাহাবার নাম নিতে পারেন না। এ সকল হাদীসকে 'মুরসাল' বলা হয়।

'মুরসাল খফী' ঐ সকল হাদীসকে বলা হয়ে থাকে যে, তা এমন এক সাহাবা রেওয়ায়েত করে থাকেন, যিনি হুজুর আলাইহিস সালামকে তো দেখেছেন, কিন্তু তিনি যে কোন হাদীস শ্রবণ করেছেন, এমন কোন প্রমাণ নেই। তিনি বরং অপর সাহাবার কাছ হতে রেওয়ায়েত করে থাকেন এবং তিনি যাঁর কাছ হতে রেওয়ায়েত করেছেন, তাঁরা নামও উল্লেখ করেননি।

মুরসালের পরিচয় এই যে, তাবেয়ীর পরবর্তী রাবী উহ্য। এটার পরিচয় এই যে, তাবেয়ী যত বড়ই হোক না কেন, যথা কাইস বিন আবী হাজেম এবং হযরত সুয়াইব বিন মুসাইব, বা ছোট হোক যেমন এয়াহয়া বিন সাঈদ আনছারী, তাঁরা যদি বলে দেন যে, হুজুর (সাঃ) এরূপ বলেছেন, বা তাঁদের অবস্থিতিতে তা হয়েছে, তবে তাই মুরসাল।

হাদীসের শেখগণ এ সম্বন্ধে একমত যে, এটাই মুরসল রেওয়ায়েত যা মুহাদ্দেস সনদসহ ধারাবাহিকরূপে তাবেয়ী পর্যন্ত রেওয়ায়েত করেন, এবং তাবেয়ী এটা বলে দেন যে, হুজুর আলাইহিস সালাম এরূপ বলেছেন। অধিকাংশ

মুরসাল রেওয়ায়েত, মদীনার সাইদ বিন মুসাইব, মক্কাবাসীদের মধ্যে আতা বিন আবী রবাহ, মিসরবাসীদের মধ্যে সাঈদ বিন আবী হেলাল, শাম দেশবাসীদের মধ্যে মকহুল ও মুশাক্কী, বসরা নিবাসীদের মধ্যে হাসন ইবনে আবী হাসন এবং কূফাবাসীদের মধ্যে ইব্রাহীম বিন ইয়াজীদ নখয়ী রেওয়ায়েত করেন। আর এ সমগ্র মুরসাল হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে সকলের চেয়ে অধিক সহী সাঈদ বিন মুসাইয়েবের মুরসাল হাদীসসমূহ। এটার কারণ এই যে, হযরত সাঈদ সাহাবার ছেলে ছিলেন। তাঁর পিতা মুসাইব বিন হাজন (রাঃ) বাইতুর রেদওয়ানে শরীক ছিলেন। আর তিনি হযরত ওমর (রাঃ), হযরত ওসমান (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত তলহা (রাঃ) এবং হযরত জুবাইর (রাঃ) এবং অপরাপর 'সুসংবাদ-প্রাপ্ত দশ ব্যক্তির' কাছ হতে উপকার লাভ করেন। তাবেয়ীনদের জমাতে এরূপ সৌভাগ্যশালী অপর কেহই ছিলেন না। তদুপরি তিনি হেজাজের ফকীহ ও মুফতী ছিলেন। আর তিনি সাত ফকীহদের নেতা ছিলেন।

ইমাম মালেক রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহে বলেন, "মদীনার সাত ফকীহ যেন এক দেহ এক প্রাণ বিশিষ্ট ছিলেন। আমি আবুল আব্বাস মুহাম্মদ বিন ইয়াকুব হতে শুনেছি, তিনি আবাসের কাছ হতে এবং তিনি এয়াহয়া বিন ময়ীন হতে শ্রবণ করেছেন।"

তিনি বলেন, "সমগ্র মুরসাল রেওয়ায়েতের মধ্যে হযরত সৈয়দ বিন মুসাইবের রেওয়ায়েত সকলের চেয়ে অধিক সহী। এটার কারণে এই যে, পূর্ববর্তী ইমামগণ যখন তাঁর মুরসল হাদীস সম্বন্ধে চিন্তা করতে লাগলেন এবং তাতে উপকৃত হতে লাগলেন, তখন তিনি সনদ পেয়ে গেলেন। আর এই বৈশিষ্ট্য অপর মুরসালদের মধ্যে পাওয়া যায় না। হাদীস শাস্ত্রে এটাই মুরসাল হাদীসের স্থান।

ইমাম হাকেম বলেন, ইয়াজীদ বিন হারুন হাম্মাদ বিন ইয়াজীদের কাছে জিজ্ঞেস করলেন, "হে আবু ইসমাঈল, কোরআন মজীদে কি আসহাবে হাদীসের উল্লেখ রয়েছে?" তিনি বললেন, "হাঁ। আপনি কি খোদার এই আদেশ শ্রবণ করেননি যে, তারা ধর্মীয় জ্ঞান লাভ করুক এবং স্বীয় কওমকে তা বুঝায়ে দিবে যখন তারা স্বীয় কওমের কাছে প্রত্যাবর্তিত হয়। তাতে যেন তাদের স্বজাতীয়রা আল্লাহকে ভয় পায়। তারা এলম লাভ করার নিমিত্ত ভ্রমণ করবে এবং স্বীয় কওমের কাছে ফিরে তাদেরকে শিক্ষা দিবে।" পবিত্র কোরআনে এ সবের উল্লেখ রয়েছে।

হযরত হাকীম বলেন, "এ কোরআনী বিধান হতে এটাই প্রমাণিত হতেছে যে, এলম এমনই উপযুক্ত দলীল যে, যিনি তা শ্রবণ করেন, তিনি অপরকেও তা শুনায়ে দিবেন। এটাই কোরআনী দলীল।"

সাঈদ বিন জুবাইরের মারফত হাদীস রেওয়ায়েত করা হয়েছে যে, তাঁর কাছ হতে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস বর্ণনা করেছেন যে, হুজুর আলাইহি সালাম বলেছেন, তোমরা আমার কাছ হতে যেভাবে শুনে থাক, অপরেও তোমাদের কাছ হতে তদ্রূপভাবে শুনবে। অতঃপর তোমাদের কাছ হতে শুনেছে তাদের কাছ হতে অপরেরা শুনবে।"

হাদীসে মওকুফ, মুনকাতেয় ও মুয়াল্লাক

যে হাদীসের শব্দাবলী সাহাবা পর্যন্ত পৌঁছে এবং সাহাবাদের কাছ হতে এটা প্রমাণিত হয় না যে, তাঁরা হুজুর আলাইহিস সালামের কাছ হতে তা শ্রবণ করেছেন কিনা, এদেরকে 'মওকূফ' বলা হয়ে থাকে। হাফেজ সাহেবও তা বর্ণনা করেছেন।

অপর এ জাতীয় হাদীস ও রেওয়ায়েত করা হয়েছে, যা এদের পরিচয় এই যে, সে সকল হাদীসের বর্ণনাকারী ধারাবাহিকরূপে দুই বা অধিক ছুটে যায়, সেই সব হাদীসকে বলা হয়। আর বর্ণনাকারী যদি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ছুটে যায় অর্থাৎ ধারাবাহিকরূপে না ছুটে, তবে এদেরকে বলা হয়।

ইমাম হাকেম 'মারেফতে উলুমে হাদীস' কিতাবে লিখেছেন, মুরসাল ও মুনকাতেয় হাদীসের মধ্যে পার্থক্য বুঝবার মত হাফেজে হাদীস অতি কম রয়েছে। মুনকাতেয় হাদীস তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। তন্মধ্যে নিম্নে একটি উদাহরণ দেয়া হয়েছে। বাগ্‌দাদে আমাদের কাছ হতে আয়ুব বিন সুলাইমান ছায়দী। তাঁর কাছ হতে আবদুল আজীজ বিন মুছা। তাঁর কাছ হতে হেলাল বিন হক! তিনি জরিরী হতে। তিনি আবুল আলা বিন শুখাইর হতে। তিনি বনী হানজলার দুটি ব্যক্তি হতে। এবং শদ্দাত বিন আওস হতে যে, হুজুর আলাইহিস সালাম আমাদেরকে এই দো'আ নামাযে পাঠ করার জন্য শিক্ষা দিয়েছিলেন ঃ

দ্বিতীয় প্রকার মুনকাতেয় হাদীস সম্পর্কে ইমাম হাকেম বলেন ঃ আবুল আব্বাস মুহাম্মদ বিন ইয়াকুব আমাদের কাছ হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর কাছ হতে এয়াহয়া বিন আবী তালেব। তাঁর কাছ হতে আলী বিন আসেম। তিনি দাউদ বিন আবী হিন্দ হতে।

তিনি বলেন, আমি যখন জজীরতুল কাইছে অবতরণ করলাম' সেখানে এক অন্ধ বৃদ্ধ ব্যক্তি যাকে লোকে আবু ওমর বলে ডাকত, সেই বৃদ্ধকে আমি বলতে

শুনেছি যে সেই বৃদ্ধ আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে শুনেছেন যে, হুজুর আলাইহিস সালাম এরূপ বলেছেন, "মানুষের উপর এমন এক সময় আসবে যে, তাঁকে কমজোরী বা নাফরমানী এ দু'টির মধ্যে কোন একটিকে অবলম্বন করতে হবে। যে সকল লোক সেই জমানা পাবে, তাদের পক্ষে নাফরমানী অবলম্বন না করে কমজোরী অবলম্বন করা উচিত।"

এ রেওয়ায়েতটিতে অন্ধ লোকটিকে আবু ওমর বলে অভিহিত করা হয়েছে। অথচ এটার কোন ভিত্তি নেই।

ইমাম হাকেম বলেন, এরূপ বহু মুনকাতেয় হাদীস রয়েছে, যার রেওয়ায়েতকারীগণ বহু বিখ্যাত। অথচ তাঁদের বর্ণিত রেওয়ায়েতে এরূপ বহু ত্রুটি রয়েছে।

তৃতীয় দৃষ্টান্ত এই যে, আবু নছর বিন ইউসুফ ফকীহ আমাদের কাছ হতে রেওয়ায়েত করেছেন। তাঁর কাছ হতে মুহাম্মদ বিন সুলাইমান হাজরমী। তাঁর কাছ হতে মুহাম্মদ বিন সুহাইল, তাঁর কাছ হতে আবদুর রাজ্জাক বলছেন যে, সওরী উল্লেখ করেছেন যে, তিনি আবু ইসহাক হতে, তিনি জাইদ বিন ইয়াসীর হতে এবং তিনি হাজীফা হতে যে, হুজুর আলাইহিস সালাম খেলাফত সম্পর্কে বলেছেন, "তোমরা যদি আবু বকরকে তোমাদের খলীফা নিযুক্ত কর, তবে বকর শক্তিশালী ও বিশ্বাসী প্রমাণিত হবে। খোদার আদেশ কার্যে পরিণত করতে, সে কারও নিন্দাবাদের পরওয়া করবে না। আর তোমরা যদি আলীকে তোমাদের খলীফা নির্বাচিত কর, তবে সে হেদায়তপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং সে অপরের হেদায়েতকারী হবে। সে তোমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করবে!

হাকীম বলেন, এই রেওয়ায়েত সম্বন্ধে যখন চিন্তা করা যায়, তখন জাহেরীভাবে এটার সনদ মুত্তাসেল বলে প্রতীয়মান হয়। এটার কারণ এই যে, মুহাম্মদ বিন সুহায়েল ও হাজরমী উভয়েই বিশ্বাসযোগ্য এবং আবদুর রাজ্জাকের সুফিয়ান সওরী হতে শ্রবণ করা বিখ্যাত ও সুপরিচিত ব্যাপার। এরূপে ইবনে ইসহাক হতে সুফিয়ান সওরীর রেওয়ায়েত মশহুর ও সুপরিচিত। কিন্তু এ রেওয়ায়েতে দুটি স্থানে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। এ রেওয়ায়েতে আবদুর রাজ্জাক এমন কোন উল্লেখ করেননি যে, তিনি সুফিয়ান সওরীর কাছ হতে রেওয়ায়েত করেছেন বা তাঁর কাছ হতে তিনি নিজে শুনেছেন। সুফিয়ান সওরী এটাও বলেননি যে, তিনি আবু ইসহাক হতে শুনে রেওয়ায়েত করেছেন। এরূপ সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে মুহাদ্দেসদের দৃষ্টিপাত করা কর্তব্য।

পরস্পর বিরোধী হাদীসের সমাধান

কতিপয় হাদীস যদি পরস্পর বিরোধী হয়, তখন এদের রাবী সম্বন্ধে বিশেষভাবে তলায়ে দেখা আবশ্যক। তারপর আদেশাবলীর ধারাবাহিকতা, সাহাবাদের মধ্যে কে আগে বা পরে ঈমান এনেছেন, তা লক্ষ্য রাখতে হবে। অতঃপর তাবেয়ীনদের মধ্যে বেশী সন্নিকট কে এবং নাসেখ ও মনসুখের প্রতি বিশেষভাবে তলায়ে দেখতে হবে।

হাফেজ আবু বকর মুহাম্মদ বিন মুসা বিন ওসমান বিন হাফেজ এই সকল সমস্যার যে সুসমাধান করেছেন, তা মুহাদ্দেসীন পরম সন্তুষ্টির সাথে শিরোধার্য করেছেন। তিনি এ সম্বন্ধে আঠারটি কায়দা বর্ণনা করেছেন।

(১) দুইটি হাদীস পরস্পর বিরোধী হলে বিশেষভাবে তলায়ে দেখা আবশ্যক যে এদের মধ্যে সামঞ্জস্য সম্ভবপর কিনা।

(২) উভয় রেওয়ায়েতের রাবীদের মধ্যে তলায়ে দেখতে হবে যে, রেওয়ায়েতের হাফেজ হিসেবে কে অধিক উপযুক্ত, তন্মধ্যে কে অধিক সতর্ক এবং সম্মানী। আর কোন্ রেওয়ায়েতে কে অধিক গ্রহণীয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ইমাম মুহাম্মদ ইবনে শেহাব জহুরীর মদীনায় ইমাম মালেক এবং শোওয়াইব বিন আবী হামজা এই দুইজন বিখ্যাত শাগরেদ ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ইমাম মালেকের রেওয়ায়েতের উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

(৩) উভয় রেওয়ায়েতের রাবী সম্বন্ধে এটাও তলিয়ে দেখতে হবে যে, কোন্ রেওয়ায়েতের রাবীর আদালত ও দেয়ানত সম্বন্ধে সকলে একমত এবং গ্রহণযোগ্য হিসেবে কার সম্বন্ধে অধিক মতবিরোধ রয়েছে। যাঁর সম্বন্ধে অধিক লোক একমত, তা গ্রহণ করতে হবে।

(৪) এটাও লক্ষ্য রাখার প্রয়োজন যে, সেই সকল হাদীসের রাবীদের মধ্যে কে স্বীয় শেখের কাছ হতে অধিক বয়সে বা কম বয়সে রেওয়ায়েত গ্রহণ করেছেন। বালেগ, বুদ্ধিমান এবং উত্তম বুদ্ধিমত্তার রেওয়ায়েত হলে, তখন কম বয়সের রেওয়ায়েতের উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

(৫) দুইটি হাদীস যখন পরস্পর বিরোধী হয়, তখন এটাও দেখতে হবে যে, কোন্ রেওয়ায়েতের রাবী নিজের শেখের কাছ হতে অপর কোন মধ্যস্থতা ব্যতীত রেওয়ায়েত শ্রবণ করেছেন এবং কোন্ উপায়ে তাঁর

শেখের রেওয়ায়েত লিখিতভাবে তাঁর কাছে পৌছেছে, নাকি তিনি উস্তাদের কিতাব হতে নিজে নকল করেছেন। সকল দিক বিবেচনা করে যে রেওয়ায়েত অধিক উপযুক্ত, তাই গ্রহণ করতে হবে।

(৬) এমন দুইজন রাবী যদি হন, একজন ঘটনা নকলকারী এবং অপরজন ঘটনার সময়ে উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে যিনি ঘটনার সম্পর্কের সাথে জড়িত ছিলেন, তাঁর উপর অধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

হযরত মাইমুনার (রাঃ) বিবাহ সম্বন্ধে দুইটি রেওয়ায়েত রয়েছে। তন্মধ্যে একটি রেওয়ায়েত এ যে, হুজুর আলাইহিস সালাম এহরামের সময় হযরত মাইমুনা (রাঃ) কে বিবাহ করেছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) এর রাবী। অপর একটি রেওয়ায়েত রয়েছে যে, তখন এহরামের সময় ছিল না। এটার রাবী হলেন হযরত আবু রাফেয় (রাঃ)। এক্ষেত্রে আবু রাফেয়ের (রাঃ) রেওয়ায়েতের প্রতি অধিক গুরুত্ব এজন্য প্রদান করতে হবে যে, তিনি সেই বিবাহ সম্পাদনে মধ্যস্থ ব্যক্তি ছিলেন।

এই সম্বন্ধে অপর একটি উদাহরণ এই যে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহাকে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন যে, মৌজার উপর কিভাবে মুসেহ করতে হবে? তখন তিনি বললেন, তুমি হযরত আলীকে (রাঃ) যেয়ে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস কর; কারণ হযরত আলী (রাঃ) হুজুর আলাইহিস সালামের সঙ্গে সফরে থাকতেন।

(৭) দুই বা ততোধিক ঘটনার মধ্যে এটাও লক্ষ্য করতে হবে যে, যে ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, আমল দ্বারা তা প্রমাণ করতে পারেন।

কোন কোন সাহাবা হতে রেওয়ায়েত রয়েছে যে, বীর্যপাত হলে গোসল ফরয হয়। কিন্তু হযরত আয়েশা (রাঃ) এটার সংশোধনার্থে বলেছেন যে, স্ত্রী-লিঙ্গে পুরুষ-লিঙ্গ প্রবেশ করলেই গোসল ফরস করা হয়।

(৮) দুইটি রেওয়াতের মধ্যে একটি যদি হেজাজী এবং অপরটি ইরাকী হয়, তবে হেজাজী রেওয়ায়েতের উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহে বলেছেন যে, সনদ ও রেজাল সহ প্রত্যেক শহরের হাদীস গ্রহণযোগ্য। কিন্তু হেজাজের হাদীসের

উপর এইজন্য অধিক গুরুত্ব প্রদান করতে হবে যে, অধিকাংশ সাহাবা মদীনায় বাস করতেন। আর প্রত্যেক হাদীসের কিছু না কিছু আসল তাঁদের জানা ছিল।

(৯) এমন দুইটি রেওয়ায়েত যদি হয় যে, একটির রেওয়ায়েতকারীকে কোন দোষ মনে করেন না। কূফা ও বসরার অধিকাংশ অধিবাসী এই মতের পোষক। অপরটি রেওয়ায়েতকারীকে দোষ মনে করিয়া থাকেন। এমতাবস্থায় পরবর্তী রেওয়ায়েত অধিক গ্রহণযোগ্য।

(১০) এমন দুইটি রেওয়ায়েত যদি থেকে থাকে যে, একটির রাবী সেই শ্রেণীভুক্ত যাঁরা অর্থ অনুযায়ী রেওয়ায়েত করার পক্ষপাতী এবং অপর একটির রেওয়ায়েতকারী সেই শ্রেণীভুক্ত যাঁরা শব্দের অনুযায়ী রেওয়ায়েতকারী, তবে পরবর্তী রেওয়ায়েত অধিক গ্রহণযোগ্য।

(১১) এমন দুইটি রেওয়ায়েত যদি থেকে থাকে যে, একটি তো হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমার খেলাফতের সময় অটুটভাবে কার্যে পরিণত করা হয়েছিল। কিন্তু অপরটির বেলায় তা কার্যে পরিণত হয়নি। এমত ব্যাপারে প্রথমটির প্রতি গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

(১২) এমন দুইটি রেওয়ায়েত যদি থাকে যে, তন্মধ্যে একটি জাহেরীভাবে কোরআনের অনুযায়ী এবং অপরটি যদি তদনুরূপ না হয়, তবে প্রথমটির অনুযায়ী আমল করতে হবে।

(১৩) এমন দুইজন রাবী যদি থাকেন যে, তাঁরা একই শেখের শাগরেদ অথচ তাঁদের পৃথক পৃথক রেওয়ায়েতের মধ্যে যদি পার্থক্য দেখা যায়, তবে যে শাগরেদ শেখের সাহচর্যে অধিক থাকতেন, তাঁরা রেওয়ায়েত বা কথা অধিক তসলীম যোগ্য। নু'মান বিন রাশেদ এবং ইউনুস বিন ইয়াজীদ নামে ইমাম জহুরীর দুইজন শাগরেদ ছিলেন। ইউসুফ বিন ইয়াজীদ প্রায়ই বাড়ীতে ও ভ্রমণে শেখের সহচররূপে থাকতেন। এজন্য নু'মানের মুকাবিলায় ইউনুস বিন ইয়াজীদের রেওয়ায়েত অধিক গ্রহণযোগ্য।

(১৪) এমন যদি হয় যে, একজন রাবী মাশায়েখে কেরাম হতে রেওয়ায়েত করে থাকেন এবং অপর একজন রাবী শহরের অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের কাছ হতে রেওয়ায়েত করে থাকেন, তবে প্রথমোক্ত ব্যক্তির রেওয়ায়েত গ্রহণ করতে হবে।

(১৫) এমন যদি হয় যে, দুইটি রেওয়ায়েতের মধ্যে একটি রেওয়ায়েতে এবং অপর রেওয়ায়েতে এমন ক্ষেত্রে দ্বিতীয় রেওয়ায়েত গ্রহণযোগ্য।

(১৬) এমন দুইটি রেওয়ায়েত যদি থাকে যে, একটি রেওয়ায়েতে হুজুর আলাইহিস সালামের পবিত্র আদেশ এবং মহান আমলও থেকে থাকে; আর অপর রেওয়ায়েতেও যদি হুজুরের পবিত্র আদেশ থেকে থাকে, কিন্তু এটার উপর যদি হুজুরের আমল না থেকে থাকে, তবে প্রথম রেওয়ায়েতের গুরুত্ব দিতে হবে।

(১৭) এমন দুইটি রেওয়ায়েত যদি থাকে যে, একটির রাবী শুধু নিজ কণ্ঠস্থ শক্তির উপর নির্ভর করেই রেওয়ায়েত করেন এবং অপর রেওয়ায়েতের এমন রাবী যদি হন যে, যাঁর স্বীয় কণ্ঠস্থ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও স্বীয় কিতাবে তা লিপিবদ্ধ করে নেন এবং তারপর তা বর্ণনা করেন, তবে দ্বিতীয় রেওয়ায়েত অধিক গ্রহণযোগ্য। এ সকল হলো, বিস্তৃত উছুল। তা প্রত্যেক মুহাদ্দেসের জন্য আমলে আনবার যোগ্য। রেওয়ায়েতের গুরুত্বের ব্যাপারে নাসেখ ও মনসুখের বিতর্কও নিহিত রয়েছে। হযরত আলী কররমল্লাহু ওয়াজহাহু কোন এক স্থানে যাচ্ছিলেন। জনৈক ওয়াজী ব্যক্তি ওয়াজ করছিলেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "নাসেখ মনসুখ সম্বন্ধে আপনি অবগত রয়েছেন কি?" ওয়াজী ব্যক্তি তা অবগত নন জানলে শেরে খোদা বললেন, "আপনি নিজেও ধ্বংসপ্রাপ্ত হবেন এবং অপরকেও ধ্বংস করবেন।"

(৮) হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা বলেন, "আমরা আবিসিনিয়ায় হিজরত করার পূর্বে যখন মক্কা শরীফে ছিলাম তখন হুজুর আলাইহিস সালাম নামাযে থাকাকালীনই আমরা তাঁকে সালাম করতাম। তিনিও সালামের জবাব দিতেন। আমরা আবিসিনিয়া হতে ফিরে এসে হুজুর আলাইহিস সালামকে সালাম করলাম তখন হুজুর আলাইহিস সালাম-এর জবাব দেন নেই। তিনি নামায হতে অবসর হয়ে এরশাদ ফরমাইলেন, 'নামাযের অবস্থায় কথা বলতে খোদা নিষেধ করেছেন।"

মুর্খযুগে মুতার (অস্থায়ী বিবাহ) প্রচলন ছিল। তা মদীনায়ও প্রচলিত ছিল। খায়বর জয়ের পর হুজুর আলাইহিস সালাম মুতা হারাম বলে অভিমত প্রকাশ করেন। খায়বর জয়ের সময় জনসাধারণ সমুপস্থিত না থাকায় তাকীদস্বরূপ মক্কা

বিজয়ের দিবস জনসাধারণের মধ্যে তা আবার ঘোষণা করে দেয়া হয়। আর এটাও ঘোষণা করে দেয়া হয় যে, আজ হতে কেয়ামত অবধি মুতা হারাম করে দেয়া হলো।

আল্লামা কাসেম রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহে বলেন, "হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনুহু হতে এই মর্মে একটি রেওয়ায়েত রয়েছে যে, মুতা অকাট্যভাবে হারাম করা হয়নি। প্রকট প্রয়োজনের সময় তা মুবাহ ছিল। কিন্তু হযরত আলী কররমল্লাহু ওয়াজহাহুর রেওয়ায়েত শুনবার পর হতে তিনি স্বীয় মত পরিবর্তন করেন।

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে রেওয়ায়েত আছে যে, হুজুর আলাইহিস সালাম বলেছেন যে, অগ্নিতে রন্ধন করা বস্তু হতে ওজু কর। এ রেওয়ায়েত মনসুখ হয়ে গিয়েছে। এটা মনসুখ হওয়া সম্বন্ধে খোলাফায়ে রাশেদীন, তাবেয়ীন এবং সকল মুহাদ্দেস একমত। আল্লামা ইবনে জুজী একটি রেওয়ায়েত পেশ করেছেন। তা এই ঃ 'আকরাশ (রাঃ) হুজুর আলাইহিস সালামের সাথে এক পেয়ালায় সরাব ভক্ষণ করেন। ভক্ষণের পর পানি আনয়ন করা হলো। হুজুর স্বীয় হাত মুখ ধৌত করলেন। তারপর চেহারা মুছে বললেন। আকরাশ, এটা অগ্নিতে রন্ধন করা বস্তুর অজু।" অর্থাৎ হাত ধৌত করা, কুলি করা এবং কোন কাপড় দ্বারা মুখ মুসেহ করা যথেষ্ট।

সুলাইমান বিন বরীদাহ তাঁর আম্মা হযরত রবীদাহ (রাঃ) হতে রেওয়ায়েত করেছেন যে, হুজুর আলাইহিস সালাম বলেছেন, 'আমি তোমাদেরকে কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করেছেন। তথাপি তোমরা কেন জিয়ারত করে থাক?"

আবু বকর হাজমী বলেন, "এ রেওয়ায়েত দ্বারা শুধু পুরুষদেরকে অনুমতি দান করা হয়েছে। স্ত্রীলোকদের জন্য আবু হুরাইরার (রাঃ) রেওয়ায়েত রয়েছে যে, যে সকল স্ত্রীলোক কবর জিয়ারত করবে, তাদের উপর খোদার লানত।"

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে রেওয়ায়েত রয়েছে, হুজুর আলাইহিস সালাম বলেছেন, "প্রত্যেক বালেগ ব্যক্তির উপর জুমার গোসল ওয়াজিব।"

এ ওয়াজিব হওয়ার আদেশ মনসুখ হয়ে গিয়েছে। নাসেখ এ যে, হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন 'জুমার গোসল ওয়াজিব কিনা।' তিনি বললেন 'তা ওয়াজিব নয়।' জুমার দিনের গোসল এই জন্য ওয়াজিব হয়েছিল যে, প্রাথমিক যুগে সাহাবাগণ সম্পদশালী ছিলেন না। তাঁরা মুজদী করে খেতেন। আর কম্বল পরিধান করতেন। মসজিদ

ছিল সংকীর্ণ এবং ছোটখাট। একদিন গরমের দিনে হুজুর আলাইহিস সালাম জুমার নামাযের জন্য আগমন করেন। লোকেরা ঘর্মাক্ত কলেবর ছিলেন। আর সেই গন্ধে প্রত্যেক মুসল্লির কষ্ট হচ্ছিল। হযরত আদেশ করলেন যে, জুমার দিন গোসল করবে এবং সুগন্ধি ব্যবহার করবে।

কিন্তু এখন খোদার ফজলে মুসলমানদের অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। এখন তাঁরা আর গন্ধযুক্ত কাপড় পরিধান করেন না; আর তাঁদেরকে পূর্বের ন্যায় মজুরী করতে হয় না। মসজিদসমূহও সুপ্রশস্ত করা হয়েছে। এখন আর তাঁদেরকে ঘর্মাক্ত কলেবর হতে হয় না। কাজেই কাউকেও আর দুর্গন্ধ সহ্য করতে হয় না।

হযরত ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহে 'কিতাবুল উম্মে' লিখেছেন, "আমি এটা পছন্দ করি যে, লোকেরা জুমার দিবস গোসল করবে, চুল কাটবে, নখ ছোট করবে। আর তাদের শরীরকে সর্বপ্রকার ময়লামুক্ত করবে। মেসওয়াক করে সুগন্ধ ব্যবহার করবে। সাধ্যানুযায়ী উত্তম পোষাক পরিধান করবে। আর এ সকল সুন্নত হিসেবেই পালন করতে হবে। আর তার নিজের কোন অপরিষ্কার এ জন্য অপরিছন্নতার জন্য অপর কারও যেন বিন্দু পরিমাণ অসুবিধাও না হয়। ঈদের দিন, প্রতি ওয়াক্তের নামাযের জমাআত এবং যেখানে মুসলমানমণ একত্রে সমবেত হয়, সেই সকল প্রত্যেক স্থানের নিমিত্ত সেই একই কথা খাটে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন যে, প্রাথমিক অবস্থায় হুজুর আলাইহিস সালাম আশুরার রোযা রাখতেন। আর লোকদেরও তখন রোযা রাখতে আদেশ দিতেন। কিন্তু রমজানের রোযা যখন ফরয হয়ে গেল, তখন আশুরার রোযা স্থগিত হয়ে গেল। এটা প্রত্যেকের ইচ্ছার উপর নির্ভর করত। যাঁরা ইচ্ছা রাখতেন, যার ইচ্ছা ছেড়ে দিতেন।

হাদীসের জাহেরী অর্থ সম্বন্ধে দুইটি কথা

সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে– 'শেষ রাত্রিতে যখন রাত্রের তিন ভাগের একভাগ অবশিষ্ট থাকে, তখন মহীয়ান গরিয়ান আল্লাহ্ দুনিয়ার আসমানে অবতীর্ণ হয়ে বলেন, 'এমন কে আছে যে, আমাকে ডাকবে, আর আমি তাকে জবাব দিব, আমার কাছে কোন কিছু চাইবে, আর আমি তাকে দান করিব, আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, অনন্তর আমি তাকে ক্ষমা করবো।'

এ রেওয়ায়েত শব্দ দ্বারা এই সন্দেহ আসে যে, খোদা তো শরীর হতে পাক পবিত্র। এমতাবস্থায় তাঁর পক্ষে উপর হতে নীচে নামা এবং নড়াচড়া করা কিরূপে সম্ভবপর হতে পারে?

আরববাসী শব্দ দ্বারা কি কি বিভিন্ন অর্থ বুঝে, তা ইমাম শাফেয়ী সাহেব বিস্তৃতভাবে বুঝায়েছেন। তিনি বলেন যে, আরববাসী উক্ত শব্দ পাঁচটি অর্থ বুঝে থাকে।

(১) নড়াচড়া করা। আল্লাহ্ বলেন, 'আমি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করেছি।'

(২) খবরদার করা। আল্লাহ্ বলেন, 'অর্থাৎ রুহুল আমীন তাকে জানায়ে দিল।'

(৩) বলা।' খোদা যেমন বলেছেন, আমিও তাই বলছি।'

(৪) কোন কিছুর দিকে তাওয়াজ্জু করা। এই পরিভাষা আরবে প্রতিরোজ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তারা বলে থাকে, 'অমুক ব্যক্তি সৎস্বভাব পরিত্যাগ করে মন্দ স্বভাব গ্রহণ করেছে।' বা তারা বলে থাকে 'অমুকের পতন হয়েছে।'

(৫) আদেশ ও আইন জারী হওয়া। আরববাসী বলে থাকে–'তার আদেশ ও আইন জারী না হওয়া পর্যন্ত আমরা আরাম আয়াসে ছিলাম।'

এ জন্য হাদীসের উদ্দেশ্য এ যে, মহীয়ান, গরিয়ান এবং বেপরোয় খোদার তো এটাই শোভা পায় যে, তিনি কোন সৃষ্ট বন্দার দিকে তাওয়াজ্জু করবেন না। কিন্তু এটা রহম ও করম যে, তিনি সহৃদয়তা প্রদর্শন করেছেন।

হাদীস শরীফে আছে–'হুজুরের সম্মুখে এক ব্যক্তির উল্লেখ হলো যে, সেই ব্যক্তি সুবেহ সাদেক পর্যন্ত শুয়েছিল এবং নামাযের জন্য উঠে নাই। হযরত (সাঃ) বলেছেন যে, শয়তান তার কানে প্রস্রাব করে দিয়েছে।' এখানে পেশাব করে দেওয়ার অর্থ বিনষ্ট করে দেওয়া। আরবে কোন কিছুকে খারাব করে দেওয়ার অর্থে 'পেশাব করে দেওয়া' ব্যবহার হয়ে থাকে।

উপকার লাভ ও অনিষ্ট হতে রক্ষা

উপকার লাভের চেয়ে অনিষ্ট হতে রেহাই পাওয়া উৎকৃষ্ট। অর্থাৎ কোন কোন একটি কাজে যদি উপকার ও অপকার উভয় থেকে থাকে, তবে অপকার হতে বেঁচে থাকা সবচেয়ে উত্তম।

হযরত তলকা বিন আলী (রাঃ) হতে রেওয়ায়েত রয়েছে যে, এক ব্যক্তি আরজ করিল, 'হে আল্লাহর রাসূল, কোন ব্যক্তি যখন লজ্জাস্থানে হাত লাগায় তবে কি তার ওজু করতে হবে?' তিনি বললেন, 'না' এটা তো তোমার শরীরের

একটি অংশ (আবু দাউদ, তিরমিযী, নেছায়ী, ইবনে মাজা, ইমাম আহম্মদ এবং দার কুৎনীএটা রেওয়ায়েত করেছেন)।

ইমাম আবু হানীফা, ইমাম সুফিয়ান সওরী, এবং হযরত হাসন বছরী (রাঃ) ইত্যাদি আরও অনেকে উক্ত মতের সমর্থক।

ইবনে হাইয়ান, তেহরানী, ইবনে আরবী এবং হাজমী এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, এ রেওয়ায়েত মনসুখ। এটার একটি কারণ এই যে, তলকা বিন আলী (রাঃ) স্বয়ং এটার বিপরীত এক রেওয়ায়েত করেছেন যে, লজ্জাস্থানে হাত লাগালে অজু ভেঙ্গে যায়। এ রেওয়ায়েতকে তিবরানী সহীহ বলে রেওয়ায়েত করেছেন।

হযতর বসরা বিন সফওয়ান করেছেন, হুজুর আলাইহিস সালাম বলেছেন যে, "কোন ব্যক্তি যদি লজ্জাস্থানে হাত লাগায়, তবে তার ওজু করা আবশ্যক।" ইমাম মালেক মুয়াত্তা কিতাবে এবং ইমাম শাফেয়ী কিতাবুল উম্মে এই রেওয়ায়েত লিপিবদ্ধ করেছেন। ইমাম আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নেছায়ী, ইবনে মাজা ইবনে হাজীমা, ইবনে হায়ান এবং ইমাম হাকেম এটা রেওয়ায়েত করেছেন। ইমাম তিরমিযী বলতেন যে, ইমাম বোখারী বলেছেন, এই রেওয়ায়েত অত্যন্ত সহী।"

হাফেজ ইবনে হাজর আসকলানী বলেছেন, "এ রেওয়ায়েত হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্ বিন ওমর (রাঃ), হযরত আবু হুরাইবা (রাঃ), হযরত আনাস বিন কায়াব (রাঃ), আবদুল্লাহ্ বিন ওমর (রাঃ), জাইদ বিন খালেদ (রাঃ), সাদ বিন আবী ওক্কাস (রাঃ), আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাঃ), আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ), আলী বিন তলকা (রাঃ), আ'মান বিন বশীর (রাঃ), হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ). হযরত উম্মেসলমা (রাঃ) এবং হযরত উম্মে হাবিবা (রাঃ)ও এটা রেওয়ায়েত করেছেন।"

হযরত ওমর (রা), হযরত আবদুল্লাহ্ বিন ওমর (রাঃ), হযরত সাদ বিন আবী ওক্কাস (রাঃ), ইমাম আতা, ইমাম মুহাম্মদ, ইবনে শেহাব জহুরী, হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়েব, ইমাম জাহেদ, সুলায়মান বিন ইয়াসের, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহম্মদ না হাম্বল এবং ইমাম ইসহাক বিন রাহুবীয়া রাহতুল্লাহে আলাইহিমের মত এ লজ্জাস্থানে হাত লাগালে ওজু ভেঙ্গে যায়।

মাসআলার হাকীকত সম্বন্ধে তলায়ে দেখলে বুঝা যায় যে, হুজুর আলাইহিস সালামের এরশাদ রয়েছে, "তোমরা প্রভাতে উঠে তোমাদের হাত কোন পাত্রে

লাগিও না। কেননা, শয়নকালে তোমরা জান না যে, তোমাদের হাত কিসে কিসে লেগেছে। এজন্য প্রথমেই তোমাদের হাত ধুয়ে নেয়া উচিত।"

এ হাদীস একটি সূক্ষ্ম ইশারা রয়েছে যে, হতে পারে শয়নকালে মানুষের হাত লজ্জাস্থানে লেগে থাকবে। কাজেই এটা একান্তই বাঞ্ছনীয় যে, নিদ্রা হতে উঠে হাত ধৌত করে নিবে। তার পূর্বে কোন কিছুতে হাত লাগাবে না।

এখন তর্ক রইল লজ্জাস্থানে হাত লাগলে ওজু ভেঙ্গে যাওয়ার কারণ কি?

হযরত আয়েশা (রাঃ) ও উম্মেহাবীবা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেছেন যে, স্ত্রীলোক যদি স্বীয় লজ্জাস্থানে হাত লাগায়ে নেয়, তবে ওজু করবে। সাহাবা কেরামদের সাধারণ অভ্যাস এবং বিশেষভাবে হযরত ওমরের (রাঃ) মত মহামহিম ব্যক্তিও ওজু করা ইচ্ছাধীন বলেছেন। মদীনার শ্রেষ্ঠ তাবেয়ীন সম্প্রদায় উক্ত মত পোষণ করেন। আর হাদীসের ইমামগণ প্রায় সকলেই শ্রেষ্ঠ তাবেয়ীন সম্প্রদায় উক্ত মত পোষণ করেন। আর হাদীসের ইমামগণ প্রায় সকলেই উক্ত মতের সমর্থক। এজন্য কোন কোন মোহাদ্দেস এ সিদ্ধান্তে পৌছলেন যে, শেষ রেওয়ায়েত নাসেখ, আর প্রথমটি মনসুখ। কেউ কেউ এটার বিপরীত মতও পোষণ করেন।

মওলানা আবদুল হাই সাহেব বলেন, ন্যায়ের চোখে দেখতে গেলে, এ রেওয়ায়েতের মধ্যে কোনটি মনসুখ, তা বলা কঠিন। তবে উসুলের নিকটবর্তী এ যে, তলকা (রাঃ) যে হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন, তা মনসুখ হয়ে গিয়েছে।

প্রকৃত সত্য এ যে, হযরত ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহের উসূল অনুযায়ী যদি বিবেচনা করা হয়, তবে মাসআলা পরিষ্কার হয়ে যাবে। তিনি বলেছেন, "উপকার লাভ করা অপেক্ষা অনিষ্ট হতে রক্ষা পাওয়া উৎকৃষ্ট।" সহীহ হাদীস রয়েছে যে, ওজু ব্যতীত নামায দুরস্ত হতে পারে না। জাহেরীভাবে বিচার করলে বুঝা যায় যে, তলকা বিন আলীর (রাঃ) রেওয়ায়েত অনুযায়ী ওজু না করার পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে। অপর রেওয়ায়েতটি ওজুর পক্ষপাতী। এ সম্বন্ধে বিপুলসংখ্যক সাহাবা, আজওয়াজে মুতাহ্হেরাত, তাবেয়ীন এবং হাদীসের ইমামগণ একমত। কাজেই উপকার লাভ না করে অনিষ্ট হতে বাঁচবার নিমিত্ত ওজু করা উৎকৃষ্ট।

হযরত ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহে 'কিতাবুল উম্মে' স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে, যখন কোন ব্যক্তি স্বীয় হস্তের তালুর দিক দিয়া লজ্জাস্থানে

হাত লাগায় এবং হাতের মধ্যে যদি কোন কাপড় না থাকে, তবে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে হাত লাগলেই ওজু করতে হবে।

তিনি বলেন, "কোন ব্যক্তি যদি স্বীয় মলদ্বার বা নিজ স্ত্রীর লজ্জাস্থান বা মলদ্বার বা কোন ছেলের লজ্জাস্থানে হাত লাগায়, তাকে ওজু করতে হবে। (কেননা, মলদ্বারে হাত লাগলে ওজু করার নিমিত্ত সহীহ রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে।) কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি লজ্জাস্থান ব্যতীত অপর কোন জায়গায় হাত লাগায়, তবে তাকে ওজু করতে হবে না। আর লজ্জাস্থানও যদি হাতের তালু ব্যতীত অন্য কোন অংগ এমনকি হাতের পশ্চাৎভাগ লাগায়, তবে ওজু করতে হবে না।

কোরবাণীর মাসআলা

ইবনে মাজা (মতবুয়া আহসানুল মুতাবেয়) কিতাবে রেওয়ায়েত করেছেন– "হযরত আবু হুরাইয়া (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন," কোন ব্যক্তির যদি সমর্থ থেকে থাকে অথচ সে যদি কোরআনী না করে, তেমন ব্যক্তি যেন আমার ঈদগাহ বা নামায পড়বার স্থানে না আসে।

এ রেওয়ায়েত দ্বারা আহ্নাফ দলীল পেশ করেছেন যে, কোরবাণী ওয়াজিব। অর্থাৎ প্রত্যেক স্বাধীন স্থায়ী বাসিন্দা মুসলিম সামর্থ ব্যক্তির উপর কোরবাণীর দিন কোরবাণী করা ওয়াজিব। সেই ব্যক্তি স্বীয় ছোট সন্তানের তরফ হতেও কোরবাণী করবে। ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম শাফেয়ী এটাকে সুন্নত বলে সাব্যস্ত করেছেন।

এ সকল রেওয়ায়েতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহে বলেন, "আমরা যদি কোরবাণীকে ওয়াজিব ধারণা করতাম, তবে এক ঘরের বাসিন্দাদের তরফ হতে একটি বকরী জবেহ করা হতো না। বরং প্রত্যেক লোকের জন্য একটি বকরী কোরবাণী করতাম।" অতঃপর তিনি বলেন, "এটা অপরিহার্য নয় যে, মানুষ নিজে বা নিজের সন্তান বা বিবির তরফ হতে কোরবাণী করবে। এটার কারণ এ, আমরা এ রেওয়ায়েত পেয়েছি যে, হযরত আবুবকর ও ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা এই সম্ভাবনার আশঙ্কায় কোরবাণী করতেন না যে, লোকেরা তাঁদেরকে অনুকরণ করতে থাকবে এবং কোরবাণী করা ওয়াজিব মনে করবে।

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাঃ) স্বীয় বন্ধু-বান্ধবের সাথে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি কোন একজন লোককে দুই দেরহাম সহ বাজারে গোস্ত খরিদ করে

আনলেন। তিনি তারপর বললেন, "এটাই ইবেন আব্বাসের (রাঃ) কোরবাণী।" অথচ তিনি স্থায়ীভাবেই মক্কা শরীফে অবস্থান করতেন। মক্কা ও মিনাতে কোরবাণী করা হতো। হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমরের (রাঃ) আদর্শ অনুসরণ করাই তাঁর প্রধানতম উদ্দেশ্য ছিল।

ইমাম শাফেয়ী বলেন, "এ জন্য কোরবাণী সুন্নত এবং এটা পরিত্যাগ করা আমি পছন্দ করি না।"

হেদায়া কিতাবের গ্রন্থকার হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) সফরে ছিলেন বলে কোরবাণী করেননি, এ মত পোষণ করেছেন।

এটার জবাবস্বরূপ হাফেজ ইবনে হাজর রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহে বলেছেন, "তাঁর সফরের অবস্থায় তা করেছেন, এমন রেওয়ায়েত আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই বরং সহী সনদসহ তাঁদের পক্ষ হতে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, লোকেরা কোরবাণী করাকে ওয়াজিব মনে করবে, এই আশংকায় তাঁরা কোরবাণী করেননি। হাফেজ ইবনে হাজর বলেন, "হযরত আবু মাসউদ বদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আমি আপনাদের মধ্যে সংগতি সম্পন্ন লোক হওয়া সত্ত্বেও এ জন্য কোরবাণী করি না যে, লোকেরা এটাকে অকাট্যভাবে ওয়াজিবে পরিগণিত করবে।"

ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম তিরমিযী সহী সনদসহ রেওয়ায়েত করেছেন, 'আত্তার বিন ইয়াসের বলেছেন, "আমরা হযরতের (সাঃ) জমানায় আমাদের নিজের এবং পরিবারস্থ লোকের পক্ষ হতে শুধু একটি বকরী কোরবাণী করতাম কিন্তু লোকেরা তো আজকাল গৌরবজনক মনে করে প্রত্যেকের তরফ হতে এক একটি কোরবাণী করতে আরম্ভ করেছে।"

কাজী সরকানী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহে বলেন, "যে সকল সাহাবা অধিকাংশ আলেম ও একমত। ইমাম নূরী বলেন, "সাহাবাদের মধ্যে হযরত আবু বকর, হযরত ওমর, হযরত বিলাল এবং হযরত আবু মাসউদ বদরী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম, তাবেয়ীনদের মধ্যে হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়েব, আলকমা এবং আসওয়াদ। ইমামদের মধ্যে ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ, ইমাম ইউসুফ, ইমাম ইসহাক, মাজনী, ইমাম দাউদ এবং ইমাম শাফেয়ী উক্ত মতের সমর্থক। শুধু হযরত রবীয়া, ইমাম আওজায়ী ও ইমাম আবু হানীফা কোরবাণী করা ওয়াজিব বলে সাব্যস্ত করেছেন।"

ইমাম বিন হাজম বলেন, "সাহাবাদের মধ্য হতে কারও কাছ হতে এটা প্রমাণিত হয় না যে, কোরবাণী ওয়াজিব। বরং অধিকাংশ সাহাবা এটাকে সুন্নত বলে বিবেচনা করেছেন।"

আবু হুরাইরার (রাঃ) রেওয়ায়েত

কোরবাণী ওয়াজিব হওয়া সম্বন্ধে শুধু হযরত আবু হুরাইরার (রাঃ) একটি রেওয়ায়েত রয়েছে। এ সম্বন্ধে মুহাদ্দেসীন তাঁদের অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, এ রেওয়ায়েত মওকুফ (স্থগিত) হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ এটা হযরত আবু হুরাইরার (রাঃ) কথা এবং এটা হুজুর আলাইহিস সালামের এরশাদ নয়। এটার বিপরীত বহু রেওয়ায়েত পেশ করা হয়েছে। হযরত আবু হুরাইরার (রাঃ) রেওয়ায়েত মওকুফ বলেই অনেকে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

হুজুর আলাইহিস সালাম এ কথার উপর জোর দেয়ার জন্য বলেছেন যে, কারও যদি সামর্থ থেকে থাকে এবং সেই ব্যক্তি যদি কোরবাণী না করে, তবে সেই ব্যক্তি যেন আমার মুসল্লার কাছে না আসে। এখানে মুসল্লা শব্দ দ্বারা যদি ঈদগাহ বুঝান হয়ে থাকে, তবে এটা সুস্পষ্ট যে কোরবাণী নামাযের পরই হয়ে থাকে। আর নামাযের পূর্বে কে কোরবাণী করল বা করল না তা প্রকাশ হবার কোন উপায় থাকে না। আর মুসল্লা শব্দ দ্বারা যদি মসজিদে নববীতে উপস্থিতি বুঝায়ে থাকে, তবে তাও হতে পারে না। হাকীকত এ যে, এটা সুন্নাত ইব্রাহীমী। এটা চিরজীবি রাখা বাঞ্ছনীয়।

হজ্ব সম্বন্ধে ইমাম শাফেয়ীর দলীল

ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহে 'কিতাবুল উম্মে' কোরআন মজীদ হতে হজ্ব সম্পর্কে অতি সূক্ষ্ম কয়েকটি দলীল পেশ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, হজ্ব প্রথাতে মুসলমানদের জন্য অসংখ্য উপকার রয়েছে।

(১) মক্কাশরীফ অদ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থান। এ বিশ্ববুকের প্রতি প্রান্ত হতে মক্কাশরীফে হাজীগণ হজ্ব ও ওমরা করে থাকেন। কাজেই লোক-সমাগমের আমদানী মক্কাবাসীবৃন্দ উপভোগ করে থাকেন। আর সেখানে অসংখ্য লোকে কোরবাণী করে থাকে। হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের দো'আ কবুল হওয়ার কল্যাণেই এটা হয়েছে। দুনিয়া যতদিন পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে, ততদিন পর্যন্ত এটা কায়েম থাকবে। তিনি দো'য়া করেছিলেন–"হে আমাদের প্রতিপালক, আমি সন্তানকে শস্যহীন ময়দানে অবস্থিতির জন্য রেখে এসেছি, তোমার সম্মানিত ঘরের কাছে। হে আমাদের প্রতিপালক, যেন তারা নামায কায়েম রাখে; অনন্তর তুমি মানুষের অন্তরকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করে দাও এবং ফলদ্বারা তাদেরকে রিজিক দাও যেন তারা কৃতজ্ঞ হতে পারে।"

(২) হজ্বের মৌসুমে বহু হেজাজবাসী নিজ নিজ ব্যবসার দ্রব্য সঙ্গে আনয়ন করে এবং এ সকল বেচা-কেনা হয়ে থাকে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির জানমাল হেরম শরীফে সুরক্ষিত থাকে, এজন্য এ বিশ্বচরাচরের মুসলিম জনসাধারণ তাতে উপকৃত হয়ে থাকে। পাক কালামেও এ সম্বন্ধে ইশারা রয়েছে–"যেন নিজ নিজ উপকার লাভ করতে পারে।"

(৩) মুসলমানদের সাধারণ সম্মেলন, পরস্পরের পরিচয়, একতা ও এবাদত পন্থা, ভাষা-সুত্র, এবং এক কেবলা-ভক্ত হওয়ার উপকার সমগ্র মুসলমান ভোগ করে থাকে। তাতে প্রত্যেক মানুষের এলমী, দীনী ও পার্থিব প্রয়োজন মিটাবার সুযোগ ঘটায়ে থাকে।

তদুপরি জেলহজ্জ মাসের দশ তারিখ ঈদের দিন, যা কোরবাণীর নিমিত্ত নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং যা সুন্নতে ইব্রাহীমীর স্মরণকারী। এমন পবিত্র সুন্নতকে চির জীবিত রাখবার সর্বপ্রকার সহজ সরল পন্থার বন্দোবস্ত রাখা হয়েছে। কিন্তু আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে, এটা যেন কারও পক্ষে অযথা গৌরবের উৎসে পরিণত না হয়। হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত ওমর (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাঃ) এবং অপরাপর আনসার তার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতেন।

এই সঙ্কট মাসআলার ওয়াজিব হওয়া সম্বন্ধে বহুকিছু মতবিরোধ ঘটেছে। অনেকে এজন্য বেপরোয়াভাবে বা প্রয়োজন ব্যতীতও ওয়াজিব বিবেচনা করে কয়েকটি কোরবাণী করে থাকে। অথচ কোরআন শরীফে পরিষ্কার বলা হয়েছে–অর্থাৎ তোমাদেরকে যদি বাধা প্রদান করা হয়, তবে তোমাদের মধ্যে যাদের পক্ষে কোরবাণী করা সহজ সরল তারা যেন কোরবাণী করে।"

কোরআন পাকে অন্যত্রও বলা হয়েছে– 'অর্থাৎ খোদার কাছে কোরবাণীর গোস্ত ও রক্ত পৌঁছে না এবং তোমাদের অন্তরের পরহেজগারী তাঁর কাছে পৌঁছে।'

হাদীস দ্বারা কোরআন নাসেখ হতে পারে না

ইমাম শাফেয়ী বলেন যে, হুজুর আলাইহিস সালাম খোদাতালার আদেশসমূহ পালনকারী ছিলেন। আর সেই আদেশসমূহ মৌখিকভাবে বা আমল দ্বারা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করার অধিকার হযরতকে প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু তাঁর কোন হুকুম বা কাজ কোরআনের খেলাফ হতে পারে না। কাজেই কোন ব্যক্তি যদি দাবী করে যে, হাদীস দ্বারা কোরআন নাসেখ হয়ে যায়, তবে তার দাবী ভিত্তিহীন।

এ সম্বন্ধে হুজুর আলাইহিস সালাম বলেছেন, "তোমরা শুন, শীঘ্রই আমার কাছ হতে রেওয়ায়েত করা হবে আর তা প্রচারিত হবে। এজন্য স্মরণ রাখবে যে, আমার যে হাদীস কোরআন মোতাবেক হবে তা তো আমার কালাম। আর যা কোরআনের খেলাফ হবে, তা নিশ্চয়ই আমার কালাম নয়।"

মাসআর বিন কেমার (রাঃ) ও হাসান বিন আম্মার (রাঃ) ওমর বিন মাররা (রাঃ) হতে তিনি বখতরী (রাঃ) হতে এবং তিনি হযরত আলী কররমল্লাহু ওয়াজহাহু হতে রেওয়ায়েত করেছেন যে, তিনি বলেছেন "তোমাদের কাছ হতে যখন আল্লাহর রাসূলের কোন হাদীস পৌছবে, তখন তোমরা সেই সম্বন্ধে গভীর চিন্তা করে দেখবে যে, তা বহু হেদায়তকারী, অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং হৃদয়কে পরম সজীবকারী কিনা। তা যদি উক্ত সমূহ গুণ সম্বলিত হয়ে থাকে, তবে তোমরা দৃঢ় বিশ্বাস রাখবে যে, তা হুজুর আলাইহিস সালামের ফরমান।"

আশয়াস বিন সাওয়ার ও ইসমাঈল বিন খালেদ ইমাম শায়বী এবং তিনি কুর্জা বি কায়াব আনসারী (রাঃ) হতে রেওয়ায়েত করেছেন, "আমরা আনসার দল যখন কূফার উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে লাগলাম, তখন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু পদব্রজে আমাদের সহচর হলেন। তিনি জনপদ অতিক্রম করে এসে বললেন, "আচ্ছা বলুন তো, আমি কেন এতদূর পর্যন্ত পদব্রজে এসেছি?" তখন আমাদের দলপতি বললেন, "আপনি আমাদের প্রতি হামদরদি প্রদর্শন মানসেই এতদূর পর্যন্ত এসেছেন।" তিনি বললেন, "আপনাদের সাথে এতটুকু আসা আমার জন্য আবশ্যক ছিল। কিন্তু এখন আমার বক্তব্য এ যে, আপনারা এখন এক কওমের কাছে যাচ্ছেন যারা অধিক পরিমাণে কোরআন পাঠ করে থাকে। কাজেই আপনারা তাদের কাছে কম রেওয়ায়েত করবেন।" কুর্জা (রাঃ) বললেন, "আমি আর কখনও হুজুর আলাইহিস সালামের হাদীস বর্ণনা করব না।"

ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহে বলেছেন, "এটা বিশেষ লক্ষ্য রাখবার বিষয় যে, রেওয়ায়েত বহু বেড়ে গেছে। কাজেই ঐ সকল হাদীস গ্রহণযোগ্য, যে সম্বন্ধে এক জমায়াত একমত এবং তা কোরআনে করীমের মুতাবেক।"

ইমাম শাফেয়ী সাহেব বলেছেন, "বিশ্বস্ত লোকের বর্ণনা এ যে, হুজুর আলাইহিস সালাম মৃত্যু-শয্যায় থেকে আদেশ করেছেন, "কোরআন ও মশহুর রেওয়ায়েত আমল করবে।"

ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহ্ বলেন, "মুহাদ্দেস ও ফকীহ যদি অন্তর দিয়ে চিন্তা করেন এবং তাঁরা যদি হুজুর আলাইহিস সালামের নুবুওত হতে আরম্ভ

করে হযরতের (সাঃ) ইন্তেকাল পর্যন্ত কোরাইশদের সহীহ ঘটনাবলী সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল থাকেন এবং তদুপরি কোরআন নাযিলের আদি অন্ত অবগত থাকেন, তখন আল্লাহ তায়ালার তরফ হতে তাঁদের অন্তরে একপ্রকার আলোক পয়দা হয়।"

প্রত্যেক নিয়মেরই ব্যতিক্রম রয়েছে ঃ

ইমাম শাফেয়ী বলেন, "হক-তায়ালার তরফ হতে কতকগুলো নির্দিষ্ট ফরয রয়েছে। তন্মধ্যে কতক ব্যতিক্রমও রয়েছে। আহকামে নববীতেও একই নিয়ম রয়েছে। নামায সকলের জন্য ফরয। কিন্তু নাবালেগ ব্যক্তি, হায়েজা স্ত্রীলোক, পাগল, মুসাফের, শেখে ফানী এবং পীড়িত ব্যক্তি, এই নিয়মের বিপরীত।"

এবাদত ব্যতীত ও অপর কয়েকটি ব্যাপারে ব্যতিক্রম রয়েছে। ফকীহ ও মোহাদ্দেসের জন্য এ সকল বিষয়ের এলম অপরিহার্য। পাক কোরআনে বলা হয়েছে ঃ 'হে মুহাম্মদ (সাঃ) বলে দাও যে, আমাকে যা আদেশ করা হয়েছে, তন্মধ্যে কখনও আহার্য বস্তুর মধ্যে কোন কিছু হারাম করা হয়নি। কিন্তু মৃত বা প্রবাহিত রক্ত বা শুকরের গোস্ত ব্যতীত; কেননা এটা নাপাক অথবা সেই পাপ-বস্তু যাতে খোদা ব্যতীত অপর কারও নাম নেয়া হয়েছে; কিন্তু যে ব্যক্তি বাধ্য হয় এই শর্তের সাথে যে, সেই ব্যক্তি নাফরমান এবং সীমাতিক্রমকারী না হয়; অনন্তর তোমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল, করুণাময়।'

'মুসতাদরক হাকীম' কিতাবে হযরত আম্মার বিন ইয়াসারের (রাঃ) এক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। একদিন অংশীবাদীরা তাঁকে পানিতে এমনভাবে চেপে ধরেছিল যে, তিনি অচেতন হয়ে পড়লেন। তখন সেই নরপশুর দল তাদের ইচ্ছামত কথা তাঁকে মৌখিকভাবে স্বীকার করায়ে নিল। তারপর তাঁকে ছেড়ে দিল।

তাঁর এ অনিচ্ছাকৃত কাজের জন্য তিনি বিশেষভাবে মর্মপীড়িত হয়ে উঠলেন। অতঃপর তিনি হযরতের (সাঃ) দরবারে উপস্থিত হলেন। তখন অঝোর নয়নে তাঁর অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। হুজুর আলাইহিস সালাম বললেন, "আম্মার ব্যাপার কি?" তিনি বললেন, "বড় খারাপ সংবাদ। আপনার সম্বন্ধে মন্দকথা বলায় এবং তাদের উপাস্য সম্বন্ধে উত্তম কথা বলায় আমি আজ রেহাই পেয়েছি।" হুজুর বললেন, "তোমার অন্তরের অবস্থা বল।" তিনি আরজ করলেন, "আমার অন্তর ঈমানের সাথে প্রশান্ত রয়েছে।"

হুজুর আলাইহিস সালাম অপরিসীম স্নেহের সাথে তাঁর অশ্রু মুছে বললেন, "তোমরা কোন সঙ্কট নেই। পুনঃ যদি এমন ঘটনা ঘটে, তখন তাই করতে

হবে।" তারপর কোরআনের নিম্নলিখিত আয়াত নাযিল হয়–'অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঈমান আনবার পর খোদাকে অস্বীকার করে, কিন্তু সে যদি অপরাগ হয়ে থাকে এবং তার অন্তর ঈমানের সাথে শান্ত থাকে, তবে তজ্জন্য ধরপাকড় করা হবে না।'

সহী হাদীস ও সাহাবাদের বাণী

সাহাবাদের বাণী সঙ্কলিত হওয়ার পর দেখা গেল যে, তাঁদের কোন কোন বাণী সহী হাদীসেরও খেলাফ। এজন্য ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহে এ সিদ্ধন্তে উপনীত হলেন যে, সহী হাদীসের মুকাবিলায় সাহাবাদের বাণীসমূহের কোন গুরুত্ব থাকতে পারে না। তদুপরি তিনি এটাও বলেছেন যে, তাঁরাও মানুষ ছিলেন আর আমরাও মানুষ।

তাঁর উদ্দেশ্য স্পষ্ট যে, সাহাবাদের বাণী যখন সহী হাদীসের খেলাফ হবে, তেমন ক্ষেত্রে সহী হাদীসের উপর আমল করতে হবে। এটা নিঃসন্দেহ যে, সমগ্র সাহাবা হযরতের খেদমতে হাজির থাকতে পারতেন না। কোন কোন সময় এমনও হত যে, সাহাবাদের অনেকেই বিশ্বনবীর মজলিসে উপস্থিত থাকতে পারতেন না।

হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমার খেলাফতের সময় যে কার্যধারা প্রচলিত ছিল, তা হতে অনুমান করা যায় যে, যখনই কোন সমস্যা দেখা দিত এবং সে সম্বন্ধে তাঁদের হুজুর আলাইহিস সালামের কোন হাদীস জানা ছিল না, তখন সাহাবাদেরকে সমবেত করে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা হতো।

হাদীস অনুযায়ী আমল করা জরুরী

হাদীসের ইমামদের এই প্রচেষ্টা থাকত যে, তাঁদের সনদ যেন 'সনদে আলী' হয়। অর্থাৎ হুজুর আলাইহিস সালাম পর্যন্ত মধ্যস্থ ব্যক্তি যত কম হয়, ততই উত্তম। আর এটার প্রত্যেক রাবী বিশ্বাসযোগ্য সেকাহ, দ্রুতকণ্ঠস্থকারী, দীনদার, এবং সুন্নতের হুবহু অনুকরণ ও অনুসরণকারী হওয়া চাই। নিম্নে একটি দৃষ্টান্ত দেয়া গেল।

ইমাম বোখারী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহে ১৩ই শওয়াল ১৯৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। আর হযরত ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ আলাইহে ১৫০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। কাজেই ইমাম বোখারী (রাঃ), ইমাম শাফেয়ীর (রাঃ) চেয়ে ৪৪ বছর কনিষ্ঠ ছিলেন।

ইমাম বোখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহে ২৫৬ হিজরীতে ঈদুল ফেৎরের রাত্রিতে এ নশ্বর পৃথবী পরিত্যাগ করেন। ইমাম শাফেয়ী (রাঃ) ইন্তেকাল করেন ২০৪ হিজরীতে।

ইমাম শাফেয়ীর (রাঃ) মৃত্যুর সময় ইমাম বোখারী (রাঃ) প্রায় দশ বছর বয়সের বালক ছিলেন। এদিক দিয়ে বিবেচনা করলে ইমাম শাফেয়ী (রাঃ) 'সনদে আলী' এবং ইমাম বোখারী (রাঃ) 'সনদে নাজেল' ছিলেন।

হযতর ইমাম শাফেয়ীর (রাঃ) শ্রেষ্ঠতম উস্তাদ ছিলেন ইমাম মালেক (রাঃ) ও ইমাম সুফিয়ান বিন আনীয়া (রাঃ)। এই জন্য মুহাদ্দেসীন ইমাম শাফেয়ীর (রাঃ) সনদকে 'স্বর্ণ-সংযোগ' বলে আখ্যা প্রদান করেছেন। রেজাল অনুযায়ী এই সনদ অত্যন্ত জোরদার।

সাহাবাদের পর্যন্ত ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের (রাঃ) চারজন মধ্যস্থ ব্যক্তি ছিলেন। ইমাম আহমদ বিন হাম্বলেরও (রাঃ) যদি এরূপ মিলে যায়, তবে তিনিও ইমাম মালেকের (রাঃ) সমকক্ষ। তেমন ক্ষেত্রে ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের (রাঃ) রেওয়ায়েতকেও 'সনদে-আলী' বলা চলে।

ইমাম আহমদ বিন শেহাব জহুরী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহে ফন্নে হাদীস মগাজী ও তফসীরের মহামহীম ইমাম ছিলেন। আর এটা বাস্তব সত্য যে, সমগ্র হাদীসের কিতাবে তাঁর রেওয়ায়েত সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও সনদ-মাফিক বিবেচনা করা হতো।

ইমাম সুফিয়ান বিন আনীয়া রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহে বলেন, 'আপনার প্রতি মুহাদ্দেসীনের পরিপূর্ণ আস্থা রয়েছে। আপনি সনদ ব্যতীতও রেওয়ায়েত করতে পারেন।" জবাবে তিনি বলেছিলেন, সিঁড়ি ব্যতীত কি ছাদে চড়া সম্ভব?"

ইমাম আবদুল্লাহ্ বিন মোবারক (রাঃ) বলেন, সনদ ধর্মের অন্তর্ভুক্ত। সনদের বালাই না থাকলে, যার যেমন ইচ্ছা তেমন কথা বলবে। হযরত সুফিয়ান সওরী রাহমাতুল্লাহ বলেন সনদ মুমিনের হাতিয়ার।"

হাদীস-গ্রহণে ইমাম শাফেয়ীর শর্তাবলী

তাঁর মতে প্রথমে কোরআন মজিদ দেখবে। তারপর হুজুর আলাইহিস সালামের সহী রেওয়ায়েত দেখতে হবে না অধিকাংশ সাহাবাদের আমল দেখতে হবে। কোন মওকুফ মুনকতে রেওয়ায়েত বা সাহাবাদের বাণীকে কোন সহী রেওয়ায়েতের মুকাবিলায় গ্রহণ করা যাবে না।

ইমাম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহের শুধু কূফার হাদীসসমূহের উপর বিশ্বাস ছিল। তিনি স্বীয় শহরের দুর্বল রেওয়ায়েতের মোকাবেলায় অপরাপর শহরের সহী রেওয়ায়েতকে কবুল করতেন না।

ইমাম মালেক রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহে মদীনার রেওয়ায়েতকে হেজাজের রেওয়ায়েতের উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করতেন।

ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহে স্বীয় মত প্রকাশ করেছেন যে, সহী ও মুত্তাসল রেওয়ায়েত, কূফা, বসরা, মিসর, শাম, হেজাজ বা যে কোন শহরের হোক না কেন তা কবুল করতে হবে।

তিনি এ নিয়মও প্রচার করেছেন যে, কোন একটি রেওয়ায়েতে যদি শব্দ কম হয় এবং অপর একটি রেওয়ায়েতে শব্দ বেশী হয়, তবে অধিক শব্দ বিশিষ্ট রেওয়ায়েতের রাবী যদি প্রথম রেওয়ায়েতের রাবী হতে প্রত্যেক দিক দিয়ে অধিক বিশ্বাসযোগ্য ও সনদযুক্ত না হয়, তবে এরূপ অধিক শব্দ বিশিষ্ট রেওয়ায়েত আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়।

তিনি এটাও মীমাংসা করেছেন যে, যদি দুইটি হাদীসে অমিল থেকে থাকে, তবে দলীল ব্যতীত কোন হাদীসকেই রদ করা যায় না। যথাসম্ভব উভয়ের মধ্যে করার মিল চেষ্টা করবে।

ইমাম শাফেয়ী (রাঃ) কমীমাংসা রারও কায়দা বর্ণনা করেছেন। শুধু এ সম্বন্ধেই তিনি একটি কিতাব লিখেছেন। এটার নাম এখতেলাফুল হাদীস। এটা 'কিতাবুল উম্ম' কিতাবের হাশিয়ার লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

ফিকাহ, উসুলে ফিকাহ, মাজহাবে ফিকাহ

এলমে ফিকাহর ফজীলতের নিমিত্ত নিম্নের কতিপয় বর্ণনা যথেষ্ট। "খোদা যার মঙ্গল চান, তাকে দীনের ফিকাহ (জ্ঞান) প্রদান করেন।" কোরআন মজীদে বলা হয়েছে– "যাকে হেকমত (দিনের জ্ঞান) প্রদান করা হয়েছে, তাকে মহামঙ্গল প্রদান করা হয়েছে।"

একদিন মসজিদে নববীতে হুজুর আলাইহিস সালাম পদার্পণ করেন। দৃষ্টিপাত করে দেখতে পেলেন যে, সেখানে দুইদল সাহাবা পৃথক পৃথক অবস্থায় উপবিষ্ট রয়েছে। একদল খোদার কাছে দো'আ করছিলেন। এবং তাঁর দিকে আকৃষ্ট ছিলেন। আর অপর দল ধর্ম-শিক্ষা দান করছিলেন। হযরত (সাঃ) বললেন, "এ উভয় দলই উত্তম। একদল-তা খোদার দিকে আকৃষ্ট। তিনি যদি

চান, তবে তাদের বাসনা পূর্ণ করবেন। আর ইচ্ছে করলে, নাও করতে পারেন। এ দ্বিতীয় দল সকলের চেয়ে উত্তম; কেননা, তারা নিজেরাও ধর্মের কথা শিখে থাকে এবং যারা জানে না তাদেরকেও শিক্ষা দিয়ে থাকে।"

এ পর্যন্ত বলে তিনি তাঁদের কাছে বসে গেলেন এবং বললেন 'আমিও এলম শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত প্রেরিত হয়েছি।"

হযরত (সাঃ) অপরিসীম স্নেহের সাথে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর জন্য দো'আ করলেন, "এলাহী তাকে দীনের ফকীহ বানাও।" এলমে ফিকাহর ফজীলত সম্বন্ধে এরূপ কতিপয় রেওয়ায়েত রয়েছে।

ফিকাহ্ কাকে বলে?

মানুষের জিম্মায় যাকিছু আমলী ফরায়েয রয়েছে তা অবগত হওয়ার নাম ফিকাহ। কোন কোন আলেম বলেছেন যে, শরীয়তের আমলী আহকামকে বিস্তৃতভাবে দলীলসহ বুঝবার নাম এলমে ফিকাহ।

সমগ্র ফকীহ ও মুহাদ্দেস এ সম্বন্ধে একমত যে, কোরআন ও হাদীস দুইটি মূল উসুল। আর এদের অন্তর্গত আইন-কানুনকে ফিকাহ বলে। আর কেয়াস ও এজমা এদের অধীন। এজমার নিমিত্ত কোন না কোন সনদের প্রয়োজন।

সমগ্র আলেম সমাজ এ সম্বন্ধে একমত যে, দলীল ব্যতীত এজমা জায়েয নয়। দলীল ব্যতীত এজমাতে ত্রুটি প্রদর্শিত হয়ে থাকে। আর ধর্ম সম্বন্ধে দলীল ব্যতীত কোন আদেশ প্রদান করা ভুল।

হযরত শাহ ওলি উল্লাহ রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহে বলেন, একদল আলেম বলে থাকেন যে, এজমার নিমিত্ত দলীলের আবশ্যকতা অপরিহার্য। কাজেই এটা অনিবার্য যে, এজমার জন্য অবশ্যই কোন না কোন দলীল থাকবে। আর দলীল ব্যতীত যদি কোন এজমা হয়, তবে হুজুর আলাইহিস সালামের পরে কোন শরীয়তের আদেশ বের করা ভুল।

এ বিস্তৃত ব্যাখ্যার পর এটা লক্ষ্য করার বিষয় যে, এ সম্বন্ধে সলফে সালেহীনের তরীকা কী ছিল। হযরত শাহ ওলিউল্লাহ সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহে আহলে হাদীসের ফকীহবৃন্দ এবং ফকীহে আহলে-রায় সম্বন্ধে পার্থক্য বর্ণনা করেছেন। উক্ত যুক্তি-তর্ক বিশেষ মনোযোগের সাথে লক্ষ্য করার বিষয়। এতে হযরত ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহের ফিকাহ ও এজতেহাদের পন্থাসমূহ হৃদয়ঙ্গম করার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে সাহায্য করবে।

এজতেহাদ ও ফিকাহ্ সম্পর্কে ফুকাহা ও মোহাদ্দেসদের পন্থা

এ সম্বন্ধে শাহ্ সাহেব নিম্নলিখিত আলোকপাত করেছেন। ইমাম শাফেয়ী (রাঃ) প্রমুখ ফুকহায়ে মুহাদ্দেসীনের এজতেহাদ পন্থা এ ছিল যে, কোন মাসআলা সম্বন্ধে যদি কোরআনী কোন স্পষ্ট মীমাংসা মিলে যেত, তবে তাঁরা শুধু তাই শিরোধার্য করে নিতেন। কিন্তু তা যদি দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠত, তখন তাঁরা হাদীসের দিকে মনোযোগ প্রদান করতেন এবং হাদীস দ্বারাই মীমাংসা করে নিতেন। তা হাদীসে মশহুর হোক বা যে কোন বিশিষ্ট শহরের রেওয়ায়েত হোক, তাতে বিশেষ ও সহী সনদ থাকলে তা কোন সাহাবা বা ফুকহার আমল করা না করার প্রতি তাঁরা কোন সাহাবা বা তাবেয়ীর এজতেহাদের উপর নির্ভর করতেন না। কিন্তু এভাবে যথাসাধ্য চেষ্টা-সাধনার পরেও যখন কোন হাদীস না মিলিত, তখন তাঁরা অপারগ হয়ে পড়তেন। এ অবস্থায় তাঁরা সাহাবাদের জমায়াত বা তাবেয়ীনদের বাণী অবলম্বন করতেন। তাতে তাঁরা কোন শহরের পার্থক্য করতেন না। সাহাবা ও তাবেয়ীন উক্ত পন্থা অবলম্বন করতেন। এ পদ্ধতিতে যদি সম্মিলিত মত মিয়ে যেত, তবে তাঁরা পরম সন্তুষ্ট হতেন। পরিতাপের বিষয় এ যে, এ সম্বন্ধেও যদি তাঁদের মধ্যে কোন বিরোধ দেখা যেত, তবে কোরআন হাদীস সম্বন্ধে যিনি অধিক ওয়াকিফহাল হতেন এবং যিনি সকলের চেয়ে অধিক সতর্ক ছিলেন বা যাঁরা স্মৃতিশক্তি অধিক তীক্ষ্ম থাকত, তাঁর বাণীকে তাঁরা শিরোধার্য করে নিতেন। আর এমন কোন মাসআলা যদি পেশ হতো যে, তা সাহাবা বা তাবেয়ীনদের কওল বরাবর হতো, তবে সেই মাসআলাকে দুই কওলওয়ালা বলা হতো। এতসব অনুসন্ধানের পরও যদি কোন মাসআলার সমাধান সম্ভবপর না হতো, তবে তাঁরা নিজেরাই কোরআন ও হাদীসের সম্বন্ধে চিন্তা করে দেখতেন। এদের উপর ভিত্তি করেই তাঁরা কেয়াস করতেন। কিন্তু তদ্রূপ ক্ষেত্রে কেয়াস করতে হলেও তাঁরা নিজেদের মনগড়া কেয়াসের পাবন্দী করতেন না। বরং তাঁরা এমন পন্থা অবলম্বন করতেন যাতে তাঁদের দেহ-মন পরম সন্তুষ্টি লাভ করতে পারে।

হানফী মাযহাব

হযরত ইমাম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহে এ মাজহাবের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ৮০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। আর ১৫০ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন। তিনি প্রায় সত্তর বছর কাল জীবিত ছিলেন। কাজী আবু ইউসূফ তাঁর শাগরেদদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তিনি হানফী মাজহাবের শক্তি-বর্দ্ধনে অতুলনীয় ছিলেন। তাঁর পূর্ণ নাম এয়াকুব বিন ইব্রাহীম আনসারী। তিনি ১১৩ হিজরীতে পয়দা হন, ১৮২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

আল্লামা ইবনে খলকান বলেন, অর্থাৎ ইমাম আবু হানীফার শাগরেদদের মধ্যে কাজী আবু ইউসূফ অতুলনীয়। তিনি না হলে ইমাম আবু হানীফার নাম এত সুপরিচিত হতো না।

ইমাম আবু হানীফার শাগরেদদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন, ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসান। তিনি ১৩২ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৯ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। জাফর বিন-হাজীল শাগরেদ হিসেবে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। তিনি কূফার অধিবাসী ছিলেন। তিনি ১১০ হিজরীতে পয়দা হন এবং মৃত্যুবরণ করেন ১৫৮ হিজরীতে। হাসান বিন জীয়াদ লুলুভী তাঁর শাগরেদ হিসেবে চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। তিনি কাজী আবু ইউসূফ আনসারী গোলাম ছিলেন। তিনি অপরাপর তিন ইমামেরও শাগরেদ ছিলেন।

ফিকাহর উসূল

কোরআন, হাদীস, এজমা ও কেয়াস, এই চারটি ফিকাহর উসূল। এই সময় উসূল অনুযায়ীই আহকাম নির্বাচন ও যাচাই হয়ে থাকে।

এজতেহাদের শর্তাবলী

অর্থাৎ এজতেহাদের শর্ত এ যে, কোরআন মজীদের আভিধানিক ও শরীয়তী অর্থ অবগত হওয়া চাই। আর যা মূল কারণ অর্থাৎ খাস ও আম আদেশ ও নিষেধাবলী এবং পূর্ববর্তী সমগ্র তত্ত্ব সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল হওয়া উচিত। কিন্তু সমগ্র কোরআনের এলম থাকা আবশ্যকীয় নয়। তবে আহকাম সম্বন্ধীয় এলম থাকা আশব্যকীয়। এ সকল আয়াতের সংখ্যা পাঁচশতের কাছাকাছি। তফসীরে আহমদীতে এ সকল আয়াতগুলো একত্র সমাবেশ করা হয়েছে। আর কোরানের সঙ্গে এলমও আবশ্যকীয়। বিভিন্ন প্রকারের হাদীস সম্বন্ধেও ওয়াকিফহাল থাকা আবশ্যক। আর সেই সকল হাদীসের সংখ্যাও তিন হাজার।

এজমা

এ উম্মতের মুজতহেদীনের পক্ষে এক সময়ে কোন একটি শরীয়তী আদেশ সম্বন্ধে একমত হওয়াকে এজমা বলে। এজমা দুই প্রকার। আল্লাহর কিতাব ও আল্লাহর রাসূলের সুন্নতের উপর প্রথম প্রকার কেয়াসের ভিত্তিভূমি। প্রয়োজনের খাতিরে ওলমা ও ফুকাহাদের কোন এক বিষয়ে একমত হওয়া দ্বিতীয় প্রকার কেয়াস। প্রথম বর্ণিত কেয়াস পালন করা ওয়াজিব এবং দ্বিতীয় প্রকার কেয়াসের অনুসরণ ইচ্ছাধীন।

এ সম্বন্ধে আলেম সমাজ একমত যে, দলীল ব্যতীত এজমা জায়েয নয়। কেননা, দলীল ব্যতীত এজমাতে ভুল-ত্রুটি হতে পারে। আর ধর্ম সম্বন্ধে দলীল ব্যতীত কোন আদেশ প্রদান করা ভুল।

হযরত শাহ ওলিউল্লাহ্ সাহেব বলেন, আলেমগণ সেই এজমা সম্বন্ধে একমত, আল্লাহর কিতাব ও আল্লাহর রাসূলের কিতাবের উপর যার স্পষ্ট দলীল পাওয়া যায়। আর সেই অনুযায়ীই মাসআলা যাচাই করা হয়ে থাকে। আর যে এজমা কোরআন-হাদীসের ভিত্তির উপর স্থাপিত নয়, আলেম সমাজ এটার সমর্থন করেন না।

কেয়াস

শাখা-প্রশাখাকে আসলের সঙ্গে হুকুম ও ইল্লতে বরাবর করাকে কেয়াস বলা হয়। ফুকাহা যখন মূল হতে শাখা-প্রশাখা বের করেন, তখন এটাকে কেয়াস বলা হয়।

ফিকাহে মালেকী

হযরত ইমাম মালেক রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহে শেখুল মোহাদ্দেসীন ছিলেন। মোহাদ্দেসীনের সিদ্ধান্ত এই যে, তাঁর রেওয়ায়েত অতি উচ্চ শ্রেণীর। তিনি তাঁর মুয়াত্তা কিতাবে বিস্তৃতভাবে রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। প্রথমে তিনি দশ হাজার রেওয়ায়েত সংকলন করেন। এরপর সূক্ষ্ম বিবেচনার পর তিনি মুয়াত্তা কিতাবে ১৭২০ রেওয়ায়েত লিপিবদ্ধ করেন। তন্মধ্যে মসনদে মরফূ ৬০০, মূরসল ২৩৫, মওকুফ ৬১৩, তাবেয়ীনদের বাণী ও ফতোয়া ২৮৫ এবং অবশিষ্ট অংশে তিনি বালাগতে ইমাম মালেক করেন।

মুয়াত্তা কিতাবে শুধু আহকামে ফিকাহ সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে। কাজেই এটাতে বোখারী ও মোসলেমের ন্যায় অসংখ্য অধ্যায় সংযোজিত হয়নি। 'মোহাদ্দেসীনের পরিভাষায় এটাকে সনদের কিতাব বলা হয়। শব্দ হতে বাইর হয়েছে। এটার অর্থ কোন কিছুকে বাছাই করা।

হযরত শাহ সাহেব বলেন, সাধারণ আয়েম্মা, ওলামা ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যা অনুসরণ করেন মুয়াত্তা শব্দ দ্বারা তাই বুঝান হয়ে থাকে। যে সম্বন্ধে সকলে একমত, এটার অর্থ তাই। যে মাসআলার উপর সাহাবাদের আমল ও সমগ্র সলফ যার উপর চলেছেন, এটাকেই মেজাজী (রূপক) অর্থ বলা হয়।

ইমাম মালেকের চিন্তাধারা

ইমাম মালেক রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহে ফতোয়া ব্যাপারে কোরআন হাদীসের উপর নির্ভর করতেন। হেজাজের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দেসীনের উপর তিনি এ সম্বন্ধে বিশেষ

গুরুত্ব প্রদান করেন। মদীনাবাসী যাঁদের অনুযায়ী আমল করতেন তিনিও তাঁদের অনুযায়ীই আমল করতেন। হযরত ওমর ও হযরত আবদুল্লাহ্ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমার উপর তাঁর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতেন। ইমাম মালেক নাফেয়ে মওলা আবদুল্লাহ্ বিন ওমর (রাঃ) হতে বহু ফয়েয ও বরকত লাভ করেন। মদীনাবাসীগণ অন্যান্য শহরের রেওয়ায়েতকে পরিত্যাগ করতেন, এজন্য ইমাম মালেকও সেই সকল রেওয়ায়েত বর্জন করেন। আর তাতেও যদি কোন মাসআলার সমাধান না হতো, তখন তিনি কেয়াসের উপর নির্ভরশীল হতেন। চুরি স্বীকার করার নিমিত্ত কাউকেও প্রহার করা ইমাম মালেকের কাছে জায়েয ছিল। ফকীহগণ এটার বিপরীত মত পোষণ করেন। ইমাম মালেক রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহে শুধু মদীনাবাসীদের এজমাকে বিশ্বাসযোগ্য বলে বিবেচনা করতেন।

ইমাম শাফেয়ীর এজতেহাদ-ধারা এবং উসুলে ফিকাহ

মুজতাহেদের পক্ষে পাঁচটি বিষয়ে ওয়াকিফহাল থাকা তিনি অপরিহার্য বলে বিবেচনা করেছেন। সর্বোচ্চ গুরুত্ব তিনি আরোপ করেন, কোরআন ও হাদীসের উপর। তারপর তিনি কোরআনের শ্রেণীবিভাগ, আম ও খাস মুজমাল ও মুবীন এবং নাসেখ ও মনসুখের উপর গুরুত্ব দান করেন। হাদীস সম্বন্ধেও সেই একই কথা খাটে। তৃতীয়তঃ আরবী ভাষা, অভিধান এবং নহু সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল হওয়া উচিত। সাহাবাদের বাণীর উপরও তিনি গুরুত্ব প্রদান করেছেন। তাবেয়ীন এবং তাঁদের শ্রেণীর বিভাগ, তাঁদের মধ্যে আপোস-মতবিরোধ এবং কেয়াস সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল হওয়ার প্রতিও তিনি গুরুত্ব প্রদান করেন।

এজতেহাদের তিনটি পর্যায়

এ সকল পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রেখে মুহাদ্দেসীন মুজতাহেদকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন।

তাঁদেরকে বলা হয়, পূর্ববর্তী মুজতাহেদের চেয়ে তিনটি বিষয়ে যাঁদের অধিক গুরুত্ব থাকে। (১) যিনি অন্য কারও নিয়ম-কানুনের পরোয়া না করে নিজেই মাসআলা যাচাই করতে পারেন। (২) তিনি হাদীস সমূহ এবং আছার সঙ্কলন করেন। আর এদের পারস্পরিক মতবিরোধের নিজেই সমাধান করতে পারেন। যাতে গুরুত্ব দেওয়ার উপযুক্ত তাতে গুরুত্ব প্রদান করেন; যাদের মধ্যে সামঞ্জস্য সমাধানের প্রয়োজন তাতে সামঞ্জস্য আনয়ন করেন। (৩) যিনি অতীত ও বর্তমান মাসায়েল সম্বন্ধে সামঞ্জস্য আনয়নের পরে এমন স্পষ্ট বিধান প্রদান করেন যা দীর্ঘকালের নিমিত্ত লোকদের গ্রহণযোগ্য হতে পারে।

কোন্‌টি এজমায়ী মাসআলা

এজমা সম্বন্ধে ইমাম শাফেয়ী সাহেবের মতামত কি তা বুঝাবার নিমিত্ত তিনি নিম্নলিখিত কোরআনের আয়াত পেশ করেছেন।

'হেদায়ত প্রকাশিত হওয়ার পরও যে ব্যক্তি হুজুর আলাইহিস সালামের বিরোধিতা এবং মুসলমানদের পথ ব্যতীত অপর পথের অনুসরণ করে, আমি তাকে দোজখে নিক্ষেপ করব এবং তা অতি মন্দ পরিণাম।

কেয়াস সম্বন্ধে ইমাম শাফেয়ীর রায়

কেয়াস সম্বন্ধে ইমাম শায়েফী রাহমাতুল্লাহ আলাইহে তিনটি নিয়মের বিধান দিয়েছেন। কোরআন-মজিদে দাসীদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, দাসী যদি ব্যভিচারের দায়ে অভিযুক্ত হয়, তবে তার শাস্তি আজাদ স্ত্রীলোকের অর্ধেক হবে। কোরআন-মজিদে গোলাম সম্বন্ধে যেহেতু আদেশ দেয়া হয় নাই, কাজেই একে ভিত্তি করে গোলাম সম্বন্ধে কেয়াস করা যায়।

কোরআন-মজিদে শরাব হারাম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। শরাবে নেশা রয়েছে, এজন্যই একে হারাম করা হয়েছে। বস্তুতঃ শরাব ব্যতীত যে বস্তুতে নেশা থাকবে, সেই বস্তুও হারাম বলে সাব্যস্ত করা যায়। ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহে এ জাতীয় কেয়াসকে বলে অভিহিত করেছেন।

দ্বিতীয় পন্থা এ যে, দুইটি আদেশ যদি পরস্পর বিরোধী হয়, তবে একটি তৃতীয় পন্থা বের হতে পারে। কিন্তু তখন কোন্ পথ অবলম্বন করতে হবে, তা যদি স্পষ্টভাবে বুঝা না যায়, তবে সেই তৃতীয় পন্থাকে সেই দুইটি আদেশের মোকাবেলা করতে হবে। যে আদেশের সাথে এটার অধিক সামঞ্জস্য, এটা সাথেই একে জুড়ে দিতে হবে। ইমাম শাফেয়ী (রাঃ) একে আখ্যা প্রদান করেছেন।

ইমাম শাফেয়ীর (রাঃ) কেয়াস এ যে, পিতা যদি কোন স্ত্রীলোকদের সাথে ব্যভিচার করে, তবে তার পুত্রকে সেই স্ত্রীলোকের কন্যা বিবাহ করা জায়েয।

ইমাম আবু হানীফা সাহেবের রায় এই যে, নিষিদ্ধ স্ত্রী লোকদেরকে বিবাহ করলে যে মনোভাবের উদ্রেক হয়, ব্যভিচার দ্বারাও সেই ভাবের উদয় হয়ে থাকে। কোন ব্যক্তি যদি কোন স্ত্রীলোকের সাথে ব্যভিচার করে, সে যেমন বিবাহিতা স্ত্রীর মাতা বা স্বীয় কন্যাকে বিবাহ করতে পারে না, তদ্রূপভাবে সে যে স্ত্রী লোকের সাথে ব্যভিচার করেছে, তার মাতা এবং কন্যাকেও বিবাহ করতে পারে না।

ইমাম শাফেয়ী সাহেব এই মাসআলার উপর দলীল প্রদান করেছেন যে, খোদাতায়ালা যেখানে সেই সকল স্ত্রীলোকের বর্ণনা করেছেন, যাদের সাথে বিবাহ জায়েয নয়, এটার পরে এটাও বর্ণনা করেছেন যে, তোমাদের উপর সেই সকল স্ত্রীলোক ব্যতীত যাদেরকে বিবাহ হারাম করা হয়েছে অন্যান্যসব স্ত্রী লোক হালাল" আর যে সকল স্ত্রী লোককে বিবাহ করা হারাম বলে বর্ণনা করা হয়েছে, তন্মধ্যে যে স্ত্রী লোকের সাথে ব্যভিচার করা হয়েছে তার মা বা কন্যাকে বিবাহ করা হারাম বলে বর্ণনা করা হয়নি। আর হক-তায়ালা যে আদেশ জারী করেছেন, তা এ যে, বিবাহ হয়ে যাওয়ার পর মানুষ নিজ স্ত্রীর মাতা বা কন্যাকে বিবাহ করতে পারে না।

কেয়াস সম্বন্ধে দুইটি দৃষ্টান্ত

ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহে কেয়াস সম্বন্ধে দুইটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। তন্মধ্যে একটি হলো, ইমাম মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহের সাথে এক বিতর্ক।

প্রথম দৃষ্টান্ত এই যে, হুজুর আলাইহিস সালাম বলেছেন, "কোন ব্যক্তি যদি বিবাহ প্রার্থী হয়, তবে অন্য ব্যক্তি তাতে প্রার্থী হবে না।"

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত এ যে, হযরত ফাতেমা বিনতে কাইস (রাঃ) হতে রেওয়ায়েত আছে যে, তিনি হুজুর আলাইহিস সালামের কাছে আরজ করলেন যে, মাবীয়া বিন আবী সুফিয়ান এবং আবু জাহাম তো সর্বদাই ভ্রমণে থাকে। আর মাবীয়া বিন আবী সুফিয়ান একজন দরিদ্র লোক। কাজেই তুমি যদি এসামা বিন জাইদকে বিবাহ কর, তবে উত্তম হবে।

এই হাদীস দ্বারা দুইটি কথা প্রমাণিত হয়েছে। একটি এ যে, তাঁরা দুইজনে একের পর অপরে বিবাহের পয়গাম প্রেরণ করেছেন। আর হযরত (সাঃ) উভয়ের পয়গাম প্রেরণের পর ফাতেমাকে এসামা বিন জাইদকে বিবাহ করার জন্য উৎসাহিত করেছেন।

কাজেই আমরা উভয় দৃষ্টান্ত বিচারাধীন রেখে এ সামঞ্জস্যে পৌছেছি যে, ফাতেমা বিনতে কাইস (রাঃ) কারও সম্বন্ধে স্বীয় মনস্তুষ্টি প্রকাশ করেননি। অথচ তাঁর সেই অধিকার ছিল।

কারণ হুজুর আলাইহিস সালামের প্রথম আদেশের উদ্দেশ্য এ ছিল যে, কারও বিবাহ প্রস্তাব যদি স্ত্রীলোক কবুল করে এবং তারপর ওলীকে হুকুম না দেয়া পর্যন্ত অপর কারও পক্ষে বিবাহের পয়গাম প্রেরণ নিষিদ্ধ।

ইমাম শাফেয়ী (রাঃ) দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত এই দিতেছেন যে, এক ব্যক্তি একটি বাড়ী খরিদ করল এবং তাতে সে একটি দালান তৈরী করল। তারপর পাড়া-প্রতিবেশীর সুপারিশক্রমে সে তা ফিরাইয়ে পেতে চাইল।

এই মাসআলা সম্বন্ধে ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ এবং তাঁদের দলীয় লোকের রায় এই যে, সুপারিশকরী বাড়ী ফিরে পাবে। আর দালান প্রস্তুতকারী স্বীয় জিনিসপত্রাদি খসায়ে নিয়ে যাবে। কাজী ইবনে আবী নিয়ে বাড়ী এবং দালান উভয়ই সুপারিশকারীকে দিয়ে দেওয়ার পক্ষপাতী।

ইমাম শাফেয়ী বলেন, "আমি কারও সাথে একমত নই। আমার মত এই যে, কোন ব্যক্তি যদি বাড়ী খরিদ করে এবং এটার উপর দালান প্রস্তুত করে বা এটার কোন অংশে দালান তৈরী করে, এটার পর বাড়ীওয়ালা যদি তা ফিরে পেতে চায়, তবে তাকে বলে দিতে হবে যে, তুমি যদি বাড়ী ফিরায়ে পেতে চাও, তবে বাড়ীর মূল্য এবং নতুন দালানের মূল্য যা সেই জমানার মূল্য অনুযায়ী হয়, সেই অনুসারে আদায় করা অন্যথায় তোমার দাবী মূল্যহীন। উক্ত পন্থা ব্যতীত অন্য কোন পন্থা নেই। কেননা, ক্রেতা তার প্রয়োজনের খাতিরেই দালান প্রস্তুত করেছিল।

আহমদ বিন হাম্বল ও শাফেয়ীর দৃষ্টিকোণ পার্থক্য

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহে হযরত ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহের শ্রেষ্ঠতম শাগরেদ (রাঃ) উসুল সমূহ মেনে নিয়েছেন এবং তা আমলেও পরিণত করেছেন। শুধু দুইটি বিষয়ে মতবিরোধ করেছেন–

(১) আমাদের কেয়াছ অপেক্ষা সাহাবাদের বাণীসমূহ উত্তম।

(২) আমলে আনবার উপযুক্ত।

এটা ব্যতীত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহে ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহের মাযহাব সম্বন্ধে অতি কম বিষয়ে মতবিরোধ করেন।

ইমাম মালেক রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহের মাযহাব সম্বন্ধে ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহের প্রায় বিশটি মাসআলা সম্বন্ধে মতবিরোধ রয়েছে। এবাদত অপেক্ষা ব্যবহারিক বিষয়েই তিনি অধিক মতবিরোধ করেছেন। ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহে হানফী মাযহাবের প্রায় সত্তরটি মাসআলা সম্বন্ধে মতবিরোধ করেছেন।

হানাফী মাসায়েল	মাসায়েলে শাফেয়ীয়া
(১) নিয়ত ও তরতীব ব্যতীত ওজু জায়েয।	(১) নিয়ত ও তরতীব ব্যতীত ওজু সহী নয়।
(২) পানি পাওয়া না গেলে খেজুরের শিরা দ্বারা ওজু দুরস্ত।	(২) পানি ব্যতীত ওজু দুরস্ত নয়।
(৩) গোসলে কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া ফরজ।	(৩) এই দুইটির কোনটাই ফরজ নয়।
(৪) নামাযে থেকে অট্টহাসি হাসলে, ওজু ও নামায উভয়ই টুটিয়া যায়।	(৪) ওজু টুটে না। নামায বিনষ্ট হয়ে যাবে।
(৫) রোযা রেখে ওজুর সময় কুলি করার কালে অজ্ঞাতসারে এবং ভুলে যদি গলার ভিতরে পানি চলে যায়, তবে রোযা বিনষ্ট হয়ে যায়।	(৫) ভ্রমে বা অনিচ্ছাসত্ত্বে কুলি করার সময় পানি যদি পেটে চলেও যায়, তবে রোযা টুটিবে না।
(৬) কাফের গোলামের পক্ষ হতে মুসলিম মনিবকে সদকা ও ফেৎরা দিতে হবে।	(৬) কাফের গোলামের উপর সদকা ও ফেৎরা নেই।
(৭) নফল রোজার কাজাও ফরজের অনুরূপ।	(৭) নফল রোজার কাজা জরুরী নয়।
(৮) রাজ্যে বাদশা থাকলে, শহরে জুমা দুরস্ত।	(৮) প্রতি অবস্থায়ই জুমার নামায দুরস্ত। শুধু চল্লিশ জন লোক হলেই চলবে।
(৯) ব্যবহৃত অলঙ্কারে জাকাত আদায় করতে হবে।	(৯) ব্যবহৃত অলঙ্কারের যাকাত নেই।
(১০) কোন স্বামীকে বলপূর্বক যদি তালাক লিখায়ে নেয়, তবে জায়েয হবে। তাতে তালাক হয়ে যাবে।	(১০) এরূপ তালাক বেহুদা এবং বিশ্বাসযোগ্য নয়।
(১১) মুসলমান গোলামের পক্ষে কাফেরদেরকে আশ্রয় দেয়া নাযায়েয।	(১১) মুসলমান গোলামও কাফের-দেরকে আশ্রয় দিতে পারে।

হানাফী মাসায়েল	মাসায়েলে শাফেয়ীয়া
(১২) ঘোড়ার গোস্ত নাযায়েয।	(১২) ঘোড়ার গোস্ত জায়েয।
(১৩) ইমামের পিছনে কেরাআত-ওয়ালা নামাযে সূরা ফাতেহা না পড়া চাই।	(১৩) প্রত্যেক নামাযে মুক্তাদীকে সূরা ফাতেহা পড়তে হবে। অন্যথায় নামায হবে না।
(১৪) নাবালেগের উপর জাকাত নেই।	(১৪) জাকাত দিতে হবে।
(১৫) কোরবাণী ওয়াজিব এবং প্রত্যেক মালদারকে একটি বকরী কোরবাণী করতে হবে।	(১৫) কোরবাণী সুন্নত। প্রত্যেক বাড়ীর মালিক নিজ বাড়ীর লোকদের তরফ হতে একটি বকরী কোরবাণী করতে পারে।
(১৬) আজাদ ও বালেগ মেয়ে ওলির মর্জি ব্যতীতও বিবাহ করতে পারে।	(১৬) তা পারে না।

ইমাম শাফেয়ীর বাণী

আল্লামা মরজানী হানফী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহে বলেন, ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহে বলেছেন 'এ সম্বন্ধে সব মুসলমান একমত যে, হুজুর আলাইহিস সালামের হাদীস কারও খাতিরে কখনও পরিত্যাজ্য নয়।"

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, "আমার মা-বাপ হুজুর আলাইহিস সালামের প্রতি কোরবাণী হোক। হযরতের কোন রেওয়ায়েত যদি প্রমাণিত হয়ে যায়, তবে পরিত্যাগ করা জায়েয নয়।"

তিনি আরও বলেছেন, "কেউ যদি আমার কেতাবে সুন্নতে রাসূলুল্লার খেলাফ কোন কথা পায়, তবে সেই সুন্নতের উপরই আমল করতে হবে এবং আমার কথাকে বর্জন করতে হবে।"

হযরত শাহ ওলিউল্লাহ্ সাহেব হুজ্জতুল বালেগা কেতাবে লিখেছেন, "ইমাম শাফেয়ী ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকে বলেছেন, আপনি সহী রেওয়ায়েত আমার চেয়ে অধিক অবগত রয়েছেন। কাজেই কোন সহী রেওয়ায়েত যদি আপনার দৃষ্টিগোচর হয়, তবে আপনি তা আমাকে অবগত করাবেন যেন আমি তা আমল করতে পারি।"

হযরত ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহের জীবনে এসকল শুধু কথামাত্রেই পর্যবসিত হয়নি। বরং তিনি দুনিয়ার সম্মুখে তা বাস্তবরূপে প্রমাণিত করে দিয়েছেন। তিনি একটি বিষয়ে কোন এক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পরও কোন সহী রেওয়ায়েত পাওয়া মাত্রই অতি অনায়াসে তাঁর পূর্ব সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করতেন। তাঁর প্রথম ও শেষ কথাতে এতটুকু পার্থক্য ছিল। সমগ্র মুহাদ্দেস ও ফুকাহা তাঁকে পরম শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। তাঁর উসূল ও সিদ্ধান্তকে মেনে নিয়েছেন। অসংখ্য মুহাদ্দেস, ফকীহ, তফসীরকার ও বুজুর্গলোক তাঁকে অনুকরণ ও অনুসরণ করেছেন।

পরবর্তীদের মধ্যে হযরত ইমাম গজ্জালী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহে এবং হযরত ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহে এই বিশ্বচরাচরে প্রদীপ্ত ভাস্কর স্বরূপ। তাঁরাও ইমাম শাফেয়ীর কেতাবের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধাবান। তাঁরা সেই সবকে চির আদর্শের চোখে দেখতেন।

ইমাম শাফেয়ী সাহেবের পরিপূর্ণ বুদ্ধিমত্তা

তিনি বলেন, "চতুষ্পদ জন্তুদেরকে আদব শিক্ষা দেওয়ার চেয়ে মানুষকে রাজনীতি শিক্ষা দেয়া অধিক কঠিন। কেননা, মূর্খেরাও নিজদেরকে আলেম ভাবতে দ্বিধাবোধ করে না। তাদের দৃঢ় ধারণা যে, তারাও আলেম। কাজেই কোন উপদেষ্টার উপদেশই তারা গ্রাহ্য করে না।

দৃষ্টি-শক্তি যেমন এক জায়গায় যেয়ে থেমে যায়, বুদ্ধি-শক্তিও তদ্রূপ সীমাবদ্ধ, সেই সীমার বাইরে এটা আর অগ্রসর হতে পারে না।

সৎস্বভাব, দানশীলতা, বিনয় ও কৃতজ্ঞতা–মানুষের মধ্যে এ চারটি গুণের সমাবেশ থাকা বাঞ্ছনীয়। এ চারটি গুণের সমাবেশ থাকলে, মানুষ পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করতে পারে।

যে যতখানি সম্মানের উপযুক্ত, আমি যদি তাকে এটার চেয়ে অধিক সম্মান প্রদর্শন করি, তার দৃষ্টিতে আমি ততটুকু পরিমাণ হেয় প্রতিপন্ন হব।

গম ব্যতীত যাঁতার কাছে যাওয়ার ন্যায় এলমী মজলিসেও দোয়াত কলম ও কাগজ ব্যতীত যোগদান করা নিরর্থক।

নির্লজ্জ কাজের সংশ্রব কেয়ামতের দিবস অনুতাপের কারণ হবে।

সেই ব্যক্তিই নিজের প্রতি সর্বাধিক অবমাননা করে থাকে, যে এমন ব্যক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে থাকে, যে ব্যক্তি তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে না।

আমাকে যে ব্যক্তি চিনেনা, তার প্রশংসা করা আমার বেহুদা কাজ ব্যতীত আর কিছুই নেই।

হালাল রুজীর উপায়, পরহেজগারী এবং প্রতি অবস্থায় খোদার উপর ভরসা এই সবের মধ্যেই দুনিয়া ও আখেরাতের মঙ্গল নিহিত রয়েছে।

যে ব্যক্তি না বুঝে এলম হাসিল করে নেয়, সেই ব্যক্তি যেন অন্ধকার রাত্রিতে লাকড়ির বোঝা বেঁধে নিল এবং সেই বোঝা হতে কোন সর্প তাকে দংশন করল।

পরহেজগারী আলেমদের অলঙ্কার স্বরূপ। আর সৎস্বভাব তাঁদের পোশাক স্বরূপ। যে ব্যক্তির মধ্যে এলমের প্রতি মোহাব্বত নেই, তার মধ্যে কোন মঙ্গল নিহিত নেই। তাদের সাথে কোন সম্বন্ধ রাখা-তো দূরের কথা, তাদের সাথে জানা-শুনা হতেও দূরে থাকা চাই।

সকলকে খুশী রাখা কঠিন ব্যাপার। কাজেই উচিত যে, মানুষ খোদার সাথে সুগভীর সম্বন্ধ রাখবে এবং অপর কারও প্রতি বিন্দু পরিমাণ ভরসাও রাখবে না।

যাকে রাগান্বিত করা হয়, অথচ সে রাগে না, সেই ব্যক্তি গাধা সাদৃশ। আর যাকে সন্তুষ্ট করলেও খুশী হয়না, সে শয়তান।

খোদার এবাদত না করা পাপও বটে এবং বেদাআতও বটে।

কোরআনের শিক্ষা দ্বারা মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং ফেকাহ্ দ্বারা তার সম্মান বৃদ্ধি পায়। আর হাদীস দ্বারা দলীল শক্তিশালী হয়।

এলম লাভ করার পরও যে ব্যক্তি পাপ হতে বেঁচে থাকেনি, এলম তার কোন মঙ্গল সাধন করতে পারেনি।

যে ব্যক্তি তোমার সঙ্গে অপরের অপবাদ গেয়ে থাকে, সেই ব্যক্তি অপরের সাথেও তোমার অপবাদ গেয়ে বেড়াবে।

বন্ধুত্বের সময় যে ব্যক্তি তোমার এমন প্রশংসা গাইবে যা তোমার মধ্যে নেই, সেই ব্যক্তি শত্রুতার সময় তোমার এমন দোষের কথাও গেয়ে বেড়াবে যা তোমার মধ্যে নেই।

কোন ব্যক্তি যদি ভাল ও মন্দের সাথে জড়িত হয়ে পড়ে, তখন যে ব্যক্তি সুপথ বেছে নেয়, সেই ব্যক্তিই বুদ্ধিমান।

আমি যদি কোন সত্য কথা ও দলীল কারও সম্মুখে পেশ করি, তিনি যদি তা কবুল করে নেন, তবে এতেও আমার অন্তরে একটি প্রভাব নিপতিত হবে এবং তাতে আমার অন্তরে তার প্রতি ভালবাসা জন্মাবে।

আর কেউ যদি সত্য ব্যাপারেও অনর্থক আমার সাথে তর্ক-বিতর্কে মেতে উঠে, তবে আমার অন্তরে তার মর্যাদা ক্ষুণ্ন হবে।

অভাবের সময় বদান্যতা, নির্জনে খোদাকে ভয় করা বা যার কাছ হতে আমি কোনকিছু আশাকরি বা আমি যাকে ভয় করি, তার সাথে অধিক সত্য কথা বলা,–এই তিনটি কাজ অত্যন্ত কঠিন।

এলম আজাদ। তালেবুল এলম এটার গোলাম। গোলাম যদি খেদমত করে, তবে মনিবের মন পেতে পারে। আর গোলাম যদি এলমের সাথে অভিমান করে, তবে এলমকে সে অধিক অভিমানী পাবে।

বুদ্ধিমানের পরিচয় এই যে, তার বুদ্ধি তাকে মন্দ কাজ হতে বেঁচে রাখবে।

কোন কাজ অতি দ্রুত সম্পাদন করতে চাইলে, এটার সুফল হতে বঞ্চিত থাকতে হয়। আর ধীর-শান্তভাবে কাজ করলে, সফল আনয়নে এটা বিপুলভাবে সাহায্য করে থাকে।

সৎলোকের সাহচর্য সৎ, এবং মন্দ লোকের সাহচর্য মন্দ কাজের দিকে প্রেরণা জোগায়ে থাকে।

যিনি প্রকৃতপক্ষে মানবতার দাবী পূর্ণ করেন, তিনি মন্দ হতে বিমুক্ত হয়েছেন এবং তাঁর পাপ ধুয়ে মুছে যায়।

বুদ্ধিহীনেরা স্বজাতীদের চেয়ে বিজাতীদেরকে অধিক সম্মান করে থাকে। সে তার কপটতা দ্বারা বিজাতীয় লোকের অন্তর জয় করতে চায়। অথচ তা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

খোদা তোমাকে আজাদ পয়দা করেছেন; কাজেই তোমার আজাদ থাকাই কর্তব্য। স্বীয় বন্ধুকে নির্জনে উপদেশ দান করা এবং বুঝায়ে শুনায়ে দেয়া ভদ্রতার অন্তর্গত। দোষ সংশোধনের এটাই গুপ্ত রহস্য। আর সকলের সম্মুখে তাকে উপদেশ দান করা তার পক্ষে সম্মানহানীজনক এবং বদনামীসূচক।

বিনয় সৌজন্যের পরিচায়ক এবং অভিশপ্ত লোকেরাই অহঙ্কার করে থাকে। লোকেরা তার কাছে আমানত রাখবে, এমন আগ্রহশীল ব্যক্তি হয় চোর, না হয় বোকা।

তোমার উপর যদি বহু কাজের ভার দেয়া হয়, তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি প্রথমে আরম্ভ করবে। অভিমান করে, তবে এলমকে সে অধিক অভিমানী পাবে।

বুদ্ধিমানের পরিচয় এই যে, তার বুদ্ধি তাকে মন্দ কাজ হতে বাঁচায়ে রাখবে।

কোন কাজ অতি দ্রুত সম্পাদন করতে চাইলে, এটার সুফল হতে বঞ্চিত থাকতে হয়। আর ধীর-শান্তভাবে কাজ করলে, সফল আনয়নে এটা বিপুলভাবে সাহায্য করে থাকে।

সৎলোকের সাহচর্য সৎ এবং মন্দ লোকের সাহচর্য মন্দ কাজের দিকে প্রেরণা জোগায়ে থাকে।

যিনি প্রকৃতপক্ষে মানবতার দাবী পূর্ণ করেন, তিনি মন্দ হতে বিমুক্ত হয়েছেন এবং তাঁর পাপ ধুয়ে মুছে যায়।

বুদ্ধিহীনের স্বাজাতীদের চেয়ে বিজাতীদেরকে অধিক সম্মান করে থাকে। সে তার কপটতা দ্বারা বিজাতীয় লোকের অন্তর জয় করতে চায়। অথচ তা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

খোদা তোমাকে আজাদ পয়দা করেছেন; কাজেই তোমার আজাদ থাকাই কর্তব্য। স্বীয় বন্ধুকে নির্জনে উপদেশ দান করা এবং বুঝায়ে শুনায়ে দেয়া ভদ্রতার অন্তর্গত। দোষ সংশোধনের এটাই গুপ্ত রহস্য। আর সকলের সম্মুখে তাকে উপদেশ দান করা তার পক্ষে সম্মানহানীজনক এবং বদনামীসূচক।

বিনয় সৌজন্যের পরিচায়ক এবং অভিশপ্ত লোকেরাই অহঙ্কার করে থাকে। লোকেরা তার কাছে আমানত রাখবে, এমন আগ্রহশীল ব্যক্তি হয় চোর, না হয় বোকা।

তোমার উপর যদি বহু কাজের ভার দেয়া হয়, তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি প্রথমে আরম্ভ করবে।

দুনিয়া-লোভী লোকদেরকে দুনিয়াদারদের গোলাম বনিতে হয়। অল্পে তুষ্ট লোককে কারও কাছে কোন কিছু চাইতে হয় না। এজন্য তারা মানুষের কাছে বেপরোয়া।

যিনি খোদার হেকমতের আলো দেখতে চান, তিনি যেন বোকাদের সংশ্রব পরিত্যাগ করেন, এবং নির্জ্জনতা অবলম্বন করেন। আর যে সকল আলেম আদব, তমীজ ও ধর্মহীন, তাঁদের সংশ্রব হতেও যেন তিনি দূরে থাকেন। সাবধান থাকবে, তোমার জিহ্বা হতে যেন একটিও বেহুদা কথা বের না হয়। কোন একটি কথা তোমার মুখ দিয়ে বের হয়ে গেলেই, তুমি এটার কাবু হয়ে যাবে। এটা তখন আর তোমার কাবুতে থাকবে না।

আলেমদের কাছ মূর্খেরা মূর্খের চেয়ে অধিক নয়। তদ্রূপ মূর্খদের কাছে আলেমও মূর্খরূপে পরিগণিত হয়। এটা কি এলমের কম বৈশিষ্ট্য যে, মূর্খেরাও এলমের দাবী করে থাকে? আর মূর্খতা এটার চেয়ে অধিক কি গর্হিত হতে পারে না, মূর্খেরাও মুর্খতাকে অস্বীকার করে থাকে। এজন্যই মূর্খ লোককে মূর্খ বললে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠে।

দানশীলতা দুনিয়া ও আখেরাতে তোমাকে স্বীয় আবেষ্টনে আগলে রাখবে। অন্তর জিহ্বার জন্য একটি ক্ষেত্রস্বরূপ। এতে উত্তম কথা বপন কর। সবগুলো যদি চারা না দেয়, তবে কিছু কিছু চারারূপে গজায়ে উঠবে।

জিহ্বা হতে যে কথা বের হয়, তা পাথরের চেয়ে শক্ত, সূচ এর আঘাতের চেয়ে অধিক বেদনাদায়ক, অম্লের চেয়ে অধিক তিক্ত এবং তলোয়ারের চেয়ে অধিক ধারাল হতে পারে। কাজেই বিশেষ সতর্কতার সাথে জিহ্বা পরিচালনা করবে। অপরিপক্ক লোক যদি রাজনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালানা করতে চাহে, তবে তাকে প্রতি পদক্ষেপে অপমানিত হতে হবে। যে এটার লোভী হয়, এটা তার কাছ হতে পলায়ন করে।

সুদীর্ঘ জীবন, স্বচ্ছলতা ও তীক্ষ্ণ মেধা থাকা তালেবুল এলমের জন্য অপরিহার্য গুণ। এলম প্রকৃতপক্ষে দুই প্রকার। আত্মার এলম এবং শরীরের এলম। এলমে দীন আত্মার এলম এবং চিকিৎসা শাস্ত্র শরীরের এলম। এলম লাভ করা নফল নামায পড়া হতে উত্তম।"

ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহে একজন খ্যাতনামা কবি ছিলেন। তিনি অবশ্য খুব সতর্কতার সাথে কবিতা আবৃত্তি করতেন। কিন্তু যেহেতু কবিত্ব ছিল আরববাসীদের জাতীয় জীবনের প্রাণ, এজন্যই কবিত্ব ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ আলাইহের জন্য অতি সহজ সরল ব্যাপার ছিল। এটা বরং আরববাসীর প্রকৃতিগত গুণ ছিল। কাজেই ইমাম তিনি রাহমাতুল্লাহ আলাইহের জীবনে এটার ব্যতিক্রম হতে পারে না। তিনি অতি অনায়াসে কবিতা আবৃত্তি করতে পারতেন। খোদাতায়ালা তাঁকে কবি-সুলভ সবকিছু গুণই প্রদান করেছিলেন।

আব্বাস এজরাক একজন কবি; একদিন ইমাম সাহেবের খেদমতে এসে বলতে লাগলেন, " হে আবু আবদুল্লাহ, আমি কবিতার কয়েকটি লাইন আবৃত্তি করেছি। আপনিও যদি তদানুরূপ কয়েক লাইন কবিতা আবৃত্তি করতে পারেন, তবে আমি কবিত্ব পরিত্যাগ করব।" তারপর কবি প্রবর একটি কবিতা আবৃত্তি করেন। এটার সারমর্ম এই যে, শত্রুর সাথে সংগ্রাম ব্যতীত আমার মধ্যে অন্য কোন সাহস বিদ্যমান নেই। জমানা পুরাতন হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আমার হিম্মত পুরাতন হবার নয়। সম্পদশালী লোকের প্রতি লোকের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ হয়ে গিয়েছে। তারা বুদ্ধি ও বোকামীর মধ্যে পার্থক্য বুঝবার ক্ষমতা রাখেন। সাহসিকতা হতে যদি সম্পদের উৎপত্তি হতো তবে তা আমাকে আকাশের কিনারা পর্যন্ত উন্নীত করত।

পাল্টা জবাব হিসেবে ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহে অজ্ঞাতসারেই কবিতার আকারে বলে যেতে লাগলেন। কবিতা সমূহের সারমর্ম এই যে, খোদা যাঁকে কোন বিশেষ ক্ষমতা দান করেছেন, তিনি যদি এ সম্বন্ধে কোন কৃতজ্ঞতা

প্রকাশ না করেন এবং তজ্জন্য খোদাতালার কোন প্রশংসাবাদ না করেন, তবে তিনি বদনসীব। হতভাগ্য লোকেরা বন্ধ দরজাগুলোকে খুলে দেয়। আর খোশনসীব তাকে প্রত্যেক দরজার নিকটবর্তী করে দেয়। কাজেই আপনি যদি শুনতে পান যে, কোন সৌভাগ্যশালী লোক একটি শুষ্ক কাষ্ঠও হাতে নিয়েছেন এবং এটা তাঁর হাতের স্পর্শ পাওয়া মাত্রই একটি ধারাল তলোয়ারে পরিণত হয়ে গিয়েছে, তবে তা আপনি বিশ্বাস করে নিবেন। আর আপনি যদি শুনতে পান যে, কোন দুর্ভাগ্যশালী লোক পানি পান করতে গিয়েছে এবং সে পানিতে ডুবে মরে গিয়েছে, তবে আপনি তাও অনায়াসে বিশ্বাস করবেন।

এ সকল কবিতা শুনে আব্বাস এজরাক বললেন, সুবহানল্লাহ্! এ সকল কি কবিতা, না অমৃত বাণী? তিনি নতশিরে ইমাম শাফেয়ী (রাঃ) সাহেবের প্রশংসা করে সেই স্থান পরিত্যাগ করলেন।

অতঃপর ইমাম শাফেয়ী সাহেব মিসরে গমন করেন। তথাকার অধিবাসী ইমাম মালেক রাহমাতুল্লাহ আলাইহের পরম ভক্ত ছিল। তারা ইমাম সাহেবের প্রতি যথাযথ ভক্তি প্রদর্শন করতে লাগলেন। কিন্তু কোন কোন মাসআলা সম্বন্ধে যখন ইমাম মালেকের সাথে তাঁর মতবিরোধ দেখা দিল, তখন তাঁর প্রতি তাদের অচল অটল ভক্তিতে ভাটা পড়ল। তাতে ইমাম শাফেয়ী সাহেব একটি কবিতা রচনা করেন। এটার সারমর্ম এ যে, উলু বনে মুক্তা ছড়ান বুদ্ধিমানের কাজ নয়। খোদার ফজল ও করম গুণে, কোন বিদূষী বুদ্ধিমান যদি সেই পথের পথিক হন, তখন হয়ত সেই মুক্তা সমাদৃত হবে। অন্যথায় সেই মুক্তা বিফলে যাবে যে ব্যক্তি মুর্খকে এমন শিক্ষা দেয়, সেই এলম বিফলে যায়।

ইমাম সাহেব নবী-পরিবারের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা স্বরূপ একটি কবিতা রচনা করেন। এটার সারমর্ম নিম্নে প্রদত্ত হলো।

"হে নবী বংশধরগণ, আপনাদের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন কোরআন দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। হযরত (সাঃ)-এর প্রতি যে ব্যক্তি দরুদ পাঠ না করে, তার নামায কবুল হবে না।"

"আমি প্রকাশ্যভাবেই বলছি যে, নবী-বংশধরদের প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের মানুষ যদি রাফেজী হয়ে যায় এবং বিশেষভাবে হযরত আলী কররমল্লাহু ওয়াজহাহুর প্রতি ভক্তি প্রদর্শনে আমি যদি রাফিজী আখ্যা হতে রেহাই না পাই এবং সিদ্দীকে আকবরের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করলে কেউ যদি আমাকে নাসেবী আখ্যা প্রদানে উন্মুখ হয়ে পড়ে, তবে আমি অম্লানবদনে স্বীকার করেছি যে, আমি রাফেজী ও নাসেবী উভয়ই। আর উক্ত বিশ্বাসসহ আমি কবরে চলে যেতেও রাজী আছি।"

ইমাম শাফেয়ী অন্য একটি কবিতায় লিখেছেন–"যিনি বুদ্ধিমান ও পরহেজগার হন, তাঁর নেকী লোকের কুৎসা-রটনা হতে তাঁকে এরূপভাবে প্রতিরোধ করে থাকে, যেমন কঠিন পীড়া রোগীকে অন্যান্য রোগীদের রোগ সম্বন্ধে বেখবর করে দেয়।"

"হিংসুক আমার দৃষ্টিপথের বাইরে গেলে, আমার নিন্দাবাদ প্রচারে উঠে পড়ে লেগে যায়! আর সে যখন আমার দৃষ্টিপথে নিপতিত হয়, তখন প্রশংসাবাদে পঞ্চমুখ হয়ে উঠে।"

" যে ব্যক্তি নিজের ইজ্জত নিজেই বুঝেনা, খোদার ডর-ভয় তার অন্তরে স্থান লাভ করে না এবং লোক-লজ্জা যার কাছে অপরিচিত, তার অধঃপতন অনিবার্য।"

"হে আমার মন, আমার কাছে যদি একদিনেরও জীবিকা থেকে থাকে, তবে আহার করব, সেই চিন্তা আমি করি না; কেননা, আমি জানি যে, আগামীকালের জন্য নব জীবিকা রয়েছে। খোদার যা কিছু মর্জি, আমি তাতেই পরিতুষ্ট রয়েছি। আমার সবকিছু ইচ্ছাকে আমি তাঁর ইচ্ছাতে বিলীন করে দিয়েছি।"

"আমি আমার সমভাবাপন্ন ভ্রাতাদের সাথে মানবতা রক্ষা করে থাকি। আর তেমন সব লোকের সাথেও মানবতা রক্ষা করে থাকি, যারা আমার সৎকাজসমূকে পছন্দ করে থাকে, আমার মহৎজীবন যাপনে আমার সহায়তা করে থাকে। এবং আমার মৃত্যুর পরেও আমাকে তারা স্মরণ করে। আমার নিজের স্বার্থের জন্য আমি আমার ভ্রাতৃবৃন্দকে অনুসন্ধান করেছি। কিন্তু অদ্রূপ ভাই আমি অতি কম পেয়েছি। আমার সঙ্কট-মুহূর্তে আমাকে সাহায্য করবে, এমন কয়টি ভ্রাতা মিলে! এমন বন্ধুটি যদি পেতাম, তবে আমার সম্পত্তি তাকে বিলায়ে দিতাম।"

"হে দুনিয়া-ধোকা প্রাপ্ত লোকেরা! তোমরা স্মরণ রাখিও যে, বাড়ী এবং বাড়ী প্রস্তুতকারী জমানা উভয়কেই ধ্বংস করবে। দুনিয়ার গৌরব এবং জাকজমক যাদের কাছে পরম পছন্দনীয়, তাদের জানা আবশ্যক যে, এই গৌরব শীঘ্রই বিলীন হয়ে যাবে। তোমরা স্মরণ রাখবে যে, দুনিয়ার ভাণ্ডার স্বর্ণ দ্বারা ভরপুর হয়ে থাকে। কিন্তু তুমি তোমার হৃদয়-ভাণ্ডারকে ঈমান ও নেকী দ্বারা পরিপূর্ণ কর।"

আপনি যখন কারও সঙ্গে ছফরে বের হন, তখন আপনি আপনার সাথীদের সঙ্গে প্রকৃত ভাই-এর ন্যায় ব্যবহার করবেন। বুদ্ধিমান এবং আলেম নিজের ত্রুটির উপর কড়া দৃষ্টি রাখে। আর স্বীয় সাথীদের দোষকে গোপন রাখতে চেষ্টা করে।"

"আপনি সকলের দোষ গেয়ে বেড়াবেন, এটা কখনও বাঞ্ছনীয় হতে পারে না। বরং আপনি তাদের সৎপথে পরিচালিত করতে সর্বদা সচেষ্ট থাকবেন। আপনি যদি তাদের দোষ প্রকাশ করতে থাকেন, তবে আপনার বন্ধু আপনা-আপনি যদি তাদের দোষ প্রকাশ করতে থাকেন, তবে আপনার বন্ধু আপনা-আপনি কমতে থাকবে। তখন এমন একদিন আসবে যে, আপনার পাশে আর একটি বন্ধুকেও দেখতে পাবেন না।"

"আমি লোভকে পরিত্যাগ করে আরামের অধিকারী হয়েছি। লালসা যতই বৃদ্ধি পেতে থাকে, অপমানিত হবার সম্ভাবনাও ততই বৃদ্ধি পেতে থাকে। অল্পে তুষ্ট মানুষ অতি কম। আমি এটাকে স্বাগত সমাদর করেছি। অল্পে সন্তুষ্টির জীবন আমাকে গৌরবান্বিত করেছে। মানুষের অন্তরে লোভ যখন স্থায়ী আবাস নির্মাণ করে, তখন মানুষ প্রতিরোজই অধিক অপমানিত ও অপদস্ত হতে থাকে।"

নির্জনবাসের সময় আপনি কখনও ভাববেন না যে, আপনি একাকী। বাস্তব সত্য এই যে, আমার উপর একজন নেগাহবান রয়েছে। মুহূর্তকালও অন্তরে এমন কল্পনাকে স্থান দেয়া সমীচীন নয় যে, খোদা আমাদের সম্বন্ধে গাফেল রয়েছেন। কোন পাপ বা দোষ তাঁর কাছে গোপন নয়।

"খোদার কসম, মানুষ যখন গাফলতের ঘুম-ঘোরে বিভোর থাকে, তখন প্রতি পদে পদে পাপ তাকে কাবু করে থাকে। হায় আক্ষেপ, খোদা যদি আমার পাপকে ক্ষমা করে আমার তওবা কবুল করে নিতেন, তবে আমি মহাসন্তুষ্টি লাভ করতাম।"

"জমানার বাতাস যদি তোমার অনুকূল হয়ে থাকে, তবে তুমি এটাকে তোমার পরম সৌভাগ্য বলে মনে করবে। সব প্রচেষ্টারই একদিন সমাপ্তি ঘটবে। এমতাবস্থায় মঙ্গলদায়ক কাজ করতে কস্মিনকালেও আলস্য করিওনা। আপনার দিনও কখন ফুরায়ে যাবে, তা কেউ বলে দিতে পারে না।"

তুমি নিজেও যখন জ্ঞাত নও এবং পরিজ্ঞাত লোকের কাছেও জিজ্ঞেস কর না, এমতাবস্থায় তোমার জানবার ও বুঝবার কোনই উপায় নেই। তুমি যদি পরিজ্ঞাত থাকতে বা জানবার চেষ্টা করতে, তবে তুমি জেনে বুঝে কখনও জ্ঞানী মনিষীদের বিরোধিতা করতে না।"

"সৌভাগ্যশালীদের সম্বন্ধে বহু প্রশংসা করা হয়ে থাকে। এমন কি তারা যা না করে থাকে, সেই সম্বন্ধেও তাদের বহু প্রশংসা করা হয়ে থাকে। আর দুর্ভাগ্যশালীদের যখন কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, তখন সে যা করেনি এমন শত দোষও তার ঘাড়ে চাপায়ে দেয়া হয়।"

ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহের গুণ-গরিমা ও পরিপূর্ণতার সীমারেখা টানা সম্ভবপর নয়। আলেম ও ইমাম হিসেবে সারা বিশ্ব জুড়ে তাঁর খ্যাতি। খোদা তাঁকে এমন মহা এলম ও সৎগুণরাজির অধিকারী করেছেন যে, তাঁর পূর্ববর্তী এবং পরবর্তীদের মধ্যে তা অতি বিরল।"

শাহ্ ওলিউল্লাহ্ সাহেবের দৃষ্টিতে ইমাম শাফেয়ী (রাঃ)

হানফী ও মালেকী মাযহাব যখন প্রচারিত হয় এবং তাঁদের উসূল ও ফুরু' লোক সমাজে খ্যাতি লাভ করে, তখন ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহের যদি আরম্ভ হয়। ইমাম শাফেয়ী যখন তাঁর পূর্ববর্তীদের বিধি-বিধান সর্বশেষভাবে চিন্তা করে দেখলেন, তখন তিনি তাতে এমন বহু কিছু পেলেন যে, যাতে তিনি সেই পন্থা অবলম্বন করতে পারলেন না। ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহে 'কিতাবুল উম্মে' এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেন। তাতে তিনি বলেছেন যে, পূর্ববর্তীগণ রেওয়ায়েতে মুরসাল ও মুনকাতেয়ের উপরও আমল করতেন। আর সেই সকল রেওয়ায়েত ত্রুটিশূন্য নয়।

হাদীসের সকল পন্থা যখন সঙ্কলিত করা হলো, তখন এটা স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়ল যে, অধিকাংশ মুরসাল হাদীসই ভিত্তিশূন্য ব্যতীত আর কিছুই নয় এবং সেগুলো সনদযুক্ত রেওয়ায়েত সমূহেরও খেলাফ। এই কারণে ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, মুরসাল রেওয়ায়েতগুলো তখনই আমলে আনা যায়, যখন এদের মধ্যে শর্তাবলী বিদ্যমান থাকে। ইমাম শাফেয়ী (রাঃ) সাহেব 'কুতুবুল উসুল' কিতাবে এ সকল শর্ত বর্ণনা করেছেন।

দ্বিতীয় ব্যাপার এই যে, বিভিন্ন হাদীসের ব্যাপারে পূর্ববর্তীদের জমানায় এ সকল বিধি বিধান আরোপিত হয়নি যাতে এদের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য আনয়ন করা যায়। কাজেই তাঁদের এজতেহাদী মসায়েলে প্রায়ই ভুল-ত্রুটি রয়ে গিয়েছে। সকল প্রয়োজনের প্রতি নজর রেখে ইমাম শাফেয়ী (রাঃ) সেই সকল হাদীসের বেলায় উসুল-ভিত্তি স্থাপনে প্রয়াসী হলেন। আর একটি কিতাবে বিশেষভাবে সেই সকল বিধি-বিধান লিপিবদ্ধ হলেন। তখন তিনি মদীনার আলেমদের সাথে তাঁর এই অনৈক্য প্রকাশ করেন যে, একজন সাক্ষী কসম খেয়ে কোন কিছু বললেই তাঁরা তা গ্রাহ্য করে থাকেন। তিনি বলেন যে, তাতে কোরআন মজীদের উপর হাত বাড়ান হয়। ইমাম শাফেয়ী (রাঃ) বলেন যে, আপনাদের কাছে কি এটা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে যে, খবর ওয়াহেদ দ্বারা আল্লাহর কিতাবের উপর বাড়াবাড়ি

করা যায়? ইমাম মোহাম্মদ (রাঃ) তা স্বীকার করলে, ইমাম শাফেয়ী বললেন, তবে আপনারা কিরূপে তা বলে থাকেন যে, ওয়ারেসের জন্য ওছিয়ত জায়েয নয়! আর আপনাদের যুক্তির সমর্থনে আপনারা দলীল পেশ করে থাকেন, খবরদার, ওয়ারেসের নিমিত্ত ওসিয়ত দুরস্ত নয়।" অথচ খোদা বলেছেন, তোমাদের নিমিত্ত এটা অপরিহার্য করা হয়েছে যে, মৃত্যু আসবার সময় যদি মাল থেকে থাকে, তবে মাতাপিতা ও আত্মীয়-স্বজনের নিমিত্ত তাতে ওসিয়ত করে যাওয়া চাই।"

ইমাম শাফেয়ী (রাঃ) এ জাতীয় আরও কতিপয় প্রতিবাদ করেছেন। ইমাম মোহাম্মদ (রাঃ) এটার কোন জবাব দিতে পারেননি।

অপর একটি ব্যাপার এই ছিল যে, তাঁদের কাছে এমন সব সহী রেওয়ায়েত পৌছত, যে সম্বন্ধে ওলমায়ে তাবেয়ীনদেরকে ফতোয়া দিতে হতো। কাজেই নিজেদের রায় অনুযায়ী তাঁদেরকে এজতেহাদ করতে হতো। শব্দ সমূহের প্রতি সাধারণতঃ তাঁরা অধিক গুরুত্ব প্রদান করতেন। আর তাঁর সাহাবদের পায়রবী করতেন। সাহাবাদের অভিমত অনুযায়ীই তাঁরা ফতোয়া দিতেন। কিন্তু তৃতীয় পর্যায়ে করলেন যে, এ সকল হাদীস তাঁদের ওলামা এবং সর্বজন সম্মিলিত অভিমতের বিরোধী। কাজেই এ সকল হাদীস অনুযায়ী তাঁরা আমল করলেন না।

অথবা এ তৃতীয় পর্যায়ে এ সকল হাদীস যখন প্রচারিত হয়নি, তখন মোহাদ্দেসীন বিশেষ চিন্তা করে দেখলেন এবং বিভিন্ন রাজ্যে পরিভ্রমণ করে হাদীসের আলেমদের কাছ হতে এ সম্বন্ধে তাহকীক করার পর এমন কতেক হাদীস বের হয়ে পড়ল যে, সাহাবাদের মধ্যে মাত্র দুই একজনে এ সকল হাদীস রেওয়ায়েত করছেন। আর তাঁদের কাছ হতেই দুই একজন রাবী তা রেওয়ায়েত করেন। কাজেই অধিকাংশ ফকীরদের দৃষ্টিপথে তা নিপতিত হয়নি। হোফ্ফাজে হাদীসগণ যখন সর্বপ্রকার রেওয়ায়েত সমবেত করেন, তখন এ সকল হাদীসও প্রসিদ্ধি লাভ করে। বসরার আলেমগণ এ সকল রেওয়ায়েত করতেন। আর অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীবৃন্দ এ সম্বন্ধে ওয়াকেফহাল ছিলেন না।

ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহে সে যুগে এ সম্বন্ধে বহু গবেষণার পর স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, ওলমা, সাহাবা এবং তাবেয়ীন প্রত্যেক মাসআলা সম্বন্ধে হাদীস জানবার জন্য চেষ্টা করতেন। এ সম্বন্ধে তাঁরা কোন রেওয়ায়েত না পেলে, তখন তাঁরা দলীল পেশ করতেন। কিন্তু তাঁরা যখনই তাঁদের দলীলের খেলাফ কোন হাদীস পেতেন, তখনই তাঁরা স্বীয় রায় ও এজতেহাদ বর্জন করতেন। কিন্তু এ সকল সুযোগ যখন ছিল না, তখন হাদীস অনুযায়ী তাঁদের আমল না হয়ে থাকলে, এটাকে হাদীস-বিরোধী আমল বলা চলে না।

সাহাবা কেরামদের সব ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহের জমানায় একত্র করা হয়েছিল। সে সকল অধিকাংশ বাণী এবং আপোসে এদের মধ্যে মতবিরোধিতার প্রতি ইমাম সাহেবের দৃষ্টি যখন আকৃষ্ট হলো, তখন তিনি স্পষ্ট মত প্রকাশ করলেন যে, এ সকল সহী হাদীসের খেলাফ এবং এটা এজন্য ঘটেছে যে, এ সম্বন্ধে রেওয়ায়েত তাঁদের কাছ পৌঁছেনি, কাজেই হাদীস অনুযায়ী তাঁদের আমল করা উচিত এবং যে মাসআলা সম্বন্ধে সাহাবাগণ একমত ছিলেন না, সেই সম্বন্ধে ইমাম সাহেব এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, তাঁরাও মানুষ ছিলেন এবং আমরাও মানুষ। এটার অপর একটি কারণ এই যে, ইমাম শাফেয়ী ফকীহদের এক জামাআতকে দেখেন যে, যেই কেয়াস সম্বন্ধে শরীয়তের অনুমতি রয়েছে, সেই কেয়াস রেওয়ায়েতসমূহকে এমন সুরক্ষিত রেখেছেন যে, যা অপর কোন পন্থা দ্বারা সম্ভবপর হয়নি। ফকীহগণ সেই কেয়াস ও রায় সম্বন্ধে কোন পার্থক্য করেননি, এবং তাঁদের সেই সকল রায়ের নাম তাঁরা রেখেছেন।

ইবনে হাজেব মুখতাসরুল উলুম কিতাবে নকল করেছেন যে, এতিম কত বছর পর্যন্ত এতিম থাকে, এ সম্বন্ধে অনেকের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। ফকীহগণ তাঁদের নিমিত্ত পঁচিশ বছর বয়স নির্ধারণ করেছেন। আর এটাও বলেছেন যে, এতিম যখন পঁচিশ বছর বয়সে পদার্পণ করে, তখন তাদের মাল-সম্পত্তি তাদেরকে দিয়ে দেয়া সমুচিত। আর এটাকেও তাঁরাও কেয়াস নামে অভিহিত করলেন।

মোটকথা এ যে, ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহে তিনি এ সম্বন্ধে বহু তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, সাহসিকতা ও আপ্রাণ চেষ্টা বহু কিতাব রচনা করেন।

ইমাম শাফেয়ী সাহেবের দুইজন নামজাদা শাগরেদ

আমাদের এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ শেষ করার পূর্বে হযরত ইমাম বায়হাকী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহে এবং হাফেজ ইবনে হাজর আসকলানী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহে সম্বন্ধে অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

অধিকাংশ মোহাদ্দেসীনই হযরত ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহের সিদ্ধান্ত অনুসারেই আমল করেছেন। এখন আমরা এমন দুইজন মহানব্যক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করব, যাঁরা ইমাম সাহেবের ফেকাহ ও তাঁর উসুলকে বিশ্ববাসীর কাছে পরিচিত করে তুলেছেন। তন্মধ্যে একজন হলেন হযরত ইমাম বায়হাকী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহে এবং অপর ব্যক্তি হলেন, হাফেজ ইবনে হাজর আসকালানী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহে। তাঁদের উভয়ের সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা হওয়া আবশ্যক।

ইমাম বায়হাকী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহে

আহমদ বিন হাসন বিন আলী বিন আবদুল্লাহ্ বিন মুসা আলহাফেজ আবু বকর বায়হাকী হিজরী ৩৮৪ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইমাম শাফেয়ী সাহেবের শাগরেদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর 'সুননে কুবরা' দশ খণ্ডে সমাপ্ত হয়েছে। হাদীস এবং সাহাবাদের আসার সম্বন্ধে আলোচনাপূর্ণ একটি অদ্বিতীয় কিতাব তিনি রচনা করেছেন। খোদার নাম ও গুণ সম্বন্ধে তিনি একটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। এ'তেকাদ, কিতাবে দালায়েলে নুবুওত, কিতাবে শুয়াবুল ঈমান, মুনাকেবে ইমাম আহমদ, আহকামুল কোরআন, ইমাম শাফেয়ী, দাওয়াতে সগীর, কিতাবুল বা আছ ওয়ান্নুশুর, কিতাবুজ্জুহ্দ এবং অন্যান্য বহু গ্রন্থ রচনা করেন।

হাফেজ জাহবী রাহমাতুল্লাজ্ আলাইহে বলেন, ইমাম বায়হাকী তাঁর জমানায় হাফেজে হাদীস হিসেবে অন্যতম ছিলেন। ইমামুল বাহরাইন বলেন, দুনিয়ায় এমন কোন শাফেয়ী নেই, যাঁর উপর ইমাম শাফেয়ীর অপরিসীম সহৃদয়তা নেই। কিন্তু ইমাম বায়হাকী সম্বন্ধে এটা বলা চলে না। বরং এটা নিরাপদে বলা চলে যে, ইমাম শাফেয়ীর উপরই তাঁর মেহেরবাণী রয়েছে। তিনি ইমাম শাফেয়ী সাহেবের মাযহাবের সমর্থনে ও শক্তি-বৃদ্ধির মানসে সকল হাদীস ও আসারে সাহাবা সঙ্কলিত করেছেন।

এক বুজুর্গ ব্যক্তি স্বপ্নে দেখেন যে, ইমাম শাফেয়ী এক অতি উচ্চ আসন অলঙ্কৃত করে রয়েছেন এবং বলছেন, "বায়হাকী কিতাব দ্বারা উপকৃত হয়েছি।"

আবু বকর বিন মুহাম্মদ মরুজী বলেন, "আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, এক আলোকময় সিন্ধুক আসমানে চলে যাচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম এটা কি? আমাকে বলা হলো যে, বায়হাকীর যে সকল গ্রন্থ আল্লাহর দরবারে গৃহীত হয়েছে, এই সিন্ধুকে সেই সকল কিতাব রয়েছে।" ইমাম বায়হাকী দীর্ঘ ত্রিশ বছর কাল রোযা রাখেন। তিনি ৪৫৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

হাফেজ ইবনে হাজর আসকলানী

হাফেজ সেওতী বলেন, হাফেজ ইবনে হাজর আসকলানী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহের পিতার যে সকল সন্তান জন্মিত, তারা শৈশবেই মারা যেত। তাঁর পিতা সেই জমানার ওলি-শ্রেষ্ঠ শেখ জাফরীর কাছে এজন্য দো'আ চাইলেন। তিনি বললেন, "এবার আপনার যে সন্তান জন্মিবেন, তিনি একজন হাদীসের আলেম হবেন এবং তিনি এমন একজন পূর্ণজ্ঞানী লোক হবেন যে, তাঁর এলম দ্বারা কেয়ামত পর্যন্ত লোকেরা উপকৃত হবে।" ইবনে হাজর ৭৭৩ হিজরীতে

জন্মগ্রহণ করেন। যৌবনে পদার্পণ করলে তিনি সমগ্র মুসলিম জাহান পরিভ্রমণ করেন এবং হাফেজুল হাদীস ইমাম জৈনুদ্দীন ইরাকীর খেদমতে পূর্ণ দশ বছর কাল থেকে হাদীস, উসূলে হাদীস আলল্ হাদীস এবং আসমায়ুর রেজাল শিক্ষা করেন। তিনি দেড়শতের চেয়েও অধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর গ্রন্থের বিশেষত্ব এই ছিল যে, তা সর্বজনগ্রাহ্য হতো। মিসর ও হিন্দুস্থানে তাঁর রচিত প্রায় পঞ্চাশটি গ্রন্থ মুদ্রিত হয়েছে। তাঁর গ্রন্থরাজির মধ্যে নিম্নলিখিত কিতাব অতি বিখ্যাত ছিল। কিতাবের নাম–নুখ্বতুল ফিক্‌র, তওয়ালিওসীস, ফতহুল বারী শরাহ বোখারী ১৪ খণ্ড, তাহজীবুত্তাহজীব ১২ খণ্ড, লেসানুল মীজান ৬ খণ্ড, আসাবা ফী মারেফতিস্ সাহাবা, আহাদীসুল হেদায়া ইত্যাদি।

তিনি ৭৯ বছর বয়সে ৮৫৬ হিজরীতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর জানাযায় লক্ষাধিক লোকের সমাগম হয়। মিসরের বাদশা তাঁর জানাযা কবরস্থান পর্যন্ত বহন করে নিয়ে যেতে অপরাপর লোকজনের সাথে অংশগ্রহণ করেন। রাজা-বাদশা, আমীয়-ওমরা, আলেম-ওলমা এবং সমগ্র জনসাধারণ তাঁর মৃত্যু-শোকে অধীর হন। তাঁর জানাযা বহন করার সময় বৃষ্টির মৌসুমে না থাকা সত্ত্বেও হালকা হালকা বৃষ্টিপাত হচ্ছিল। তাঁর গ্রন্থরাজি সকল মাযহাবের লোকের জন্যই বিশেষ উপকারী ছিল। তা বিশেষভাবে শাফেয়ীদের জন্য হেদায়তের মশাল ও সলাহ্ এবং ফলাহের উৎস্বরূপ ছিল।

ইমাম শাফেয়ীর (রাঃ) মৃত্যুর পূর্ববর্তী অবস্থা

ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহে অর্শ্বরোগে ভুগছিল। হাফেজ ইবনে হাজর আসকলানী (রাঃ) বলেন, ইমাম সাহেব কঠিন অশ্বরোগে ভুগেছিলেন। অশ্বারোহণের সময় প্রায়ই তাঁর শরীর হতে রক্ত নির্গত হতো। তাঁর পায়জামা রক্তে ভিজে মোজা পর্যন্ত রক্তাক্ত হয়ে উঠত।

তাঁর মৃত্যু সম্বন্দে অন্যান্য মতামতও দেখা যায়। কথিত আছে যে, ফীতান নামে একজন মালেকী ইমাম সাহেবের সাথে তর্ক-বিতর্ক করেন। লোকটি বিতর্কের সময় ভদ্রতার সীমা ডিংগায়ে যান। এটা নিয়ে মুকদ্দমা রুজ হয়। বিসরের আমীর এটার বিচার করে ফীতানকে শাস্তি দান করেন।

ফীতান এটার প্রতিশোধ নিবার জন্য সুযোগ অনুসন্ধান করতে লাগলেন। এক অন্ধকার রাত্রিতে সুযোগ ফীতান ইমাম সাহেবের মাথায় এমন এক আঘাত করলেন যে, তাতে ইমাম সাহেবের মাথা ফেটে যায়।

তিনি অর্শ্বরোগের দরুণ অত্যন্ত দুর্বল ছিলেন। কাজেই উক্ত আঘাতের ফলে ইমাম সাহেবের মুমূর্ষু অবস্থা দেখা দিল।

অপর একটি ব্যাপার এই ছিল যে, আশহাব বিন আবদুল আজীজ মালেকী মাযহাবের একজন ফকীহ্ ছিলেন। তাঁর একটি নিয়মিত কাজ এই ছিল যে, তিনি সর্বদাই ইমাম শাফেয়ী (রাঃ) সাহেবের জন্য বদ দো'আ করতেন। তিনি দো'আ বলতেন, "হে খোদা, শাফেয়ীকে দুনিয়া হতে উঠালেন নিয়ে যাও অন্যথায় মালেকী মাযহাবের ফিকাহ ধ্বংস হয়ে যাবে।"

এ সকলের প্রতি লক্ষ্য করে ইমাম শাফেয়ী (রাঃ) সাহেব ফরিয়াদ করতেন, "হে খোদা! বহু লোক আমার মৃত্যু কামনা করে থাকে। আচ্ছা, আমি যদি একান্তই মরে যাই, তবে মৃত্যু হতে কে-ই বা বাঁচবে! জ্ঞান সম্বন্ধে তারা যদি বিন্দু পরিমাণও ওয়াকিফহাল থাকতো, তবে তারা এতটুকু স্বচ্ছন্দভাবেই বুঝতে পারত যে, যারা আমার মৃত্যু কামনা করছেন, তারা কি চিরজীবিত থাকবে?"

কথা আছে যে, ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহের মৃত্যুর আঠার দিন পরে আশহাবও মৃত্যুমুখে পতিত হন।

দুইশত চার হিজরীতে রজব মাসের ত্রিশ তারিখ আসরের নামাযের সময় ইমাম সাহেবের শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত মারাত্মক হয়ে উঠে ইমাম মাজনী তখন তাঁর শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি আরজ করলেন, "হে উস্তাদমণ্ডলীর উস্তাদ, আপনার মেজাজ এখন কেমন?"

ইমাম সাহেব বললেন, "আজ আমি দুনিয়া হতে বিদায় নিয়েছি। আমার ভ্রাতাদের কাছ হতে আজ আমি বিচ্ছিন্ন হবো। আজ আমাকে আমার মন্দ কাজের জন্য শাস্তিভোগ করতে হবে। আজ আমাকে খোদার সম্মুখে উপস্থিত হতে হবে। আমি খোদার কসম করে বলছি যে, আমার কাছে এমন কোন খবর পৌঁছেনি যে, আমি জান্নাতবাসী হবো এবং আমাকে সেখানে স্বাগত-সমাদর করা হবে, বা আমাকে দোজখী হতে হবে এবং আমাকে সেখানকার শাস্তি ভোগ করতে হবে।"

অতঃপর তিনি মাগরিবের নামায পড়লেন। নামায শেষে তিনি শুয়ে পড়লেন। তখনই তাঁর মৃত্যু যন্ত্রণা আরম্ভ হলো। তবুও তিনি বলে যেতে লাগলেন। "আপনারা যেয়ে মিসরের সর্বশ্রেষ্ঠ আবেদের কাছে আমার মাগফেরাতের জন্য দো'আ করতে বলবেন।" আবার তিনি ফরিয়াদ আরম্ভ করলেন, "হে পরম দয়ালু, আমি যদিও মহাপাপী, তথাপি আমি যে এখন

তোমার দরবারে হাজির হয়েছি। তুমি ব্যতীত আমি আর কার দরবারে ফরিয়াদ করব? বড় নিরুপায় হয়ে আমি তোমার খেদমতে ফরিয়াদ করেছি। তুমি-তো দিবারাত্রই পাতকীদের পাপ ক্ষমা করে থাক। তোমার অনুকম্পা না থাকলে কোন আবেদ বা পরহেজগার লোকের শয়তানের ফেরেবের মোকাবিলা করার ক্ষমতা নেই। হযরত আদম আলাইহিস সালামকে পর্যন্ত যে শয়তান ফেরেব দিয়েছে, সেই শয়তানের ফেরেব হতে অপরে কিরূপে বাঁচতে পারে? এলাহী, আমি তোমার একজন অবিবেচক নাফরমান। তুমি ব্যতীত আমাকে আর কে ক্ষমা করতে পারে? তুমি যদি আমার প্রতিশোধ নাও তবে আমি তুমি ব্যতীত অপর কার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করব? তুমি যদি আমার আমল অনুযায়ী আমাকে দোজখের ভাগী কর, তবে তা কোন প্রকার অন্যায় হবে না। আমি শৈশব হতে শেষজীবন পর্যন্ত বহু পাপ করেছি। কিন্তু হে রহমান, হে রহিম, তোমার রাহ্‌ম ও করম এর চেয়ে শতগুণে যে অধিক! আমি পাপী হলেও আমার পাপকে আমি বরাবরই মন্দ বলেই জানতাম। কিন্তু এটাকে যখন তোমার করম ও বখশিশের মোকাবিলা করেছি তখন তোমার রাহ্‌ম-করমকে আমি অনেক বড় দেখেছি।"

অতঃপর তিনি এশার নামায পড়লেন। তারপর অনন্ত অসীম দয়াময়ের দরবারে তিনি বড় বিনীত করজোড়ে দো'আ করলেন। নামায-শেষে তিনি শায়িত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রাণ-পাখী দেহ-পিঞ্জর হতে উড়ে গেল। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।

কাফন-দাফন

ইমাম মাজনী নিজ হাতে তাঁকে গোসল দান করেন। রাত্রিকালেই জানাযা প্রস্তুত হয়ে গেল। কিন্তু মহান ব্যক্তির মৃত্যু সাধারণ ব্যাপার ছিল না। কাজেই জুমার নামায না পড়ে তাঁর জানাযার নামায পড়া সম্ভবপর হলো না। জানাযায় দেশময় লোকের মহাভিড় হয়েছিল। আসরের পূর্বে জানাযার নামায সমাপ্ত হলে, তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর কবর বিশ্ব মুসলিমের চির জেয়ারত স্থান রূপে বিরাজ করেছে। আজ পর্যন্ত প্রতি রোজ সকাল হতে রাত্র পর্যন্ত অসংখ্য লোক তাঁর কবর জেয়ারত করে নিজদেরকে ধন্য মনে করে থাকে।

মৃত্যুর পরে সুসংবাদ

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহে বলেন, "আমি ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহিকে স্বপ্নে দেখলাম। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, খোদা আপনার সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন?" ইমাম সাহেব বললেন, "খোদা

আমাকে তাঁর রাহমা ও করম গুণে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আর আমার শিরোপরি নূরের টুপি পরিধান করা হয়েছে। আর হূরের সঙ্গে আমার বিবাহও সম্পাদিত হয়েছে। আর আমাকে এটাও বলে দেয়া হয়েছে, 'হে শাফেয়ী, আমি তোমার উপর এজন্য অনুগ্রহ করেছি যে, তুমি কখনও অহঙ্কার করনি (ইবনে আসাকের)।"

রবীয় বিন সুলায়মান বলেন, 'আমি ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, "খোদাতায়ালা আপনার সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? তিনি বললেন, 'হে রবীয়, খোদা আমাকে স্বীয় অনুগ্রহবলে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আমাকে স্বর্ণের চেয়ারে উপবিষ্ট করান হয়েছে।"

মুহাম্মদ দিন মুসলেম বলেন, "আমি ইমাম শাফেয়ী সাহেবের ইন্তেকালের পর তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, মহান আল্লাহ আপনার সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? তিনি বললেন, খোদার তরফ হতে হুকুম হয়েছে যে, তাকে আবু আবদুল্লাহ্ ও আবু আবদুল্লাহর সঙ্গে বসবাস করতে দাও। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তাঁরা কে? তিনি বললেন, প্রথম আবদুল্লাহ ইমাম মালেক। দ্বিতীয় আবদুল্লাহ্ ইমাম হাম্বল।"

ইমাম বায়হাকী রাহমাতুল্লাহ্ ওসমান রাহমাতুল্লাহ্ হতে রেওয়ায়েত করেছেন যে, আমি স্বপ্নে দেখলাম কেয়ামত কায়েম হয়ে গিয়েছে। আরশের নিম্নভাগ হতে ঘোষণাবাণী প্রচার করা হয়েছে যে, আবু আবদুল্লাহ, আব আবদুল্লাহ, আবু আবদুল্লাহ, এবং আবু আবদুল্লাহ্কে বেহেশ্তে দাখিল কর। আমার পাশে দণ্ডায়মান এক ফেরেশতাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, তাঁরা কে? তিনি বললেন, ইমাম মালেক, ইমাম সুফিয়ান সওরী, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহমাতুল্লাহ আলাইহিম।

শোক-গীতি

তাঁর মৃত্যুতে দেশময় শোকের তুফান লাগল। তন্মধ্যে বিশেষ কয়েকটি শোক-গীতি নিম্নে বর্ণিত হলো।

"আপনি কি মুহাম্মদ ইদ্রীসের মৃত্যুর পরে তাঁর স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ কোনকিছুই দেখতে পাচ্ছেন না? তাঁর জ্ঞানের আলো সর্ব কঠিন মাসআলা সম্বন্ধে আলোকপাত করেছে। তাঁর জ্ঞান-মশাল এমনই সমুজ্জ্বল যে, কেয়ামত পর্যন্ত তা নিষ্প্রভ হবে না। এটা এমনই সরল রাস্তা যে, এটা মানবকে হেদায়ত-পানে পথ নির্দেশে করে থাকে।"

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রাঃ)

[জন্ম–১৪৬ হিজরী, মৃত্যু–২৪১ হিজরী]

বৈশিষ্ট্য

* ফকীহ, মুহাদ্দেস এবং মুজাহেদ।
* সংসার বিরাগী এবং সুন্নতে নবীবীর পাবন্দ।
* লড়াই যখন শুরু হয়, তখন আব্বাসীয় বংশের সর্ব্বাপেক্ষা অত্যাচারী এবং আত্মপরায়ণ খলীফা মু'তাসিমের সাথে তাঁর সংগ্রাম শুরু হয়। তাঁকে তখন বহু অত্যাচার সহ্য করতে হয় কিন্তু অভিযোগের সুরে তিনি একটি কথা উচ্চারণ করেননি।
* 'মসনদে ইবনে হাম্বল' হাদীস সম্বন্ধে একটি মানিত-গ্রন্থ।
* আরবের বিভিন্ন অংশে হাম্বলী মাযহাব প্রচলিত রয়েছে। হাম্বলী মাযহাব আরবের বর্তমান সওদী সরকারে সরকারী মাযহাব।

জন্ম, শৈশব এবং বংশধারা

তাঁর বংশধারা শেখুল ইসলাম, ইমামুল মুসলেমীন, কাদওয়াতুল মুত্তকীন আবু আবদুল্লাহ্ আহমদ বিন মুহাম্মাদ বিন হাম্বল বিন বেলাল বিন আসাদ বিন ইদরিস বিন আব্দুল্লাহ ছায়মন বিন আবদুল্লাহ্ বিন আনস বিন আসাদ বিন আউফ বিন কাসেত বিন মাজান বিন বাজীল বিন শীবান বিন জহল বিন সুয়লাবা বিন আকাবা বিন মাসআব বিন আলী বকর বিন ওয়ায়েল বিন কাসেত বিন হালব বিন কাসী বিন ওয়ামী বিন হাজীলা বিন আসাদ বিন রবীয়াহ বিন নিযা বিন মু'আদ বিন আদনান বিন আওদ বিন হামিই সাবেত বিন কীদাদ বিন ইসমাঈল বিন ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ সলওয়াতুল্লাহ্ আলাইহিম আজমঈন।

ইমাম আবু বকর বায়হাকী (রাঃ) স্বীয় উস্তাদ আবু আবদুল্লাহ হাকীমের রেওয়ায়েত হতে ইমাম আহমদ হাম্বল সাহেবের জীবন-চরিত রচনা করেন।

ইবনে খলকানের তাহকীক

উপরোক্ত বংশ-ধারা বায়হাকী নকল করেছেন। কিন্তু ইবনে খলকান ইমাম হাম্বল সাহেবের বংশ-ধারা নিম্নলিখিত ধারানুযায়ী বর্ণনা করেছেন।

আল-ইমামু আবু আবদুল্লাহ্ আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল বিন আসাদ বিন ইদ্রীস বিন আবদুল্লাহ্ বিন হালব বিন আফীজী বিন দায়মী বিন হাদীমেলাহ, বিন আসাদ বিন রাবিয়া বিন আফীজী বিন দায়মী বিন হাদীমেলাহ, বিন আসাদ বিন রাবিয়া বিন তারার বিন দায়দ বিন নান।

তিনি আরও বলেছেন যে, হযরত ইমাম হাম্বল সাহেবের বংশ ধারা সম্বন্ধে মতবিরোধ রয়েছে। কিন্তু আমি সর্বজনমান্য সহী পন্থা অবলম্বন করতে চেষ্টা করেছি। ইমাম নূদী সাহেবের তাহজীবুল আসমায়া ওয়াল্লুগাত ও তকীউদ্দীন সেবকী সাহেবের তবকাতেশশাফেয়ীয়াহ্ এবং অপরাপর কিতাবের মধ্যে যে মতবিরোধ রয়েছে, তারপ্রতি দৃষ্টিপাত করার পর ইবনে খলকান যে সংশোধিত বংশ তালিকা পেশ করেছেন, তা বিশ্বাস না করে কোন উপায় নেই।

ইমাম সাহেবের জন্মস্থান সম্বন্ধে মতবিরোধ রয়েছে। অনেকের ধারণা যে, ইমাম সাহেব মাতৃগর্ভে থাকবার সময়ই তাঁর পিতা বাগদাদ আগমন করেন। আর ইমাম সাহেব বাগদাদেই ১৬৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। অনেকের ধারণা এ যে তাঁর পিতা যখন মরদ হতে চলে আসেন তখন ইমাম সাহেব জন্মগ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি বাগদাদে লালিত-পালিত হন।

জ্ঞান-পিপাসা ও জ্ঞান-লাভ

ইমাম আহমদ রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহে পনর কি ষোল বছর বয়সে হাদীসের ক্লাসে যোগদান করতে আরম্ভ করেন। তিনি সর্বপ্রথমে ইমাম আবু ইউসুফ সাহেবের হাদীসের ক্লাসে যোগদান করেন। তিনি অপরাপর মুহাদ্দেসীনের ক্লাসেও যোগদান করেন। ১৮৭ হিজরীতে তিনি সর্বপ্রথম হজ্ব করেন। তিনি দ্বিতীয় বার হজ্ব করেন ১০১ হিজরীতে। ওলীদ বিন মুসলিমও সেই বছর হজ্ব করেন। ১৯৬ হিজরীতে তিনি আবার হজ্ব করেন। বছরকাল তিনি মক্কাশরীফে অবস্থান করেন। অতঃপর তিনি ক্রমান্বয়ে দুই বছর হজ্ব করেন। তিনি তথা হতে এয়ামনে যেয়ে মুহাদ্দেস আবদুর রাজ্জাক সাহেবের কাছ হতে হাদীস শ্রবণ করেন। তাঁর সঙ্গে তখন ইমামুল জরহা ওয়াত্তা'দীল এয়াহয়া বিন ময়ীন এবং ইমাম আহলুল মুশরেক ইসহাক বিন রাহু ইত্যাদিও হাদীস ক্লাসে যোগাদন করেন।

ইমাম আহমদ বলেন, আমি পাঁচ বার হজ্ব করি। তন্মধ্যে তিনবার পদব্রজে হজ্ব করি। আর আমার প্রত্যেক হজ্বে মাত্র বিশ দেরহাম খরচ হয়। তিনি পদব্রজে হজ্ব করার সময় এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে যে তখন তিনি পথ ভুলে যান। তিনি তাতে হাদীসের টুকরা পড়তে শুরু করেন। ইতিমধ্যেই তিনি আবার পথ পেয়ে ফেলেন।

হজ্ব হতে ফিরে এসে তিনি কূফায় অবস্থান করেন। তিনি সেখানে এমন অনাড়ম্বর ভাবে কালযাপন করতে থাকেন যে শয়নকালে তাঁর মাথার নীচে রাখবার নিমিত্ত একটি বালিশও ছিল না। তখন তিনি মাথার নীচে একটি ইট রেখে নিদ্রা যেতেন। এলম শিখবার নিমিত্ত তাঁর বহু স্থানে যাতায়াত প্রয়োজন হতো। কিন্তু পথ-খরচের অভাবে অনেক স্থানেই যেতে পারতেন না।

ইমাম আহমদ সাহেবের এই অর্থকষ্টের কথা ইবনে আবী হাতেম তাঁর আব্বাজানের কাছ হতে বর্ণনা করেন যে, ইমাম শাফেয়ী বললেন, আহমদ ইবনে হাম্বল মিশরে এসে আমার সাথে দেখা করার ওয়াদা করেছিলেন। কিন্তু না জানি কেন এ পর্যন্তও তিনি আসলেন না। ইবনে আবী হাকীম বলেন, "ইমাম আহমদের অর্থ-কষ্টই বোধ হয় এটার কারণ হয়ে থাকবে।"

ইমাম আহমদ হাম্বল সাহেবের এরূপ অর্থ-কষ্ট থাকা সত্ত্বেও তিনি সমগ্র মুসলিম সাম্রাজ্য ভ্রমণ করেন। ইমাম সাহেবের জ্ঞান-তৃষ্ণা এবং এলমের নূরের জন্য তাঁর প্রত্যেক শেখ তাঁকে পরম স্নেহ, শ্রদ্ধা এবং গৌরবের চোখে দেখতেন।

ইমাম আহমদ ও ইমাম শাফেয়ী

ইমাম আবু বকর বায়হাকী যে যে স্থলে ইমাম শাফেয়ী সাহেবের শেখবৃন্দের আলোচনা করেছেন, এদের প্রত্যেক স্থানেই ইমাম শাফেয়ী সাহেবেরও উল্লেখ করেছেন। হাম্বল সাহেব ইমাম শাফেয়ী সাহেবের কাছ হতে যে কতিপয় হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন, এদের সকলগুলো ইমাম আবু বকর সাহেব একত্র করেন।

ইমাম আহম্মদ সাহেবের শ্রেষ্ঠত্বের এটাও একটি বড় দলীল যে ইমাম শাফেয়ী তাঁর অন্যতম উস্তাদ হওয়া সত্ত্বেও ইমাম আহমদ সাহেবের বয়স যখন মাত্র ত্রিশ বছর তখন তিনি তাঁকে বলেছেন, "তুমি যদি হেজাজ, শাম, ইরাক ইত্যাদি যে কোন স্থান হতে কোন সহী হাদীসের সন্ধান পাও তবে তুমি আমাকে তা জানাবে। আমি তা আমল করব; আমি হেজাজী ফকীহদের অনুরূপ নই। তাঁরা হেজাজ ব্যতীত অন্যান্য ইসলামী রাজ্যে প্রচারিত হাদীস সমূহকে অগ্রহণীয় মনে করে থাকেন। আর সেই সকল হাদীস সম্বন্ধে তাঁরা 'আমরা এ সকলকে গ্রহণও করি এবং মিথ্যাও জানি না' বলে আখ্যা দিয়ে থাকেন। আমি যে কোন দেশ হতে হাদীস পেলেই, তা গ্রহণ করে থাকি।

ইমাম আহমদ বিন্ হাম্বলের উস্তাদবৃন্দ

তাঁর উস্তাদবৃন্দের মধ্যে বশর বিন ফজল, ইসমাইল বিন আলীয়া, সুফিয়ান বিন আনীয়া, জরীর বিন আবদুল হামীদ, এয়াহয়া বিন সাঈদ বিনেল কত্তান, আবু দাউদ, আবদুর রাজ্জাক, আলী বিন আয়াশুর হামসী, মু'তমর বিন সালাইমান,

ওকী' বিন আজম, ইয়াজীদ বিন হারুণ (তিনি তাঁর স্বীয় পুঁজি প্রদান করে তাঁর কাছ হতে হাদী পুঁজি নিয়ে যেতেন।) কীতাব, দাউদ বিন ওমর, খলফ বিন হেশাম (এ সকল লোক ইমাম আহমদ সাহেবের চেয়ে অধিক বয়স্ক ছিলেন।)

আহমদ বিন আবীল হাওয়ারা, এয়াহয়া বিন মঈন, আলী বিন মদীনী, জেয়াদ বিন আয়ুব, মুহাম্মদ বিন রাফেয় তাঁর কাছ হতে রেওয়ায়েত করেন। তাঁর দুই পুত্রও তাঁর কাছ হতে হাদীস শিক্ষা করেন। তাঁর এক পুত্রের নাম ছিল আবদুল্লাহ্ এবং অপর পুত্রের নাম সালেহ। তাঁরা একাধারে যেমন ছিলেন ইমাম আহমদ সাহেবের, অপর ধারে তাঁরা তাঁর প্রকৃত রূহানী ফরজন্দও ছিলেন। এলম ও কামালিয়তের দিক দিয়েও তাঁরা তাঁদের পিতার যথাযোগ্য স্থলাভিষিক্ত ছিলেন।

ইমাম সাহেবের শাগরেদ ও উস্তাদ

তাঁর অসংখ্য ছাত্র ও শাগরেদ ছিলো। তন্মধ্যে বিশিষ্ট কতিপয়ের নাম নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

আবু বকর আল-আছয়াম, হারবুল করমানী, হাম্বল বিল ইসহাক ইত্যাদি। আবুল কাসেম বাগদাদী তাঁর সর্বশেষ ছাত্র ছিলেন। ইমাম আজম সাহেবের সাথে আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ বেনেল হাসান এবং জাফর রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহিমের যে সম্বন্ধ ছিল, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল সাথেও তাঁদের সেই একই সম্পর্ক ছিল।

ইমাম আহমদ সাহেবের ফেকাহ ও এজতেহাদ একশত বিশ জন লোকে গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে কতিপয়ের নাম ইসহাক বিন মনসুর, আবু দাউদ, আবু ইসহাক, ইব্রাহীম হারবী, আবু বকর মাজুরী, আবদুল মালেক মাইমুনী, আবু তালেবুল ছাকানী, আহসান বিন সওয়াব, ইবনে শীস, আহমদ বিনেল আসেম এবং আহমদ বিন আসরামুল মাজরী।

আবদুর রহমানুল মুওয়াতীব, আহমদ বিনেল হাসনুল তির্মিযী, আহমদ বিন আবু ওবাইদা, আহমদ বিন নসরুল, হেকাফ, আহমদ বিন ওয়াসেলুল মাকরী, আহমদ বিন হিশাম, আহমদ বিন এয়াহয়া, আহমদ বিন মুহাম্মদ ইমাম সাহেবের অতি প্রিয় শাগরেদ ছিলেন। তাঁরাই ইমাম সাহেবের ফেকাহ এবং এলমী এজতেহাদকে বিশ্বময় প্রচার করেন। এ সকল মহান ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ না করলে এলম বুকে নিয়েই ইমাম সাহেবকে কবরে শয়ন করতে হবে।

বৈরাগী ও পরহেজগারী

বায়হাকী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহে মাজনীর মারফত ইমাম শাফেয়ীর কাছ হতে রেওয়ায়েত করেন যে, ইমাম শাফেয়ীর সাথে খলীফা হারুণুর রশীদ আলাপ

করলেন, এয়মন দেশের জন্য একজন কাজী নিযুক্ত করা আবশ্যক। ইমাম শাফেয়ী বললেন, "আমি সেই বন্দোবস্ত করেছি।"

ইমাম শাফেয়ী সাহেব এ সম্বন্ধে ইমাম আহমদ হাম্বলের সাথে আলোচনা করলেন। আর এটাও বললেন যে, আপনাকে ব্যতীত এ কাজের নিমিত্ত অধিক উপযুক্ত লোক আমি আর কাকেও পাচ্ছি না।

তখন ইমাম আহমদ সাহেব হাদীসের ছাত্র হিসেবে ইমাম শাফেয়ী সাহেবের খেদমতে যাতায়াত করতেন।

ইমাম আহমদ সাহেব কঠোর ভাষায় উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তদুপরি বললেন, "আমি আপনার খেদমতে এজন্য যাতায়াত করে থাকি যে, আমি এলম শিক্ষা করব। আপনি আমাকে কাজীপদের জন্য নির্বাচন করবেন, আমি এ উদ্দেশ্যে আপনার এখানে যাতায়াত করি না।" ইমাম সাহেব অনুতপ্ত হলেন।

ইমাম বায়হাকী রেওয়ায়েত করেছেন যে, ইমাম সাহেব নিজ পুত্র, চাচা কারও পিছনে নামায পড়তেন না এবং তাঁদের খানাও খেতেন না। এটার কারণ এ ছিল যে, তাঁরা উভয়েই সরকারী চাকুরি করতেন।

এক আশ্চর্য ঘটনা এ যে, একদিন ইমাম সাহেব তিন দিন পর্যন্ত ক্ষুধার্ত হলেন। ঘরে কোন কিছুই খাবার ছিল না। তখন তিনি প্রতিবেশী কারও কাছ হতে কিছু আটা কর্জ করে আনেন। স্বামী অত্যন্ত ক্ষুধার্ত ভেবে বিবি সাহেবা যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি রুটি তৈরী করার বন্দোবস্ত করলেন। তখন তাদের পুত্র সালেহের তন্দুর জ্বলছিল। তিনি সেখান হতে রুটি পাকায়ে নিয়ে আসলেন।

এত তাড়াতাড়ি কিরূপে রুটি পাকান হলো, ইমাম সাহেব তা জানতে পেরে বিবি সাহেবা বললেন, "আপনাকে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত বুঝতে পেরে সালেহের জ্বলন্ত তন্দুর হতে রুটি পাকায়ে নিয়ে আসছি।"

এটা শুনে ইমাম সাহেব বললেন, "রুটিগুলো আমার সম্মুখ হতে নিয়ে যাও এবং আমার বাড়ী হতে আমার পুত্র সালেহের বাড়ী যাওয়ার যে দরজা রয়েছে, তা আজ হতে বন্ধ করে দাও।"

ইমাম বায়হাকী বলেন, এটার কারণ এই যে, ইমাম সাহেবের পুত্র সরকারী লোকের অধীনে চাকুরী করতেন।

ইমাম সাহেবের দ্বিতীয় পুত্র আবদুল্লাহ্ বলেন যে, হযরত ইমাম সাহেব একদিন পনর ষোল দিন ক্রমাগত খলীফার সহচররূপে ছিলেন। কিন্তু একদিন তিনি খলীফার খাবার খান নাই। সেই ষোল দিন তিনি শুধু ছাতু খেয়ে কাটায়ে দেন। তাও তিনি খলীফা হতে বহুদূর যেয়ে ভক্ষণ করতেন।

হযরত আবদুল্লাহ্ বলেন, "সেই ঘটনার পর ছয় মাস পর্যন্ত ইমাম সাহেব শারীরিক অসুস্থ ছিলেন।"

মুহাদ্দেসীনের মধ্যে বিতরণ করার মানসে মামুন কিছু স্বর্ণ প্রেরণ করেন সকলেই তা গ্রহণ করলেন। কিন্তু ইমাম সাহেব তা গ্রহণ করেননি তিনি সোজাসুজিভাবে তা অস্বীকার করলেন।

সুলাইমান কূফি রেওয়ায়েত করেন যে, একদিন ইমাম আহমদ সাহেব এক জিম্মির কাছে একটি বাসন বন্ধক রাখেন। তিনি যখন তা ছাড়ায়ে আনতে গেলেন, তখন সেই ব্যক্তি দু'টি বড় বাসন এনে ইমাম সাহেবের সম্মুখে পেশ করল। বাসন দু'টি এক আকারের ছিল। কাজেই ইমাম সাহেব কোন বাসনাই গ্রহণ করলেন না।

ইমাম সাহেবের পুত্র আবদুল্লাহ্ বলেন যে, খলীফা ওয়াসেকের জামানা আমরা দেশবাসী বড় অভাব অনটনে কাল কাটাচ্ছিলাম। এক ব্যক্তি ইমাম সাহেবের কাছে চিঠি লিখলেন, "আমার কাছে চার হাজার দেরহাম রয়েছে আপনি তা কবুল করুন।" ইমাম তা অস্বীকার করলেন। সেই ব্যক্তি পীড়াপীড়ি করল। ইমাম সাহেব অধিক কঠোরতার সাথে তা অস্বীকার করলেন আমি তাতে আক্ষেপ প্রকাশ করলে তিনি বললেন, "আমি তা গ্রহণ করলে তা খরচ হয়ে যেত। আবার আমাদের পূর্বাবস্থাই দেখা দিত।"

আমরা এ সকল আলাপ-আলোচনা করছিলাম, এমন সময় এক সওদাগর দশ হাজার দেরহাম আব্বাজানের খেদমতে পেশ করলেন। সওদাগর এ আব্বাজানের জন্য পূর্ব হতে রেখে দিয়েছিলেন। তিনি তাও ফিরায়ে দিয়ে বললেন, "আমরা উত্তম অবস্থাতেই আছি। আল্লাহ তায়ালা আপনার শুভ কামনা বরকত দান করুন'। এটার পর অন্য এক সওদাগরও ত্রিশ হাজার দেরহাম তাঁর খেদমতে পেশ করলেন। তিনি তাও অম্লানবদনে অস্বীকার করে সেই স্থান পরিত্যাগ করলেন।

ইমাম আহমদ হাম্বল যে সময় হাদীসের এলম লাভ করার জন্য এয়মনে গমন করেন, তখন তিনি অত্যন্ত অভাবগ্রস্থ ছিলেন। তাঁর শেখ ইমাম আবদুর রাজ্জাক মুহাদ্দেস সাহেব তা অবগত হয়ে তাঁর হাতে কিছু দীনার গুঁজে দিতে চাইলেন। 'আল্লাহ্ আমার প্রয়োজন মিটায়ে থাকেন' বলে তিনি তাও অগ্রাহ্য করলেন।

তাঁর সেই অর্থ-সঙ্কটের দিনে এমন সময়ও দেখা দিল যে তাঁর পরিধেয় বস্ত্র এমন ভাবে ছিঁড়ে গিয়েছিল যে, তা আর পরিধানের উপযুক্ত রইল না। তখন

তিনি ঘরের মধ্যে লুকায়ে রইলেন। ঘরের দরজাও বন্ধ করে দিলেন। লোকেরা এর রহস্য জানতে পেরে তাকে সাহায্য করতে চাইলে, তিনি তাও অস্বীকার করলেন। অতঃপর তিনি সেই ব্যক্তির কোন কিতাব লিখায়ে নিবে, এই শর্তে এক দিনার নিবেন।

আবু দাউদ বলেন, "ইমাম আহমদ বিন হাম্বল সাহেবের কাছে বসলে, আখেরাতের অশেষ উপকার হতো। আমি কস্মিন্‌কালেও তাঁকে পার্থিব কোন লোভ-লালসার বশবর্তী হতে দেখিনি।"

বায়হাকী রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি ইমাম আহমদ সাহেবকে আল্লাহর উপর ভরসা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। ইমাম সাহেব বললেন, "আল্লাহ ব্যতীত অপর সবকিছুর সাথে সম্বন্ধ ছিন্ন করার নাম আল্লাহর উপর ভরসা। হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামকে যখন অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়, তখন জিব্রাঈল আলাইহিস্ সালাম তাঁকে আসমান ও জমীনের মাঝখানে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার কোন প্রয়োজন আছে কি?"

তখন পয়গাম্বর আলাইহিস সালাম বললেন, "আমার প্রয়োজন আছে। কিন্তু আপনার কাছে আমার কোন প্রয়োজন নেই।"

জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম বললেন, "যাঁর কাছে আপনার প্রয়োজন তাঁর কাছে আপনি চেয়ে নিন"। তিনি বললেন, খোদার যা পছন্দ আমার কাছে এটাই পছন্দ"।

বায়হাকী বলেন যে আবুল ফজল রেওয়ায়েত করেছেন, "ইমাম আহমদ হাম্বল সেজদায় দো'আ করতেন, হে আল্লাহ! উম্মতে মুহাম্মদীর সকল পাপীদেরকে ক্ষমা করে দাও। আর তাদের সব আজাব আমাকে ভুগতে দাও।"

ইমাম সাহেবের পুত্র হযরত সালেহ বলেন যে, "তাঁর আব্বাজান কারও কাছ হতে ওজুর পানি চেয়ে নেননি। বরং তিনি নিজেই কূপে বাল্‌তি নিয়ে পানি তুলতেন। বাল্‌তি ভরে পানি উঠালে, তিনি আল্-হামদুলিল্লাহ্ বলতেন। আমি এটার কারণ জিজ্ঞেস করলে, তিনি বললেন, আল্লাহ তায়ালা কি পবিত্র কোরআন শরীফে বলেননি?

ইমাম আহমদ সাহেবের জীবনে এরূপ বহু ঘটনা রয়েছে। তিনি বৈরাগ্য সম্বন্ধে একটি অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি সেই অতুলনীয় গ্রন্থের তোফায়লে এমন উচ্চপদ মর্যাদা লাভ করেছেন, যা তাঁর সমকক্ষ অতি কম লোকের ভাগ্যেই ঘটেছে।

ইসমাইল বিন ইসহাকুচ্ছেরাজ বলেন যে, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল একদিন হারেস মজাসীকে তাঁর বাড়ীতে এসে দাওয়াত দিবার জন্য অনুরোধ করলেন। আমি মহা খুশী হয়ে হারেসের খেদমতে যেয়ে তাঁকে দাওয়াত করলাম। তিনি দলবলসহ রাত্রে আসলেন। তাঁরা এশার নামাজের শুধু ফরজ পড়ে হযরত হারেসের চার পাশে বসে গেলেন।

তারপূর্বেই ইমাম আহমদও এক কিনারায় বসে পড়লেন। হারেস ও তাঁর দলবলের কেউই তা বুঝতে পারেননি। হযরত হারেসের দলবল কেউই এ সম্বন্ধে কোন জিজ্ঞাসাবাদ করেননি।

হযরত হারেস বৈরাগ্য সম্বন্ধে ওয়াজ শুরু করলেন। এতেই প্রত্যেকের মর্মস্থল স্পর্শ করিল এবং সকলেই বহু রোদন করলেন।

ইসমাঈল বিন ইসহাক বলেন, "আমি ইতিমধ্যে হযরত আহমদ বিন হাম্বল সাহেবের অবস্থা জানবার জন্য তাঁর পাশে গেলাম। তাঁকে রোদনে রত দেখতে পেলাম। তিনি প্রায় বেহুশ হয়ে পড়বার অবস্থায় উপনীত"।

হযরত হারেস ফজর পর্যন্ত ওয়াজ নসীহত করলেন আর লোকেরা অধীর রোদনে রত রইল।

ইমাম সাহেবকে ইসহাকুচ্ছেরাজ জিজ্ঞেস করলেন, আপনি তাঁকে কিরূপ দেখতে পেয়েছেন"? তিনি বললেন, "খোদার কসম, বৈরাগ্য ও আনুগত্য সম্বন্ধে অনুপ্রেরণা জাগায়ে তুলবার নিমিত্ত তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আমি অপর কাকেও দেখিনি। আর তাঁর জমাতের চেয়ে উত্তম দলবলও আমি আর দেখিনি। তথাপি লোকদেরকে তাঁদের সংশ্রব হতে দূরে থাকবার নিমিত্ত অনুপ্রাণীত করব।"

ইমাম বায়হাকী বলেন, "ইমাম আহমদের এ সম্বন্ধে নিষেধ করার কারণ এই ছিল যে, হযরত হারেস যদিও বড় আবেদ ও জাহেদ লোক ছিলেন, তথাপি তিনি একজন বক্তা ছিলেন। আর ইমাম সাহেব কে অত্যন্ত না পছন্দ করতেন। আর অপর একটি কারণ এটাও ছিল যে, হযরত হারেস এমন সব বিষয়ে আলাপ আলোচনা করতেন, যা জনসাধারণের বোধগম্য হতো না।

অনেকের ধারণা এ যে, ইমাম আহমদ হযরত হারেসের দলবল হতে দূরে থাকবার নিমিত্ত এ জন্য আদেশ করতেন যে, তাঁদের আলাপ-আলোচনা কোন কোন সময় কশ্‌ফের সীমানার বাইরেও চলে যেত। আর তিনি নফ্‌স সম্বন্ধে এমন কঠোর বিধানের পক্ষপাতী ছিলেন যে, শরীয়তে এ সম্বন্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এ সকল কারণে তিনি যখন আবু জরআ মুহাদ্দেসকে হযরত হারেসের পথ পরিত্যাগ করুন; কারণ এতে বেদাআত রয়েছে"।

হযরত ইমাম আহমদ বলতেন যে, অভাব-অনটনকে বরদাস্ত করার মধ্যে এক মহা মঙ্গল নিহিত রয়েছে। কিন্তু একমাত্র শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের পক্ষেই এটা হতে উপকার লাভ সম্ভবপর হতে পারে।

তিনি আরও বলতেন যে, দারিদ্র্য ঐশ্বর্যের চেয়ে শত সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ। কেননা, এতে অতি উচ্চপর্যায়ের ধৈর্যের আবশ্যক হয়। আর যে কোন প্রকার নেয়ামত উপভোগ করে শুকরিয়া আদায় করা অপেক্ষা এটা বহু গুণে শ্রেষ্ঠ কাজ।

ইমাম সাহেব প্রতি কাজে সংক্ষেপকে অত্যন্ত পছন্দ করতেন। এটার কারণ এ যে, আখেরতের হিসেবকে তিনি বহু ভয় করতেন। তাঁর ভয়ের নমুনা এরূপ ছিল যে, একব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি যে এলম শিক্ষা করেছেন, তা আপনি শুধু আল্লাহর ওয়াস্তে হাসেল করেছেন কি"? তিনি বললেন, "আপনি যে শর্ত আরোপ করেছেন, এটার সঠিক সদুত্তর প্রদান করা আমার পক্ষে বড় কঠিন কাজ। হাঁ আমি কতেক বিষয় আমার নিমিত্ত পছন্দ করেছি এবং তা স্বীয় পক্ষে স্থান দিয়েছে।"

ইমাম বায়হাকী বলেন, "এক ব্যক্তি ইমাম সাহেবের খেদমতে এসে আরজ করল, "আমার মাতা কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত। আপনি তাঁর মুক্তিলাভের জন্য দো'আ করবেন"। তখন তিনি কিছুটা বিরক্তির সুরে বললেন, "আমিই-তো বরং দো'আ পাবার অধিক উপযুক্ত পাত্র। অতঃপর তিনি সেই বৃদ্ধার জন্য দো'আ করলেন"।

সেই ব্যক্তি বাড়ী ফিরে দরজার কড়া নাড়লে, তার মাতা দরজা খুলে দিয়ে বলল, "আল্লাহ্ আমাকে আমার কঠিন পীড়া হতে মুক্তি দান করেছেন"।

ইমাম সাহেবের বুজুর্গী সম্বন্ধে এরূপ বহু ঘটনাই রয়েছে। তিনি কোন এক ব্যক্তিকে খুশী হয়ে একটি বস্তু দান করেন। অপর এক ব্যক্তি তা অত্যধিক মূল্যে গ্রহণ করতে প্রয়াসী হয়। তাতে প্রথম ব্যক্তি বললেন, "আমি এটা শতগুণ অধিক মূল্য পেলেও হাতছাড়া করতে রাজী হতে পারি না। আপনি এটা দ্বারা যেরূপ বরকত লাভের আশা পোষণ করে থাকেন, আমিও তজ্জন্য কম আগ্রহান্বিত নই।"

খলকে কোরআনের বিবাদ

সাগরে তরঙ্গ থাকবেই। তরঙ্গই সাগরের সৌন্দর্য। সংসারও একটা সুগভীর সাগর। এটাতেও তরঙ্গ থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু মানুষের পাপের দরুণ যদি তা অধিক তরঙ্গায়িত হয়ে উঠে, তা কখনও সুখের বিষয় হতে পারে না।

আব্বাসীয় খেলাফতের সময় মু'তাজেলা সম্প্রদায়ের উদ্ভব সবচেয়ে কঠিন বিপদ ছিল। এটা ইউনান দেশের উলুম ও ফুনুনের অপরিহার্য পরিণাম ছিল। হারুণুর রশীদের চতুর্থ পুত্র মামুন তখন সিংহাসনে সমাসীন। পূর্ব জমানায় ঐশী গ্রন্থ সমূহের রদ-বদল আরম্ভ হয়ে গেল। তাতে দর্শন ও অন্যান্য বহু কিছুর সংমিশ্রণ শুরু হয়। এটাতে ঐ সকল গ্রন্থের প্রকৃত সুর বিলীন হয়ে যায়। এটার ফলেই মু'তাজেলা সম্প্রদায়ের উদ্ভব সম্ভবপর হয়। সে সকল মাসআলা সম্বন্ধে সকল আলেম সম্প্রদায় একমত ছিলেন, তাদের কারসাজিতে সেই সকলও রদ হতে থাকে। মামুনের শাসনকালের শেষভাগে মু'তাজেলা আলেমদের প্রভাব প্রবল পরাক্রান্ত হয়ে পড়ে। তখন মু'তাজেলা পন্থীরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। এটার প্রচারে এবং এটার প্রতি আলেমদের মন আকৃষ্ট করার জন্য খলীফার তরফ হতে আপ্রাণ চেষ্টা চলতে থাকে। এ সম্পর্কে মামুন বাগদাদের আলেমদের নামে পত্র প্রেরণ করলেন। এটার সমর্থনে তাঁরা কোরআন হতে দলীল পেশ করতে চেষ্টা করেন যে, কোরআন মখলুক ।

মামুন সকলকে উক্ত দলভুক্ত করার নিমিত্ত আপ্রাণ চেষ্টা করলেন। আর এটাকে যাঁরা অমান্য ও অস্বীকার করতেন, তাঁদেরকে শাস্তি প্রদান ও আরম্ভ হলো। মু'তাজেলা বিরোধীদের জীবিকা নির্বাহের উপায় বন্ধ করে দেয়া আরম্ভ হলো। তাঁদের প্রতি অত্যাচার ও হত্যার হুমকি চলল। জোরজবরদস্তিতে বহু লোক উক্ত মত মেনে নিল এবং এর ভক্তে পরিণত হলো। কিন্তু পবিত্র-মধুর স্বভাব-চরিত্র বিশিষ্ট লোকদের পক্ষে তা মেনে নেয়া সম্ভবপর হলো না। অতএব অত্যাচার অবিচার ও হত্যার হুমকিতেও তাঁরা অচল অটল রয়ে গেলেন। তাঁদের পুরুভাগে রইলেন, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল এবং মুহাম্মদ বিন নূহ। হযরত ইমাম আহমদ হাম্বলকে এই অনাচার বিদূরিত করার মানসেই খোদাতায়ালা পয়দা করেন। কেননা, কোরআন বজ্রগম্ভীর স্বরে ঘোষণা করেছে–

এ সম্বন্ধে বহু হাদীসও রয়েছে। স্বয়ং হযরত ইমাম আহমদ হযরত মায়াজ বিন জাবাল (রাঃ) হতে রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত মায়াজ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসলামের কাছে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন যে, মানুষের মধ্যে কারও উপর অধিক বিপদ নিপতিত। হযরত (সাঃ) বললেন, "আম্বিয়া আলাইহিস সালামদের উপর এবং অতঃপর মর্যাদা হিসেবে অন্যান্য মানুষের উপর বিপদ নিপতিত হয়। আর ধর্মের ব্যাপারে প্রত্যেক মানুষ ধর্মের উপর যতখানি মজবুতভাবে কায়েম রয়েছে, সেই অনুসারেই তাদের উপর বিপদ নিপতিত হয়ে থাকে এবং মানুষের জীবিতকাল পর্যন্ত পরীক্ষা কায়েম থাকবে।

ইমাম মুসলেমও এটা রেওয়ায়েত করেছেন। হযরত মায়াজ (রাঃ) হতে ইমাম আহমদ এটাও রেওয়ায়েত করেছেন যে, দুনিয়া সব সময় দুঃখ-কষ্ট এবং ঝগড়া -বিবাদ উৎপত্তি করে থাকে এবং দুঃখ-বিপদ ভবিষ্যতে উত্তরোত্তর বেড়েই চলবে, এটা কমবে না।

কোরআন-হাদীস এতসব নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের মত মহান ব্যক্তি কেন দুঃখ-কষ্ট সইবার জন্য বদ্ধপরিকর হবেন না। শুধু বাহ্যিক পরহেজগারী ও পাক-পবিত্রতা মানুষের ইহলৌকিক মঙ্গলের জন্য যথেষ্ট নয়। আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রত্যেক বন্দাকে পরীক্ষা করে থাকেন। কাজেই আহমদ বিন হাম্বল সাহেবের পরীক্ষা অধিক প্রয়োজন।

কোন কোন বর্ণনা অনুযায়ী বুঝা যায় যে, সত্য স্বপ্নসমূহের মারফত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল তাঁর মহা পরীক্ষার বিষয় অবগত হতেন। আর তিনিও তজ্জন্য প্রস্তুত থাকতেন।

বায়হাকী রবী হতে রেওয়ায়েত করেন, যে, ইমাম শাফেয়ী সাহেবের কাছ হতে একখানা পত্রসহ আহমদ বিন হাম্বলের কাছে আমাকে প্রেরণ করেন। ইমাম আহমদ সাহেব তখন সবেমাত্র ফজরের নামায হতে ফারেগ হয়েছেন, এমন সময় আমি তাঁর খেদমতে হাজির হলাম। আমি পত্রটি তাঁর হাতে অর্পণ করলাম। তিনি পত্রটি হাতে নিয়ে বললেন, "আপনি কি তা পাঠ করেছেন?" আমি পাঠ করিনি বলবার পর তিনি পত্রটি পাঠ করতে লাগলেন। পত্র পাঠ কারৈ তাঁর গণ্ড বয়ে অশ্রু গড়ায়ে পড়তে লাগল। আমি এটার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, "ইমাম শাফেয়ী সাহেব লিখছেন যে, তিনি রাসূল (সাঃ) কে স্বপ্নে দেখেছেন। হযরত (সাঃ) তাঁকে বললেন, "ইমাম আহমদের কাছে আমার সালাম বলবে। আর তাঁকে এটাও জানায়ে দিবে যে, অনতিবিলম্বে সম্বন্ধে তাকে মহা পরীক্ষার নিপতিত হতে হবে। খবরদার সে যেন এটা স্বীকার না করে। এটার পুরস্কারস্বরূপ খোদাতায়ালা তার এলমকে কেয়ামত পর্যন্ত বাকী রাখবেন।"

রবীয় বলেন, "আমি ইমাম আহমদকে এ সম্বন্ধে সুসংবাদ প্রেরণ করলাম। তিনি নিজ জামা ইমাম শাফেয়ীকে দেয়া নিমিত্ত আমায় দিয়েদিলেন। আমি এটা নিয়ে মিসরে ফিরে আসলাম। তখন ইমাম শাফেয়ীদের কাছে আমি সেই জামার কথা উল্লেখ করলাম।"

তিনি বললেন, "জামা দ্বারা আমার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু এটা ভিজাইয়ে আমাকে এটার পানি দিয়ে দিন। আমি এটার দ্বারা বরকত লাভ করব।"

ইমাম আহমদ সাহেব পূর্ব হতে সব কথা জানতে পেরেছিলেন। মামুন এক দল মু'তাজেলা আলেমের পরামর্শানুযায়ী বাগদাদের সকল আলেমকে সমবেত করলেন। দুর্বলচিত্ত বহু আলেম জীবনের মায়ায় অসত্যের কাছে মাথা অবনত করলেন এবং এর ভক্ত সাজালেন। কিন্তু ইমাম আহমদ এবং মুহাম্মদ বিন নূহ কঠোর ভাষায় এটার বিরোধিতা করলেন।

তখন তাঁদের উভয়কে উষ্ট্রযোগে মামুনের দরবারে নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত করা হলো। পথিমধ্যে জাবের বিন আমর নামে এক আরবী ব্যক্তি তাঁদের সম্মুখীন হয়ে ইমাম আহমদ সাহেবকে সালাম করলেন। তিনি অতঃপর বললেন, "হযরত বর্তমান যুগে আপনিই মুসলমানদের একমাত্র আশা ভরসার স্থল। আর আপনি মুসলমানদের প্রতিনিধি হিসেবেই খলীফার দরবারে যেতেন। আল্লাহর ওয়াস্তে আপনি এমনভাবে স্বীয় কর্তব্য পালন করবেন যেন, মুসলমানদেরকে হতাশ হতে না হয়। আর আপনি কস্মিন্‌কালেও অনুমোদন করবেন না। আল্লাহর সাথে যদি আপনার বন্ধুত্ব থেকে থাকে, তবে আপনি অবশ্যই ধৈর্যাবলম্বন করবেন। বেহেশত এবং আপনার মধ্যে মাত্র শহীদ হওয়া বাকী। আর মৃত্যু-তো একদিন আসবেই আসবে। আপনি যদি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেন, তবে আপনি ইহা-পরকাল উভয়ই লাভ করতে পারেন।"

ইমাম আহমদ (রাঃ) বলেন, "তাঁর নসীহত আমার হৃদয়ের মর্মস্থল স্পর্শ করল। আর সে ভ্রান্ত-ধারণার বিরোধিতা করতে আমি বদ্ধপরিকর হলাম।"

ইমামদ্বয়কে খলীফার সম্মুখে উপস্থিত করা হলো এবং খলীফার সন্নিকটবর্তী একস্থানে তাঁদেরকে অবস্থান করান হলো। অল্পক্ষণ পরেই মামুনের এক খাদেম রোদন করতে করতে সেখানে উপস্থিত হলেন এবং ইমাম আহমদ সাহেবকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন, "হে আবু আবদুল্লাহ্, আপনার সম্মুখে মহা কঠিন পরীক্ষা। মামুন তরবারি খাপমুক্ত করেছেন। আর রাসূল (সাঃ)-এর নামে শপথ করেছে যে, আহমদ যদি সমর্থন না করেন, তবে এ তলোয়ার দ্বারা তাঁকে দ্বিখণ্ডিত করবে।"

ইমাম আহমদ (রাঃ) এটা শুনে আকাশের দিকে তাকায়ে বললেন, "হে খোদা তোমার ধৈর্য্য এই দুরাচারকে অত্যন্ত দেমাগী করে তুলেছেন। সে আজ তোমার বন্ধুর উপরও তলোয়ার চালাতে দ্বিধাবোধ করছে না। হে খোদা, তোমার কালাম বদি হয়ে থাকে, তবে তুমি আমাকে সত্যের উপর কায়েম রাখিও। আজ আমি এটার নিমিত্ত সবকিছু বরদাস্ত করতে বদ্ধপরিকর।"

তাঁর প্রার্থনাও শেষ হয়ে আসছেন, এমন সময় রাত্রিকালের মধ্যেই মামুনের মৃত্যু সংবাদ দেশময় প্রচারিত হয়ে পড়ল।

ইমাম সাহেব বললেন, "উক্ত সংবাদ শুনে আমি মহাখুশী হলাম। কিন্তু পরক্ষণেই আমি জানতে পারলাম যে, মু'তাসিম খলীফারূপে নির্বাচিত হয়েছে। আর মুহাম্মদ বিন আবীদাউদ উজীররূপে নিযুক্ত হয়েছে। আমার ধারণা জন্মিল যে, এখন পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে।"অতঃপর অন্যান্য কয়েদীদের সঙ্গে ইমাম সাহেবকেও বাগদাদে পাঠায়ে দেয়া হলো। পথিমধ্যে তাঁদেরকে অশেষ যন্ত্রণা সহ্য হয়েছিল। তাঁদের পায়ে তখন রেডি ছিল। এটাতে হাঁটবার সময় তাঁদের বহু কষ্ট হতো। মুহাম্মদ বিন নূহ (রাঃ) পথিমধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। ইমাম আহমদ (রাঃ) তাঁর জানাযার নামায পড়লেন। ইমাম সাহেবও পীড়িতাবস্থায় বাগদাদে পৌছলেন। তখন রমজান মাস ছিল। তিনি বাগদাদে পৌছা মাত্রই তাঁকে কারারুদ্ধ করা হলো। কেউ কেউ বলেন যে, তিনি আঠাঁর মাস জেলে ছিলেন।

কয়েদী অবস্থায় তাঁকে একদিন এক অন্ধকার কামরায় রেখে দেয়া হয়েছিল। সেখানে কোন বাতিরও বন্দোবস্ত ছিল না। ওজুর পানির দরকার হওয়ায় তিনি এদকি সেদিক হাতড়াতে লাগলেন। ইতিমধ্যে তিনি এক পায়ে একটি পাত্রে কিছু পানি পেলেন। তারপর তিনি ওজু করে নামায আদায় করলেন। নামায পড়বার সুযোগ পাওয়ায় তিনি বহু শুকরিয়া আদায় করলেন।

এটার পর মু'তাসিম ইমাম সাহেবকে ডাকল। ইমাম সাহেবকে খলিফার নিকটবর্তী হবার আদেশ প্রদান করা হলো। তিনি তাঁর কাছে যেয়ে সালামান্তে চুপ করে রইলেন। খলীফা এবং ইমাম সাহেবের মধ্যে বহুকিছু আলাপ-আলোচনা হলো। ইমাম সাহেবের জবাবের গভীরতা দেখে মু'তাসিম মোহিত ও মুগ্ধ হলো। এমনকি তাঁকে মুক্তিদানের কল্পনা ও তার অন্তরে সমুদিত হয়েছিল। কিন্তু ততটুকু সুবুদ্ধি ও সোৎসাহ তার ছিল না।

তখন খলীফার আদেশক্রমে আবদুর রহমান ইমাম সাহেবকে বহু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করল। অন্যান্য প্রশ্নের পর সম্বন্ধে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো। কিন্তু তাতে তাদের উদ্দেশ্য সফল হলো না।

আবদুর রহমান প্রশ্ন করল, "আচ্ছা, এমন সময় ছিল কি যে, আল্লাহ ছিলেন এবং কোরআন ছিল না?" ইমাম সাহেব বললেন, "এমন সময় কি ছিল যে, আল্লাহ্ ছিলেন এবং তাঁর জ্ঞান ছিল না?" আবদুর রহমান তখন নিরুত্তর রইল।

ইমাম সাহেব তখন আল্লাহর কিতাব ও আল্লাহ রাসূলের সুন্নতের দলীল চাইলেন। এটা শুনে আবু দাউদ বলে উঠল "তর্ক করতে হলে নকল ব্যতীত বুদ্ধিরও আবশ্যক হয়।" ইমাম সাহেব বললেন, "কিতাব ও সুন্নত ব্যতীত অপর কোন কিছুর উপর কি ধর্মের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে?" তখন তারা ইমাম সাহেবের সম্মুখে দলীল পেশ করল। ইমাম সাহেব এদের দাঁতভাঙ্গা উত্তর প্রদান করলেন। কিন্তু চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী।

ইবনে আবী দাউদ মু'তাজেলাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দুরাচার ব্যক্তি ইমাম সাহেবের জ্ঞান গরিমা ও বুদ্ধিমত্তাতে মু'তাজেলা সম্প্রদায়কে মোহিত মুগ্ধ হতে দেখে সে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল। সে বলল, "যে আমীরুল মুমিনীন, এ ব্যক্তি পথভ্রান্ত এবং অপরাপরদেরকেও বিভ্রান্তকারী। আপনার ফকীহ ও কাজী সাহেবগণ এখানে সমবেত রয়েছে। আপনি এ সম্বন্ধে তাঁদের অভিমত জিজ্ঞেস করুন।" তখন ফকীহ ও কাজীর দরুণ ইমাম সাহেবকে পথভ্রান্ত বলে ফতোয়া দিল। তখন খলিফা তর্ক মূলতবী করে দিলেন। এরূপে ক্রমাগত কয়েক অধিবেশন হয়ে গেল। ইমাম সাহেব একাকী সকলের মোকাবিলা করলেন।

ইমাম সাহেব বললেন, "তর্ক ব্যাপারে আমাকে এমন কথাও শুনতে হয়েছিল যে, যা বলা কোন আলেমের পদমর্যাদানুযায়ী হওয়া দূরের কথা বলাও সম্ভবপর নয়।"

মু'তাজেলাদেরকে ইমাম সাহেবের সম্মুখের দিকে পদক্ষেপে হতভম্ব হতে দেখে খলীফা বরাবরই বলছিলেন, "হে ইমাম সাহেব, আপনি যদি আমার সেই একটিমাত্র প্রশ্ন সম্বন্ধে একমত হন, তবে আমি আপনাকে বিশিষ্ট বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে।"

তখন ইমাম সাহেব বললেন, "আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নতের বাইরে আমি এক বিন্দুও অগ্রসর হতে রাজী নই।"

মু'তাজেলারা তখন সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে বলতে লাগল, "আমীরুল-মুমিনীন, এই ব্যক্তি কাফের পথভ্রান্ত এবং বিভ্রান্তকারী।" খলীফা বললেন, "হে ইমাম সাহেব, আমি আপনার বহু মঙ্গল সাধন করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আপনি জেদের বশবর্তী হয়ে আমার কোন কথার প্রতিই মনোযোগ দান করেননি। কাজেই আপনাকে কোড়া মারবার আদেশ না দিয়ে পারলাম না।"

কোড়া (বেত্রাঘাত) মারবার জন্য লোক ডেকে আনা হলো। ইমাম সাহেবের হস্ত দুইটি বেঁধে ফেলা হলো। কোড়া মারবার লোক ইমাম সাহেবের সম্মুখে

উপস্থিত হলে, তিনি বললেন, "রাসূল (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি বলে, তার জান মাল সব নিরাপদ। আমার রক্তপাত তাদের পক্ষে কিরূপে হালাল হতে পারে? তবে কি আমি মুসলমান নই? হে আমীরুল মুমিনীন, ভীষণ কেয়ামতকে ভুলবেন না। আজ আমি যেমন আপনার সম্মুখে দণ্ডায়মান, আপনাকেও সেই দিন খোদার সম্মুখে এই রূপভাবে দণ্ডামান হতে হবে। আমার এই রক্তপাতের আপনি কি উত্তর প্রদান করবেন?"

এ সকল কথা খলীফার অন্তরকে আলোড়িত করে তুলল। ইমাম সাহেবকে মুক্তি দিয়ে ফেলা হবে, অবস্থা দেখে মু'তাজেলা দল আদাজল খেয়ে সমস্বরে বলতে লাগল, "আহমদ বিপথগামী এবং কাফের। তাঁকে কিছুতেই ক্ষমার চোখে দেখা যায় না।"

"কোড়া মারা আরম্ভ হয়ে গেল। কোড়ার প্রথম আঘাতের সময় আমি বিসমিল্লাহ্ বললাম। দ্বিতীয় আঘাতের সময় আমি 'লা-হাওলা ওয়ালাকুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহির আলাইয়ীল আজীম' পড়লাম। তৃতীয় আঘাতের সময় বললাম। চতুর্থ আঘাতের সময় পাঠ করলাম।"

আর আমার আঘাতকারী বলছিল, "আল্লাহ্ তোমাকে বরবাদ করুক! স্বীয় নাফরমানীর স্বাদ আস্বাদন কর এবং সাধ মিটাও।" এরূপে আমাকে কোড়া মারা হলো। আমি তখন বেহুশ হয়ে পড়লেন। অল্পকালের জন্য আঘাত স্থগিত রাখা হলো। তখন আমার চেতনা আবার ফিরে আসল।

মু'তাসিম বরাবরই বলে আসছিলেন, "আমার কথা মেনে নিলে আমি আপনাকে রেহাই দিব।" আমি এটার কোন জবাব দেইনি। আর কোড়ার আঘাতকারী বলত, "খলীফা সাহেব নিজে বলতেছেন, তথাপি আপনি কথা বলতেছেন না।" এটা বলে আঘাতকারী অধিক জোরে আঘাত করল।

"খলীফা আমাকে শত প্রকারে তার কথা মানায়ে নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমি বরাবরই চুপ ছিলাম। শেষবারও বোধ হয় তাই বলে থাকবো। কিন্তু বেদম প্রহারের দরুণ আমি তা বুঝতে পারিনি। কিন্তু আমি বরাবরই চুপ ছিলাম। শেষবারও বোধ হয় তাই বলে থাকবো। কিন্তু বেদম প্রহারের দরুণ আমি তা বুঝতে পারিনি। আমি আবার বেহুশ হয়ে পড়লাম।"

মু'তাসিম তখন ভয় পেয়ে গেল। আঘাত বন্ধ করে দেয়া হলো আবার আমার হুশ ফিরে আসল। আমি তখন খলীফার এক প্রকোষ্টে আমাকে বন্ধনমুক্ত অবস্থায় দেখতে পেলাম।

২২১ হিজরীতে ২৫ রমজান এই ঘটনা ঘটে। ইমাম সাহেবকে বাড়ী পৌছায়ে দিবার নিমিত্ত খলীফা আদেশ করল। ইমাম সাহেবের বাড়ী ফিরবার পথে ইসহাক বিন ইব্রাহিমের বাড়ীতে তিনি থামলেন। ইমাম সাহেব রোজাদার ছিলেন। ইফতারের জন্য কিছু ছাতু তাঁর সম্মুখে পেশ করা হলো। তিনি অস্বীকার করলেন। তাঁর দুর্বলতা ও মসীবতের মধ্যেও তিনি রোজা ভাঙ্গলেন না। জুহরের নামাযের সময় জমায়াতের সাথে নামাযও পড়লেন।

ইবনে সমাআতাল কাজী ইমাম সাহেবের প্রতিবাদ করে বললেন, "আপনার রক্ত গড়ায়ে পড়তেছে, তথাপি নামায পড়তেছেন।" ইমাম সাহেব বললেন, "হাঁ। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এমন অবস্থায়ও নামায পড়তেন যে, তাঁর যখম হতে রক্ত ফোয়ারার মত নির্গত হচ্ছিল।" ইবনে সমাআ এ কথা শ্রবণ করে চুপ হয়ে গেলেন।

হযরত ইমাম আহমদ সাহেব সম্বন্ধে এক রেওয়ায়েত রয়েছে যে, তাঁকে যখন কোড়া মারবার জন্য দণ্ডায়মান করা হয়, তখন ঘটনাক্রমে তাঁর পায়জামার ফিতা খুলে যায়। তখন তিনি উলঙ্গ হয়ে পড়বার আশঙ্কা ঘটে। তাঁর হস্তপদ-তো বাঁধা ছিল। তিনি জবান মোবারক দ্বারা এ দোয়া পড়লেন, "হে বিশ্বপ্রতিপালক, তুমি যদি জান যে, তোমার সত্যের খাতিরে আমি এই সবকিছুর যাতনা সহ্য করছি, তবে তুমি আমার পর্দা রক্ষা করিও।

এই দো'আ সঙ্গে সঙ্গে পায়জামার ফিতা বন্ধনযুক্ত হয়ে পড়ল। ইমাম সাহেব যখন ঘরে ফিরে আসলেন, তখন জরাহ এসে ইমাম সাহেবকে আঘাত-জর্জরিত অবস্থায় দেখতে পেলেন। তিনি ইমাম সাহেবের যখমগুলোতে পট্টী বেঁধে দিলেন।

পাষাণ হৃদয়ও গলে গেল। খলীফার মনে অনুতাপের অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে উঠল। খলীফা তার প্রতিনিধি স্বরূপ এক ব্যক্তিকে ইমাম সাহেবের মঙ্গলা-মঙ্গল জানবার জন্য প্রেরণ করলেন। ইমাম সাহেব সুস্থ হয়েছেন শুনতে পেয়ে জনসাধারণ এবং খলীফাও মহা খুশী হলেন।

ইমাম সাহেব বলতেন, "মুমিন ভাইকে কষ্ট দেয়া বড় গর্হিত কাজ। কেয়ামতের দিবস আল্লাহ তায়ালা যখন লোকদেরকে তাদের কাজের পুরস্কার প্রদান করার জন্য আহ্বান করবেন, তখন সর্বপ্রথম সেই ব্যক্তি অগ্রসর হবেন, যিনি দুনিয়াতে অপরের ত্রুটি ক্ষমা করেছেন।"

ইমাম সম্বন্ধে অভিমত

ইমাম বোখারী বলেন, "ইমাম আহমদ সাহেবের এই হৃদয়-বিদারক ঘটনার সংবাদ যখন অগ্নির ন্যায় দ্রুত বসরাতেও পৌঁছল, তখন আমি আবুল ওলীদ তায়াসীকে বলতে শুনেছি যে, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল যদি বনী ইসরাঈলদের জমানায় জন্মগ্রহণ করতেন, তবে এটা অসম্ভব ছিল না যে, তিনি নবী হতেন।"

ইসমাঈল বিন খলীলও ইমাম সাহেব সম্বন্ধে এই অভিমত পেশ করেছেন। ইমাম মাজনীর ধারণা এই যে, দুনিয়ায় পাঁচ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেছেন, যাঁরা পাঁচটি ঘটনার সময় অভূতপূর্ব সার্থকতা ও অপূর্ব আত্মত্যাগের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখায়েছেন তাঁরা হলেন হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত ওমর (রাঃ), হযরত ওসমান (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত ইমাম আহমদ হাম্বল রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহে। ব্যাপারে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রাঃ) সিফ্ফীনের ব্যাপারে হযরত আলী (রাঃ), মারাত্মক হট্টগোলের সময় হযরত ওসমান (রাঃ), বনী সকীফার ব্যাপারে ফারুক আজম (রাঃ) অপূর্ব সাহসিকতা ও ধৈর্যের পরিচয় দান করেন।

ইমাম শাফেয়ী (রাঃ), "আহমদ বিন হাম্বল (রাঃ) ইরাকের অন্যতম আলেম, মোত্তাকী ও পরহেজগার ছিলেন।"

এয়াহয়া বিন সায়ীদুল কত্তান বলেন, "ইরাকের যতলোকের সাথে আমার দেখাশুনা করার সুযোগ ঘটেছে, তন্মধ্যে ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের (রাঃ) চেয়ে অধিক আল্লাহ্-প্রেমিক লোক আর আমি কাউকেও দেখিনি। আমি তাঁকে সকলের চেয়ে অধিক ভক্তি করে থাকি।"

বোখারী ও মোসলেমের উস্তাদ বলেন, "সুফিয়ান সওরীর মৃত্যুর সঙ্গে পরহেজগারীরও মৃত্যু ঘটেছে; ইমাম শাফেয়ীর (রাঃ) সাথে সুন্নতের মৃত্যু ঘটেছে; আর আহমদ বিন হাম্বলের মৃত্যুর সাথে আসল দীনের মৃত্যু এবং বেদাআতের প্রচারের ভিত্তি পত্তন হয়। আহমদ বিন হাম্বল (রাঃ) উম্মতে মুহাম্মদীর নিমিত্ত একজন নবীর মত কাজ করেছেন। তিনি আল্লাহর রাস্তায় নবী-সুলভ ধৈর্যাবলম্বন করেছেন। স্বভাব-চরিত্র এবং দৃঢ়তার দিক দিয়ে সালেহীন, সাহাবা এবং তাবেয়ীনদের সাথে তাঁর কত না সামঞ্জস্য রয়েছে! দুনিয়াকে তাঁর সম্মুখে পেশ করা হয়েছিল। তিনি তারপ্রতি একবার দৃষ্টিপাতও করেননি। তাঁর সম্মুখে এক নূতন অভিনব ধর্ম পেশ করা হয়েছিল। তিনি তা অম্লানবদনে অবহেলা করে একলক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গাম্বরের প্রচারিত ধর্মে অটল রয়েছেন।

হযরত বশর বিনেল হারেস বিন হামী ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের (রাঃ) পরীক্ষার পর বলেন, "অগ্নিতে দগ্ধ হয়ে স্বর্ণ যেমন এটার প্রকৃত পরিচয় প্রদান করে, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলেও তদ্রূপ শতসহস্র বিপদাপদের মধ্যে উপযুক্ততা ও কামালিতের পরিচয় প্রদান করেছেন।"

আলী ইবনে মদীনী বলেন, "ইমাম আহমদ (রাঃ) ইসলামের যে মহা খেদমত করেছেন, ইসলামের ইতিহাসে তা অতুলনীয়। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) সত্যের সংগ্রামে আনসার ও মুহাজেরদের সাহায্য পেয়েছিলেন। কিন্তু ইমাম আহমদ একজন সাহায্যকারীও পাননি। ইমাম নিশ্চয়ই উম্মতকুল শ্রেষ্ঠ ছিলেন।"

ইসহাক বিন রাহুবিয়া বলেন, "ইমাম আহমদ আল্লাহ্ এবং বান্দার মধ্যে দলীলস্বরূপ। তাঁর কোন মাসআলা আমার দৃষ্টিগোচর হলে আমি নিঃসন্দেহ ও সঙ্কোচহীনভাবে তা মাথা পেতে স্বীকার করে নেন। তাঁর সাথে মোকাবেলা করার শক্তি কার! তাঁর চরিত্রে আমি এমন সৎগুণরাজির পরিচয় পেয়েছেন, যা অতি কম আলেমের মধ্যেই দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে। মুহাদ্দেস, হাফেজ, আলেম, ওরা এবং জাহেদ সবকিছু তাঁর চরিত্রে সোনায়-সোহাগার মত ফুটে উঠেছিল।

হেলাল বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা নিম্নলিখিত চার ব্যক্তি দ্বারা উম্মতে মুহাম্মদীর মহা মঙ্গল সাধন করেছেন।

(১) ইমাম শাফেয়ী সহী তরীকাতে হাদীসে-রাসূল লোকদেরকে বুঝায়ে দিয়েছেন। তারপর তফসীর সম্বন্ধেও তিনি বিরাট খেদমত করেছেন। আর নাসেখ-মনসুখ সম্বন্ধে তাঁর দান অপূর্ব ও অতুলনীয়।

(২) আবু ওবাইদা (রাঃ) জইফ হাদীস সম্বন্ধে লোকদেরকে ওয়াকিফহাল করেছেন।

(৩) এয়াহয়া মিথ্যা হাদীস সম্বন্ধে মুসলমান জাতিকে হুশিয়ার করে দিয়েছেন।

(৪) আহমদ বিন হাম্বল মহাপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ঈমানের মহাবল প্রদর্শন করেছেন, এ চার মহান ব্যক্তির অস্তিত্ব না থাকলে, লোকেরা ধ্বংস হয়ে যেত।

বাকর বিন আবী দাউদের খেয়াল এই যে, ইসলাম-জগতে যাঁরা এলম চর্চা করেছেন, তন্মধ্যে ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের স্থান অতি উচ্চে। হাদীসে আছে যে, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, 'আমার উম্মতের মধ্যে একদল সর্বদা সত্যের উপর

কায়েম থাকবে। কেউই তাদেরকে অপমানিত করতে পারবে না এবং কেউই তাদের কোন ক্ষতিও করতে পারবে না। এভাবে আল্লাহর হুকুম (কেয়ামত) এসে পড়বে।"

বাকর বিন আবু দাউদ বলেন, "আবদুল্লাহ বিনেল মোবারক এবং আহমদ বিন হাম্বল ইত্যাদি আমার খুব বিশ্বাস সেই সকল সৌভাগ্যশালীদের অন্তর্গত লোক।"

সরকার-বিরোধিতা

সেই হৃদয়-বিদারক ঘটনার পর ইমাম আহমদ (রাঃ) বাড়ী ফিরে আসলেন। তখন হতে তাঁর যখমের চিকিৎসা শুরু হয়। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে আরোগ্য দান করলেন। তিনি এরূপ নির্জনবাসী হলেন যে, জুমা, জমাআতে যোগদান এবং হাদীস-ক্লাস সব হতে দূরে সরে পড়লেন। অতি অল্প আয়ে তিনি স্ত্রী-পুত্র পরিবার সহ জিন্দেগানী চালাতে থাকেন।

দলের লোক যখন খলীফার পদে বরিত হলেন, তখন লোকেরা মহাখুশী হলো। এ সম্বন্ধে কোন প্রকার আলাপ-আলোচনা না করার জন্য সরকারী-ঘোষণা প্রচারিত হলো। ইমাম সাহেবকে মহা সম্মানীতভাবে খলীফার-দরবারে প্রেরণ করার মানসে খলীফা একজন বিশিষ্ট লোককে নিযুক্ত করলেন। সেই বিশিষ্ট লোকটির নাম ছিল ইসহাক। লোকটি ইমাম সাহেবকে মহা সম্মান প্রদর্শন করল। যাত্রা করার জন্য সব বন্দোবস্ত করা হলো। কিন্তু তার সাথে ইমাম সাহেবের এমন এক ঘটনা ঘটল যে, তাতে ইস্হাক ইমাম সাহেবের প্রতি রাগান্বিত হয়ে পড়ল। তখন তার পূর্ব আক্রোশ আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। সে খলীফার কাছে যেয়ে ইমাম সাহেব সম্বন্ধে অভিযোগ পেশ করল। খলীফা তাঁকে ফিরে যেতে আদেশ দিলেন। এতে ইমাম সাহেবের হৃদয় মর্মাহত হলো। তিনি আবার বাগদাদ ফিরে গেলেন।

ইবনে সালজী নামে জনৈক পথভ্রান্ত এবং ধর্মহীন ব্যক্তি খলীফার কর্ণগোচর করল যে, ইমাম সাহেব ওলুভী খান্দানে সাথে ঘোর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছেন। খলীফা বাগদাদের গভর্ণরকে ইমাম সাহেবের বাড়ীখানা তালাশ করার জন্য আদেশ দিলেন। রাত্রিকালে এ দুরাচার ব্যক্তিরা ইমাম সাহেবের বাড়ী ঘেরাও করে ফেলল। ইমাম সাহেব এ সকলের কোনকিছুই জানতে পারলেন না। হঠাৎ তিনি আলোক এবং বাড়ীর চারদিকে ঘেরা লোকজন দেখতে পেলেন।

লোকজন তাঁর ছাদে আরোহণ করে দেখতে পেলেন যে, ইমাম সাহেবের বাড়ীতে তাঁর স্ত্রী-পুত্র, পরিবার পরিজন ব্যতীত অপর কোন লোকজন নেই। তারা ওলুভী সম্প্রদায়ের সাজেস সম্বন্ধে জিজ্ঞেসাবাদ করলে, ইমাম সাহেব বললেন যে, এ-সম্বন্ধে তিনি কোনকিছুই জ্ঞাত নন। গুপ্তচরেরা তাঁর বাড়ীর আনাচে-কানাচে বহুকিছু অনুসন্ধান করেও ওলুভী সম্প্রদায়ের লোকের সাথে তাঁর কোন প্রকার সংশ্রব বুঝতে পারল না। খলীফা এ-সকল শুনে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, লোকেরা অনর্থক তাঁর কাছে ইমাম সাহেবের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করেছেন। খলীফা মহা অনুতপ্ত হলেন। তখন হতে ইমাম সাহেবের প্রতি তাঁর হৃদয়ে গভীর ভক্তি-শ্রদ্ধার উদ্রেক হলো। অতঃপর খলীফা ইয়াকুব বিন ইব্রাহীমের মারফত দশ হাজার দেরহাম ইমাম সাহেবের খেদমতে নজর স্বরূপ প্রেরণ করলেন।

ইমাম সাহেব তা গ্রহণ করলেন না। ইয়াকুব বলল, "এটাই বরং অধিক নিরাপদ যে, আপনি তা গ্রহণ করে অপরকে দান করুন। অন্যথায় খলীফা আপনার প্রতি মহা অসন্তুষ্ট হবেন।"

ইমাম সাহেব তখন তা গ্রহণ করলেন। অতঃপর নিজ বন্ধু-বান্ধবকে ডাকায়ে বাগদাদ ও বসরার দরিদ্র মোহাদ্দেসীন ও আলেমদেরকে আহ্বান করার জন্য আদেশ দিলেন। আর তাঁদের মধ্যে সকলকে বিলিয়ে দেয়ার নিমিত্ত নির্দেশে দান করলেন। অবিলম্বে তা কার্যে পরিণত করতে আদেশ করলেন। অন্যথায় তাঁর নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটবে বলে তাদেরকে জানায়ে দিলেন। আর সেই রাত্রের মধ্যেই সমুদয় অর্থ দরিদ্র আলেমদের মধ্যে বিতরণ করে দেয়া হলো। অথচ তাঁর নিজ পরিবার-পরিজন কপর্দকহীন এবং উপায়হীন থাকা সত্ত্বেও তাঁদের নিমিত্ত ইমাম সাহেব একটি কানাকড়িও রাখলেন না। তবে ব্যাপার এ ঘটেছিল যে, তাঁর এক অবোধ দৌহিত্র সামান্য কিছু অর্থ মুষ্টি ভরে নিয়ে যায়। এটা তাঁর দৃষ্টিপথে নিপতিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিষেধ করেননি।

উক্ত সংবাদ যখন খলীফার কর্ণগোচর হলো যে, ইমাম সাহেব সমুদয় অর্থ অপরাপরদের মধ্যে বিতরণ করে দিয়েছেন এবং টাকার থলিয়াটি পর্যন্ত নিজের কাছে রাখেননি, তখন খলীফা ইমাম সাহেবকে অধিক অর্থ সাহায্য করতে মনস্থ করলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি খলীফাকে বলল, "হে আমীরুম মুমেনীন, ইমাম সাহেব আপনার অর্থ পেয়েও তা দান করে ফেলছেন। আর প্রকৃত ব্যাপারও এই যে, ইমাম সাহেব যে ধরনের লোক তাতে তাঁর অর্থের প্রয়োজনই বা কি থাকতে পারে? প্রতিরোজ দুইবেলা রুটি জুটে গেলে তাঁর পক্ষে যথেষ্ট।" খলীফা বললেন, "তুমি মন্দ বলনি।"

অতঃপর ইসহাক বিন ইব্রাহীম এবং তার পুত্র মুহাম্মদের মৃত্যুর পর আবদুল্লাহ্ বিন ইসহাক যখন বাগদাদের শাসনকর্তা রূপে নিযুক্ত হলো, তখন খলীফা তাকে লিখে পাঠালেন, "ইমাম সাহেবকে আমার দরবারে পরম সম্মানের সাথে নিয়ে আসুন।"

ইমাম সাহেবের কাছে গভর্ণর উক্ত আরজ পেশ করলেন, তিনি তাঁর বার্ধক্য ও শারীরিক দুর্বলতার ওজর জ্ঞাপন করলেন। গভর্ণর খলীফার কাছে উক্ত সংবাদ পৌছায়ে দিলেন। খলীফা হতে সন্তুষ্ট হতে না পেরে গভর্ণরকে লিখেলেন, "আপিনি ইমাম সাহেবের কাছে আমার এ কামনা জ্ঞাপন করে দিন যে, আমি তাঁর সাহায্য হতে বরকত লাভ করতে চাই এবং আমি তাঁর দো'আ প্রার্থী।"

ইমাম সাহেব এ সকল পরিজ্ঞাত হয়ে বাগদাদ হতে স্ত্রী-পুত্র-পরিবার সহ যাত্রা করলেন। তিনি রাজধানীর সন্নিকটবর্তী হলে খলীফার খাদেম তাঁকে মহা জাঁক-জমকের সাথে স্বাগত সমাধর করল। খাদেম তাঁকে সালাম জানালেন, তিনি সালামের জবাবও দিয়ে দিলেন। অতঃপর খাদেম বলল, "আপনাকে একটি শুভ সংবাদ জ্ঞাপন করেছি যে, খোদা আপনার দুশমন ইবনে আবী দাউদকেএ দুনিয়ার পৃষ্ঠ হতে উঠায়ে নিয়ে গিয়েছেন।"

ইমাম সাহেব এটা শুনে চুপ হয়ে রইলেন। ইমাম সাহেব তখন একটি দালানে আশ্রয় নিলেন। পরিশেষে তিনি জানতে পারলেন যে, দালানটি জায়েয পন্থাতে লাভ হয় নাই, তখন তিনি তা পরিত্যাগ করলেন। তারপর অপর একটি বাড়ী ভাড়া করে তিনি তাতে স্ত্রী-পুত্রসহ অবস্থান করতে লাগলেন।

তখন হতে সেখানে আমির-ওমরাদের ভিড় জমতে শুরু হলো। খলীফা সে বাড়ীর জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে আসবাবপত্র প্রেরণ করলেন। আর খুব উপাদেয় আহার্য্য প্রস্তুত করে ইমাম সাহেবের খেদমতে প্রেরণ করা হলো।

কিন্তু ইমাম সাহেব এইসব হতে কোন কিছু স্পর্শও করলেন নাতনি বরাবরই রোযা রাখছিলেন।

তখন খলীফা তাঁকে বলে পাঠালেন, "আপনি অতীতের তিক্ত স্মৃতি ভুলে যান। আপনার জীবনের শেষ দিনগুলো এখানেই কাটান। আবার আপনি হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শিক্ষা-প্রদানে ব্রতী হোন।"

ইমাম সাহেব তখন তাঁর অসুস্থতা ও বার্ধক্যের ওজর পেশ করলেন। খলীফা বরাবরই ইমাম সাহেবের খেদমতে খানা প্রেরণ করছিলেন সেই আহার্য যে কোন্ প্রকারের ছিল, তা বলা নিষ্প্রয়োজন। খলীফা তাঁর সাধ্যানুযায়ী ও সামর্থানুযায়ী উপাদেয় খাদ্য প্রেরণ করতে কোন প্রকার চেষ্টার ত্রুটি করেননি।

কিন্তু ইমাম সাহেব এই সবের প্রতি ভ্রূক্ষেপও না করে তিন দিন ক্রমাগত রোযা রাখলেন। ইতিমধ্যে তিনি কোনকিছু আহার করেননি। তিন দিন অতীত হয়ে যাওয়ার পর তিনি কিছু ছাতু পানিতে মিশায়ে পান করলেন।

একদিন আবদুল্লাহ্ বিন এয়াহয়া বিন খাকান খলীফার পক্ষ হতে বহু অর্থ সহ ইমাম সাহেবের খেদমতে উপস্থিত করা হয়েছে। ইমাম সাহেব তা গ্রহণ করলেন না। শত অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি তা গ্রহণ করলেন না।

খলীফা তখন সমুদয় অর্থ ইমাম সাহেবের পরিবার-পরিজনের মধ্যে বিতরণ করে দিলেন। তদুপরি ইমাম সাহেবের সন্তান-সন্ততির নিমিত্ত প্রতিমাসে চার হাযার দেরহাম বৃত্তি-স্বরূপ নির্দিষ্ট করে দিলেন। কিন্তু ইমাম সাহেব তা হতে কখনও কিছুই ভোগ করেননি। আর সন্তানদেরকে বললেন, "আমার জিন্দেগানীর আর কতিপয় বছর বাকী রয়েছে, তোমরা আমার জীবিতাবস্থায় শাহী-বৃত্তি গ্রহণ করেছ। জানি না, খোদাতায়ালা এটার জন্য সুফল দান করবেন, নাকি এটাকে দোযখ-ভোগের কারণ করবেন।" তিনি তাঁর সন্তানদেরকে এ-সম্বন্ধে বহু দলীল পেশ করলেন। কিন্তু তিনি তা মানলেন না।

ইমাম সাহেবের শারীরিক দুর্বলতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে লাগল। তাঁর অবস্থা সঙ্কটপূর্ণ হয়ে উঠলে, খলীফা চিকিৎসক পাঠায়ে দিলেন। ইমাম সাহেবের হাল-হাকীকত অবগত হয়ে চিকিৎসক খলীফাকে জানায়ে দিলেন যে, ইমাম সাহেব কোন কিছুই আহার গ্রহণ করেন না, এটা ব্যতীত তাঁর শরীরে অন্যান্য কোন রোগ নেই। ক্রমাগত রোযা রাখা এবং অত্যধিক এবাদত বন্দেগীই তাঁর সমূহ রোগের মূল কারণ।

খলীফা এটা শুনে মৌনতা অবলম্বন করে রইলেন। খলীফা জননী ইমাম সাহেবের খেদমতে যাবার বাসনা জ্ঞাপন করলেন। খলীফা ইমাম সাহেবকে লিখে পাঠালেন যে, তিনি যেন খলীফার পুত্রের মহলে পদার্পণ করেন। প্রথমে তিনি তা অস্বীকার করতে চাইলেন। কিন্তু শেষে ভাবলেন যে, এতে হয়-তো তাঁর পক্ষে বাগদাদ ফিরবার পথ সহজ ও সরল হতে পারে।

খলীফা তখন রাজকীয় যানবাহন মূল্যবান পোশাক ইমাম সাহেবের খেদমতে প্রেরণ করলেন। তিনি এতে আরোহণ করলেন না, কারণ এতে কিছু ছবি চিত্রিত ছিল। তিনি জনৈক সওদাগরের গাধায় আরোহণ করে গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হলেন। খলীফা ও খলীফা-জননী তখন পর্দার আড়ালে অবস্থান করছিলাম।

খলীফা-জননী ইমাম সাহেবের দিকে একটিবার মাত্র তাকায়ে বলতে লাগলেন, 'আল্লাহ্-আল্লাহ্! হে বৎস, তুমি কি এরূপ মহান ব্যক্তির উপর ষড়যন্ত্রের অভিযোগ প্রদান করেছিলে? আমার অন্তর চেয়েছে যে, আমি তাঁকে তাঁর স্বীয় ভবনে পৌছায়ে দেই।"

খলীফাও তাঁর চেহারার-পানে তাকাবামাত্র বললেন, "আম্মাজান, দেখুন, কি-রূপ আলোকিত হয়ে পড়েছে!"

অতঃপর খাদেম এসে ইমাম সাহেবের গায়ে বহু মূল্যবান রাজকীয় পোশাক পরিধান করায়ে দিলেন। ইমাম সাহেব তখন খামোশ অবস্থান বসে রইলেন। এতে বুঝা যাচ্ছিল যে, তিনি তা পছন্দ করেননি। ইমাম সাহেব তওবা-এসতেগফার পড়ে সেখান হতে বের হলেন।

ইমাম সাহেবের বাগদাদে ফিরবার জন্য বন্দোবস্ত হলো। তজ্জন্য খলীফা এক রাজকীয় কিস্তি পাঠায়ে দিলেন। ইমাম সাহেব তাও গ্রহণ করলেন না। তিনি এক সাধারণ নৌকা-যোগে বাগদাদ পৌছলেন। তিনি রাজকীয় পোশাক বিক্রয় করে সেই বিক্রয়-লব্ধ পয়সা দীন-দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করলেন।

খলীফার সাথে তাঁর এতখানি মিলামিশায়ও তাঁর মনে ক্ষোভের সঞ্চার হলো। তিনি আক্ষেপের সুরে বলতে লাগলেন, "আজীবন তাঁদের সাথে সংশ্রবশূন্য ভাবে কাটায়ে দিয়ে জীবনের শেষভাগে এরূপ মিলামিশা করা ঠিক হয়নি!"

কোন কোন আমীর যেয়ে খলীফাকে জানায়ে দিল যে, ইমাম সাহেব খলীফা প্রদত্ত কোন বস্তু ব্যবহার করছেন না। তদুত্তরে খলীফা বললেন, "মু'তাসিম যদি আবার কবর হতে উঠে এসে ইমাম সাহেবের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করে, তবে তাও গ্রাহ্য নয়।"

তখন হতে ইমাম সাহেবের প্রতি খলীফার অচল অটল বিশ্বাস জন্মেছিল। তিনি বরাবরই ইমাম সাহেবের খবরা-খবর নিতেন।

ইবনে আবী দাউদ ইমাম সাহেবকে যে কষ্ট প্রদান করেছিল, খলীফা একদিন ইমাম সাহেবকে সেই সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। ইমাম সাহেব চুপ রইলেন। খলীফা তাকে যথাযথ শাস্তি প্রদান করলেন।

কোন এক ব্যক্তি খলীফার কাছে গোপন চিঠি প্রেরণ করল যে, ইমাম সাহেব আপনার বাপ-দাদাকে জিন্দীক বলে অভিহিত করেন। জওয়াবে মুতওক্কল বললেন, "এটা সত্য যে, মামুন লোকের সাথে অধিক মিলামিশা করতেন। কাজেই ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর মতিভ্রম অসম্ভব ব্যাপার নয়। আর আমার পিতা

মু'তাসিম একজন ঝগড়াপ্রিয় লোক ছিলেন। এলম-কলামের সাথে তাঁর কোন সংশ্রব ছিল না। অথচ ধর্ম সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি করতে যেয়ে তিনি বহু গর্হিত কাজ করেছেন। আর আমার ভাই ওয়াসেব যে নিসক জিন্দীক ছিল, তাতে সন্দেহের অবকাশ দেখিনা।"

প্রকৃত ব্যাপার জানবার জন্য খলীফার মনে এক প্রবল বাসনা জাগল। তাঁর অনুরোধক্রমে ইমাম সাহেব এ সম্বন্ধে এক বিরাট গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এতে তিনি হাদীসে মরফুয়া এবং সাহাবা কেরামদের আছার হতে বহু দলীল পেশ করেন।

ইমাম সাহেবের আকীদা

আবুল ফরাহ ইবনুল জুজী হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের একটি পত্র নকল করেছেন। ইমাম সাহেবের কাছে তাঁর শাগরেদ যে পত্র লিখেছিলেন, উক্ত পত্রে তিনি এটার জবাব দান করেছেন। আর প্রকৃতপক্ষে পত্রটি ইমাম সাহেবের আকীদা সম্বন্ধে এক আয়না-স্বরূপ।

আবু বকর বিন মুহাম্মদ যিনি ইবনুল জুজীর সনদের সর্বশেষ রাবী, তিনি বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম আহমদ সাহেবের জনৈক শাগরেদ রওয়াফেজ, কাদরীয়াহ্ ও মু'তাজেলাদের ফেৎনা এবং ইত্যাদি সম্বন্ধে সঙ্কটপূর্ণ প্রশ্ন সমূহের জবাব চেয়ে ইমাম সাহেবের কাছে একটি পত্র লিখেন। এটার জবাব-স্বরূপ ইমাম সাহেব লিখেন–"আল্লাহ্ তোমাকে এবং আমাকে এমন শক্তি দান করুন, যাতে আমরা প্রতি কাজে তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করতে পারি–; আর তিনি যেন আমাদেরকে এমন প্রতি কাজ হতে বাঁচায়ে রাখেন, যাতে তিনি নারাজ হবেন। আর যাঁরা আল্লাকে ভয় করেন, তিনি যেন আমাদেরকে তাঁদের দলভুক্ত করেন। কেননা, একমাত্র তাঁদের আমলই অনুসরণ-যোগ্য। আর আমি তোমাকে আমার পক্ষ হকে পরহেযগার এবং সুন্নতের অনুসরণ-কারী দলের অনুকরণ-অনুসরণ করতে নসীহত করেছি।"

"আমি এ হাদীসটি জানতে পেরেছি যে, মানুষ সুন্নত অনুযায়ী কাজ করলে বেহেস্তী হবে। কাজেই আমি তোমাকে স্মরণ করায়ে দিচ্ছি যে, কোরআনের চেয়ে অন্য কোন কিছুর উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করা চলে না। আর এটা আল্লাহ্-তায়ালার কালাম এবং আল্লাহ তায়ালা স্বীয় কলামে পূর্বকালীন উম্মতের যে হালত বর্ণনা করেছেন, তাও এবং লওহে মাহফুজে যা লিপিবদ্ধ রয়েছে, তাও এ-সকলকে যারা বলে, তারা কাফের। আর যারা তাদেরকে কাফের বলে না, তারাও কাফের।"

"আল্লাহ তায়ালার কালামের পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হাদীসের স্থান। আর হযরতের হাদীসের সঙ্গে সাহাবা ও তাবেয়ীনদের গ্রহণযোগ্য। আর রাসূল (সাঃ) যা নিয়ে এসেছেন, এদেরকে সত্য বলে জানা এবং তাঁর সুন্নতের অনুকরণ-অনুসরণ নাজাতের উৎসস্বরূপ। এটাই সমগ্র সলফ ও খলফদের অভিমত।"

পথভ্রান্ত লোকেরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ

(১) তারা কোরআনকে আল্লাহ তায়ালার কালাম কিন্তু মাখলুক বলে বিবেচনা করে থাকে।

(২) তারা কোরআনকে আল্লাহর কালাম বলে মান্য করে থাকে।

(৩) তারা বলে থাকে যে, কোরআনের বাণীসমূহ মাখলুক।

"তারা প্রত্যেকেই পথভ্রান্ত। আর সলফগণ এ সম্বন্ধে একমত যে, সকল লোক যদি স্বীয় আকীদা হতে তওবা না করে, তবে তাদের সাক্ষ্য গ্রাহ্য নয় এবং তাদের জবেহও হালাল নয়।"

"কথা এবং আমলের নামই ঈমান। নেক কাজ করলে এটা বৃদ্ধি পায় এবং পাপের কাজ করলে এটা কমে যায়। মানুষ অনেক সময় পাপ পরিত্যাগ করে ইসলামের দিকে আসে। মানুষ পাপ করে যখন তওবা করে, তখন তার মধ্যে ঈমান আসে। শেরেক বা আল্লাহর ফরজ কাজসমূহের মধ্যে কোন একটিকে অস্বীকার করা ব্যতীত অপর কোনকিছুই ইসলাম হতে খারেজ করে না। কোন ব্যক্তি যদি বেপরোয়াভাবে কোন ফরজ পরিত্যাগ করে, তবে এটা আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছাধীন। ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমা করবেন না শাস্তি প্রদান করবেন।"

মু'য়তাজেলাদের সম্পর্কে আমি পূর্ববর্তী সকল আলেমের কাছে শুনেছি যে, তারা পাপকে কাফের হওয়ার উপযুক্ত কাজ বিবেচনা করে থাকে। এই মাপকাঠিতে বিচার করতে গেলে হযরত আদম আলাইহিস সালাম এবং ইউসূফ আলাইহিস সালামের সব ভাই কাফের হয়ে যাবেন (নাউজুবিল্লাহ্)। কেননা, হযরত আদম আলাইহিস সালামও তাঁর প্রতিপালকের নাফরমানী করেছিলেন। আর ইউসূফ (আঃ)-এর ভাইগণ তাঁদের পিতার সাথে মিথ্যা কথা বলেছিলেন।"

"এরূপ কথা যারা বলে, তারা কাফের। তাদের সাথে কোনপ্রকার আলাপ-আলোচনাও করা চাই না। তাদের জবেহও খাওয়া চাই না।"

"রাফেজীদের সম্বন্ধেও আমরা আমাদের সকল পূর্ববর্তীদের কাছ হতে শুনেছি যে, রাফেজীরা হযরত আলী (রাঃ) কে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর উপর গুরুত্ব

প্রদান করে থাকে। আর শেরে খোদার ঈমানকে সিদ্দীকে আকবরের ঈমানের পূর্ব-ঘটনা বলে প্রচার করে থাকে।"

"যে ব্যক্তি এরূপ ধারণা করে যে, সিদ্দীকে আকবরের (রাঃ) চেয়ে আলী (রাঃ) শ্রেষ্ঠ, তারা কিতাব ও সুন্নতকে রদ করে থাকে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, এ আয়াত দ্বারা সিদ্দীকে আকবরকে বুঝান হয়েছে, শেরে খোদাকে বুঝান হয়নি। কোরআন দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, সিদ্দীকে আকবর শেরে খোদার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তদুপরি রাসূল (সাঃ)ও বলেছেন, "আমার পক্ষে কাউকেও যদি বন্ধুরূপে গ্রহণ করা সম্ভবপর হতো, তবে আমি আবু বকরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম। কিন্তু আল্লাহ্ আমাকে তাঁর বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন।"

"আর যারা ধারণা করে যে, হযরত আলী (রাঃ) হযরত আবু বকরের (রাঃ) পূর্বে ঈমান এনেছেন, তারা ভুল করেছে। কেননা হযরত আবু বকর (রাঃ) ৩৫ বছর বয়সের সময় ঈমান আনেন। তখন হযরত আলীর (রাঃ) বয়স মাত্র সাত বছর। তখন তাঁর পক্ষে নামায রোযাও ফরজ হয়নি।"

"আমাদের ঈমান এই যে, কাজা ও কদর, ইষ্ট ও অনিষ্ট, ভাল ও মন্দ সকলই খোদার কাছ হতে হয়ে থাকে। আল্লাহ তায়ালা বেহেশত ও বেহেশতী-দেরকে সারা জগৎ সৃষ্টি করার পূর্বেই পয়দা করেছেন। আর বেহেশতের প্রত্যেকটি নেয়ামতই চিরস্থায়ী।"

"এরূপে দোজখ এবং দোজখীদেরকেও পয়দা করা হয়েছে। আর এটার আজাবও চিরস্থায়ী। এটা কখনও ধ্বংস হবে না।"

"আর আমরা এটাও বিশ্বাস করে থাকি যে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শাফায়াত অনুযায়ী একদল দোজখ হতে মুক্তি পেয়ে বেহেশতবাসী হবে এবং বেহেশতবাসীরা অন্য কোন প্রতিবন্ধক ব্যতীত স্বীয় চোখে আল্লাহ তায়ালাকে দেখতে পাবে।"

"আল্লাহ তায়ালা হযরত মুসা আলাইহিস সালামের সাথে কথা বলেছিলেন। হযরত ইব্রাহিম কে আল্লাহ তায়ালা স্বীয় বন্ধুতে পরিণত করেন।

"মীজান সত্য। পুলসেরাত সত্য। নবীগণ সত্য। আর ঈসা বিন মরিয়ম আল্লাহর একজন বন্দা এবং তাঁর রাসূল। আরশ, কুরছি সত্য। মালাকুল মওত বন্দার জান কবজ করবেন, এটার উপর আমরা ঈমান এনেছিল।"

"আর এটার উপরও আমরা ঈমান এনেছি যে, রূহ আবার শরীরের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। আর রূহকে তওহীদ ও রেসালাত সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হবে। শিঙ্গাতে ফুঁ দেয়া সত্য।"

"মদীনাতে যে কবর রয়েছে, তা হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কবর। আর কেউ কবরের পাশে সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) এবং ফারুক আজমের (রাঃ) কবর রয়েছে।"

"আর মানুষের অন্তরসমূহ আল্লাহ তালার চোখসমূহের মধ্যে রয়েছে। দজ্জাল নিশ্চয়ই একদিন বের হবে আর ঈসা আলাইহিস সালাম সেই দুনিয়ায় পয়দা হবেন। আর তিনি দাজ্জালকে নিহত করবেন। ওলামায়ে আল-সুন্নাত যে বস্তুকে বলেছেন তা মুনকার, আর সাধারণ বেদাআতসমূহ হতে বেঁচে থাকতে হবে।"

"হযরত আবু বকর, হযরত ওমর, হযরত ওসমান এবং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম সকলেই হেদায়ত প্রাপ্ত। আর আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিম্নলিখিত হযরত অকাট্যভাবে বেহেশতী, যথা আবু বকর, ওমর, ওসমান, তলহা, জুবাইর, সাআদ, সাইদ, আবদুর রহমান বিন আউফ এবং আবু উবাইদা বিন জররাহ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম।"

"তাঁদেরকে এই জন্য বেহেশতী বলেছি যে, হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে বেহেশতী বলে উল্লেখ করেছেন।"

"আর অপর কোন মুসলমানকে অকাট্যভাবে বেহেশতী এবং দোজখী বলা সহী নয়। নফসের গোলামদের সাথে ঝগড়া করা নিষ্ফল।"

হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আসহাবগণের দোষ বর্ণনা এবং তাঁদের মধ্যে আপোসের বাদানুবাদ সম্বন্ধে সংযত হয়ে রসনা পরিচালনা করিও। বরং তাঁদেরকে ফজীলত সম্বন্ধেই আলোচনা করবে।"

"বেদাতীদের সাথে পরামর্শ করা দূরের কথা তাদের সাহচর্যও বর্জন করবে।"

"মুতা' কেয়ামত পর্যন্ত হারাম। প্রত্যেক আহলে কেবলার জানাযায় শামিল হবে। তাদের ব্যাপারে আল্লাহর উপর ন্যস্ত কর। প্রত্যেক ইমামের সাথে জেহাদ ও হজ্বে যোগদান করা উচিত।"

"জানাযার চারটি তকবীর রয়েছে। ইমাম যদি পাঁচ তকবীর বলে ফেলেন, তবে তুমিও তাই বলবে। হযরত আলী বিন আবী তালেব (রাঃ) ও তা করেছিলেন।"

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাঃ) বলেছেন যে, ইমাম যদি পাঁচ তকবীর বলেন, তবে তুমিও পাঁচ তকবীর বলবে। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী এ সম্বন্ধে

মতবিরোধ করেছেন। তিনি বলেন যে, "পাঁচ তকবীর বললে নামায দ্বিতীয়বার পড়তে হবে।"

ইমাম আহমদ হাম্বল (রাঃ) পরিশেষে আবার বললেন, "কোরআন আল্লাহর কালাম এবং কোরআন বলতে কস্মিনকালেও দ্বিধাবোধ করা চাই না। কেননা, এটা আল্লাহর কালাম। আর আল্লাহর কালাম কখনও হতে পারে না।"

"যারা কোরআনকে বলে থাকে বা কোরআনকে আল্লাহর কালাম বলে থাকে কিন্তু এটাকে কোন কিছুই বলে না বা অকাট্যভাবে কোরআন বলে থাকে, তাদের প্রত্যেকের সাথে তর্ক করা হতে দূরে থাকবে। কেননা, তারা সকলেই এক পর্যায়ভুক্ত।"

"দজ্জাল যখন পয়দা হবে, তখন তার দুই চোখের মধ্যবর্তী স্থানে কাফের শব্দ লিখে থাকবে।"

"যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক নামায পরিত্যাগ করে, সে কাফের। আমলের মধ্যে নামায ব্যতীত অন্য কোন আমল পরিত্যাগ করলে কুফর বর্তে না।

"যারা আখলাক উত্তম, সে খাঁটি মুমিন। চোর এবং খারেজীদের সাথে মারামারি জায়েয।"

"প্রত্যেক তেমন ব্যক্তি যাকে খলীফা নির্বাচিত করা হয়েছে, বা সে নিজেই বলপূর্বক খলীফা হয়ে গিয়েছে, সে মুসলমানদের খলীফা।"

"ফাসেক ও ফাজের ইমামকে যাকাত ও সদকা দিয়ে দিলে, তা আদায় হয়ে যাবে।"

"আর জুমা প্রত্যেক ফাসেক ফাজের ইমামের পিছনেও পড়া যায়। যে ব্যক্তি তা না করবে বা নামায আদায় করার পর আবার পড়বে সে নিতান্ত ভুলের উপর থাকবে। আর সে কিছুতেই জুমার ফজীলত পাবে না।"

"কোন নেতাকে আক্রমণ করা চাইনা, যদিও সে অত্যাচারী হয়। আর কোন তওহীদ পন্থীকে কাফের বলা চাইনা, যদিও সে কবীরা গুনাহে লিপ্ত থাকে আর হযরতের আসহাবদের মধ্যে কোন মন কষাকষি হয়ে থাকলে ও তেমনক্ষেত্রে চুপ থাকা বাঞ্ছনীয়। আর হযরতের স্ত্রীবর্গ ও সন্তান সন্ততি কে রাহ্‌মের দৃষ্টিতে দেখা সমুচিত। এটাই মূল সুন্নত। এ সকল কায়েম রাখলে মানুষ মুসলমান বনিতে পারে। আর এসব পরিত্যাগ করলে, মানুষ পথভ্রান্ত হয়ে যায়।"

এ সম্বন্ধে আমি এলমী তাহকীক করতে ইচ্ছা করেছিলাম। কিন্তু এটার ফলাফল খুব সন্তুষ্টজনক হয়নি। এটার কারণ এ যে, এটা জনসাধারণের (বোধগম্য) ব্যাপার নয়।"

গ্রন্থাবলী

ইমাম সাহেব অসংখ্য কিতাব লিখেছেন। তন্মধ্যে কতিপয় গ্রন্থ সবশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। নিম্নে কয়েকটির নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কিতাবুল আমল, কিতাবুওফ্সীর, কিতাবুন্নাসেখ ওয়াল মনসুখ, কিতাবুজ জুহদ, কিতাবুল-মসায়েল, কিতাবুল ফজায়েল, কিতাবুল মুনাসেফ এবং কিতাবুল ঈমান।

এ সকল কিতাব ব্যতীত আরও বহু কিতাব রয়েছে, যথা কিতাবুল এয়তেকাদ, কিতাবুচ্ছালাত, কিতাবুল ওরা। শেষোক্ত কিতাব দুইটি মুদ্রিত হয়েছে।

"কিতাবুল মসনদ" ইমাম সাহেবের অতি প্রসিদ্ধ একটি কিতাব। ইমাম সাহেব এতে বহু হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন।

হাম্বল বিন ইসহাক রেওয়ায়েত করেছেন যে, আমার চাচা ইমাম আহমদ বলেন, আমি এতে পঞ্চাশ হাজার সাত শতের চেয়ে অধিক হাদীস সঙ্কলিত করেছি। মুসলমান যদি কোন হাদীস সম্বন্ধে ঝগড়া করে, তবে সে যেন এ কিতাবে তা দেখে নেয়। এতে যদি তা পাওয়া যায়, তবে এটাকে সহী বলে বিবেচনা করবে। আর যদি পাওয়া না যায় তবে তা সহী নয়।"

ইমাম সাহেবের পুত্র আবদুল্লাহ্ বলেন, "আমার আব্বাজান এতে এমন দশ হাজার হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন যে, আমি তা কণ্ঠস্থ করে ফেলেছি। আমি একদিন আব্বাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি তো এই সকল হাদীস বুঝে থাকেন, তথাপি আবার সনদসহ লিখেছেন কেন? তিনি বললেন, "লোকেরা যদি কোন হাদীস সম্বন্ধে এখতেলাফ করে তবে এ কিতাব তা দেখে নিতে পারবে।"

হযরত আবদুল্লাহ্ আর বলেছেন, "আমার পিতা সাত লক্ষ হাদীস হতে গুণে বেছে এ মসনদ লিপিবদ্ধ করেছেন।"

হযরত ইমামুল মুত্তাকী হেনদীর ধারণা এ যে, 'মসনদে আহমদ' কিতাবে যা কিছু লিখতে হয়েছে, তা মকবুল।

সিউতী 'মসনদে আহমদ' কিতাবের শরা লিখিতে বলেছেন, "ইমাম আহমদ স্বীয় মসনদ সম্বন্ধে কড়া দৃষ্টি রেখেছেন।"

আবু মুসাল মাদীনী রেওয়ায়েত করেছেন যে, ইমাম আহমদ বলেছেন, মসনদে যে সকল হাদীস স্থান পেয়েছে, তা দলীলস্বরূপ। আর যা স্থান পায়নি, এটাকে দলীল রূপে ধরা যায় না, বরং ইমাম সাহেব বলতে চেয়েছেন যে, এতে যা স্থান পায়নি তা অকাট্য দলীল নয়। কিন্তু এতে যা স্থান পেয়েছে, তা অকাট্য দলীল।

মৃত্যুর পূর্বাবস্থা

ইমাম সাহেবের পুত্র হযরত সালেহ বলেন, "আমার আব্বাজান ২৪১ হিজরীতে রবিউল আউওয়াল মাসের প্রথম ভাগে মৃত্যু শয্যায় শায়ীত হন। তিনি কোন কিছু খেতে চান কিনা, আমি তা জিজ্ঞেস করলাম। খাওয়ার বস্তুর প্রতি চিরকাল যেরূপ অনাসক্ত ছিলেন, তখন তিনি তদ্রূপ মনোভাব প্রকাশ করলেন।"

ইমাম সাহেব বললেন, "বিশিষ্ট লোক জনসাধারণের সমাগম খুব বেশী হয়েছে। যথাসম্ভব এটা কমায়ে দেয়া ভাল।"

এটার পরে তিনি আরও কিছু নসীহত করলেন। অতঃপর তিনি শিশুদেরকে ডাকলেন। তিনি তাদের জন্যও দো'আ করলেন। তাঁর একটি বাচ্চা ছিল বাচ্চাটি তখন সবেমাত্র হাঁটতে আরম্ভ করেছে। তিনি উভয় বাচ্চাকে কাছে ডেকে এনে স্নেহ-আদর করলেন। ইমাম সাহেব বললেন, "আমার এ বার্ধক্যে আমি তাদের কাছ হতে কি উপকার লাভের আশা করতে পারি?" লোকেরা বললেন, "তারা বড় হয়ে আমার জন্য দোয়ায়ে খায়ের করবে।"

হযরত সালেহ ও আবদুল্লাহ্ বলেন, "হযরত ইমামের সময় তখন ফুরায়ে এসেছে। তখন তিনি 'দূর হও, দূর হও' বললেন। লোকেরা বলল, "আপনি কাউকে দূর হতে বলেছেন?" তিনি বললেন, "ঘরের কোণায় ইবলীস বসে রয়েছে। আর মনের দুঃখে সে নিজের অঙ্গুলি নিজেই কামড়াচ্ছে। সে আমাকে বলছে, আহমদ, ক্ষণিকের জন্য আমার দিকে একটু খেয়াল কর। আমি বললাম, "আমি নিশ্চয়ই তোমার কথায় কর্ণপাত করতে রাজী নই। আমার আত্মা তওহীদ সহ যে পর্যন্ত আমার দেহ হতে নির্গত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমার সম্বন্ধে গাফেল থাকব না।"

অতঃপর ইমাম সাহেব বললেন, "আমাকে ওজু করাও। আরও বলতে লাগলেন, শরীরের অমুক অমুক অংশ অতি উত্তমরূপে ধৌত কর। আবার বললেন, পায়ের আঙ্গুলগুলো খেলাল কর। আর এ সময়ের মধ্যে তিনি বরাবরই আল্লাহর জিকিরের মধ্যে মশগুল ছিলেন।"

পবিত্র মধুর ভাবে তিনি ওজু সম্পন্ন করলেন। আর তখন তিনি এই নশ্বর দুনিয়া পরিত্যাগ করে অবিনশ্বর জগতে চলে গেলেন। 'ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।'

তিনি শুক্রবার সকাল দশটার সময় ইন্তেকাল করেন। বাগদাদের সকল লোক তাঁরা জানাযার শরীক হবার নিমিত্ত ঝড় গতিতে ছুটে আসল।

মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন জাহের তখন খলীফার প্রতিনিধিরূপে বাগদাদে অবস্থান করছিলেন। তিনিও কতিপয় গোলামসহ কাফন নিয়ে রওয়ানা হলেন। আর ইমাম সাহেবের পরিবারস্থ লোকজনের কাছে বললেন, "আমি এ সকল খলীফার তরফ হতে আনয়ন করেছি। তিনি যদি বাগদাদে থাকতেন, তবে আজ তিনি স্বয়ং এখানে হাজির হতেন।"

ইমাম সাহেবের পুত্র জানায়ে দিলেন যে, আমীরুল মুমিনীন হযরত ইমামের জীবিতাবস্থায় তাঁকে কিছু দুঃখ-কষ্ট প্রদান করেছেন। ইমাম সাহেব তা সাহেবের প্রদত্ত কাফন ব্যবহার করা আমি সমীচীন মনে করিনা।

নাবালেগ শিশুরা যে কাপড় বুনেছিল, এমন কাপড় দ্বারা ইমাম সাহেবের কাফন দেয়া হলো। আর গোসল করার প্রত্যেকটি বস্তু খরিদ করে নিয়ে হয়েছিল। এমনকি পানি পর্যন্ত খরিদ করে নেয়া হয়েছিল। আর ইমাম সাহেবের পুত্রগণ রাজ-সহকারে চাকুরী করতেন। এজন্য ইমাম সাহেবের জীবিতাবস্থায় তাঁদের প্রদত্ত খানাপিনাও তিনি গ্রহণ করেননি। সুতরাং তাঁদের ঘরের পানি পর্যন্ত তাঁরা গোসলের সময় ব্যবহার করা হয়নি।

ইমাম সাহেবকে গোসলদানের সময় রাজধানী হতে হাশেম বংশের শতেক লোক উপস্থিত হন। তাঁরা বারংবার ইমাম সাহেবের কপালে চুমু খাচ্ছিছিলাম এবং দো'আ করছিলেন। আর আল্লাহর কাছে ব্যাকুলভাবে রাহমাত প্রার্থনা করছিলেন।

ইমাম সাহেবের লাশ যখন বের করা হলো, তখন অগণিত আবালবৃদ্ধবণিতা এমন কি স্ত্রীলোক পর্যন্ত জানাযার শামিল হলো। অসংখ্য সৈন্যও জানাযার সঙ্গে সঙ্গে চলল। শহর-নায়েব মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ্ ও জনতার সঙ্গে ছিলেন। তিনিই জানাযার নামাযের ইমামতি করেন। এজন্য অনেকে নামায দ্বিতীয়বার পড়েন।

লোক-সমাগমের অবস্থা এ যে, দ্বিপ্রহরের পূর্বেই লাশ বের করা হয়। আর আসরের নামায আদায়ের পূর্বে সেই লাশ কবরস্থ করা সম্ভবপর হয়নি।

লোক-সংখ্যা সম্বন্ধে অবশ্য মতভেদ রয়েছে। অনেকের ধারণা চার লক্ষেরও অধিক লোক শামিল হন। অনেকে আরও অধিক লোক জানাযায় অংশগ্রহণ করেছেন বলে অনুমান করেন।

বায়হাকী হাকিম হতে নকল করেন যে, আবদুল ওহ্হাবের কাছে এ রেওয়ায়েত পৌঁছে যে, জাহেলিয়াত ও ইসলাম এ উভয় জমানায় কোন জানাযায় এত লোকের সমাগম হয়নি।

কাফী বর্ণনা করেন যে, ইমাম সাহেবের ইন্তেকালের দিবস বিশ হাজার ইহুদী, নসরা এবং অগ্নিপূজক দীন-ইসলাম গ্রহণ করেন।

হেজায বিন মুহাম্মদুশ্ শায়ের হতে বায়হাকী রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলছিলেন, "ইমাম আহমদ হাম্বল সাহেবের জানাযার নামায শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি কোন জেহাদে যোগদান করে শহীদী-মৃত্যু বরণ করাও পছন্দ করিনি।"

বায়হাকী রেওয়ায়েত করেন যে, কোন কোন আলেম রেওয়ায়েত করেছেন যে, যে দিন ইমাম আহমদ বিন হাম্বল এই নশ্বর দুনিয়া পরিত্যাগ করেন, সে দিন হতে এ দুনিয়া-পৃষ্ঠ হযরত আবু বকর, হযরত ওমর, হযরত ওসমান, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আন্হুম এবং হযরত ওমর বিন আবদুল আজীজ রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহের অনুরূপ মহৎ লোক শূন্য হয়ে যায়।

হযরত ইমাম যে দিন ইন্তেকাল করেন, তখন তাঁর বয়স ৭৭ বছর এবং একমাসের কাছাকাছি ছিল।

ইমাম সাহেবের ব্যক্তিত্বের উপর নজর

ইমাম সাহেব বলেন, "আমি পাঁচবার হজ্ব করেছি। তন্মধ্যে আমি তিনবার পদব্রজে গমন করেছি।"

ইমাম সাহেব সম্বন্ধে মুহাদ্দেসীনের অভিমত– ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহে বলেন, "বাগদাদের বুকে আমার চোখে ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের চেয়ে অধিক ফকীহ, জাহেদ, মুত্তাকী এবং আলেম অপর কেউই দৃষ্টিগোচর হননি।"

এয়াহয়া বিন মাঈন বলেন, "আমি যদি সারাদিন পরেও ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের প্রশংসা করতে থাকি, তবুও তা নিঃশেষ হবার নয়।"

ইমাম আজলী বলেন, "ইমাম আহমদ এবং তিনি এ সুন্নত ও আসারে সাহাবাদের পরিপূর্ণ অনুসরণকারী।

ইমাম সাহেব-তনয় হযরত আবদুল্লাহ বলেন, "খোদাতায়ালা নিম্নলিখিত ব্যক্তিকে পয়দা করে উম্মতে মুহাম্মদীয়ার অশেষ উপকার সাধন করেছেন। ইমাম শাফেয়ী জন্মগ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের হাদীসসমূহ সহীহ ফিকাহ দ্বারা যাচাই করে দিয়েছেন।"

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহমাতুল্লাহ আলাইহে জন্মগ্রহণ করে নিখুঁত সত্যের রাজপথের পথিক সেজে সুস্পষ্ট সুন্নত পথকে দেদিপ্যমান করে তুলেছেন।

ইমাম এয়াহইয়া বিন সাঈদ সহী রেওয়ায়েতের ভিত্তি পত্তন করে হাদীস শাস্ত্রকে সহজ বোধগম্য করে তুলেছেন।

ইমাম বোখারীর উস্তাদ আলী বিন মদীনী রাহমাতুল্লাহ আলাইহে বলেন, "আমাদের হাদীস বন্ধুদের মধ্যে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল সকলের চেয়ে উত্তম হাফেজুল হাদীস।"

ইমাম দারকুৎনী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহের এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, ইমাম সুফিয়ান সওরী রাহমাতুল্লাহ আলাইহের মৃত্যুর পর সম্বন্ধে আর দ্বিতীয় ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেননি। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহমাতুল্লাহে আলাইহের মৃত্যুর পর বেদাআৎ দেশময় ছড়ায়ে পড়ে। ইমাম সাহেবের জমানায় তা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারেনি। তিনি এক লক্ষ হাদীস হতে বাছাই করে 'মসনদে আহমদ' লিখেন। এতদ্ব্যতীতও তিনি বহু বিখ্যাত গ্রন্থরাজি দ্বারা মুসলিম জগতের অশেষ উপকার সাধন করে গিয়েছেন।

শাগরেদ

ইমাম সাহেবের বহু শাগরেদ ছিলেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত তিনজন সবিশেষ বিখ্যাত ও নামজাদা ছিলেন।

(১) আবু বকর আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাফীমা'রুফ। তিনি হাম্বলী ফিকাহ সম্বন্ধে বহু কিতাব লিখেন।

(২) আহমদ বিন মুহাম্মদ বিননেল হাজ্জুল মারুজী। তিনিও ফিকাহর বহু কিতাব লিখেন।

(৩) ইসহাক বিন ইব্রাহীমুল মারুজী। তিনিও হাম্বলী মাযহাব সম্বন্ধে বহু কিতাব রচনা করেন।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহে হযরত ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহের কাছ হতে ফিকাহ শাস্ত্র সম্বন্ধে পরিপূর্ণ শিক্ষা লাভ করেন। আর কোন কোন মাসআলা সম্বন্ধে হাম্বল সাহেব নিজেও এজতেহাদ করেছেন।

ইমাম শাফেয়ী সাহেব তাঁকে প্রাণাধিক ভালবাসতেন। তাঁর প্রতি তিনি সুগভীর আস্থা রাখতেন। আর প্রায় সময়ই তিনি বলতেন, "দেখছ আহমদ আমার এজতেহাদ ও রায়ের খেলাফ তোমার চোখে যদি কোন হাদীস দৃষ্টিগোচর হয়, তবে তুমি আমাকে ওয়াকিফহাল করবে; তা হলে আমি নিজকে সংশোধিত

করতে পারব। কেননা, আমি হুজুর আলাইহিস সালামের এরশাদের খেলাফ যদি কোন মত পোষণ করি, তবে এ আসমান ও জমীনে এমন কে আছে যে, আমাকে রক্ষা করবে!"

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ও ইমাম শাফেয়ীকে পরম ভক্তির চোখে দেখতেন। তিনি তাঁর উস্তাদের খেদমতে মুহূর্তকাল থাকতে পারলেও তাকে পরম সৌভাগ্যের বিষয় মনে করতেন।

ইমাম বায়হাকী এক ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যাক্তি ইমাম আহমদ রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহের কাছে ইমাম মালেক কেমন লোক, এ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, তাঁর হাদীস সহী কিন্তু রাবী দুর্বল। অর্থাৎ ইমাম মালেকের হাদীস-তো সহী কিন্তু তাঁর রায় কমজোর।

সেই লোকটি আবার ইমাম আওজায়ী সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন হাদীস ও রাবী উভয়ই দুর্বল। তাঁর হাদীস ও কমজোর এবং রায় ও কমজোর।

লোকটি আবার ইমাম শাফেয়ী সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে, তিনি বললেন, হাদীস ও রাবী উভয়ই সহী। তাঁর হাদীসও সহী এবং রায়ও সহী। সর্বশেষে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, তাঁর রায় ও হাদীস কোনকিছুই নেই।

ইমাম বায়হাকী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহ্ ইমাম আহমদ রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহের মতামতকে অধিক স্পষ্ট করে বলেছেন যে, হযরত ইমাম মালেক রাহমাতুল্লাহ আলাইহের রেওয়ায়েত অত্যন্ত সহী ও গ্রহণযোগ্য। আর সনদের দিক দিয়ে এতে কোন ত্রুটি নেই। কিন্তু তিনি কোন মাসআলা সম্বন্ধে মদীনাবাসীর আমলের উপর খুব বেশী গুরুত্ব প্রদান করেছেন এবং তাঁদের আমলকে সম্মিলিত মত বলে দাবী করেছেন। অথবা কোন এক শহরের সম্মলিত আমলকে বলা যায় না।

ইমাম আওজায়ী সম্বন্ধে ইমাম আহমদ যা বলেছেন, এটার কারণ এই যে তিনি কোন কোন মাসআলা সম্বন্ধে রেওয়ায়েতের উপর আমল করেছেন। আর সেই সকল রেওয়ায়েতের উপর ভিত্তি করে তিনি কেয়াস দ্বারা ফতোয়া দিতেন।

ইমাম শাফেয়ী সম্বন্ধে ইমাম আহমদ রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহে বলেছেন যে, তিনি সহী হাদীস পেলেই যদিও তা মক্কী, এয়মনী বা মিসরী হোক, যেকোন শহরের রেওয়ায়েতের উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করতেন।

ইমাম রবীয় বলেন যে, ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহে যখন মিসরে চলে যাচ্ছিলেন, আমাকে বললেন, "আপনি আমার এ চিঠি ইমাম আহমদের কাছে নিয়ে যেয়ে জবাব নিয়ে আসুন।"

আমি বাগদাদে পৌঁছে ইমাম আহমদকে ফজরের নামাযে লিপ্ত দেখতে পেলাম। তিনি নামায হতে অবসর গ্রহণ করলে, পত্রটি দানপূর্বক বললাম, "মহামহিম ইমাম শাফেয়ী উত্তর দান করেছেন।"

আমি পত্রখানি পড়েছি কিনা, ইমাম সাহেব চাইলেন। আমি তা পড়িনি শুনে তিনি লেফাফা খুলে পত্রাখানি পাঠ করতে লাগলেন। তখন তাঁর চক্ষু আশ্রুত ভরে উঠল।

আমি পত্রের মর্ম জানতে চাইলে তিনি বললেন, এতে ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহে লিখেছেন যে তিনি হুজুর আলাইহিস সালামকে স্বপ্নে দেখেছেন এবং হযরত ইমাম শাফেয়ীকে আদেশ করেছেন, "তুমি আবু আবদুল্লাহ্ আহমদ বিন হাম্বলকে পত্র লিখ। তাতে তাকে আমার সালাম জানাও যে, তোমাকে দুনিয়ায় শীঘ্রই এর ঝগড়ার বিপদে পতিত হতে হবে। খোদা তোমাকে সত্যের উপর অটল রাখবেন। তোমার এলম কেয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে।"

রবীয় তাঁকে তখন মোবারকবাদ জানালেন। ইমাম সাহেব তখন পত্রে জবাব দিলেন। তারপর তাঁর পরিধানের কোর্তা খুলে রবীয়ের হাতে দান করে এটা হযরত ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইকে নজর স্বরূপ দান করার জন্য অনুরোধ করলেন।

হযরত রবীয় মিসরে ফিরে ইমাম শাফেয়ী সাহেবের খেদমতে ইমাম আহমদ কোর্তা সম্বন্ধে তিনি বিশেষ জানতে চাইলে আমি সব কথা খুলে বললাম।

ইমাম শাফেয়ী সাহেব তন কোর্তাটি ভিজায়ে এটার পানি বরকত স্বরূপ ব্যবহার করতে লাগলেন।

ইমাম আহমদ সাহেব হযরত ইমাম শাফেয়ী সাহেবের জন্য প্রতি নামাযের পর সেজদায় যেয়ে বিশেষভাবে দোয়া করতেন আর কেউ যখন ইমাম শাফেয়ী সম্বন্ধে কোন আলাপ-আলোচনা করতেন, তখন তিনি বলতেন, "আমি আমার শেখ, সাহেবের আদেশ মত জীবন যাপন করে থাকি।"

তৃতীয় শতাব্দিতে বেদায়াৎ ও মু'তাজেলাদের ঝগড়া যখন মাথাচাড়া দিয়ে উঠছিল এবং শুধু একজন খলীফা নয় এবং ক্রমান্বয়ে মামুন, মু'তাসিম এবং ওয়াসেক বিল্লাহের তরবারিও উত্তোলিত হলো, তখন বহু আলেম পর্যন্ত অসত্যের কাছে মাথা নত করলেন।

পথহারাদের অভিমত এ ছিল যে, হুজুর আলাইহিস সালামের এরশাদ যথেষ্ট

নয় এতদ্ব্যতীতও বহু কিছু বলবার এবং করবার রয়েছে। বিচারপতি ও আমীরদের সন্তুষ্টির উপরও গুরত্ব দেয়া কর্তব্য। আর আমাদের প্রত্যেক কল্পনা ও ধ্যান ধারণার মূল্য রয়েছে। দর্শন শরীয়তের বিচারক।

এ সকল আবোল-তাবোল বকাবকির কাছে অনেকেই প্রথমেই মাথা নত করল। অনেকে তো প্রথমে সত্যের উপর অটল রইলেন। কিন্তু সরকারী ঝড়ের দমকা বাতাসে তাঁদের ঈমান-আমান ধূলিবৎ উড়ে গেল। অনেকের ধারণা এরূপ ছিল যে, এটা হাদীস প্রচারের যুগ নয়। ঝড়ের সময় নৌকাডুবিতে লোকেরা যেরূপ দো'আ করতে থাকে, তদ্রূপ দো'আ করেই স্বীয় কর্তব্য ফতে করলেন।

অনেকে বলতে লাগলেন, আজকাল খামোশ থাকবার জমানা। এখন নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে থাকবার দিন।

নামজাদা আলেমদের যখন এরূপ মনোভাব, তখন দীনকে রক্ষা করবার নিমিত্ত মহান আত্মদান অপরিহার্য হয়ে উঠল। তখন একমাত্র ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের উপরই সবকিছু আশা-ভরসা নির্ভর করছিল। তিনি দুনিয়ার কাছে মাথানতকারী আলেমদের প্রতি একটিবারের নিমিত্তও দৃষ্টিপাত করা দূরে কথা, শাসনকর্তাদের হুমকি, শাস্তি ও অমানুষিক অত্যাচারের সম্মুখে হিমালয় পর্বতের ন্যায় অচল অটল রইলেন। ঝড়ের দমকা বাতাস, ঘূর্ণিবায়ূ তাঁর ব্যক্তিত্বের সাথে ধাক্কা লেগে চূর্ণ-বিচূর্ণ ও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

তিনি কারারুদ্ধ হলেন। তাঁর পায়ে বেড়ী দেয়া হলো। তাঁকে বাগদাদ হতে তারতাউস নেয়া হলো। পবিত্র রমজানের শেষ দশ দিন। প্রখর রৌদ্রতাপে তাঁকে পথ চলতে হয়েছে। যাঁর দেহমনে নবুওতী এলম ও মারেফত আশ্রয় গ্রহণ করেছিল, তাঁর পৃষ্ঠদেশে যথা-শক্তি কোড়া মারা হয়েছে। জল্লাদের জল্লাদগিরি পুরাদমে চলেছে কিন্তু ইমাম সাহেবের মুখে একটি মাত্র বুলি, কোরআন আল্লাহর কালাম।

ইমাম সাহেব মৃত্যুর গর্জনকে অমৃতের ন্যায় শুনছিলেন। তখন মু'তাসিম সেখানে হতভম্বের ন্যায় দাঁড়ায়ে বলছিলেন–"হে আহমদ, আমি আমার পুত্রকে যতটুকু ভালবাসি, আপনাকে আমি তদপেক্ষা শতসহস্র গুণ অধিক ভালবাসি। কিন্তু আপনি একবার যদি মেনে নেন, তবে আমি নিজ হাতে আপনার পায়ের শৃঙ্খল খুলে দিব।"

ইমাম সাহেব তখন বজ্র কঠোর ভাষায় ঘোষণা করলেন, "খোদার কলাম হুজুর আলাইহিস সালামের এরশাদ দ্বারা তা প্রমাণ করুন, তবে আমি অবিলম্বে তা স্বীকার করে নিব।"

মু'তাসিম তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে কাজী ইবনে দাউদ এবং অপরাপর আলেমদেরকে বললেন, "আপনারা ইমাম সাহেবের সম্মুখে আপনাদের দলীল পেশ করুন।" তখন তারা মুনতেকী প্রমাণাদি দিতে থাকলে ইমাম সাহেব বললেন, "কোরআন এবং হাদীস ব্যতীত আমি অপর কোনকিছু আবোল তাবোল শুনতে রাজী নই।"

ইব্রাহীম বিন মাসআব বলেন, "আমি ইমাম আহমদের চেয়ে উপযুক্ত লোক অপর কাউকেও দেখিনি। আমরা তো দূরের কথা, রাজা বাদশাহগণও তাঁর তুলনায় মক্ষিকা সদৃশ।"

আল্লামা ইবনে জুঝী বলেন, "ইমাম আহমদ যখন কারাগারে ছিলেন, তখন ওলমায়ে কেরাম একত্র সমবেত হলেন। তাঁরা এমন রেওয়ায়েত বর্ণনা করলেন, যা দ্বারা প্রাণ বিনাশের আশঙ্কা থাকলে, প্রাণ বাঁচাবার পথ অবলম্বন করা যায়।"

ইমাম সাহেব এটা শুনে বললেন, "হুজুর আলাইহিস সাল্লামের এ এরশাদের আপনারা কি জবাব দিয়েছেন? সাহাবায়ে কেরাম যখন হুজুর আলাইহিস সালামের কাছে তাঁদের প্রতি কাফেরদের অত্যাচারের কথা বর্ণনা করলেন, তখন তিনি ফর্মাইলেন, শ্রবণ কর যে তোমাদের পূর্বেও এমন লোক অতীত হয়ে গিয়েছেন যাঁদের মাথার উপর করাত চালান হয়েছে এবং শরীর তক্তার ন্যায় চিরে ফেলা হয়েছে। কিন্তু সত্য প্রচারে এই পরীক্ষাও তাঁদেরকে রুখতে পারেনি।"

আবুল আব্বাস বলেন, "আমরা এ রেওয়ায়েত শুনে খামোশ হয়ে গেলাম।"

ইমাম সাহেব স্বয়ং বলেছেন, "রোযার দিনে আমাকে এরূপে প্রহার করা হয়েছিল যে, আমার শরীর রক্তে রঞ্জিত হয়ে গিয়েছিল এবং আমি অচেতন হয়ে পড়েছিলাম। আমার চেতনা হওয়ার পর কয়েক ব্যক্তি পানি নিয়ে আসল এবং আমাকে পানি পান করতে অনুরোধ করল। 'রোজা ছাড়া যায় না' বলে আমি পানি ফিরায়ে দিলাম। আমাকে সেখান হতে ইসহাক বিন ইব্রাহীমের বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হলো। তখন যোহরের নামাযের সময় হয়ে পড়ল ইবনে সমাআ ইমামতী করলেন। আমিও তাঁর পিছনে নামায আদায় করলাম।"

ইবনে সমাআ নামাযের পরে বললেন, "আপনার নামায কিরূপে জায়েয হবে এখনও-তো রক্ত নির্গত হয়েছে। আর আপনার পোষাক রক্তে রঞ্জিত। জওয়াবে আমি বললাম যে, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুরও নামাযের সময় জখম হয়েছিল, রক্ত নির্গত হচ্ছিল। কিন্তু তিনি নামায পূর্ণ করেন।"

ইমাম সাহেবের পুত্র হযরত আবদুল্লাহ্ বলেন, "আব্বাজান সর্বদাই এবং ব্যক্তির জন্য নিম্নলিখিত দো'আ পাঠ করতেন, হে খোদা, আবুল হাশেমকে ক্ষমা করিও এবং তার উপর রহম করিও।"

আমি আরজ করলাম, "আবুল হাশেম কে?" তিনি বললেন, "শুন সিপাহী যেদিন আমাকে শাহী দরবারে নিয়ে যায়, তখন পথিমধ্যে এক ব্যক্তির সাথে আমার দেখা হয়। লোকটি বলল, "আপনি কি আমাকে চিনেন আমি একজন চোর ডাকাত এবং প্রবঞ্চক। আমার নাম আবুল হাশেম সরকারী দপ্তরে নাম লিপিবদ্ধ রয়েছে। কোড়া মেরে যদি আমার অপরাধের শাস্তি বিধান করা হয়, তবে আমার পিঠে আঠার হাজার কোড়া মারতে হবে। কিন্তু আমাকে গ্রেপ্তার করবে, এমন কার সাধ্য? শুনেন, শয়তানের পায়রবীতে আমি এরূপে অবিচল রয়েছি। কিন্তু আপনি যদি আল্লাহ্ তায়ালার রাস্তায় এ মহা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হতে পারেন, তবে আপনার জন্য আমার বহু আক্ষেপ হবে।" তার নসীহত আমার অন্তরকে স্পর্শ করেছেন।

সুসংবাদ

আল্লামা ইবনে জুযী বলেন, "আমি হযরত বশর হাফীকে স্বপ্নে দেখলাম। তাঁর আস্তীনের মধ্যে কোন বস্তু নড়াচড়া করছিল। আমি তাঁকে সেই সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, রাত্রিকালে ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের উপর মুক্তা ও ইয়াকুত বর্ষণ করা হয়েছিল। তন্মধ্যে হতে আমিও কয়েকটি কুড়িয়ে নিয়েছি। আমার আস্তীনের ভিতর তা রেখে দিয়েছি।

আল্লামা ইবনে জুযী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহে বলেন, "আবু বকর মারুজী হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহকে স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি বড় জাঁকজমকের সাথে একস্থানে উপবিষ্ট রয়েছেন। তাঁর পরণে দুইটি সবুজ এবং এর চাদর আর তাঁর শিরোপরি এমন একটি তাজ শোভা পাচ্ছিল যে, এটাকে একটি নূরের খণ্ড বললেনও অত্যুক্তি হবেনা। তাঁর চালচলন ছিল অভিনব রকমের। আমি তখন জিজ্ঞেস করলাম, আপনার চলচলন বড় অভিনব দেখছি। তিনি বললেন, "শান্তি-নিকেতনের অধিবাসীদের চালচলন এরূপ হয়ে থাকে।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি এ তাজ কোথা হতে পেলেন?" তিনি বললেন, "আমার খোদা অতি সদয়ভাবে আমার হিসাব গ্রহণ করে আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আর আমাকে তাঁর দীদার-উপভোগের অনুমতি দান করেছেন। খোদা আরও বলছেন, "হে আহমদ, এটা বড় সম্মানিত তাজ। তুমি পরম ধৈর্যের সাথে আমার কলামকে বলছে। এটার পুরস্কার রূপে তোমাকে এ তাজ প্রদত্ত হলো।"

হাফেজ ইবনে হাজর আসকলানী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহে 'তাহজীবুত্তাহজীব' কিতাবে লিখেছেন যে, আবুল হাসন জাগূনী বলেন যে, যখন শরীফ আবু জাফর

বিন আবী মুসার কবর হযরত ইমাম আহমদ হাম্বল রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহের পাশে খনন করা হচ্ছিল, তখন হযরত ইমামের কবরের পাশও খুলে গেল। তখন দেখা গেল যে, কাফন পূর্বের ন্যায়ই অটুট রয়েছে এবং তাঁর পার্শ্বদেশ ও শরীর অক্ষত রয়েছে।"

হযরত ইমামকে দাফন করার দুইশত ত্রিশ বছর পরে এ ঘটনা ঘটে। রাদিয়াল্লাহু তায়ালা রয়েছে।"

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, নবুওতের অংশের মধ্যে সত্য স্বপ্ন ব্যতীত অপর কোন অংশ বাকী নেই। মুমিন হয়ত নিজে সেই স্বপ্ন দেখবে না অপরে তার সম্বন্ধে স্বপ্ন দেখবে। হাদীস শরীফে এটাও রয়েছে যে, মুমিনের স্বপ্ন নুবুওতের ছয়চল্লিশ ভাগের এক ভাগ।

হযরত বায়হাকী রাহ্মাতুল্লাহ আলাইহে মুসাল্লামা ইবনে মুসাবের কাছ হতে শুনেছেন যে, তিনি বললেন, "আমি হযরত আহমদ বিন হাম্বল রাহমাাতুল্লাহ্ আলাইহের খেদমতে উপবিষ্ট ছিলাম। তখন একজন অতি বৃদ্ধ লোক বড় হেলিয়া দুলিয়া ইমাম সাহেবের খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললেন, "আমি জানতে চাই যে, আপনাদের মধ্যে কার নাম আহমদ?"

ইমাম সাহেব বললেন, "আমার নাম আহমদ। আপনার কোন প্রয়োজন আছে কি?"

সেই বৃদ্ধলোকটি বললেন, আমি সুদূর পথ অতিক্রম করে আপনাকে সুসংবাদ দান করতে আসছি যে, আমি হযরত আলাইহিস সালামকে স্বপ্নে দেখেছি। তিনি বললেন যে, তুমি আহমদের কাছে যেয়ে বল যে, আরশের অধিবাসীগণ এবং ফেরেশতাকুল তার প্রতি সন্তুষ্ট ও খুশী। এটার কারণ এই যে, তুমি আল্লাহ তালার রাস্তায় অসাধারণ ও অতুলনীয় ধৈর্য প্রদর্শন করেছ।"

আবু আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ বিন খজীনাতুল ইসকান দারানী বর্ণনা করেছেন, "হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের মৃত্যুতে আমার মনে ভীষণ ক্ষোভের উদ্রেক হয়। একদিন আমি তাঁকে স্বপ্নে দেখলাম যে, তিনি মহাখুশীভরে কোথাও যেতেছেন। আমি এটার কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, দারুচ্ছালামের অধিবাসীদের চালচলন এরূপই হয়ে থাকে। অতঃপর খোদাতায়ালা তাঁর সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন, তা জানতে চাইলে তিনি বললেন, আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং এটাও জানিয়ে দিয়েছেন, "তুমি আমার কালাম বলে প্রচার করেছ এজন্যই তোমাকে এ সকল পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করা হয়েছে।"

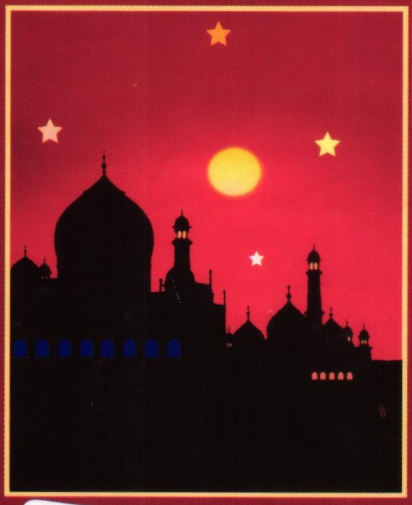
আমি তখন আবার তাঁকে বললাম, "আহমদ, আপনি সুফিয়ান সওরীর জন্য যেরূপ দো'আ করেছেন, আমার জন্য তদ্রূপ দো'আ করবেন।"

আহমদ বললেন, "আমি খোদাতায়ালার কাছে আরজ করেছি, হে খোদা আপনি আমার সমুদয় অপরাধ ক্ষমা করে দিন এবং আমাকে যেন কোন ঝুঁকি সইতে না হয়। আল্লাহ তায়ালা বললেন, আহমদ, এটা বেহেশত, তুমি এতে ঢুকে পড়। আমি সেখানে যেয়ে সুফিয়ান সওরীকে দেখতে পেলাম। আমি তাঁকে বেহেশতের এক বৃক্ষ হতে অন্য বৃক্ষে উড়ে যেতে দেখলাম। তখন তিনি এ আয়াত পড়ছিলেন।

অতঃপর আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, "বশর হাফীর সাথে কিরূপ ব্যবহার করা হয়েছে? তিনি বলেছেন, খামোশ থাকুন। আল্লাহ। আল্লাহ! কে বশরের সমকক্ষ হতে পারে? আল্লাহ তায়ালার সম্মুখে আমি তাঁকে ছেড়ে আসছি। তাঁর সম্মুখে আহার্যের নিমিত্ত বড় এক দস্তরখানা বিছান হয়েছে। আর আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রতি তাওয়াজ্জু করেছেন। আর বলেছেন, ওহে আমার সেই বন্দা তুমি খাও, তুমি দুনিয়াতে পরিতুষ্ট ভাবে আহার করনি। আর তুমি আরাম কর, তুমি যে দুনিয়ায় আরাম ভোগ করনি।"

আহমদ বিন আবী হাতেম মুহাম্মদ বিন মুসলিম হতে রেওয়ায়েত করেছেন যে আবুজরআ যখন মৃত্যুমুখে পতিত হলেন, তখন আমি তাঁকে স্বপ্নে দেখলাম এবং আল্লাহ তাঁর সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন তা জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, মহামহিম আল্লাহ তায়ালা আদেশ করলেন যে, তাঁকে আবু আবদুল্লাহ, আবু আবদুল্লাহ্ এবং আবু আবদুল্লার সাথে একত্রে বসবাস করতে যাও। অথ্যাৎ মালেক শাফেয়ী ও আহমদের ডাক নাম ছিল আবু আবদুল্লাহ্।

ওসমান বর্ণনা করেছেন, "আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, কেয়ামত সংঘটিত হয়েছে এবং আল্লাহ তায়ালা বিচার করার জন্য সমাসীন হয়েছেন। আর আরশ হতে এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করছে যে, মালেক, শাফেয়ী ও আহমদকে বেহেশতে প্রবেশ করাও। আমি এটার বিস্তৃত বিবরণ আমার পাশে দণ্ডায়মান এক ফেরেশতার কাছ হতে জানতে পেরেছিলাম।"



চার ইমামের জীবনী
মাওলানা লুৎফুর র...
45794#1455599-1
ROK-STK

মীনা বুক হাউস
বুক এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স-এর ২০৮ নং দোকান
৪৫ বাংলাবাজার (২য় তলা) ঢাকা ও
৫, ১৩ বায়তুল মোকাররম, ঢাকা